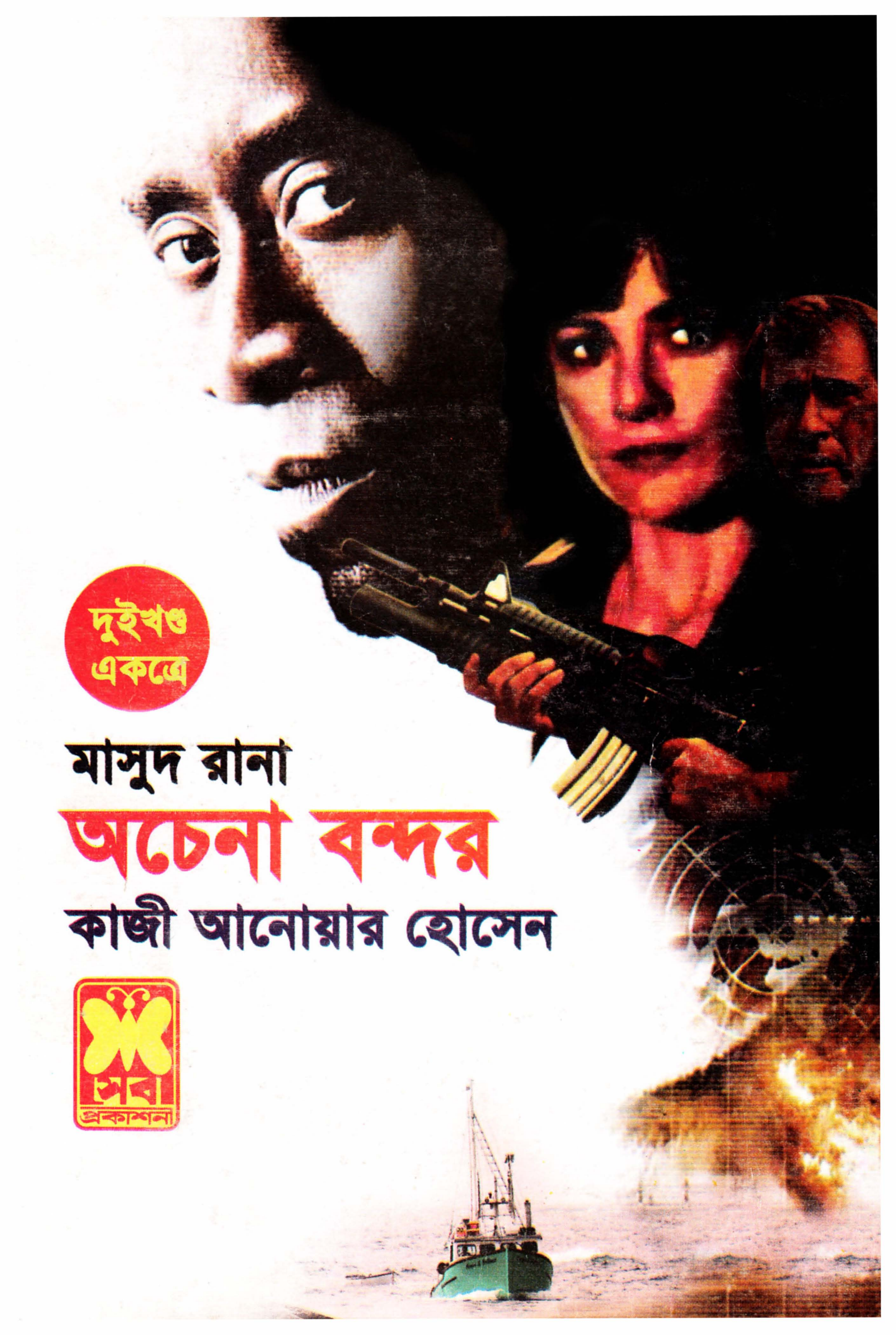

দুইখণ্ড একত্রে

মাসুদ রানা

অচেনা বন্দর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা
দুইখণ্ড একত্রে

অচেনা বন্দর

কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানার বাহুতে রিমোট-কন্ট্রোলড্ বোমা প্ল্যান্ট করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে: আমাদের কাজটা করে দাও, বাছা; নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। কারও সাধ্য নেই যে তোমাকে রক্ষা করে। হুমকিটা মিথ্যে নয়—প্রমাণ পেয়েছে ও। আতাসী, মার্সিয়া, ফায়জা ও মিশ্রি খানকে নিয়ে কাজে নেমে গেছে মাসুদ রানা। সঙ্গে অতিথি শিল্পীর মত অংশ নিল সোহেল, গিলটি মিয়া। কিন্তু একদিকে বোমা, ও প্রতিপক্ষের তাগিদ; অন্যদিকে ধরা পড়ার ভয়—সব মিলিয়ে চরম উদ্বিগ্ন ও। এতকিছু সামলে আস্ত একটা দেশ হজম করতে হবে ওকে। করতেই হবে। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

অচেনা বন্দর

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7684-2

চুয়াশি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
ACHENA BANDOR
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

অচেনা বন্দর-১ : ৫–১৬৩
অচেনা বন্দর-২ : ১৬৪–৩২৮

ভূমিকা

আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই নেই। ঝোপঝাড় আর খুদে রকেট সাইজের রাক্ষুসে মশায় ভর্তি পরিত্যক্ত এয়ারস্ট্রিপটায় দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছে পশ্চিম আফ্রিকার নিকষ কালো রাত। তার মধ্যে এখানে-সেখানে জটলা করছে কিছু লোক। আকাশের গায়ে তাদের কাঠামো ফুটে আছে।

নিচু স্বরে কথা বলছে সবাই। আলোচনার বিষয় যদিও গোপন কিছু নয়। তবু পরিবেশে টান টান উত্তেজনা। খানিক পর পর সিগারেটে চুমুক দিচ্ছে তারা, টকটকে লাল আগুন জ্বলে উঠছে এখানে-সেখানে। দু'-এক মুহূর্তের জন্য, তারপরই আবার স্তিমিত হয়ে আসছে।

ঝিঁঝিসহ নানান নিশি-পতঙ্গের চড়া কোরাসের শব্দে সরগরম হয়ে আছে গোটা এলাকা। কান ঝালাপালা হওয়ার দশা।

মেঘ একেবারে নীচে নেমে এসেছে আজ রাতে। স্ট্রিপের পাশের ইরোকো গাছগুলোর মাথা ছুঁই ছুঁই করছে। প্রতীক্ষারত লোকগুলো মনে মনে প্রার্থনা করছে: আরও কিছুক্ষণ যেন ওভাবেই থাকে মেঘ। শিকারী কুকুরের মতো হন্যে হয়ে আকাশ চষে বেড়ানো মিগ সেভেনটিনগুলো যেন তাদের অবস্থান শনাক্ত করার সুযোগ না পায়।

ল্যাণ্ডিং লাইটের সাহায্যে মিনিটখানেক আগে এখানে নেমেছে একটা ঝক্কর মার্কা সুপার কনস্টিলেশন। ফাইনাল অ্যাপ্রোচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, খুব বেশি হলে পনেরো সেকেণ্ডের জন্য জ্বলে উঠেছিল স্ট্রিপের লাইটগুলো—বিদেশী পাইলট যাতে বেয়ারিং পায়।

ওটার ক্যাপ্টেন অভিজ্ঞ মানুষ। মিশরীয় পাইলট। তার জন্য পনেরো সেকেণ্ডের পথের দিশাই যথেষ্ট ছিল। তাই সামনের চাকা মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিভিয়ে ফেলা হয়েছে ল্যাণ্ডিং লাইট।

এ মুহূর্তে দৌড়ের শেষ পর্যায়ে রয়েছে সুপার কনস্টিলেশন। অসমান স্ট্রিপের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে অন্ধের মতো ছুটে আসছে পাতার ছাউনি দেয়া কাঁচা ঘরগুলোর দিকে। পুরনো এঞ্জিনগুলো খানিক পর পর কাশছে খুক খুক করে।

দু'-তিনটে মিগ সেভেনটিনের কান ফাটানো শব্দে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জটলাগুলোর মধ্যে। কিন্তু না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটল না শেষ পর্যন্ত। নীচে আলোর আভাস পর্যন্ত নেই দেখে ইরোকো গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে ভেসে চলা মেঘের পর্দাটার ওপর দিয়ে গোঙাতে গোঙাতে পশ্চিমে চলে গেল

প্লেনগুলো। দেখা গেল না একটাকেও। তার মানে ওগুলোর পাইলটও দেখতে পায়নি নীচের স্ট্রিপ।

বিদেশী পাইলট আকাশের ফাইটারের গর্জন শুনতে পায়নি সম্ভবত। সব ক'টা চাকা মাটি ছোঁয়ার পর কোথায় চলেছে দেখার জন্য ক্ষণিকের জন্য আলো জ্বালল সে। শুনতে পাবে না জেনেও বড় একটা জটলা থেকে কেউ একজন তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, 'কিল ডি লাইটস! কিল ডি লাইটস!'

কোনও দরকার ছিল না। গন্তব্য বুঝতে দু'-এক মুহূর্তের বেশি সময় নিল না পাইলট। ঠিকমতো জ্বলে উঠতে না উঠতেই সেগুলো নিভিয়ে দিল সে। আবার কালো ভেলভেটের চাদরে ঢাকা পড়ে গেল স্ট্রিপ। ততক্ষণে ফাইটারগুলো চলে গেছে বহু দূরে।

দক্ষিণ থেকে আর্টিলারির হুঙ্কার কানে আসছে এখনও। দু' মাসের মরিয়া সংগ্রামের একটা পর্যায় শেষ হতে চলেছে। অবশেষে পরাজয় মেনে নিতে শুরু করেছে নিরুপায় টিভ উপজাতির যোদ্ধারা। কিছু করার ছিল না তাদের। রসদ নেই, গোলাবারুদ নেই, ভবিষ্যতের কোনও নিশ্চয়তা নেই। এ অবস্থায় আর কতোদিন যুদ্ধ করা চলে?

আজকের মাঝরাত পর্যন্ত ইরুবাদের প্রতিরোধ করতে পারবে তারা বড়জোর, তারপর বনের মধ্যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

বড় একটা জটলার বিশ গজের মধ্যে এসে থামল সুপার কনস্টিলেশন। একটু পর ইঞ্জিন অফ করে নেমে এলো পাইলট। এক লম্বা আফ্রিকান ছুটে গেল তার দিকে। কিছু কথা হলো দু'জনের। তারপর তাকে নিজের জটলাটার দিকে নিয়ে চলল আফ্রিকান। আপনা থেকে দু' ভাগ হয়ে গেল জটলা।

পথ প্রদর্শকের দেখাদেখি জটলার মধ্যমণির মুখোমুখি এসে থামল পাইলট। মানুষটা মাঝারি উচ্চতার। গাট্টাগোট্টা। একবার দেখলে যে কেউ বুঝবে নেতা হওয়ার জন্যই জন্ম হয়েছে এ লোকের। কালো মানুষটাকে আগে কখনো দেখেনি পাইলট। কিন্তু তাই বলে বুঝতে কোনও অসুবিধে হলো না যে এঁকে নিয়ে যেতেই পাঠানো হয়েছে তাকে।

তার ডান হাতটা আপনাআপনি স্যালিউটের ভঙ্গিতে উঠে গেল কপালের দিকে। এমন কাজ আগে কখনো করেনি সে। অন্তত কোনও কালো আফ্রিকানকে তো নয়ই। আজ কেন করল, তা সে নিজেও বলতে পারবে না।

'আমি ক্যাপ্টেন বাশির আব্বাস, সার,' বলল পাইলট।

মধ্যমণির বড়সড়ো মাথাটা দুলে উঠল। মোটা কাপড়ের ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্মের বুকের কাছে সড়সড় শব্দে ঘষা খেলো তার অযত্নে বেড়ে ওঠা কুচকুচে কালো, ঘন দাড়ি।

জবাবটা এলো চোস্ত ব্রিটিশ ইংরেজিতে, 'এমন বিপদের মধ্যে আকাশে ওড়া অত্যন্ত বিপজ্জনক, ক্যাপ্টেন।'

যেন কোনও ড্রামের ভেতর থেকে উঠে আসছে কথাগুলো। গভীর, ভরাট কণ্ঠস্বর।

একটু বিরতি। তারপর, 'তবু আপনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন বলে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আপনাকে নিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব টেক অফ করার নির্দেশ আছে আমার ওপর,' ব্যস্ত শোনাল পাইলটের কণ্ঠ। 'আমাদের এখনই রওনা হয়ে যাওয়া উচিত, সার।'

কসম করে বলতে পারে পাইলট, জীবনে কখনও কোনও কালো আফ্রিকানকে 'সার' বলে ভুলেও সম্বোধন করেনি। আজ মনের ভুলে সব ওলট-পালট... মনের ভুলে?

তবে এই মানুষটা যে অন্য জাতের, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। কী জাদু আছে এর মধ্যে? ভাবল পাইলট।

প্রায় নীরব চারদিক। নিশি-পতঙ্গ বাহিনীও বড় পতঙ্গের আগমনে সুর হারিয়ে নীরব হয়ে গেছে। দাড়িওয়ালার মাথা একটু একটু দুলছে। কোনও গভীর ভাবনা মাথায় ভর করেছে নিশ্চয়ই। পাইলটকে যে লম্বা আফ্রিকান রিসিভ করেছিল, সে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

'আমাদের তাড়াতাড়ি করা উচিত, সাহ্।'

'রাইট,' আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল পাইলট। 'আপনাকে নিয়ে আকাশে না ওড়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি হবে না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মানুষদের কথা ভেবে পা উঠছে না।'

'আপনি চিন্তা করবেন না, সাহ্,' লম্বা সঙ্গী আশ্বস্ত করতে চাইল তাকে। 'আমরা এখনও বেঁচে আছি। আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবো আমরা।'

'আসুন। প্লিজ!' বলল পাইলট।

ব্যস্ত পায়ে প্লেনে ফিরে গেল। দাড়িওয়ালা মুখ তুলে মেঘের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন। যারা যাচ্ছে না, তাদের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন একে একে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কেউ বাদ পড়ে গেল কি না দেখলেন। তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালেন প্লেনের দিকে। দু' কাঁধ ঝুলে পড়েছে।

একই মুহূর্তে মৃদু কাশির সঙ্গে স্টার্ট নিল প্লেনের চার ইঞ্জিনের প্রথমটা। নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে বাকি তিন ইঞ্জিনও এক এক করে চালু হলো। জেনারেলের সঙ্গীদের মধ্যে যারা যাওয়ার ছিল, তারা উঠে পড়ল ঝটপট।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনের গর্জন চড়তে লাগল একটু একটু করে। খানিক পর ঘুরল সুপার কনস্টিলেশন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থেকে ছোটোখাটো একটা লাফ দিয়ে সামনে ছুটল। ঝাঁকি আর দোল খেতে খেতে যেদিকে ল্যাণ্ড করেছিল, সেই দক্ষিণ প্রান্তের দিকে ধেয়ে চলল।

একটু পর শূন্যে নাক জাগাল ওটা, ইরোকো গাছগুলোর মাথা ছুঁয়ে মেঘের রাজ্যে হারিয়ে গেল তিনটে ফিন।

একটা ঘণ্টা ভয়ে ভয়ে, খুব সাবধানে প্লেন চালাল ক্যাপ্টেন বাশির আব্বাস। খোলা আকাশ সযত্নে এড়িয়ে গেল। এক মেঘের রাজ্য থেকে আরেক মেঘের রাজ্যে ঢুকে এগোলো। নইলে যে কোনও মুহূর্তে নাইট ফাইটারগুলোর চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কেননা চাঁদ উঠে পড়েছে ততক্ষণে।

যখন মনে হলো উপসাগরের অনেক গভীরে এসে পড়েছে সুপার কনস্টিলেশন, উপকূল বহু মাইল পিছনে ফেলে আসা গেছে, তখন কেবিন লাইটগুলো জ্বেলে দিল সে।

অচেনা বন্দর-১

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৯

এক

মশারির নীচে ক্যাম্প খাটের ওপর মূর্তির মতো অনড় বসে থাকা বিশাল কাঠামোটা নড়ে উঠল জেমস ব্রায়ানের। সামনে ঝুঁকে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল সে নীচের ঈষৎ ভেজা লালচে মাটিতে। পুবের গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দিনের প্রথম আলোর আভাস ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

সামনে খানিকটা জায়গা খালি। তার ওপাশের কয়েকটা গাছের আকৃতি মোটামুটি দেখা যায়। আসলে যতোটা না দেখা যায়, তারচেয়ে বেশি অনুমান করা যায়।

নিজের চারদিকের দুর্ভেদ্য, অন্ধকারে ডুবে থাকা জঙ্গলটাকে কল্পনায় আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করল ব্রায়ান। তারপর কাকে যেন অভিসম্পাত দিল বিড় বিড় করে। তার স্থানীয় লেবার, টিভরা তাকে মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করে, সাগর পাড়ের সভ্যতা ফেলে এই পোড়া জায়গায় কেন বার বার ফিরে আসে সে? কিসের টানে?

প্রশ্নটা সে নিজেও নিজেকে করে। সত্যিই তো। এই বিষাক্ত পোকামাকড়ে ভরা মহাদেশে সে কেন আসে? এখানকার কোন্ জিনিসের মায়া সে কাটাতে পারে না?

যদি বিষয়টা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে মাথা ঘামায়, তা হলে তার স্বীকার না করে উপায় থাকবে না: এখানেই কবে কখন যেন বাঁধা পড়ে গেছে তার নিয়তি। আর কোথাও গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারবে না সে। ডালউইচে তো নয়ই, সারা ইংল্যাণ্ডেও নয়। ইট-কাঠ, কাঁচ আর লোহা লক্কড়ের শহর সহ্য হয় না ব্রায়ানের। কঠোর আইন-কানুন, নানান বিধিনিষেধ, ইনকাম-ট্যাক্স নামের বাড়াবাড়ি বা হাড় কাঁপানো শীত-তুষার, কোনওকিছুই ধাতে সহ্য হয় না কেন যেন। আফ্রিকাই ভাল তার কাছে। এ মহাদেশটিকে সে যেমন ভালবাসে, তেমনি ঘৃণাও করে।

এখানকার ম্যালেরিয়া, পাম ওয়াইন, উইস্কি, অজস্র বিষাক্ত পোকামাকড়ের হুল বা কামড়ের মত আফ্রিকাও তার রক্তে মিশে গেছে। এখান থেকে চলে যেতে হলে বাঁচবে না সে।

জেমস ব্রায়ানের বয়স এখন বিরাশি। কিন্তু দেখলে মনে হবে বড়জোর ষাট-পঁয়ষট্টি। লম্বায় প্রায় সাত ফুট। প্রকাণ্ড কাঠামো। পোড় খাওয়া পেশিবহুল দেহটাকে কেন যেন রক্ত-মাংসের মনে হয় না। মনে হয় কড়া পাক দেয়া জাহাজ বাঁধার কাছি।

জাতে ব্রিটিশ সে। খেলার বয়স পার হতে না হতে দেশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামের বিভীষিকায় জড়িয়ে পড়তে দেখেছে। লুফৎওয়াফের বোমা বর্ষণে

এক রাতেই বাপ-মা হারিয়ে এতিম হয়েছে সে আর ছোটো বোন রায়না।

তাদের বয়স তখন চোদ্দো আর এগারো। যুদ্ধের পর দেশে দেখা দেয় চরম অভাব, বেকারত্ব আর ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। ফলে তরুণ প্রাণটা অল্পদিনেই হাঁপিয়ে ওঠে তার।

কিছুদিনের মধ্যে রায়না রেড ক্রসের এক মেল নার্সকে বিয়ে করে ফেলায় পিছুটান মুক্ত হতে পেরে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় ব্রায়ান। কাউকে কিছু না জানিয়ে আফ্রিকামুখী জাহাজে উঠে বসে একদিন। শতাব্দীর প্রচণ্ডতম শীতে জবুথবু, খাদ্য, পানি, বিদ্যুৎসহ সবকিছুতে রেশনিং-এর দেশ, উইনস্টন চার্চিলের আকাশছোঁয়া রাজনৈতিক অভিলাষের বলি ইংল্যাণ্ডকে বিদায় জানিয়ে চলে আসে এখানে। সেই থেকে পশ্চিম আফ্রিকাই তার সব। ষাট বছরের বেশি হয়ে গেছে এখানে আছে সে।

প্রথমদিকে কিছুদিন ইংরেজ মালিকানাধীন খনিতে কাজ করে পেট চালিয়েছে, তারপর এক সময় নিজেই বিনু অধিত্যকায় ছোটোখাটো এক টিন খনির মালিক হয়ে বসে। জায়গাটা নাইজেরিয়ার জস শহরের আশি মাইল দূরে।

সেই আমলে ইংলিশ ক্লাবে আড্ডা দিতে আসা ইংলিশ মেয়েরা বিশালদেহী ব্রায়ানের প্রতি আকৃষ্ট হতো। কিন্তু সে পাত্তা দিত না। আশাহত মেয়েগুলো বলতো, 'ও একটা জংলী' অথবা 'ব্যাটা লম্বু আনস্মার্ট।'

মেকি ভদ্রতা, মাপা হাসি-কথা, কিছুই ভাল লাগতো না জেমস ব্রায়ানের। আফ্রিকান জীবন ধারার সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে গিয়েছিল সে। বুনো পরিবেশ ভাল লাগে। আফ্রিকানদের ভাল লাগে। ওরা তার হাজারো বকাঝকা, ধমক-ধামক খেয়েও মুহূর্তে সব ভুলে যায়। উল্টে দাঁত বের করে হাসে। তিন বেলা পেট ভরে খেতে পাবে, এই আশায় মুখ বুজে গাধার মতো খাটে দিনের আলো ফোটা থেকে শুরু করে সন্ধে পর্যন্ত।

কিছুদিন পর বিনু অধিত্যকা হতাশ করে ব্রায়ানকে। খনির টিন ফুরিয়ে যেতে নতুন খনির সন্ধানে বের হয় সে। কিন্তু বরাত মন্দ বলে একটা খনি পেয়েও চার মাসের বেশি চালাতে পারেনি, কারণ ওটারও মজুদ টিন ফুরিয়ে গেছে। সেবার শুধু লোকসানই হলো না, টাকাকড়ি যা ছিল সব গেল।

এরপর নিরুপায় হয়ে এ-দেশ সে-দেশ করে বেড়িয়েছে সে কিছুদিন। এটা-সেটার আশায় খনন করেছে। রাণ্ড-এ সোনার আশায়, এনডোলার বাইরে তামার আশায়। সোমালিল্যাণ্ডে দুষ্প্রাপ্য মিষ্টি পানি আর সিয়েরা লিওনে ডায়মণ্ডের আশায়। কোনওটাতেই ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি।

এক সময় যখন পুরোপুরি দেউলিয়া হওয়ার জোগাড়, তখন এক ব্রিটিশ মাইনিং কোম্পানি ম্যানসন'স কনসোলিডেটেড বা সংক্ষেপে ম্যানকন-এ চার্জ হ্যাণ্ড হিসেবে যোগ দেয় সে। ম্যানকন তখন নতুন এসেছে এ অঞ্চলে। আজও ম্যানকনেই আছে।

এই বয়সেও আগের মতোই আছে সে। চওড়া কাঠামোর বিশালদেহী মানুষ। ষাঁড়ের মতো শক্তিশালী। হাতের পাঞ্জা দু'টো প্রকাণ্ড। বছরের পর বছর খনিতে কাজ করার ফলে কেটে-চিরে, ছাল-চামড়া উঠে এতই কর্কশ হয়ে গেছে

যে দেখলে সন্দেহ জাগে ওটা মানুষেরই হাত কি না। তারই একটা মাথার পাতলা হয়ে আসা ধূসর, খড়খড়ে চুলের মধ্যে চিরুণির মতো চালিয়ে দিল সে। নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে পরিষ্কার করতে লাগল খুলির চামড়ায় ঘামে লেপ্টে থাকা ধুলোর স্তর।

আরেক হাতে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা মশারির তলা দিয়ে বের করে মাটিতে পিষে নিভিয়ে দিল। আলো আরও খানিকটা ফুটেছে এর মধ্যে। ভোর হলো বলে। সামনের গাছপালা কেটে সাফ করা ছোটো জায়গাটার ওপাশে তার কুক রান্নার জন্য আগুন ধরানোর আয়োজন করছে, আওয়াজ শুনে বোঝা যায়।

নিজেকে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার বলে ভাবতে ভালবাসে ব্রায়ান, যদিও কোনও ডিগ্রি নেই। কিন্তু যা আছে, পৃথিবীর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধ্য নেই সে জিনিস দেয়ার। সেটা হলো প্রায় ছয় দশক ধরে হাতে-কলমে অর্জন করা বাস্তব অভিজ্ঞতা।

যে কোনও মাইন শ্যাফটের ওপর একবার চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারে ওটা নিরাপদ না বিপজ্জনক। গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারে ভেতরে কী খনিজ আছে এবং তার মজুদ কী পরিমাণ। বিলুপ্তপ্রায় প্রসপেক্টর বা খনিজসন্ধানী যাদের বলা হতো, জেমস ব্রায়ান আসলে তাদেরই একজন। বিরল প্রজাতি।

গত ছয় মাস ধরে ম্যানকনের হয়ে এই বাজ পড়া উপকূলে কাজ করছে। রিপাবলিক অভ জাংগারোর ক্রিস্টাল মাউন্টেন রেঞ্জের গোড়ার ফুটহিলে। এক দেশের মধ্যে অন্য দেশের খুদে একটা অঞ্চল এটা—এনক্লেভ। সভ্যতা থেকে বহু শত মাইল দূরে। পৃথিবীর ম্যাপে এ জায়গার কোনও উল্লেখ আছে কি না, সে ব্যাপারে ঘোর সন্দেহ আছে ব্রায়ানের। ক্রিস্টাল মাউন্টেন রেঞ্জ রিপাবলিকের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত ছোটো ছোটো অসংখ্য পাহাড়ের একটা সারি।

উপকূলের চল্লিশ মাইল ভেতর দিয়ে এক সারিতে এগিয়ে গেছে। সারির মাঝখানে একটা ফাঁক আছে, যার মধ্য দিয়ে ভেতরে চলে গেছে এ অঞ্চলের একমাত্র মাটির রাস্তা। গ্রীষ্মে কংক্রিটের মতো কঠিন হয়ে থাকে, শীতকালে চোরাবালি।

ভেতরে যে আদিবাসীরা থাকে, তাদের মত পশ্চাদপদ কোনও উপজাতি আজও পৃথিবীতে আছে, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে মন চায় না ব্রায়ানের। পেশার খাতিরে এ অঞ্চলের আরও অনেক দুর্গম জায়গায় গেছে সে। কিন্তু হলপ করে বলতে পারে, এমন নমুনা দ্বিতীয়টা তার চোখে পড়েনি।

দু' হাতে কয়েকবার মুখ ডলল সে। ঘামের তেলতেলে ভাবটা মুছে নিয়ে হাই তুলে সময় নিয়ে আড়মোড়া ভাংল। আজও একাই আছে সে। কাজের চাপে বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি বলে ওদিকটা ফরসা। বোন রায়না অনেক আগেই বিধবা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা যে যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত। আর্থ্রাইটিসের কামড়ে প্রায় শয্যাশায়ী মাকে তারা প্রায় ভুলেই গেছে। বছরে একবার মাদার'স ডে-তে কারও ইচ্ছে হলো তো দেখতে এল, না হলে নেই।

চলাফেরায় খুব কষ্ট হয় বেচারীর। শুধু বোনটার টানে দু'-চার বছর পর পর

মাস খানেকের ছুটি নিয়ে দেশে যায় ব্রায়ান। তারপর এক সপ্তাও ঠিকমতো পেরোতে পারে না, পালাই পালাই শুরু হয়ে যায়। অফিস থেকে বেতন-ভাতা, ইনক্রিমেন্ট-বোনাস ইত্যাদি যাবতীয় পাওনা তুলে বোনের অ্যাকাউন্টে জমা করে দিয়ে পালায় সে। আবার আফ্রিকার জঙ্গলে এসে হাঁপ ছাড়ে।

এই রেঞ্জের নাম ক্রিস্টাল মাউন্টেন রেঞ্জ হয়েছে শ্রেণীর মধ্যেকার একটা বিশেষ পর্বতের কারণে। একশ' বছর আগে এক খ্রিষ্টান মিশনারি এসেছিল এদিকে ধর্ম প্রচার করতে। পর্বত শ্রেণীর মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে ওটা দিয়ে ভেতরে ঢোকে সে, লোকালয়ের খোঁজে মাইল বিশেক যাওয়ার পর দেখতে পায় নিঃসঙ্গ একটা পর্বত।

সারি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুটা ভেতরদিকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা—একা। রোদ লেগে ঝিকমিক করছে ক্রিস্টালের মতো। অন্য পর্বতগুলোর তুলনায় খানিকটা খাটো বলে উপকূল থেকে দেখা যায় না সেটাকে।

আগের রাতে প্রবল বৃষ্টি হয় ওই অঞ্চলে। অস্বাভাবিক রকম ভারি বৃষ্টি। যদিও ওই অঞ্চলে সেটাই স্বাভাবিক। বর্ষাকালের পাঁচ মাসে এখানে এমনকী তিনশ' ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাতও হয়ে থাকে। কাছে গিয়ে যাজক দেখল, সকালের রোদ গায়ে মেখে সেই বিশেষ পর্বতটা যেন হাসছে। আগের চেয়ে আরও বেশি ঝিকমিক করছে। এই চেহারার জন্য যাজক ওটার নাম ক্রিস্টাল মাউন্টেন রাখল। নিজের নোট বুকে লিখে রাখল সে কথা।

দু'দিন পর তাকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে স্থানীয় ইরুবারা, রোস্ট করে খেয়ে ফেলে। প্রায় এক দশক পর যাজকের সেই নোট বুক ঔপনিবেশিক ফরাসি সৈন্যদের এক টহল বাহিনীর হাতে পড়ে। কাছের এক গ্রামে আফ্রিকান জুজু দেবতার আরতিতে ব্যবহার হতো ওটা।

সেই গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সৈন্যরা, উপকূলে ফিরে এসে নোটবুকটা মিশন সোসাইটির হাতে তুলে দেয়। সেই থেকে ক্রিস্টাল মাউন্টেইন নাম আর যাজকের নাম, দুটোই ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন পর্বতের গায়ে ঝকমকে যে জিনিসটা যাজক দেখেছিল, তা আসলে ক্রিস্টাল ছিল না, ছিল পানি। আগের রাতের মুষল ধারার বৃষ্টির পানি পর্বতের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় রোদ মেখে ঝিকমিক করছিল।

আর সব পর্বত থেকেও পানি পড়ছিল। কিন্তু সেগুলোর গায়ে প্রচুর ঘন সবুজ ঘাস-পাতা, ঝোপঝাড়-গাছ ইত্যাদি ছিল বলে তা অতোটা খোলামেলাভাবে দেখা যাচ্ছিল না। দেখা যাচ্ছিল কেবল ক্রিস্টাল মাউন্টেনের গা বেয়ে ঝরা পানি। কারণ ওটার গায়ে ঘাস-পাতার পরিমাণ ছিল অনেক কম।

যাজকের হয়তো মাথায়ই আসেনি ওটার গায়ে সবুজের এত অভাব কেন। কিন্তু প্রসপেক্টর ব্রায়ানের চোখে সবার আগে সেই অস্বাভাবিকতাই ধরা পড়েছে। প্রতি মুহূর্ত গরম ভাপ উঠতে থাকা ক্রিস্টাল মাউন্টেন নামের জাহান্নামের গোড়ায় তিন মাস কাটানোর পর গোটা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে সে।

প্রায় উদোম বলেই যে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের গা বেয়ে গড়িয়ে নামা পানি দেখা যাচ্ছিল, ঘটনাটা শুধু তা-ই নয়। অন্য সব পর্বতের গায়ে পানি আড়াল

করার সবুজের আবরণ ছাড়াও পানি শুষে নেয়ার মতো টপসয়েল থাকে। পর্বতের মূল পাথরের কাঠামোর ওপরকার মাটির স্তর। এই স্তর অন্যগুলোয় ছিল কম করেও বিশ ফুট, অথচ ক্রিস্টাল মাউন্টেনে বলতে গেলে ছিলই না। প্রায় নগ্নই ছিল ওটা।

এর আসল কারণ সময় নিয়ে আবিষ্কার করেছে 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার' ব্রায়ান। মাটি খোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে ওটার অন্তত বিশ জায়গায় গভীর-অগভীর গর্ত খুঁড়ে টপসয়েলের ভেতরের মাটি সংগ্রহ করে জেনেছে। গোটা বিষয়টা বেশ মজার।

ভূ-পৃষ্ঠের আকার ধারণ করার বিষয়টা জাগতিক আর সব সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মতোই বিস্ময়কর। পাথর দিনে দিনে ক্ষয় হয় সবাই জানে। কিন্তু সে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে অকল্পনীয়। লাখ লাখ, কোটি কোটি বছর। এভাবে ক্ষয় হয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া পাথরের মূল উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণায় পরিণত হয়ে বাতাসে উড়তে থাকে। তার সঙ্গে উড়ন্ত বালিকণা আর বৃষ্টির সাথে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পানির সঙ্গে থাকা বালি, সব একাকার হয়ে প্রথমে ঘোলা স্রোতধারায় পরিণত হয়ে নদীর পানে ছোটে।

নদী হয়ে এগিয়ে যায় সাগরের অগভীর স্থান বা গাধভূমি হয়ে কাদামাটির মোহনার দিকে। হুড়মুড় করে ছুটে চলার সময় পথে যত পাথরের ফাটল পড়ে, তার সবগুলোর মধ্যে কিছু কিছু করে রেখে যায় ঘোলা পানি। এ ছাড়া ছুটে চলার পথে নরম পাথরের বুকে মাথা কুটে নিজেও কিছু ছোটো ছোটো গর্ত খুঁড়ে সেগুলোতেও কিছু রেখে যায়। এই গর্ত আর ফাটলগুলো এক সময় পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ড্রেনে পরিণত হয়। বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয় সেগুলোর মধ্য দিয়ে।

চলার সময় নিজস্ব প্রণালী তৈরি করে নেয় সে পানি। ক্রমে গভীর থেকে আরও গভীর করে পাহাড়ের একেবারে ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যায় সেগুলোকে। এভাবে কোনও কোনও প্রণালী পাহাড়ের মধ্যে বেমালুম উধাও হয়ে যায়। এই দুই ধরনের প্রণালীই ওপরের টপসয়েল অক্ষত রেখে নিজেদের কাজ সারে।

এই পদ্ধতিতে কখনও একশ বছর, কখনও বা হাজার বছর ধরে চর জাগার মত ভূ-পৃষ্ঠের স্তর একটু একটু করে উঁচু হয়। তারপর পাখি ঠোঁটে করে এবং বাতাস আপন রথে চড়িয়ে দূর-দূরান্ত থেকে বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে ফেলে সেই মাটির বুকে। উপযুক্ত জায়গা পেয়ে একদিন সেখানে মাথা তোলে লতা-পাতা, গাছ-গাছালি। ওগুলোর শেকড় পাহাড়ের ঢালের মাটি কামড়ে ধরে রাখে যাতে তা স্থানচ্যুত হতে না পারে।

জেমস ব্রায়ান যখন প্রথমবার ক্রিস্টাল মাউন্টেন রেঞ্জ দেখে, তখন তার প্রতিটা পর্বতেই চূড়া ও ঢালু গা ঢেকে রাখার মতো গাছ বা আঙুর লতা ছিল। ছিল না কেবল একটায়।

সেটার কঠিন গায়ে প্রণালী করার মতো ক্ষমতা পানির ছিল না। তারপরও এখানে-সেখানে আদ্যিকালের কিছু পকেটে মাটি জমে ছিল। যেগুলোর মধ্যে ছিল ছোট ছোট ঝোপঝাড়, ঘাস আর ফার্নগাছ। দূরে দূরে থাকা পকেটগুলোয়

জন্মানো লতা গাছ লকলকিয়ে এসে পরস্পরের গলা আঁকড়ে ধরে বেষ্টনী তৈরি করার মরিয়া চেষ্টায় ছিল। তবে দুর্বল ছিল তাদের বন্ধন। তা ছাড়া সেসব পর্বতের গা আড়াল করে রাখার মতো ঘনও ছিল না।

বাকি সব পর্বতের মতো বর্ষাকালের পাঁচ মাস মূল ক্রিস্টাল মাউন্টেনও গোসল করতো। অন্যগুলোর গা বেয়ে গড়িয়ে নামা পানি ঘাস, লতা-পাতা এবং অসংখ্য প্রণালী ইত্যাদির কারণে চোখে পড়তো না। কিন্তু এটার গা ধোয়া পানি দূর থেকেও তরল রূপার মতো ঝকমক করতে দেখা যেতো।

এরকম হওয়ার কারণটা অবশ্য খুবই সাধারণ। কয়েকদিন সময় নিয়ে পর্বতটা কয়েকবার চক্কর দিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে জেমস ব্রায়ান। সেটা হলো, মেইন রেঞ্জ থেকে আলাদা এই পর্বত সুপ্রাচীন কালের পাথরে গঠিত। গ্র্যানেট পাথরের মতো কঠিন পাথর। লাখ লাখ বছরের পুরনো। আর বাকিগুলো এর তুলনায় বলতে গেলে নতুন পাথরের।

ব্রায়ানের হিসেবে কমপক্ষে সত্তরটা ঝরনা ধারা আছে ক্রিস্টাল মাউন্টেনে। সবগুলো থেকে গড়িয়ে আসা পানি পর্বতের গোড়ার দিকের তিনটে মূল ধারায় মিলিত হয়ে ফুটহিল অতিক্রম করে গভীর উপত্যকায় নেমে গেছে। এ ছাড়া আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করেছে সে।

ক্রিস্টাল মাউন্টেনের পানির ধারাগুলোর কিনারার মাটির রং একটু অন্যরকম। সেগুলোর দু' তীরে অল্প-স্বল্প যে ঘাস-পাতার অস্তিত্ব আছে, সেগুলোর রংও। আর সব পর্বতে সেসবের কিছু কিছু যেমন অবাধে বেড়ে উঠেছে, এটাতেও তেমনই ঘটেছে।

তবে কিছু কিছু লতা-পাতার অস্তিত্ব নেই। মোট কথা আর সব পর্বতের পানির ধারাগুলোর কিনারায় সবুজ যেটুকু আছে, সেই তুলনায় ক্রিস্টাল মাউন্টেনে সবুজ প্রায় নেই বললেই চলে। টপসয়েলের অভাবে এরকম হয়েছে বলার সুযোগ নেই। কেননা আর যা-ই হোক, অন্তত ঘাস-পাতা জন্মানোর মতো মাটি যথেষ্টই আছে সেটায়।

এর অর্থ একটাই দাঁড়ায়, বাকি সবগুলোর তুলনায় ওটার মাটিই আলাদা। সে জন্যই ওটার পানির ধারাগুলোর কিনারায় উদ্ভিদ বেড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে না।

এ নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিল জেমস ব্রায়ান। সময় নিয়ে বিস্তারিত চার্ট তৈরি করল একটা। তাতে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের সত্তরটা ঝরনার কথা উল্লেখ করল। ম্যাপও আঁকল সবগুলোর। তারপর প্রতিটা ঝরনার কিনারার সারফেস গ্রাভেল আর বেডরক, দুটোরই স্যাম্পল জোগাড় করল।

পাঁচশ' পাউণ্ড বালি আর নুড়ি। মূল পর্বতের গা থেকে সংগ্রহ করেছে আরও পাঁচশ' পাউণ্ড পাথর। তারপর রেঞ্জের আর সব পাহাড়ের পাথর ও বালির স্যাম্পল মিলিয়ে আরও প্রায় দু'হাজার পাউণ্ড। সব মিলিয়ে মোট ছয়শ' পলিথিন লাইনড ব্যাগ লেগেছে ওগুলো প্যাকেট করতে।

ব্রায়ানের ধারণা, এগুলো কষ্টেসৃষ্টে একবার লণ্ডনে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করাতে পারলে অত্যন্ত দামি, দুর্লভ কোনও খনিজের সন্ধান পাওয়া যাবে।

অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা প্রায় হলপ করেই বলতে পারে সে। কারণ, এখানে যা কিছু দেখেছে সে, এখান থেকে যা কিছু সংগ্রহ করেছে, সবকিছু ওই একটি কথাই বলে। এখন শুধু দেখার অপেক্ষা ওটা কী জিনিস।

তাই গাট্টি-বোঁচকা বেঁধেছেঁদে নিয়ে দু' দিনের মধ্যে আবার দেশে যাচ্ছে সে। তিন বছর পর। আশা করছে এবারের ছুটি উপভোগ করবে সে। অন্যান্য বারের মতো এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই মনটা পালাই পালাই করবে না। অন্তত ল্যাব টেস্টের ফলাফল জানতে না পারা পর্যন্ত থাকতেই হবে তাকে।

মশারি তুলে কট থেকে নামল বৃদ্ধ। কুকের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল গলা চড়িয়ে, 'হেই, কালাচাঁদ! আমার কফির কী হলো?'

'কফি' ছাড়া আর একটা শব্দও বুঝল না কুক। তবু এদিকে তাকিয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল। হাত নাড়ল ব্রায়ানকে আশ্বস্ত করার জন্য। মাথার কাছে দলা হয়ে পড়ে থাকা টি-শার্টটা তুলে নিয়ে এক পা, দু' পা করে অস্থায়ী কিচেনের দিকে এগোলো ব্রায়ান।

ক্যানভাস ওয়াশ বাকেটটা ওদিকেই। তার ঘাম চটচটে শরীরটা নাগালের মধ্যে পেয়ে রাক্ষুসে মশা এসে বসতে শুরু করল একটা, দুটো করে। দুটো কামড় খেয়েই তাড়াতাড়ি টি-শার্টটা পরে নিল সে।

জ্বলতে থাকা জায়গাগুলো চুলকাতে লাগল চোখমুখ বিকৃত করে। 'ব্লাডি আফ্রিকা!'

চারদিন পর। ছোটো, রং চটা একটা কোস্টারের রেইলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেমস ব্রায়ান। হাতে সিগারেট পুড়ছে। জাংগারোর রাজধানী পোর্ট ক্লারেন্স থেকে রক স্যাম্পলগুলো নিয়ে প্রতিবেশী রিপাবলিকে যাচ্ছে। ওখান থেকে কোম্পানির চার্টার করা প্লেনে দেশে ফিরবে।

জাংগারোর নিজস্ব কোনও এয়ার লাইনার নেই। এয়ারপোর্ট একটা আছে অবশ্য, তবে না থাকার মতই। একটা প্রাইভেট ফরাসি এয়ার লাইনার সপ্তাহে দু'দিন যাত্রী আনা-নেয়া করে। তাই ওটার ওপর কখনও ভরসা করে না জেমস ব্রায়ান। বিশেষ করে এরকম প্রয়োজন দেখা দিলে তো নয়ই।

অবশ্য এ পথে না গিয়ে নিজের দুই টনি মার্সেডিজে করে ক্রিস্টাল মাউন্টেন সাইট থেকেও সরাসরি চলে যেতে পারতো সে পাশের দেশে। কিন্তু দু' দেশের মধ্যেকার যোগাযোগের একমাত্র রাস্তাটার অবস্থা যারপরনাই জঘন্য। কাঁচা রাস্তা।

বর্ষাকালে হাঁটু পর্যন্ত আঠাল কাদার সাগরে পরিণত হয় সেটা। মানুষ আর গবাদি পশুর চলাফেরার কারণে বিশ্রী খানাখন্দে ভরা থাকে। গরমকালে এবড়োখেবড়ো অবস্থাতেই আবার গ্র্যানেট পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এত মালপত্র নিয়ে ও পথে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। আস্ত গাড়ি নিয়ে জায়গামতো পৌঁছানো কোনওমতেই সম্ভব নয়।

তা ছাড়া ম্যানকন আর জাংগারান সরকারের মধ্যে চুক্তি আছে, তাদের এনক্লেভ থেকে কোনও মিনেরাল স্যাম্পল বাইরে নিয়ে যেতে হলে রাজধানী

ক্লারেন্স থেকে ছাড় করিয়ে নিতে হবে।

ক্রমে পিছিয়ে যেতে থাকা উপকূলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেমস ব্রায়ান। প্রপেলারের তাড়নায় মহা আলোড়ন চলছে পিছনের পানিতে, সাদা ফেনিল পানির চওড়া একটা ধারা রেখে যাচ্ছে কোস্টারটা। পানিতে আলোড়ন উঠলে মাছ আসে, সেই আশায় তিন-চারটে সি গাল ওটার পিছু নিয়েছে। ওপর থেকে ঘাড় কাত করে শিকার খুঁজছে আলোড়নের মধ্যে।

আনমনে কিছুক্ষণ সেগুলোর শক্তিশালী ডানার কসরত দেখল ব্রায়ান, তারপর এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া চেনা বন্দরটার দিকে তাকাল শেষবারের মত।

জানে না, এই জগতে আর কোনওদিন ফিরে আসা হবে না তার। প্রিয় আফ্রিকার সঙ্গে এই তার শেষ দেখা।

ক্লারেন্স সিটিতে পৌঁছতে তিন দিন লাগল ব্রায়ানের। তারপর মালপত্র চেক করিয়ে আগে থেকে তৈরি এয়ারক্র্যাফটে চড়ে ইংল্যাণ্ডের লুটনে পৌঁছল পাঁচ দিনের দিন দুপুরে।

লুটন এয়ারপোর্ট থেকে ট্রাকে করে তার সমস্ত স্যাম্পল ওয়াটফোর্ড নিয়ে যাওয়া হলো অ্যানালাইসিসের জন্য। তারপর নিয়ম অনুযায়ী তাকে কোম্পানির ডাক্তারের মুখোমুখি হতে হলো থরো ফিজিক্যাল চেক-আপের জন্য। সবশেষে চার সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে ডালউইচের পানে ছুটল সে বোনের কাছে।

তিনদিন পরের কথা। ওয়াটফোর্ড। গভীর রাত। অনেক দূরে মেঘ ডাকছে গুড় গুড় করে। ম্যানকনের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টাডি, রিসার্চ, জিও-ম্যাপিং অ্যাণ্ড স্যাম্পল অ্যানালাইসিসের চিফ অ্যানালিস্ট, ডক্টর মার্টিন হুপার অনড় বসা। স্তব্ধ বিস্ময়ে সামনের টাইপ করা দুধ সাদা কাগজগুলোর দিকে চেয়ে আছেন।

ছোটোখাটো মানুষ হুপার। সরু কাঁধ। বয়স ষাটের মতো। হাঁটার সময় শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে যায় আপনাআপনি। পুরো মাথা জোড়া টাক। আলো থাকলে চক চক করতো। কিন্তু এ মুহূর্তে রুমের সিলিং মাউন্টেড আলোগুলো জ্বলছে না। জ্বলছে কেবল তাঁর টেবিলের ওপরকার একটা ডেস্ক ল্যাম্প। তাই আধো আলো, আধো অন্ধকারের রাজত্ব চলছে এ রুমে।

হুপারের মুখের একটা পাশ দেখা যায় তাতে। আরেক পাশ অন্ধকার। কিছুটা ভৌতিক লাগছে দৃশ্যটা। এত রাত পর্যন্ত কখনোই অফিসে থাকেন না মার্টিন হুপার। আজ আছেন বসের বিশেষ নির্দেশে, একটা রিপোর্ট তৈরি করতে। ইচ্ছে করলে সহকারীদের কাউকে দিয়েও কাজটা করানো যেত, কিন্তু সাহস হয়নি ডক্টরের। তাই নিজে টাইপ করেছেন।

রিপোর্টের দুটো কপি করেছেন হুপার। এক কপি স্টেপল করে খামে ভরলেন। ওটা নিয়ে কাল বসের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় কপিটাও স্টেপল করলেন তিনি। নিয়ম অনুযায়ী ভল্টে তুলে রাখলেন—ল্যাব অফিস কপি।

চেয়ারে ফিরে এসে টাকের মাঝখানটা চুলকালেন হুপার। চশমা মুছলেন

সময় নিয়ে। চোখে পরলেন। তারপর প্রথম কপিটা কাছে টেনে নিয়ে আবার শুরু করলেন প্রথম থেকে। আফ্রিকা থেকে প্রসপেক্টর জেমস ব্রায়ানের নিয়ে আসা কান্ট্রি রক আর গ্র্যাভেল স্যাম্পল সম্পর্কিত রিপোর্ট ওটা।

একবার, দু' বার নয়, তিনবার পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে তার স্যাম্পলগুলো। ফলাফল প্রতিবার একই হয়েছে। রিপোর্টে বাড়তি কিছু লেখেননি হুপার। যেটুকু লেখা দরকার, সেটুকুই শুধু লিখেছেন। সেটা এরকম: ম্যানকনের প্রসপেক্টর জেমস ব্রায়ান পশ্চিম আফ্রিকার দেশ রিপাবলিক অফ জাংগারোর হিন্টারল্যাণ্ডে একটা পর্বত বা পাহাড় আবিষ্কার করেছে। একটা পর্বতমলার কাছে সেটা, কিন্তু আর সবগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন।

নাম: ক্রিস্টাল মাউন্টেন। গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে আঠারোশ' ফুট উঁচু ওটার চূড়া, গোড়ার ব্যাস হাজার গজের মতো।

ক্রিস্টাল মাউন্টেন থেকে তার সংগ্রহ করে আনা স্যাণ্ডস্টোন ও র‍্যাগস্টোনে মূল্যবান খনিজ পদার্থের উপস্থিতির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, কাছের অন্য সব পাহাড় থেকে সংগ্রহ করে আনা একই ধরনের পাথরের তুলনায় ক্রিস্টাল মাউন্টেনের পাথর লাখ লাখ বছরের বেশি পুরানো।

সেটায় যে সমস্ত খনিজের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলো হচ্ছে পাললিক টিন, লো-গ্রেড নিকেল আর হাই গ্রেড প্ল্যাটিনাম।

পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ প্ল্যাটিনাম উৎপন্ন হয় দক্ষিণ আফ্রিকার রাসটেনবার্গ খনিতে। প্ল্যাটিনামের কনসেণ্ট্রেশন বা গ্রেড সেখানে হয় প্রতি রক টনে সর্বোচ্চ পয়েন্ট টু এইট। কিন্তু ব্রায়ানের স্যাম্পলের গড় কনসেণ্ট্রেশন পয়েন্ট এইট ওয়ান।

অবিশ্বাস্য!

সকালে যখন এটা নিয়ে মালিক স্যার রিচার্ড ম্যানসনের সঙ্গে দেখা করবেন, তখন তাঁর চেহারা কেমন হবে অনুমান করে হাসি পেলো হুপারের। অ্যানালাইসিসের ফল আজ বসকে টেলিফোনে জানিয়েছেন তিনি। তাতেই মহাখুশি স্যার রিচার্ড। হুপারকে মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে বলেছেন এ ব্যাপারে। তাকে এবং ব্রায়ানকে একসঙ্গে ডেকেছেন আজ। লণ্ডনের সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে সবাই মিলে ডিনার করবেন।

রিপোর্টে ডুবে ছিলেন ডক্টর হুপার, দেয়াল ঘড়ির চাইম রাত দুটো ঘোষণা করতে চমকে উঠলেন।

সর্বনাশ! এত রাত হয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি উঠলেন বৃদ্ধ। রিপোর্টটা ড্রয়ারে রাখার জন্য হাত বাড়ালেন, এমনি সময় দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল এক লোক। সঙ্গে একরাশ ঠাণ্ডা বাতাসও ঢুকলো। করিডোরের আলোয় মানুষটাকে চিনলেন হুপার। তাঁর জুনিয়র অ্যানালিস্টদের একজন। সাইমন এনডিন। মাত্র ছ'মাস হলো যোগ দিয়েছে ম্যানকনে, তবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে তাঁর। ভেতরে এসে গোটা দরজা জুড়ে দাঁড়াল লোকটা। আলো জ্বেলে দিল।

'তুমি...?' প্রশ্নটা শেষ করতে পারেননি হুপার, তার পিছনে এসে দাঁড়াল

আরও তিনজন। একবার দেখলে জীবনে ভোলা যাবে না, এমনই মার্কা-মারা চেহারা সবার। স্বাস্থ্যও তেমনি, বুনো শুয়োরের মতো। সুটেড-বুটেড, কিন্তু তাতে চেহারা ও মনের কদর্যতা ঢাকা পড়েনি। দেখার চোখ থাকলে যে কেউ বুঝবে খুন-খারাবিতে পিএইচডি করা সবক'টা।

'কী... ক্বী ব্যাপার!'

'আপনার ল্যাব টেস্টের ওই রিপোর্টটা আমাদের দরকার, সার,' কোনওরকম ভান-ভণিতা নেই সাইমনের আচরণে, কথায়। 'ওটা নিয়ে লণ্ডন যাওয়ার কষ্ট করতে হবে না আপনাকে। আমাকে দিয়ে দিন। প্লিজ।'

চাউনি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল ডক্টরের। বিশ্রী একটা সন্দেহ উঁকি দিল মনে। এই লোক দ্বিতীয়বার জেমস ব্রায়ানের রক স্যাম্পল পরীক্ষার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল। ও হয়তো আন্দাজ করে ফেলেছে কী পাওয়া গেছে। কিন্তু ও কেন সেই টেস্টের ফাইনাল রিপোর্ট...

'তার মানে?'

শ্রাগ করল এনডিন। চেহারা দেখে মনে হলো, না জেনে বিস্বাদ কিছু খেয়ে ফেলেছে। 'মানেটা না শোনাই ভাল, সার। আপনি অ্যানালাইসিসের ফলাফল সার রিচার্ডকে আগেভাগে জানিয়ে দিয়ে বিপদেই ফেলে দিয়েছেন। আমাকে বাধ্য করেছেন তাড়াহুড়ো করতে। আসতেই হলো আমাদের। ওটা দিয়ে দিন দয়া করে,' ডান হাত বাড়াল। 'আমার বন্ধুরা ব্যস্ত। সময় নেই।'

'এসব কী বলছ তুমি?' হুপারের চেহারায় নিখাদ অবিশ্বাস। 'এটা... তুমি... আর কারও হয়ে...'

সাইমনের ডান পাশের ষাঁড়টাকে সাপ্রেসর পরানো একহাত লম্বা একটা পিস্তল বের করতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন ডক্টর। পাথর কুঁদে তৈরি মুখগুলোর ওপর চোখ বোলালেন একে একে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে।

'আমি... আমি সার রিচার্ডকে কথা দিয়েছি...'

'ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, ডক্টর,' বাধা দিয়ে বলল সাইমন। 'কথা না রাখার জন্য সার রিচার্ড আপনার কাছে কখনও কৈফিয়ত চাইতে আসবেন না। বি শিওর।' হাত আরেকটু বাড়াল। 'দিয়ে দিন ওটা, প্লিজ।'

কয়েক মুহূর্ত লাগল হুপারের কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেতে। 'কিন্তু... এটা আমি তোমাকে দিই কী করে?'

চোহারা দেখেই বোঝা গেল ধৈর্য ধরে রাখতে বেশ কষ্ট হচ্ছে লোকটার। 'আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর এখন আর কিছুই নির্ভর করে না, ডক্টর। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

অসহায় রাগে ফুঁসে উঠলেন অ্যানালিস্ট। 'কতো টাকার বিনিময়ে বেঈমানীটা করলে, সাইমন?'

শ্রাগ করল যুবক। নির্বিকার। 'দিয়ে দিন, সার।'

সামনে পড়ে থাকা ল্যাব অফিস কপির দিকে তাকালেন ডক্টর। কপালে-মাথায় ঘাম চিক চিক করে উঠল। চট্ করে রিপোর্টটা তুলে নিয়ে পিছনে লুকালেন। 'যদি... যদি না দিই...'

দল থেকে দ্রুত এক পা সরে গিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াল পিস্তলধারী। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই মৃদু 'ফট! ফট!' শব্দে দু' বার গাঢ় কমলা রংয়ের আগুন বের করল তার গান মাজল। আচমকা সুতোর টান খেয়েছে যেন, এমনভাবে উড়ে গেল ডক্টর হুপারের ছোটোখাটো দেহটা। পিছনের দেয়ালের ওপর গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

সেখান থেকে হুড়মুড় করে মেঝেতে ধসে পড়ল ভাঙাচোরা পুতুলের মতো। পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করে পা বাড়াল সাইমন। ডক্টরের আড়ষ্ট মুঠো থেকে টান মেরে ছিনিয়ে নিল শিটগুলো। তারপর টেবিলের উপর থেকে তুলে নিল খামটা।

'ডামকফ (ইডিয়েট)!' সিলিঙের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা ডক্টরের উদ্দেশে থুতু ফেলল হত্যাকারী।

আধ ঘণ্টা পর হুপারের অন্ধকার অফিস থেকে রাস্তায় উঠে এলো একটা স্টেশন ওয়াগন। ওটাও অন্ধকার। সব লাইট নেভানো। কিছুটা দূরে সরে এসে আলো জ্বালল ওটা। তারপর ঝড়ের গতিতে লণ্ডনের দিকে ছুটল।

ওটা চোখের আড়ালে যেতে পেরেছে কি পারেনি, গাঢ় কমলা-লাল আগুনের বিরাট একটা কুণ্ড লাফিয়ে উঠল ডক্টর হুপারের অফিস থেকে। চোখের পলকে ছড়িয়ে পড়ল আগুন, একতলা বিল্ডিংটার সবখানে লাফিয়ে লাফিয়ে পৌঁছে গেল। আশপাশের অনেকখানি এলাকা ভীতিকর লালচে আভায় আলোকিত হয়ে উঠল। পড় পড় আওয়াজ করতে লাগল আগুন।

গভীর রাত বলে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি গিয়ে পৌঁছাতে বেশ অনেকটা দেরি হলো। ততোক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সব।

এই ঘটনার ঠিক দু' ঘণ্টা আগের কথা। অভিজাত পাড়া ওয়েস্ট এণ্ড। নিজের দশ বেডরুমের সুবিশাল ম্যানসনে লেট ডিনারে বসেছেন ম্যানসন'স কনসোলিডেটেড বা ম্যানকনের মালিক, মাইনিং টাইকুন, সার রিচার্ড ম্যানসন। খুব জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় বাসায় ফিরতে আজ বেশ দেরি হয়ে গেছে।

বয়স প্রায় সত্তর তাঁর। তবে হালকা-পাতলা, সুঠামদেহী বলে সহজে বয়স বোঝা যায় না। লম্বা সাত ফুটের কছাকাছি। চলাফেরায় চটপটে। অফুরন্ত উদ্যমের ভাণ্ডার। এই বয়সেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমান তালে কাজ করে যেতে পারেন তিনি। ক্লান্তি কী জিনিস, জানেন না। তবে হার্টের সমস্যা দেখা দেয়ায় আজকাল একটু বুঝে চলতে হয়। প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়।

তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায়, দামি খনিজের সন্ধানে খোঁড়াখুঁড়ি করে। প্রথম জীবনে নেটিভ লেবারদের সঙ্গে নিজেও কোমর বেঁধে মাঠে কাজ করতেন সার রিচার্ড। পঞ্চাশ বছর বয়সের পর নিশ্চিত সাফল্য ধরা দিতে ধীরে ধীরে নিজেকে ফিল্ড ওয়ার্ক থেকে গুটিয়ে নেন। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বেড়ে যাওয়ায় আজকাল পেপার ওয়ার্কই বেশি করতে হয় তাঁকে। ফিল্ডে যাওয়ার সময় হয় না। প্রয়োজনও হয় না। কর্মচারীরাই সব সামাল দেয়।

ন্যাপকিনে হালকা করে মুখ মুছে ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিলেন মাইনিং টাইকুন। তিনি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। বিশাল বাড়িটা তাই খাঁ-খাঁ করছে। বাসার কাজের সার্বক্ষণিক কর্মচারীরা আছে বটে, তবে তারা কাজের সময় থাকে। কাজ ফুরালে ম্যানসনের পিছনের স্টাফ কোয়ার্টারে চলে যায়।

গত তিনদিন মূল ম্যানসনে সার রিচার্ড একাই থাকছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা বিদেশ সফরে গেছে। আমেরিকা, কানাডা ঘুরে দেশে ফিরতে অন্তত মাসখানেক লাগবে ওদের। প্রতি বছরই নিয়মিত বিদেশ সফর করে তাঁর পরিবার। তিনিও যান। এবারও যাওয়ার সবকিছু একদম ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভাগ্য বিশাল এক চমক নিয়ে হাজির হয়ে যাওয়ায় নিজের যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে সার রিচার্ডকে।

ভেবেছিলেন চমকটা সামাল দিয়ে ক'দিন পরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেটাও বুঝি আর সম্ভব হবে না। কারণ চমকটার সত্যিকারের রূপ তিনি আজই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছেন চিফ অ্যানালিস্ট ডক্টর হুপারের কথায়। সত্যি হলে ধরে নেয়া যায়, ম্যানকন একটা যুগান্তকারী ইতিহাস সৃষ্টি করতে চলেছে।

বি-শা-ল ব্যাপার! সবার আগে এটাকে সামলাতে হবে, তারপর বাকি সব।

সার রিচার্ড বিশ্বাসই করতে পারছেন না এতবড় সৌভাগ্য ধরা দিয়েছে তাঁর হাতে। আফ্রিকায় কর্মরত তাঁর নগণ্য এক কর্মচারী, খুব সাধারণ, তবে নির্ভেজাল ভালমানুষ এক প্রসপেক্টর, তাঁর জন্য সাত রাজার ধন আবিষ্কার করে ফিরেছে।

মানুষটার সম্মানে কাল দুপুরে লণ্ডনের সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে শানদার এক লাঞ্চের আয়োজন করেছেন তিনি। মোটা বোনাসও দেবেন তাকে। তার সঙ্গে ম্যানকনের চিফ অ্যানালিস্ট ডক্টর মার্টিন হুপারও থাকবেন।

সার রিচার্ড জানেন, একজন মাইনারের জীবনে এত বিশাল সাফল্য বিশ্বে এটাই প্রথম। ইতিহাসে এরকম নজির আর নেই। তবে নানান কারণে আপাতত গোপন রাখা হবে এই আবিষ্কারের খবর। তিনি আর চিফ অ্যানালিস্ট ছাড়া কেউ জানবে না। পরে সময় হলে অবশ্য সবাই জানতে পারবে।

জীবনের এমন অচিন্তনীয় শার্প টার্নিঙের মুহূর্তে স্ত্রীর অভাবটা বেশি করে অনুভব করছেন সার রিচার্ড। সুখে-দুঃখে যার সঙ্গে দীর্ঘ জীবনটা কাটালেন, সেই জীবনসঙ্গিনী এ-সময় পাশে থাকলে ভাল হত।

খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন টাইকুন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক মাঝ বয়সী মেইড তাঁর প্রেশারের ওষুধ নিয়ে হাজির হলো। রোজ রাতে একটা করে খেতে হয়। কিন্তু মেইড ওষুধ নিয়ে আসায় একটু অবাক হলেন রিচার্ড। কারণ এসব একান্ত ব্যক্তিগত কাজ সব সময় নিজে করেই অভ্যস্ত তিনি। এমনকী স্ত্রীকেও এসব কাজে ডাকেন না।

তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে মেইড ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি আসার একটু আগে ম্যা'ম ফোন করেছিলেন, সার। আপনি মাঝে মাঝে ওষুধ খেতে ভুলে যান, তাই ম্যা'ম অনুরোধ করেছেন আমি যেন মনে করে খাইয়ে

দিই।'

মৃদু হেসে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলেন মাইনিং টাইকুন। 'অল রাইট, মিস পেগি। থ্যাংক ইউ।'

ওষুধটা গিলে ফেললেন সার রিচার্ড। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেমন একটা ঘুম ঘুম ভাব পেয়ে বসল তাঁকে। ঝিমঝিম করতে লাগল সারা শরীর। চোখ খুলে রাখতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। নিশ্চয়ই ক্লান্তি থেকে এমনটা হচ্ছে, ভাবলেন তিনি। বেশি খাটুনির ফল। ঘুম দিলেই সেরে যাবে।

পরদিন কোন্ সুট-টাই পরবেন, কী কী করবেন, সেই প্ল্যান করতে করতে বিছানায় উঠলেন মাইনিং টাইকুন।

বাথরুমের মেডিসিন কেবিনেটে থাকা ওষুধ যে কোনও এক রহস্যময় হাতের ছোঁয়ায় পাল্টে গিয়েছিল, সে খবর অজানাই থেকে গেল তাঁর। প্রেশারের ওষুধের বদলে মেইড যে তাঁকে না জেনে বিষ খাইয়েছে, সেটাও।

ডালউইচ। ভোরের আলো ফুটতেই ঘুম ঘুম ভাবটা কেটে গেল জেমস ব্রায়ানের। কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল সে। স্বয়ং মালিকের সঙ্গে ডিনার করার নিমন্ত্রণ পেয়েছে, তাই খুশিতে বলতে গেলে ঘুম হয়ইনি রাতে। একটা ম্যাজমেজে অনুভূতি নিয়ে বিছানা ছাড়ল ব্রায়ান। কিন্তু মেজাজ ফুরফুরে।

পনেরো মিনিট পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল রায়নার ঘর অন্ধকার। এখনও ঘুম ভাঙেনি ওর। কিচেনে এসে কফির জন্য পানি চড়িয়ে দিল সে। সামনের দরজা খুলে উঁকি দিল। রোজ সকালে খবরের কাগজ আর দুধের বোতল তুলে নেয়ার অপেক্ষায় থাকে সামনের সিঁড়িতে। আজ সেগুলোর সঙ্গে নতুন একটা জিনিস দেখতে পেল।

সুন্দর র‍্যাপিং কাগজে মোড়া একটা মাঝারি আকারের প্যাকেট। সেটার ওপরে তার নাম-ঠিকানাসহ বড়, লাল অক্ষরে লেখা : কংগ্রাচুলেশন্স্! গেস হোয়াট!

ভুরু কুঁচকে উঠল ব্রায়ানের। প্রেরক দেখা যাচ্ছে তারই বস! ব্যাপার কী? কৌতূহল বহুগুণ বেড়ে গেল। ড্রইংরুমের দরজায় দাঁড়িয়েই র‍্যাপিং ছিঁড়ে ফেলল সে টান মেরে। ভেতরে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। আকারের তুলনায় যথেষ্ট ভারী লাগছে। ওপরের ফ্ল্যাপটা কেন যেন শক্ত হয়ে এঁটে বসে আছে। কোনওমতে সেটার নীচে তিন আঙুল ভরে দিল ব্রায়ান। টান মেরে তুলে ফেলল ফ্ল্যাপ।

পরক্ষণে তীব্র নীলচে একটা আলো ঝলসে উঠল। পিলে চমকে দেয়া বিকট শব্দে কেঁপে উঠল গোটা এলাকা। একেবারে তার মুখের ওপর ফেটেছে শক্তিশালী বোমাটা।

কিন্তু তার পিলেও চমকালো না, আশাহত হওয়ার অনুভূতিও জাগল না। কারণ তার আগেই মাথা উড়ে গেছে তার। ধড়টা আছড়ে পড়ল ধড়াস্ করে। তবে মাথা হারিয়েও স্থির হলো না তার দেহঘড়ি। প্রচণ্ড আক্ষেপে ঘন ঘন খিঁচ ধরতে লাগল শরীরের প্রতিটা পেশিতে।

কিন্তু সে প্রক্রিয়াও ক্রমে স্থির হয়ে গেল। গলার ছেঁড়া কিছু টিসু তিরতির করে কাঁপল আরও কিছুক্ষণ। দমকে দমকে রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল কার্পেট। সামনের সিঁড়ি আর ড্রইং রুমের পুরোটা জেমস ব্রায়ানের রক্ত, মগজ আর খুলির ভাঙা টুকরোয় একাকার হয়ে গেল।

বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই কিচেনে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল কেটলি। কফির পানি ফুটেছে।

দুই

কয়েকদিন পরের কথা।

পিকাডিলি, লণ্ডন। পক্ষাঘাতে আক্রান্তের মতো বসে আছে মানুষটা ডেস্কের পিছনের প্রকাণ্ড রিভলভিং চেয়ারে। চেহারা দেখে মনে হয় কঠিন কোনও ধাঁধার জবাব মেলাতে ব্যস্ত। ইওরোপিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কিছুটা ঘাটতি আছে তার, একটু খাটো।

চেহারায় নিষ্ঠুর একটা ভাব আছে। সবাই সেটা বুঝতে পারে না অবশ্য। তবে মানুষটা যে আর দশজনের মতো যে-সে নয়, তা বুঝতে পারে। তার নানান লক্ষণ আছে। সেগুলো হাজার জনের মধ্য থেকেও চোখে আঙুল দিয়ে তাকে আলাদাভাবে চিনতে সাহায্য করে।

দেখে মনে হয় ক্ষমতা, উদ্যম আর দোর্দণ্ড প্রতাপ আটকা পড়ে আছে তার ছোটোখাটো কাঠামোটার মধ্যে। বের হওয়ার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

অত্যন্ত ঘন ভুরু মানুষটার। তার নীচে একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখ। নজর যেন খুলি ভেদ করে মগজে ঢুকে যায়।

এ মুহূর্তে সামনের টাইপ করা দুধসাদা কাগজগুলোর ওপর সেঁটে আছে তার নজর। মোট আটটা শিট। এতক্ষণ ওগুলো যেন জাদু করে রেখেছিল তাকে। পাশে একটা বড় অ্যাটলাস ও একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও আছে। কারণ জাংগারো দেশটা এতই ছোট যে ওই জিনিস না হলে দেখাই যায় না ঠিকমতো। এক সময় নড়ল মানুষটা।

সপ্তমবারের মতো শিটগুলো পড়া শেষ হতে এত যত্নের সঙ্গে গোছালো, যেন ওগুলো ঐশীবাণীর মত পরম পবিত্র কিছু। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'ক্রাইস্ট!'

যিশুকে ডাকল বটে, তবে ধর্ম মানে না সে। তার কাছে ওসব ধাপ্পাবাজি, লোক ঠকানোর হাতিয়ার। চমকপ্রদ কিছু ঘটলে মাঝেমধ্যে অজান্তেই শব্দটা বেরিয়ে আসে তার মুখ দিয়ে। তবে সেটা ভক্তিতে নয়, বিস্ময়ে। ঠোঁট গোল করে নিঃশব্দে শিস দিয়ে উঠল সে। কফির জন্য বেল বাজিয়ে কিছুক্ষণ খাটো, মোটা আঙুল দিয়ে তবলা বাজাল মেহগনি কাঠের বিশাল ডেস্কটার ওপর। আঙুলের মূল্যবান পাথর বসানো আংটিগুলো ঝিকিয়ে উঠতে থাকল আলো

লেগে।

কফি আসতে কয়েক চুমুকে অর্ধেকের বেশি শেষ করে দামি হাভানা চুরুট বের করে ধরাল সে। তামাকের আকর্ষণীয়, ভারী গন্ধে ভরে উঠল তার বিশাল পেন্টহাউস অফিস সুইট।

শিটগুলো ড্রয়ারে রেখে চেয়ার ছাড়ল সে একটু পর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রুমের দক্ষিণ মাথার প্লেট গ্লাস পিকচার উইণ্ডোর দিকে। নীচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লণ্ডনের ওপর চোখ বোলাতে লাগল আনমনে।

এ শহর আজও বিশ্ব অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। কারও কাছে শুধুই রুজি-রোজগারের জায়গা। কারও কাছে বিরক্তিকর বাঁধাধরা, মেকি ভদ্রতার মুখোশ পরা ক্লান্তিকর এক শহর। কারও কাছে ঝোপ। বুঝে কোপ মারতে, অর্থাৎ মেধা আর শ্রম দিতে পারলে পুরস্কার পাওয়া যায়।

রোমান্টিকদের কাছে মার্চেন্ট অ্যাডভেঞ্চারের শহর লণ্ডন। প্রয়োগবাদীদের কাছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাজার, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নিস্টদের কাছে অলস, সোনার চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীতে আসা চর্বির ডিপো, দুশ্চরিত্র মিলিয়নেয়ার-বিলিয়নেয়ারদের নোংরা বিলাসিতার বাগানবাড়ি।

কিন্তু সে জানে এই কসমোপলিটান শহরের হাজারো বিশেষণের মধ্যে কোন্‌টা পুরোপুরি সঠিক। তার মতে, লণ্ডন হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম জঙ্গল। এবং সে নিজে এ জঙ্গলের গণ্ডা গণ্ডা টাকাওয়ালা প্যান্থারদের একজন। জন্ম-শিকারী। বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। এবং সেজন্য গর্বিতও।

একষট্টি-বাষট্টির মতো বয়স হবে তার। গাট্টাগোট্টা। শরীরটা বুলডোজারের মতো অনেকটা। চেহারায় আগ্রাসী একটা ভাব আছে। আচরণে আছে মধ্যযুগের পর্তুগিজ জলদস্যুদের নিষ্ঠুরতা। ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা অত্যন্ত সমীহ করে চলে তাকে।

যদিও এটা তার নিজের শহর নয়। এমনকী এ দেশটাও তার নয়। কিন্তু টাকার গরম আছে বলে দুনিয়ার সমস্ত বড় শহরকেই নিজের শহর বলে মনে করে সে। লণ্ডনকে তো বটেই। নিজ দেশের মতো এখানকার সরকারী প্রশাসনেও যথেষ্ট কদর আছে মানুষটার। অকল্পনীয় প্রভাব আছে। এর সবটাই সম্ভব হয়েছে শুধু টাকার জোরে।

সময়মতো তার কিছুটা উপযুক্ত জায়গায় ঢেলেছিল সে, তাই সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে পেরেছে। এখন কেউ তার অতীত সম্পর্কে জানতে পারবে না। সে চেষ্টা কেউ করতে গেলে তাকে একটার পর একটা নিরেট দেয়ালে ধাক্কা খেতে হবে। তার জীবনের শুরুর দিক সম্পর্কে খুব অল্পই জানা যায় এবং সেসব মানুষের অগোচরে রাখার কৌশলও সে ভালই জানে।

অঢেল টাকা তার। গা থেকে ভুর ভুর করে টাকার গন্ধ বের হয় সারাক্ষণ। পোশাক-আশাক, চলন-বলন, কথাবার্তা বা আর সবকিছু থেকেও। মানুষটাকে কখনও হাসতে দেখা যায় না। সব সময় গম্ভীর। সবার সঙ্গে হুকুমের সুরে কথা বলে। দিন-রাত শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লাট্টুর মতো বন বন করে পাক খায় দুনিয়াময়।

সকালে লণ্ডন তো বিকেলে প্যারিসে থাকে সে, আজ বার্লিনে তো কাল মস্কোয়। কোপেনহেগেন, অসলো, বার্ন, দি হেগ, জুরিখ, প্যারিস, টোকিও, বেইজিং, সিউল, করাচি, দুবাই, বাগদাদ, তেল আভিভ, কলকাতা, মুম্বাই, হেলসিঙ্কি, মোটকথা দুনিয়াতে এমন কোনও বড় শহর নেই যেখানে তার যাওয়া-আসা নেই—যেখানে ব্যবসা নেই। অক্টোপাসের মতো আট হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে সে দুনিয়াজুড়ে। যদিও দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে ছাড়া দুনিয়াতে আপনজন বলতে আর কেউ নেই।

সে মরে গেলে এত টাকা কার কাজে লাগবে, তার কোনও ঠিক নেই।

যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজ বলতে গেলে একাই করে সে। এতকিছু সামলাতে মেশিনের মতো একনাগাড়ে চলতে হয়। তবে মেশিনের মাঝে-মধ্যে বিশ্রামের প্রয়োজন পড়লেও তার পড়ে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনেকটা জোর-জবরদস্তি করে রাতে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ঘুমায় মানুষটা। তা-ও অনেক সময় নিজস্ব জেট প্লেনে চলার ওপর থাকে বলে ঘুমায় এক শহরে, ঘুম ভাঙে আরেক শহরে।

নিজের ব্যবসার সাম্রাজ্য আরও সম্প্রসারিত করতে ইদানীং 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ নেটওয়ার্ক' খুলেছে সে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের আছে এই নেটওয়ার্ক। সেগুলোর কাজ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বী বা বেশি লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোয় কৌশলে নিজের 'চর' ঢুকিয়ে দেয়া। চরেরা ভেতর থেকে সেগুলোর হাঁড়ির খবর পাঠালে তারই ভিত্তিতে তাদের নিয়োগকর্তারা নিজেদের নতুন ব্যবসায়িক কৌশল ঠিক করে।

কয়েকদিন আগে তার নেটওয়ার্কের জালে অনেক, অ-নে-ক বড় একটা মাছ পড়েছে। ব্যবসার কাজে দুনিয়ার আরেক মাথায় ছিল বলে মাছটার সাইজ বুঝতে একটু সময় লেগে গেল। চারদিন পর আজ লণ্ডন ফিরে সরাসরি অফিসে চলে এসেছে সে। মনটা এখন আনন্দে ফুরফুর করছে। মাছটাকে ডাঙায় টেনে তোলার আয়োজনের কথা ভাবছে এখন।

ডক্টর হুপারের ক্রিস্টাল মাউণ্টেনে প্ল্যাটিনামের মজুদের হিসেবটার কথা মনে পড়ল। পাহাড়টার উচ্চতা, ব্যাস ইত্যাদি হিসেব করে সেখানে প্ল্যাটিনামের মজুদের আনুমানিক পরিমাণ এভাবে বের করেছেন হুপার: যদি দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন কিউবিক গজ পাথরের পাহাড় হয়ে থাকে ক্রিস্টাল মাউণ্টেন, তা হলে প্রতি কিউবিক গজে আছে দুই টন করে পাথর। আর প্রতি রক টনে যদি আধ আউন্স করেও প্ল্যাটিনাম পাওয়া যায়, তা হলে মোট দাঁড়ায় আড়াইশো মিলিয়ন আউন্স!

লণ্ডন মেটাল মার্কেটে সোনা-রূপাসহ সব ধরনের ধাতুর দাম মিনিটে মিনিটে ওঠা-নামা করে। সেখানে সোনার চেয়েও প্রায় দ্বিগুণ দাম প্ল্যাটিনামের। গত এক সপ্তাহ ধরে সেখানে প্ল্যাটিনামের দর আউন্স প্রতি ১৪৭৫ থেকে ১৪৭৮ পাউণ্ড স্টার্লিঙে ওঠা-নামা করছে। সেক্ষেত্রে আড়াইশো মিলিয়ন আউন্সের দাম...

'ক্রাইস্ট!' আবার বলল সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীচের গাড়িঘোড়ার দিকে মন দিল। আফসোস এটা তার নিজের শহর নয়। কিন্তু হতে পারতো। খুব হতে পারতো, যদি হিটলার তাড়াহুড়ো না করতেন। নির্বান্ধব, অসহায় ইংল্যাণ্ডকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও বড় মাছ ধরার আশায় রাশার দিকে ধেয়ে গিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়ে না বসতেন।

কিছুক্ষণ পর ডেস্কে ফিরে এল সে। হুপারের রিপোর্টের সঙ্গে সাইমন এনডিনের জুড়ে দেয়া প্রেশাস মেটালের তুলনামূলক একটা বিবরণও ছিল। ওটা পড়তে লাগল মনে দিয়ে।

'আ প্রেশাস মেটাল ইজ আ রেয়ার মেটালিক কেমিক্যাল এলিমেণ্ট অফ হাই ইকোনমিক ভ্যালিউ। কেমিক্যালি দিজ আর লেস অ্যাট্রাকটিভ দ্যান মোস্ট এলিমেণ্টস, হ্যাভ হাই লাস্টার, আর সফটার অর মোর ডাকটাইল, অ্যাণ্ড হ্যাভ হাইয়ার মেল্টিং পয়েণ্টস দ্যান আদার মেটালস।'

কপালের একটা পাশ চুলকে নিল প্যান্থার। চুরুটে লম্বা করে একটা টান দিয়ে আবার পড়ায় ডুবে গেল।

'...শতাব্দীর পর শতাব্দী ধাতব মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে বলে প্রেশাস বা বহু মূল্যবান ধাতু সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে সেগুলো ইদানীং বিনিয়োগ ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমোডিটি হিসেবেও সমান দাপটে রাজত্ব করছে। সেসবের মধ্যে সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম ও প্যালাডিয়াম, সবগুলোর আইএসও ৪২১৭ কারেন্সি কোড আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিচিত ধাতু হচ্ছে সোনা ও রূপা। এই দুই ধাতু নানান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলেও শিল্প, অলঙ্কার এবং ধাতব মুদ্রা প্রস্তুতের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে।

'বাকি সব মূল্যবান ধাতু, বিশেষ করে প্ল্যাটিনাম পরিবারের রুথেনিয়াম, রোডিয়াম, প্যালাডিয়াম, ওসমিয়াম, ইরিডিয়াম এবং প্ল্যাটিনামের মধ্যে শেষেরটাই সবচেয়ে বেশি হাত বদল হয়। রেনিয়ামও মূল্যবান ধাতু, তবে প্ল্যাটিনাম পরিবারের সঙ্গে সেটার কোনও সম্পর্ক নেই। আর সব মূল্যবান ধাতুর মতো ঐতিহ্যবাহী নয় সেটা।

'এগুলোর দাম কেবল বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করে না, বরং বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে সেসবের কদর কতোখানি এবং গুদামজাত করা থেকে গুদাম থেকে বের করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ, সবকিছুর ওপর নির্ভর করে।

'১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে লণ্ডন মেটাল মার্কেটে প্যালাডিয়ামের আউন্স প্রতি দাম যা ছিল, সোনার দাম ছিল তার দ্বিগুণেরও বেশি। আর প্ল্যাটিনামের দাম ছিল সোনার দ্বিগুণ। প্রেশাস মেটালের মধ্যে রেনিয়ামের দাম সবচেয়ে বেশি। ওই সময় সেটার দাম ছিল প্ল্যাটিনামের চেয়ে সাড়ে চার গুণ বেশি।

'এসবের মধ্যে সবচেয়ে কম দামী ধাতু হচ্ছে সিলভার বা রূপা। আউন্স প্রতি দাম দশ পাউণ্ডের সামান্য বেশি। তারপরও অলঙ্কার ও ধাতব মুদ্রা তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হয় বলে রূপাও প্রেশাস মেটালের মধ্যে পড়ে।

'কোনও মেটাল প্রেশাসের মর্যাদা পায় তখন, যখন সেটা প্রাপ্তির দিক থেকে বিরল হয়। নতুন খনি আবিষ্কার বা মাইনিং আর রিফাইনিং ব্যবস্থার উন্নতি এসবের দাম পড়ে যাওয়ার কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন অ্যালুমিনিয়াম।

আজকাল এ জিনিস অত্যন্ত সহজলভ্য। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম পৃথক করা ছিল প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। সে সময় সোনার চেয়েও দামি আর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল অ্যালুমিনিয়াম।

'১৮৫৫ সালে ফ্রান্সের এক্সপোজিশন ইউনিভার্সেল-এ ফরাসি ক্রাউন জুয়েলের সঙ্গে কয়েকটা অ্যালুমিনিয়াম বারও প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল। এ ছাড়া নেপোলিয়ন তৃতীয় তাঁর সম্মানিত মেহমানদের জন্য অ্যালুমিনিয়ামের একটা ডিনার সেট সব সময় রেডি রাখতেন।

'ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পিরামিডের মত চূড়ার পুরোটাই খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি। ওটা যখন নির্মাণ করা হয়, তখন সোনা, রূপা বা প্ল্যাটিনামের চেয়েও অ্যালুমিনিয়ামের দাম অনেক বেশি ছিল। ১৮৮৬ সালে হল-হেরল্ট প্রক্রিয়া আবিষ্কার হয়। তার ফলে আকরিক থেকে অ্যালুমিনিয়াম পৃথক করার প্রতিবন্ধকতা চিরতরে দূর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের দামও চিরদিনের জন্য পড়ে যায়।

'অনেক দেশেই সোনা-রূপার তৈরি মুদ্রার চল আছে। সেসবের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার ক্রুগেরাণ্ড সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত। সোনা বা রূপা হিসেবে সেগুলোর প্রকৃত দাম যা হয়, মুদ্রা হিসেবে তা অনেক কম। যেমন কানাডার পঞ্চাশ ডলারের সোনার মেইপল লিফ কয়েন। এক ট্রয় আউন্স বা ৩১.১০৩৫ গ্রাম সোনার তৈরি ওটা। ফেস ভ্যালিউ পঞ্চাশ কানাডিয়ান ডলার হলেও অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার হলে তারই দাম হবে ৬৩৭ ডলার।'

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল সে। হুপারের রিপোর্টের সঙ্গে সাইমন এনডিনের জুড়ে দেয়া প্রেশাস মেটালের তুলনামূলক চার্ট আর মেটালের বিস্তারিত বিবরণ পড়তে ভালই লাগছে। মনে মনে এনডিনের প্রশংসা করল সে। লোকটা বুদ্ধি করে এই চার্ট জুড়ে দেয়ায় উপকারই হয়েছে তার। চুরুটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে আবার পড়ায় ডুবে গেল প্যান্থার।

বিবরণ পড়া শেষ হতে প্রেশাস মেটালের ব্যাপারে রীতিমতো বিদ্যার জাহাজে পরিণত হলো সে। ওটার মূল বক্তব্য মনে মনে ঝালাই করতে লাগল।

'বিশ্বে প্রতি বছর প্ল্যাটিনাম উৎপন্ন হয় পনেরো লাখ ট্রয় আউন্সের কিছু বেশি। অবশ্য উৎপাদনকারীরা নিজেদের মজুদের হিসেব কখনোই সঠিক জানতে দেয় না, তাই আসল পরিমাণ জানার কোনও উপায় নেই।

'প্ল্যাটিনামের মোট উৎপাদনের বেশিরভাগই বাজারে আসে দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও রাশা, এই তিন উৎস থেকে। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ আসে এসব দেশ থেকে। রাশা হচ্ছে এই দলের বিষফোঁড়া। বাজার স্থিতিশীল রাখতে বাকি দুই সূত্রকে সহযোগিতা করা উচিত, নিজের সত্যিকারের মজুদের পরিমাণ তাদেরকে জানানো উচিত—একথা মানতে চায় না।

'উৎপাদনকারীদের উচিত প্ল্যাটিনামের মত দামি ধাতুর বাজার স্থিতিশীল রাখা। কারণ কারও নতুন মাইনিং ইকুইপমেন্ট কেনা বা নতুন মাইন উন্নয়ন জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বিনিয়োগের পরিকল্পনা থাকলে বাজারের স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে আস্থার সঙ্গে তা করতে পারে সে বা তারা।

'সে ক্ষেত্রে ভরসা থাকে কোথাও থেকে যদি সংশ্লিষ্ট মেটালের বড় কোনও চালান আচমকা এসে হাজির হয়, তা হলেও হঠাৎ করে বাজার বসে পড়বে না। কিন্তু রাশানরা চায় তার উল্টোটা। তারা চায় সব সময় বাজারে যেন এই ভয়টা বজায় থাকে।

'তারা চায় বিশ্বের সকল উৎপাদনকারী জানুক, তাদের হাতে অজ্ঞাত পরিমাণ প্ল্যাটিনামের মজুত আছে। ইচ্ছামতো যে কোনও সময় সেসব বাজারে ছেড়ে সয়লাব করে দিতে পারে তারা। ধস নামিয়ে দিতে পারে বাজারে। ফলে মেটাল মার্কেট সারা বছরই রাশা-জ্বরে ভোগে।

'বাৎসরিক উৎপাদন পনেরো লাখ ট্রয় আউন্সের মধ্যে সাড়ে ৩ লাখ আউন্স বছরে বাজারে ছাড়ে তারা। অর্থাৎ পুরোটার তেইশ থেকে চব্বিশ শতাংশ। প্রভাব বিস্তার করার জন্য পরিমাণটা যথেষ্ট। রাশার প্ল্যাটিনাম বাজারে আসে সয়াস প্রম এক্সপোর্ট নামের এক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

'কানাডা প্রতি বছর বাজারে ছাড়ে দুই লাখ আউন্সের মতো। কানাডার প্ল্যাটিনাম মেটাল মার্কেটে আসে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মিত্র আমেরিকার এঙ্গেলহার্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের হাত ঘুরে। কিন্তু ইদানীং আমেরিকার প্ল্যাটিনামের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। চেষ্টা করেও তা পূরণ করতে পারছে না কানাডা। তাই আমেরিকানদের বাড়তি প্ল্যাটিনাম খোঁজাও শেষ হচ্ছে না।

'এ জিনিস বাজারে সরবরাহ করার তৃতীয় এবং সর্ববৃহৎ সূত্র হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। বছরে সাড়ে ৯ লাখ আউন্স প্ল্যাটিনাম ছেড়ে মেটালের বাজারে রাজত্ব করে আসছে তারা অনেক বছর থেকে। তাদের প্ল্যাটিনাম উৎপাদনকারী বড় দুটি প্রতিষ্ঠান, ইমপালা মাইনস ও রাসটেনবার্গ মাইনস নিয়ন্ত্রণ করে জোহান্সবার্গ কনসোলিডেটেড। রাসটেনবার্গের পুরোটা প্ল্যাটিনামই বাজারে আসে লণ্ডন ভিত্তিক জনসন-ম্যাথির হাত হয়ে।'

এগুলো সাধারণ তথ্য। আর দশজন ব্যবসায়ীর মতো তারও কিছু কিছু জানা ছিল। তবে এনডিনের এই রিপোর্ট পড়ার আগে পর্যন্ত তার এই জানা ছিল ব্রেন সার্জন যেমন হার্ট কীভাবে কাজ করে জানে, সেইরকম অনেকটা।

অবশ্য তার কাছে পাকা খবর আছে, এঙ্গেলহার্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক চার্লি এঙ্গেলহার্ড গত কিছুদিন থেকে নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্ল্যাটিনাম কিনতে শুরু করে দিয়েছে। কারণটা অজ্ঞাত। তবে প্যান্থার ঝুনো ব্যবসায়ী, কারণটা জেনে-বুঝে নিতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি তাকে।

বিশেষ প্রয়োজনে প্ল্যাটিনামের চাহিদা ইদানীং অনেক দেশেই বেড়ে গেছে। বিশেষ করে আমেরিকা আর জাপানের মতো ধনী দেশগুলোতে। অথচ বর্তমানের তিন সরবরাহকারীর পক্ষে সে-চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই প্রচণ্ড চাপ পড়ছে তাদের ওপর। অথচ বাজার পরিস্থিতি বলছে প্ল্যাটিনামের সরবরাহ বাড়ার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই।

তাই নতুন কোনও সূত্রের খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে আমেরিকা। এর কারণ তার দেশের গাড়ি উৎপাদনের অবিশ্বাস্য হার। ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে তারা।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে প্রথমবারের মত ‘এয়ার পলিউশন’, ‘ইকোলজি’ আর ‘এনভায়রনমেণ্ট’ প্রভৃতি শব্দ মার্কিন পরিবেশবিদদের মুখে উচ্চারিত হতে শুরু করে। দশ বছর আগেও সাধারণ মানুষ এসব বচন শোনেনি। কিছুদিনের মধ্যে তা নিয়ে রাজনীতিও শুরু হয়ে যায়। ঘরে-বাইরে হরদম সবার মুখেই সেই কথা। যত্রতত্র ‘পলিউশন’, ‘ইকোলজি’ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তখন।

ক্রমে পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার বিষয়ে মানুষ সোচ্চার হতে থাকে। এ জন্য পরিবেশবাদীরা প্রথমেই যেটার ওপর হামলা চালায়, সেটা হলো মোটর কার। কারের ধোঁয়া নাকি পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি করে। তাদের আন্দোলনের চাপে আমেরিকান সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৭৬ সালে একটা আইন পাশ করে। তা হলো প্রতিটা গাড়িতে বিশেষ একটা ডিভাইস ফিট করতে হবে যা একজস্ট পাইপের ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর গ্যাস পরিশুদ্ধ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখবে।

মোটর কার একজস্ট তৈরি করতে তিনটা জিনিসের দরকার পড়ে। তার দুটো সারা হয় কেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে যাকে অক্সিডেশন বলে। বাকিটা হচ্ছে রিডাকশন। এ জন্য যা প্রয়োজন, তাকে বলে ক্যাটালিস্ট বা অনুঘটক।

সোজা কথায়, যা নিজে পরিবর্তিত না হয়ে কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে, সেটাই ক্যাটালিস্ট।

এবং পৃথিবীতে মোটর কারের জন্য উপযুক্ত ও টেকসই ক্যাটালিস্ট একটাই আছে—সেটা হলো প্ল্যাটিনাম।

আমেরিকায় নতুন আইন জারি হওয়ার পর থেকে উৎপাদকরা প্রতিটা গাড়ির সঙ্গেই ক্যাটালিস্ট জুড়ে দেয়া শুরু করেছিল। কিন্তু ১৯৮০ সালের আগে পর্যন্ত তাদেরকে নন-প্রেশাস মেটালের তৈরি ক্যাটালিস্টের ওপর ভরসা করে থাকতে হতো। নির্ভরযোগ্য ছিল না সেগুলো। তারপর বাজারে আসে প্ল্যাটিনাম-বেজড নির্ভরযোগ্য ক্যাটালিস্ট। প্রতিটা ডিভাইস তৈরি করতে প্রয়োজন হয় এক আউন্স খাঁটি প্ল্যাটিনামের দশ ভাগের এক ভাগ।

কিন্তু পৃথিবী এখন আর ১৯৭০ বা ১৯৮০-র দশকে বসে নেই। মানুষ বেড়েছে। গাড়ির প্রয়োজনও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। গাড়ি উৎপাদনকারী দেশগুলো একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাড়ি বানাচ্ছে। জাহাজ ভরে ভরে রফতানী করছে। এরমধ্যে চারগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে গাড়ি উৎপাদনের মাত্রা। সরবরাহ করে কুলিয়ে উঠতে পারছে না উৎপাদনকারীরা। অথচ প্ল্যাটিনামের উৎপাদন এখনও সীমিতই আছে।

আমেরিকানদের মতো সর্বভুক জাতি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টা নেই। প্রকৃতি বা মানুষের তৈরি ভোগ-বিলাসের বস্তু যা কিছু আছে, সবই তাদের চাই। গাড়ির ক্ষেত্রেও সেটাই হচ্ছে। তাই ও দেশের গাড়ি নির্মাতাদের প্ল্যাটিনাম খোঁজাও সেই যে গত শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে, আজও শেষ হচ্ছে না।

হবেও না কখনও—জানা আছে তার।

বাড়তি প্ল্যাটিনামের আশায় সারা বছর দুনিয়াময় ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়

ওরা। এরকম এক মাহেন্দ্র সময়ে সুযোগটা যখন মেঘ না চাইতে জলের মতো এসেই গেল, সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

সর্বভুক জাতিটাকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার একটা উপায় ভেবে বের করেছে প্যান্থার। আর ঘুরতে হবে না ওদের। যতো প্ল্যাটিনাম দরকার, এখন তার কাছ থেকেই কিনতে পারবে ব্যাটারা। প্রয়োজনে কুতকুতেগুলোকেও দেবে সে কিছু। তার চিন্তা কীসের? তার হচ্ছে টাকা নিয়ে কথা। অবশ্য দামটা একটু বেশি দিতে হবে ভায়াদের। এই আর কী!

তবে কিছু সমস্যাও আছে। তাকে অবশ্যই সবকিছুর আগে নিশ্চিত করতে হবে যে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের মাইনিং রাইটস একমাত্র সে-ই নিয়ন্ত্রণ করবে। আর কেউ নয়। তা কীভাবে সম্ভব? এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে সে।

এখন তার প্রথম কাজ হবে জাংগারোয় গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করা। কোনও সুইস ব্যাংকে তার নামে মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো বিশাল অংকের টাকা জমা রাখার প্রস্তাব দিঁয়ে তাকে লাইনে আনা এবং দু' পক্ষের মধ্যে প্রফিট-পার্টিসিপেশনের ভিত্তিতে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের সোল মাইনিং রাইটস নিজের কোনও এক কোম্পানির নামে আদায় করে নেয়া।

সরকার ও তার কোম্পানির মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের গোপন অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভেটেড হবে। পরে প্ল্যাটিনাম উত্তোলনের কাজ শুরু হলে লাভের টাকায় জাংগারান সরকারী কোষাগারের সিন্দুকও ভরবে, প্রেসিডেন্টের সুইস অ্যাকাউন্টও মোটাতাজা হতে থাকবে।

কিন্তু খুবই সাবধানে এগোতে হবে তাকে। দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা বা রাশা যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় জাংগারোয় কী আছে, তা হলে তারা কাউন্টার বিড অবশ্যই দেবে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যাবে। কারণ সমান আগ্রহী একাধিক পার্টি হাজির হলে স্বভাবতই একদিকে জাংগারান সরকারের 'শেয়ার' চড়বে, অন্যদিকে তার 'শেয়ার' পড়তে থাকবে।

এদিক থেকে ম্যানকনও বড় একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারত, যদি সময়মত সবদিক থেকে গোড়া না মেরে দেয়া হত। প্ল্যাটিনাম আবিষ্কারের বিষয়টা জানাজানি হওয়ার আগেই ম্যানকনের মালিক, চিফ অ্যানালিস্ট এবং সেই প্রসপেক্টর বুড়োর পটল তোলার আয়োজন করা না হত।

এখন বাকি যে সমস্ত আগ্রহী পার্টি আছে, জানা কথা তারা আগ্রহী সবাই চাইবে হয় ক্রিস্টাল মাউন্টেনের মাইনিং রাইটস কবজা করতে, নয়তো ওটার প্ল্যাটিনাম যাতে কখনও আলোর মুখ দেখতে না পারে, সেই আয়োজন পাকাপোক্ত করতে। চিরতরে ওই খনি বন্ধ করে দিতে। বিশেষ করে রাশা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এ কাজে অন্য যে কারও চেয়ে বেশি আগ্রহী হবে।

কারণ, নিজের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া যদি অন্য কারও নিয়ন্ত্রণে থেকে ওই প্ল্যাটিনাম বিশ্ব বাজারে হাজির হয়, তা হলে রাশারই সবচেয়ে বেহাল দশা হবে।

প্রভাব বলে কিছু থাকবে না। বাজার রাশা-জ্বর মুক্ত হলে সে সবার মাথার ওপর ছড়িও ঘোরাতে পারবে না। সেখান থেকে নিয়মিত রোজগারও হুমকির

মুখে পড়বে। কারণ যথেষ্ট মাল যদি বাজারে থাকে, তা হলে পশ্চিমের ক্রেতারা আর কাউকে না হোক, রাশাকে অন্তত ল্যাং মারবেই।

অতএব এসব অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথিদের ঠেকাতে হবে তাকে, যে করে হোক। মনে মনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পাকা করে ফেলল প্যান্থার। কিন্তু আধঘণ্টা পার হতে না হতেই সেদিনকার ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডের একটা পিচ্চি খবর যে সমস্ত পরিকল্পনা ওলট-পালট করে দেবে, চিন্তাই করেনি সে।

সন্তুষ্ট মনে প্রকাণ্ড রিভলভিং চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ মৃদু মৃদু দোল খেল মানুষটা। তারপর সময় নিয়ে আরেকটা হাভানা চুরুট ধরাল। ঘন ঘন কয়েক টানে আগুনটা ঠিকমতো ছড়িয়ে নিয়ে রুমের আরেক মাথার প্লেট গ্লাস জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল।

দুপুরেই সন্ধের মত আঁধার একটু একটু করে চেপে বসতে শুরু করেছে লণ্ডনের উপর। আশপাশের হাই রাইজ বিল্ডিংগুলোর নীচের অর্ধেক অংশের সব ফ্লোরে আলো জ্বলে উঠেছে। উপরের ফ্লোরগুলোতে কাজ চালানোর মতো দিনের আলো এখনও কিছুটা আছে, তাই ওপরের অংশে আলো জ্বালা হয়নি।

কিছু মেণ্টাল ওয়ার্ক করতে হবে বলে সেদিন একটু আগেই অফিস ছাড়ল টাইকুন। সাধারণত এত তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বের হয় না সে। যদিও এর মধ্যেই অফিস আওয়ারের সমাপ্তি ঘটেছে। কালির মতো কালো হয়ে গেছে আকাশ। ঝলমলে আলোর সাগরে পরিণত হয়েছে রূপসী লণ্ডন।

নীচে মানুষ আর মানুষ। বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো পথে নেমে এসেছে। ব্রোকার-ট্রেডার, কেরানি-মার্চেণ্ট, ব্যাংকার-অ্যাসেসর, জুনিয়র লেভেল অফিসার, লইয়ার-সেক্রেটারি, সবাই।

ছোটো-বড় গাড়িতে ভরে গেছে চারদিক। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ থেকে। তাই ছাতা মাথায় দেয়া পদচারী মানুষের মিছিলও আছে তার সঙ্গে। ওপর থেকে অদ্ভুত লাগছে দেখতে। রেল স্টেশন বা বাস স্টপেজের দিকে গড়াতে শুরু করেছে মিছিলগুলো। এডেনব্রিজ বা সেভেনওকস যাবে। তাদের ভরসা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট।

সোফার-চালিত বিশাল মার্সেডিজ বেঞ্জে চড়ে অফিস ছাড়ল প্যান্থার। ভেজা, প্যাচপেচে রাস্তা দিয়ে ধীর গতিতে, প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে ওটা। সামান্যতম ঝাঁকি বা দোল নেই। গাড়ি আদৌ চলছে কি না, রাস্তার দু' পাশের আলোগুলোর উল্টোমুখো দৌড় না দেখলে বোঝারই উপায় নেই।

চ্যারিং ক্রস স্টেশনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শোফারকে দিয়ে একটা ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড আনিয়ে চোখ বোলাতে লাগল প্যান্থার। হঠাৎ স্টপ প্রেস-এর দেড় ইঞ্চির একটা খবরের ওপর নজর আটকে গেল। ঘোড়দৌড়ের ফলাফলের মাঝে নয় পয়েণ্টে ছাপা হয়েছে। এত ছোটো যে সহজে চোখে পড়ে না।

হেডিং পড়ে বিড়বিড় করে দুটো মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল প্যান্থার, 'এই যা!'

ঝাড়া দশ মিনিট অচল থাকার পর সচল হলো প্যান্থার। স্বাভাবিক ক্রিয়া শুরু করে দিল তার উর্বর মস্তিষ্ক। অণু আকৃতির আরেক আইডিয়ার জন্ম হলো সেখানে। ক্রমে ডালপালা মেলতে শুরু করল। আর কেউ হলে হেসেই উড়িয়ে

দিতো হয়তো, কিন্তু প্যান্থার আলাদা জাতের মানুষ।

বিংশ শতাব্দীর পাইরেট সে, তাই একেবারে উড়িয়ে দিল না আইডিয়াটা। বরং মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

তার নজর কাড়া খবরটার হেডলাইন ছিল এরকম :

'New *Coup D'Etát* in Zangaro.'

কিছুক্ষণ পর আবার খবরটার ওপর চোখ বোলাল সে। বারবার পড়ল। একটু পর ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখল পত্রিকাটা। মহা গড়বড় হয়ে গেল তো, ভাবছে সে। আগের সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম আপনাআপনি বাতিল হয়ে গেল ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডের এই খবরটার কারণে। তা-ও ভাল যে তার চোখে পড়েছিল।

যে মুহূর্তে কাজে হাত দিতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই জাংগারোতে কু ঘটে যাওয়াটা ভারি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল তাকে।

এখন আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে সবকিছু। মুশকিল!

পরদিন কাঁটায় কাঁটায় দশটায় অফিসে ঢুকল প্যান্থার। চেয়ারে বসেই ইণ্টারকমের বাটন টিপল। 'মিস কুক, কাম ইন প্লিজ।'

তার লণ্ডন হেড অফিসের প্রায় সবাই ইংরেজ এবং মোটা বেতনভোগী। যে-সমস্ত দেশে তার অফিস আছে, সবগুলোতেই ওপরের দিকের দু'-চারজন ছাড়া প্রায় সবাই সেই-দেশী কর্মী নিয়োগ পায়। এর ফলে প্রায় ডজনখানেক ভাষা শিখে ফেলেছে সে। বুঝতে পারে। কিছু কিছু বলতেও পারে।

মিস কুক বসের রুমে পা রাখতে পিছনে নিঃশব্দে বুজে গেল বিচ-প্যানেলড ওয়াল। একগাদা কাগজপত্রের মধ্য থেকে মুখ তুলল টাইকুন।

'মিস কুক, কফি। আর সোয়া দশটায় সাইমন এনডিনকে আমার রুমে আসতে বলবেন।'

'ওকে, সার।'

'পিটার মার্টিন এসেছে?'

'এসেছে।'

'ওকেও থাকতে বলুন। প্রয়োজন হতে পারে।'

'ইয়েস, সার।' চলে গেল মহিলা।

ঠিক দশটা পনেরোয় বসের রুমে পা রাখল সাইমন এনডিন। বিশালদেহী এক আইরিশ। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। গণ্ডারের মত স্বাস্থ্য। খনিজ সম্পদ অ্যানালাইসিস এক্সপার্ট সে। ক'দিন আগে পর্যন্ত ম্যানকনের ডিপার্টমেণ্ট অভ স্টাডি, রিসার্চ, জিও-ম্যাপিং অ্যাণ্ড স্যাম্পল অ্যানালাইসিসের চিফ অ্যানালিস্ট, ডক্টর মার্টিন হুপারের রিসার্চ অ্যাসিসটেণ্ট ছিল।

অতীতে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি বা আইআরএ-র সদস্য ছিল সে। দুর্ধর্ষ গেরিলা যোদ্ধা ছিল। পিটার মার্টিনের সঙ্গে অনেক মিল আছে এই যুবকের। দয়া-মায়ার বালাই নেই। যখন-তখন মশা-মাছির মত মানুষ মারতে

পারে।

প্যান্থারের জানা আছে, কিছুদিন আগেও ওরা নিজেদেরকে ইংরেজদের নির্যাতনের শিকার বলে বিশ্ববাসীর সহানুভূতি আদায়ের যে চেষ্টা চালিয়েছিল, সেটা ছিল একদম ভুয়া।

আইআরএ আসলে একটা গোঁড়া ক্যাথলিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। ব্রিটিশদের সঙ্গে ওদের যে শত্রুতা, তার সৃষ্টি হয়েছে স্রেফ ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্টদের বহু শতাব্দীর পুরনো গোলমাল। আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রাম-টংগ্রাম ইত্যাদি আসলে ভুয়া।

তবে সাইমন নিঃসন্দেহে গুণী মানুষ। গুণ্ডা-পাণ্ডা হোক আর যা-ই হোক, নিজের ক্ষেত্রে বিস্তর পড়াশোনা করেছে। সেটা জেনেই তাকে ডেকে চাকরি দিয়েছিল প্যান্থার।

'কাম ইন, প্লিজ।' সামনে স্তূপ হয়ে থাকা কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে হাসল পাইরেট। 'কফি?'

'না, সার। ধন্যবাদ।'

'বোসো। তোমাকে দুটো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করব। স্পেসিফিক জবাব চাই।'

'নিশ্চয়ই!'

'তোমার লুটন ল্যাবের সামারি রিপোর্টে প্ল্যাটিনাম সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সে বিষয়ে তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত তো? এসবের আর কোনও ব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই?'

'বুঝলাম না, সার।'

'প্ল্যাটিনামের পরিবর্তে আর কিছু হতে পারে না ওসব?'

'প্রশ্নই ওঠে না, সার,' দৃঢ় স্বরে বলল যুবক। 'এই ব্যাপারে একশোভাগ নিশ্চিত থাকতে পারেন। একবার দু'বার না, তিন-তিনবার স্যাম্পলগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তা-ও আমি না, ডক্টর হুপারের মতো একজন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ টেস্ট করেছেন। আমার উপস্থিতিতে। তিনি অবশ্য জানতেন না যে আমি লক্ষ করছি সব। ফলাফল প্রতিবার একই হয়েছে।'

একটু ভাবল যুবক। 'থিওরিটিক্যালি এমন হলেও হতে পারে, পাললিকের পরিমাণের হিসেবে সামান্য গড়বড় ঘটেছে। কারণ পরীক্ষার সময় ওটার ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। কিন্তু প্ল্যাটিনামের বেলায় সে চান্স লাখে এক ভাগও নেই, সার। ওই রিপোর্ট সমস্ত ধরনের বৈজ্ঞানিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে। কথাটা আমি নিজের জীবন বাজি রেখে বলতে পারি।'

সন্তুষ্টি ফুটল প্যান্থারের চেহারায়। সন্তুষ্ট সে আগেও ছিল, তবু শেষবারের মতো একটু বাজিয়ে নিল।

'গুড। লুটনের আর কেউ জানে এই ফলাফলের কথা?'

'না, সার। কেউ জানে না। আমাকেও অনেক কৌশল করে জানতে হয়েছে।'

'তোমাদের কোনও সহকারী, বা...' এনডিনকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল সে।

'না, সার। অসম্ভব সতর্ক ছিলেন ডক্টর হুপার।'

মিনিট বিশেক পর এনডিনকে বিদায় দিয়ে ভাবতে বসল সে। ছেলেটার মধ্যে কেমন একটা ছটফটে ভাব ছিল না? সেটা কি নিজের মহামূল্যবান আবিষ্কারের সাফল্যে, নাকি... শ্রাগ করল পাইরেট। একটু বেশি উচ্চাভিলাষী বলে মনে হলো না?

ছেলেমানুষ!

প্যান্থারের নীচের ফ্লোরে তার চিফ একসিকিউটিভ পিটার মার্টিনের অফিস। ভেতরে সুন্দরী সেক্রেটারি নোরা বসের চেয়ারের হাতলে চড়ে বসে তার গলা ধরে দোল খাচ্ছে। দু'জনেরই ঠোঁটে-গালে লিপিস্টক জেবড়ে আছে। চোখে ঘোর।

নতুন করে চুমোচুমির সেশন শুরু হতে যাচ্ছিল, এই সময় ভায়া মিস কুক বসের তলব পেয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল মার্টিন। রুমালে দ্রুত মুখ মুছে নিয়ে নোরার উদ্দেশে নীরবে 'টাটা' করে লম্বা পা ফেলে এগোলো দরজার দিকে।

প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ সে। অ্যাথলিটদের মত সুগঠিত দেহ। বয়স ৩৩-৩৪। আকর্ষণীয় চেহারা। মাথা ভর্তি ঘন কোঁকড়া চুল। তার চেহারার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে ঠোঁট। ও দুটোর আকর্ষণ মেয়েরা সহজে এড়াতে পারে না। যদিও তার গাঢ় নীল চোখ দু'টোর চাউনি সাপের চোখের মত ঠাণ্ডা। অপলক।

অফিসে একগাদা মেয়ে সেক্রেটারি কাজ করে। তাদের প্রায় সবারই বুকের ভিতর মার্টিনের জন্য হা-হুতাশ আছে। আড়ালে-আবডালে তাকে 'ডিশি' বলে ডাকে মেয়েগুলো। সে জন্য কিছুটা হামবড়া ভাব আছে মার্টিনের মধ্যে।

এ শহরের গো-গেটিং ইণ্ডাস্ট্রির সবচেয়ে হৃদয়হীন গো-গেটার মালিকের ডান হাত পিটার মার্টিন। সেভিল রো-র সুটের জন্য আজকাল দেখতে মার্জিত লাগলেও ব্যাক গ্রাউণ্ড বলে অতীতে জঘন্য চরিত্রের মানুষ ছিল সে। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এমন কাজ নেই যা করতে পারত না।

এক সময় ওয়েস্ট এণ্ডের নামী-দামি ক্লাবগুলোয় নিয়মিত আড্ডা দিতে আসা মিলিয়নেয়ার-বিলিয়নেয়ারদের একটু বয়স্ক, বাছা বাছা সুন্দরী বউদের পটানো ছিল তার পেশা। তাতে রথ দেখা আর কলা বেচা, দু'টোই হত। নিজের মোহনীয় সৌন্দর্যের ফাঁদে ফেলে তাদেরকে শয্যাসঙ্গিনী করত সে। তারপর কিছুদিন পরম আনন্দ দিয়ে দুর্বল করে নিয়ে নানান কৌশলে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ত।

অবশ্য বিশেষ কিছু গুণও আছে তার। সেগুলোর মধ্যে একটা হলো যখন যা করে, মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে করে। কোনও কাজে ফাঁক রাখে না। স্কুলের পাঠও সে মন দিয়েই করেছিল, যে-পাঠ পরবর্তীতে প্যান্থারের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে তার ভবিষ্যৎকে।

ওয়েস্ট এণ্ডের ধান্ধাবাজির ব্যবসায় একদিন অরুচি ধরে গেল মার্টিনের।

একই কাজ, সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড়—কাঁহাতক ভাল লাগে? ওসব ছেড়ে একদিন 'ভদ্রলোক' হওয়ার খায়েশ জাগল তার। কারণ ততদিনে বোঝা হয়ে গেছে যে ধান্ধাবাজিতে টাকা-পয়সা আসে ঠিকই, সাফল্য আসে না। ভদ্র সমাজে কল্কে জোটে না।

অতএব কিছুদিন মেয়ে পটানোর ব্যবসা থেকে সরে থাকল সে। সুযোগমত ইণ্টারভিউ দিয়ে এক ধনী তেল ব্যবসায়ীর শেয়ার মার্কেট ব্যবসা দেখাশোনার চাকরি জুটিয়ে নিল। গাড়ি-বাড়ির সুবিধাসহ বেশ মোটা বেতনেরই চাকরি ছিল সেটা।

কিন্তু কথায় বলে : কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। চাকরিতে যোগ দেয়ার দু' মাসের মধ্যে বসের অষ্টাদশী, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত অসাধারণ সুন্দরী বউটিকে দেখে লোভ সামলাতে পারল না মার্টিন। নিয়ত আবার ত্যাড়া হয়ে গেল। ভদ্র হওয়ার খায়েশ জলাঞ্জলি দিয়ে পুরনো কায়দায় মেয়েটাকে পটিয়ে মৌজ করল কিছুদিন, তারপর যথারীতি বসের পুঁজির বড় একটা অংশ কৌশলে পকেটস্থ করে সটকে পড়ল।

কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের জানা-বোঝার পরিধি বিস্ময়কর রকম ব্যাপক হয়ে থাকে। এটা প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা। দু'দিনেই সবার হাঁড়ির খবর জানা হয়ে যায় তাদের। পিটার মার্টিনও সেই প্রজাতির। শেয়ার মার্কেটে তার বিচরণ ছিল অল্প কিছুদিনের। তার মধ্যেই সেখানকার ফাঁক-ফোকর, অলি-গলি, কানাগলি আর তস্য গলি সম্পর্কে মহাবিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে সে। সেই জ্ঞান সে প্রতিপক্ষের ওপর এমন নির্দয়ভাবে খাটাত যে অনেক আদি স্টক ব্যবসায়ীরও নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল।

এভাবে পিটার মার্টিন লণ্ডন শেয়ার বাজারে 'ডিজাস্টার মার্টিন' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্যান্থারের চোখ পড়ে তার ওপর। কিছুদিন পর চাকরিটা ছাড়তেই মোটা টাকার টোপ দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলে সে। এত মোটা টোপ যে মার্টিনের মত অমানুষও তা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দলে ভিড়ে যায় সে প্যান্থারের।

সেসব বেশ আগের কথা। এখন মার্টিনের অতীত আর বর্তমানের মাঝে একটা নিরেট দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে প্যান্থারের টাকায়। সে দেয়াল ভেদ করে ওপাশটা দেখার মত ক্ষমতা এমনকী আইনেরও নেই। প্যান্থারের ছোঁয়ায় এখন সে এতটাই বদলে গেছে যে আজকাল অতীত দিনের কথা তার নিজের কাছেই স্বপ্নের মত অবাস্তব মনে হয়।

এখন অনেক বদলে গেছে সে। যদিও ওপরে ওপরে। তলে তলে আগের মত নির্দয়, অমানুষই রয়ে গেছে। মাছি মারা আর মানুষ খুন করা, দুটোকে আলাদা করে দেখার মানসিকতা এখনও জন্ম নেয়নি তার মধ্যে। কেবল এই বিশেষ গুণটির কারণেই আজ সে প্যান্থারের চিফ একসিকিউটিভদের একজন।

সিঁড়িঘরে বেরিয়ে এলো মার্টিন। লিফটের দিকে গেল না ইচ্ছে করেই। ওটার আগেই পৌঁছে যেতে পারবে জানে, তাই লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। বসের রুমে পা রাখতেই উঠে এসে হ্যাণ্ডশেক করল গো-গেটার।

'হ্যালো, মার্টিন!' মুখে হাসির আভাস। 'সিট ডাউন, প্লিজ।'

নিজের ডেস্কের পিছনে চলে এলো প্যান্থার। সময় নিয়ে একটা হাভানা চুরুট ধরাল। ঘন ঘন কয়েক টানের পর রুমের আরেক প্রান্তের প্লেট গ্লাস জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। আজও অসময়ে সন্ধে নেমেছে লণ্ডনে।

চেয়ারে বসে যুবকের দিকে তাকাল গো-গেটার। দামী সুটের নীচে পেশিবহুল দেহটা উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে যুবকের। স্বাভাবিক, ভাবল সে। মনিবের নতুন নির্দেশ শোনার প্রতীক্ষায় থাকার সময় অন্যদের মাঝেও এটা দেখা যায়। সম্ভবত বিদেশী মনিব বলে এক ধরনের অনিশ্চয়তা কাজ করে ওদের মাঝে।

চুরুট রেখে কিছুক্ষণ রুমের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারী করল প্যান্থার। চিন্তিত। খাটো খাটো হাত দু'টো পিছনে বাঁধা। মার্টিনের চোখ নীরবে অনুসরণ করছে তাকে।

একটু পর নিজের চেয়ারে ফিরে এল প্যান্থার। ঝাড়া ত্রিশ মিনিট ধরে নতুন মিশন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে গেল পিটার মার্টিনকে। একেবারে পাখি পড়া করাল। তারপর বলল, 'সবকিছু নিখুঁত হওয়া চাই। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল পিটার মার্টিন। 'পেরেছি।'

'ওকে, বাই,' কাগজপত্রের কৃষ্ণসাগরে ডুবে গেল প্যান্থার।

তিনদিন পর জাংগারোর প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়ার উদ্দেশে উড়াল দিল পিটার মার্টিন।

তিন

দুই সপ্তাহ পরের কথা। রিপাবলিক অভ জাংগারোর ওপর লেখা পিটার মার্টিনের পুরু ফাইলটা দেখল প্যান্থার। বড় বড় ছবির একটা ডোশিয়েও আছে সঙ্গে। আর আছে কিছু ম্যাপ।

'কু-র পিছনে বাইরের কোনও শক্তির হাত ছিল কি না জানা গেল?' প্রথম প্রশ্ন করল গুন্থার।

'হ্যাঁ, সার। ছিল। মস্কোর সরাসরি সহযোগিতা ছিল।'

ভুরু কোঁচকাল টাইকুন। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল, 'তারপর? নতুন সরকারের হেড কে?'

'আর্মির এক কর্নেল, সার। ফ্রান্সিস কিমবা। কর্নেল ছিল। ক্ষমতায় বসার পনেরো দিনের মধ্যে দুই লাফে মেজর জেনারেল হয়েছে। অনেকে বলে লোকটা নাকি বদ্ধ উন্মাদ।'

'হুঁম,' ফাইলটা দেখাল গুন্থার। 'কেউ জানতে চায়নি এ কাজ তুমি কার জন্যে করছ?' গালে এক হাত রেখে বসল গাট্টাগোট্টা গো-গেটার। অন্য হাতের

আঙুলের ফাঁকে মোটা চুরুট পুড়ছে।

'না,' বলল মার্টিন। মাথা ভর্তি ঘন কোঁকড়া চুল দুলে উঠল ঝাঁকি লেগে।

'জাংগারো কর্তৃপক্ষ জানতে পারবে না তাদের দেশ সম্পর্কে ডেটা সংগ্রহ করছে বাইরের কেউ?'

'না,' দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল যুবক। 'এসব ডেটা বেশিরভাগ এখান থেকেই জোগাড় করেছি আমি। বাকিটা ইওরোপের বিভিন্ন ভার্সিটির লাইব্রেরি ঘেঁটে। জাংগারোর দশ বছরের পুরনো এক টুরিস্ট গাইডেও পেয়েছি কিছু। মনরোভিয়ার এক বুক স্টলে।'

মাথাটা উপর-নীচ করল প্যান্থার।

'সবখানে বলেছি, আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসনামল ও তার পরবর্তী শাসনামলের পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর গ্র্যাজুয়েট থিসিস করার জন্য তথ্যগুলো আমার চাই।'

সন্তুষ্ট হলো পাইরেট। 'ওকে। এবার জাংগারো ও তার আশপাশের এলাকা সম্পর্কে বলো শুনি।'

ফাইলটা কাছে টেনে নিল মার্টিন। কয়েকটা পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে গেল। তারপর একটা ম্যাপ টেনে নিয়ে ডেস্কের ওপর বিছাল। আফ্রিকার যে অংশে রিপাবলিক অভ জাংগারো, সেই অংশের গোটা উপকূলরেখা দেখা যাচ্ছে ওটায়।

মার্টিনের বলা শেষ হতে গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল প্যান্থার। 'হুঁম!' তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘুরতে লাগল ম্যাপের ওপর। 'কিন্তু কোনও দিকে বর্ডার লাইন দেখছি না তো!'

হাসল যুবক। 'থাকলে তো! আফ্রিকার এই অঞ্চলে অতীতে স্থানীয় মাতবরদের নিয়ে সালিশ-বৈঠক করে বর্ডার নির্দিষ্ট করার রেওয়াজ ছিল। ফরাসিরাও সেই নিয়মে কাজ চালিয়েছে বলে ম্যাপে বর্ডার দেখানোর প্রশ্নও কখনও ওঠেনি। তাই জমিতে বলতে গেলে কার্যকর কোনও বর্ডার নেই। রাস্তাঘাটের অবস্থাও তেমনি। তবে এখানটায়, পাশের দেশে যাওয়ার একটা বর্ডার ক্রসিং পয়েন্ট আছে,' এক জায়গায় টোকা দিল সে। 'এই যে। এটাকে আন্তর্জাতিক ক্রসিং পয়েন্ট হিসেবে ধরা হয়। মানে, কিমবা ক্ষমতায় বসার আগে পর্যন্ত হতো আর কী। এখন প্রায় সিলড্ অবস্থায় আছে।'

পয়েন্টটায় ভাল করে চোখ বোলাল পাইরেট। 'পুব আর দক্ষিণ বর্ডারের কী অবস্থা?'

'ওদিকের রাস্তা-ঘাট বহু পুরনো। ভাঙাচোরা। হাঁটাপথও আছে কিছু। পাহাড়ি এলাকা আর গভীর বনের মধ্যে দিয়ে গেছে। বন বেশিরভাগ জায়গাতেই দুর্ভেদ্য। দেশটার আয়তন সাত হাজার স্কয়ার মাইল, সার। উপকূল ঘেঁষা প্রান্ত সত্তর মাইল লম্বা, ভেতরদিকের প্রান্ত একশ মাইল। রাজধানী ক্লারেন্স সিটি এখানে, উপকূলীয় প্রান্তের ঠিক মাঝখানে। দেশের উত্তর এবং দক্ষিণ, দুই বর্ডার থেকেই আনুমানিক পঁয়ত্রিশ মাইল ভেতরে।

'ক্লারেন্সের পিছনদিকে আছে সরু কোস্টাল সমভূমি। দেশের একমাত্র আবাদযোগ্য অঞ্চল বলতে গেলে ওইটুকুই আছে। তার পিছনে আছে জাংগারো

নদী। তারপর ক্রিস্টাল মাউন্টেনের ফুটহিল। তারপর ক্রিস্টাল পর্বতমালা। তারও ওপাশে, পুবদিকের বর্ডার জুড়ে আছে মাইলের পর মাইল গভীর জঙ্গল।'

'যোগাযোগের কী অবস্থা?' জানতে চাইল প্যান্থার।

'সড়ক আর নৌপথই ভরসা,' কানের লতি চুলকে নিল মার্টিন। 'তবে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা সুবিধের না, সার। ছোটো একটা নৌ বন্দর আছে। একটা নদী আছে জাংগারো নদী নামে, ক্লারেন্সের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে। ওটার জন্যে শহরটা দু'ভাগে বিভক্ত। নদীটা কয়েক মাইল পর্যন্ত উপকূলের সমান্তরালে এগিয়ে গেছে, তারপর বাঁক নিয়ে ক্লারেন্সের ভেতরে ঢুকেছে। ওটার সাগরের দিককার অংশে অনেক লম্বা, সরু একটা জলাভূমি আছে। আফ্রিকার সবচেয়ে বড় আর দুর্ভেদ্য গরান বন আছে সেখানটায়। ওই বনের কারণে জাহাজে তো নয়ই, ছোটো বোটে করেও উপকূলে পৌঁছানো কঠিন।'

গভীর দৃষ্টিতে ম্যাপটা পর্যবেক্ষণ করল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। উপকূল আর সাগরের মাঝখানের সরু, দীর্ঘ জলাভূমি, দুর্ভেদ্য গরান বন আর ক্রিস্টাল মাউন্টেনের অবস্থান, সবকিছুর ওপর সময় নিয়ে চোখ বোলাল। আরও মিনিট দশেক পর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলাল সে।

'গুড। নতুন সরকারের মিলিটারি সাইড সম্পর্কে কদ্দূর কী জানতে পেরেছ। রাশান সৈন্যের ঘাঁটি আছে?'

আমতা আমতা করতে লাগল পিটার মার্টিন। 'এই ব্যাপারে কিছু জানতে পারিনি, সার। অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারিনি,' মাথা চুলকাল যুবক।

চুরুট ধরাতে যাচ্ছিল প্যান্থার। হাত থেমে গেল কথাটা কানে যেতে। 'কিন্তু মিলিটারি সাইডই হলো আসল। ওই ব্যাপারে না জানলে এগোবো কীভাবে?'

'সার, বর্ডারে এত কড়াকড়ি চলছে, যা ওই অঞ্চলের মানুষ কিছুদিন আগে কল্পনাও করতে পারত না। তাই... ঢোকার সাহস করে উঠতে পারিনি।'

'মুশকিলের কথা!' বিড়বিড় করে অনেকটা নিজেকেই শোনাল যেন পাইরেট। ঘন ভুরু কুঁচকে আছে। 'একেবারে কিছুই না জেনে অন্ধের মতো অজানা-অচেনা এক দেশে গিয়ে...'

'কিছু বললেন?'

'তোমাকে না,' বলে কিছু ভাবল সে। 'মিলিটারি সাইড সম্পর্কে ভাল করে জানতে না পারলে চলবে না। এক পা-ও এগোতে পারবো না তাহলে। কিছুই করা যাবে না।'

অপরাধী ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল পিটার মার্টিন। 'এ নিয়ে বেশি কথা বলতে গেলে মানুষের মনে সন্দেহ জাগতে পারতো, সার। জানাজানি হয়ে যেতে পারতো। তাই চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

কিছুক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবল প্যান্থার। 'আচ্ছা, ঠিক আছে। ওসব পরে দেখব। এখন বলো জাংগারো সম্পর্কে আর কী কী জেনেছ।'

ফাইলটা কাছে টেনে নিল মার্টিন। ভেতরের কয়েক পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে নিল দ্রুত। তারপর গড়গড় করে বলতে শুরু করল। মাঝে-মধ্যে প্যান্থার

কোনও প্রশ্ন করলে বিরতি দিতে হলো, নইলে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলে তারপর থামল সে।

'হুঁম!' বলে চুপ মেরে গেল টাইকুন। হজম করে ফেলল সব তথ্য। চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে টেবিলে টোকা মারতে লাগল আস্তে আস্তে। এবার ক্লারেন্স সিটি আর প্রেসিডেন্ট কিমবার প্যালেসের ভেতর-বাইরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, তার একটা কমপ্লিট ব্রেকডাউন চাই আমার, মনে মনে বলল সে।

সৈন্য আর পুলিশের সদস্য সব মিলিয়ে কতো, কিমবার স্পেশাল প্রেসিডেনশিয়াল বডিগার্ড বাহিনীর সদস্য কতো, তারা কী রকম ফাইটার, ট্রেনিং আর অভিজ্ঞতা কেমন, আক্রান্ত হলে পাল্টা জবাব দিতে পারবে কি না, তাদের ব্যারাক কোথায়, কোন দেশি অস্ত্র ব্যবহার করে, সেসবের মজুদের পরিমাণ কীরকম, মূল অস্ত্র ভাণ্ডার কোথায়, আর্মার্ড কার বা আর্টিলারি আছে কি না ইত্যাদি জানতে হবে। সবচেয়ে আগে জানতে হবে রাশান কোনও বিশেষ বাহিনী দেশটিতে ঘাঁটি গেড়েছে কি না। গেড়ে থাকলে তাদের লোকসংখ্যা কতো ইত্যাদি। তারপর নৌ-বাহিনী আর বিমান বাহিনীর শক্তি সম্পর্কেও জানা জরুরি।

আপনমনে মাথা দোলাল সে। এসব না জেনে পা বাড়ানো বোকামি হবে। সরকারকে টাকা দিয়ে কেনা গেলে এ ঝামেলায় না জড়ালেও চলত, ভাবল সে। তার আগের হিসেবটাও সেরকমই ছিল। কিন্তু নতুন কু-টা সব গুবলেট করে দিয়েছে। এখন বাধ্য হয়েই অন্য পথে হাঁটতে হবে।

ওই দেশে রাশানদের উপস্থিতি সম্পর্কে যে-সমস্ত কথা গত কয়েকদিনে চালাচালি হতে শোনা গেছে, তাতে সুবিধের মনে হচ্ছে না তার। তাই বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই যা করার করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল টাইকুন।

এদিকে মার্টিন বসের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে তার মাথার মধ্যে কী চিন্তা ঘুরছে বোঝার চেষ্টা করছে। নিশ্চয়ই জটিল কোনও হিসেব কষছে সে। তার ধারণা ছিল নতুন সামরিক সরকারকে ঘুস দিয়ে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা নেয়া হবে। এ কাজেই অভ্যস্ত তারা, সব সময় করে আসছে। কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে বসের মাথায় আর কোনও পরিকল্পনা পাক খাচ্ছে। কী হতে পারে? মতলব কী মানুষটার?

'সার, আপনি বললে আরেকবার চেষ্টা করে দেখতে পারি টুরিস্ট ভিসা নিয়ে জাংগারোয় ঢোকা যায় কি না।'

জানালার কাছে মার্টিনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। মাথা নাড়ল। 'না। অজায়গায় অল্পদিনের মধ্যে এক চেহারা দু'বার দেখা গেলে সন্দেহ জাগতে পারে।'

মাথা চুলকাল যুবক। 'আমারও তাই মনে হয়, সার।' হঠাৎ কী ভেবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'এসব মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি বুঝতে এই লাইনের অভিজ্ঞ কাউকে পাঠানোর চেষ্টা করে দেখলে হতো না? সেটাই তো মনে হচ্ছে ভাল হতো।'

ঠোঁটজোড়া একটু একটু করে প্রসারিত হলো গো-গেটারের। হাসছে

নিঃশব্দে। 'আমিও সেই কথাই ভাবছি।'

'ওয়েল, সার। যদি বলেন, আমি খুঁজে দেখতে পারি এরকম কাউকে...' বসকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে ব্রেক কষল সে।

'দরকার নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল প্যান্থার। 'লোক ঠিক করে ফেলেছি। এই লাইনেরই।'

স্বস্তি ফুটল মার্টিনের চেহারায়। 'ভালই হলো। তা হলে আমি তার সাথে যোগাযোগ করি?'

'এখনই না। সময় হলে আমি জানাব তোমাকে।'

গো-গেটারের নির্দেশে একদল মানুষ তৎপর হয়ে উঠল। ওরা মাসুদ রানার অবস্থান এবং রুটিন জানতে চায়।

গারমিশখ, মিউনিখ। পাহাড়ের ঢালে মাইলের পর মাইল এলাকা নিয়ে সবুজ গাছ-গাছালি ঘেরা ছবির মতো সুন্দর একটা দুর্গ। বিশ ফুট উঁচু ওটার সীমানা দেয়াল। তার ওপর আছে কাঁটাতারের বেড়া। একটা টকটকে লাল রঙের স্পোর্টস মডেল পরশ্ এসে থামল দুর্গের গেট নামের লৌহকপাটের সামনে। চালকই সেটার একমাত্র আরোহী।

গেটের এক পাশের অংশে চার ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি ফাঁক সৃষ্টি হলো। দুটো নীল চোখ দেখা দিল সেখানে। এক মুহূর্ত পর নিঃশব্দে দু' দিকে সরে গেল বিদ্যুৎচালিত গেট। ওটার দুই অংশের সিমেন্টের তৈরি টেক্সচারড সারফেসের ওপর দুটো ইংরেজি অক্ষর 'আর জি' বসানো। সোনালি রঙের। সবুজ লতাপাতা দিয়ে অলঙ্করণ করা আছে অক্ষর দুটো।

খোয়া বিছানো রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শুকনো পাতা মুড়মুড় শব্দে মাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল পর্শ্। দুর্গের দিকে ত্রিশ গজমত যেতে একটা গভীর বার্চ বনের মধ্যে এসে পড়ল। বেশ গভীর বন। দিনের বেলাতেও ঠিকমতো সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। গা ছমছমে পরিবেশ। মুখ দিয়ে 'ঘোঁৎ!' জাতীয় দুর্বোধ্য একটা শব্দ বের হলো আরোহীর। সাইড লাইট জ্বেলে দিল সে। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলল পর্শ্।

টানা চার মাইল যাওয়ার পর খোলা জায়গায় পড়ল গাড়ি। আচমকা ঝলমলে রোদ হেসে উঠল চারদিকে। সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে ঘন সবুজের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হলো পর্শের আরোহী। ফুলের কেয়ারি দিয়ে সাজানো লনটা এত মনোরম, যার বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব।

এখানে-ওখানে অনেকগুলো সুদৃশ্য ঝরনা অনবরত কাজ করে চলেছে। যান্ত্রিক কৌশলে নির্দিষ্ট বিরতি পর পর চারদিকে এক পশলা বৃষ্টির মত পানি ছিটাচ্ছে যাতে সবুজের সমারোহ মুহূর্তের জন্যও মলিন হতে না পারে। আলপেন বা আল্পস ছুঁয়ে আসা মৃদুমন্দ বাতাসে মাতালের মতো দুলছে টিউলিপ আর ড্যাফাডেলের ঝাড়। মাথার অনেক উপরে নীল আকাশের গা ঘেঁষে সাদা কোদালে মেঘের ভেলা ভেসে চলেছে অজানার পানে। শেষ বাঁকটা ঘুরতেই দুর্গটা চোখে পড়ল।

গুরুগম্ভীর চেহারার প্রাচীন একটা দুর্গ। প্রতিটা ফ্লোর অনেক উঁচু। নয়তলা ভবনটার রুমের সংখ্যাও কম নয়। কম করেও দেড়শ' তো হবেই। ছাদে অনেকগুলো ছোট-বড় গম্বুজ আছে। বিশাল, ছিমছাম ভবন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বিশাল পোর্টিকোর নীচে দামি দামি চারটে গাড়ি আছে। ওগুলোর পাশে পর্শ্ পার্ক করল সে। বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকাল।

প্রকাণ্ডদেহী এক দানব মানুষটা। লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট হবে। বুকের ছাতি আটচল্লিশ। শরীরটা ড্রামের মত, প্রায় গোল। দু' বাহু গাছের গুঁড়ির মতো মোটা। মুখখানা পূর্ণিমার চাঁদের মতো, সাইজটাও তেমনি। ঘাড়ের চিহ্ন নেই। মাথাটা যেন ঠেসে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁধের উপর।

মাঝারি উচ্চতার এক মোটাসোটা লোক বেরিয়ে এলো ভিতর থেকে। দেখেই বোঝা যায় যথেষ্ট শক্তি আছে লোকটার দেহে। প্রয়োজনে বিদ্যুৎ-গতিতে চলাফেরা করতে পারে। তার থুতনির নীচে থলথল করছে প্রচুর চর্বি। অনেকটা গলকম্বলের মত, দোলে। দেখলে গা ঘিনঘিন করে।

'গুটেন ট্যাগ (গুড মর্নিং),' বলল লোকটা। 'বস আপনার অপেক্ষায় আছেন। আসুন, প্লিজ।'

তিনতলায় বাস্কেট বল কোর্টের মত বিশাল এক রুমে নিয়ে আসা হলো তাকে। রুমের অর্ধেক পরিমাণ জায়গা অফিসের মত করে সাজানো, বাকি অর্ধেকে আছে একটা লাইব্রেরি ও মাঝারি আকারের বার। দামি আসবাবপত্রে সাজানো রুমটা। দানবকে দেখে অফিস অংশের বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশ থেকে উঠে এলো বিংশ শতাব্দীর টাইকুন। গলকম্বল নিঃশব্দে দরজা লাগিয়ে বাইরে মনিবের ডাকের অপেক্ষায় থাকল।

'গুড মর্নিং, হফম্যান,' টাইকুন বলল। 'সময়মত আসতে পেরেছ দেখে খুশি হলাম,' বারের দিকে এগিয়ে গেল। 'ড্রিংক? হেলপ ইওরসেলফ।'

ত্রিশ মিনিট পর। দীর্ঘ আলোচনা শেষে দানবের হাতে কয়েকটা পোস্ট কার্ড সাইজের ছবি তুলে দিল সে। একজনেরই ছবি, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওঠানো। ছবির চেহারাটা ভাল করে মনের মধ্যে গেঁথে নিল সে। তারপর মেহগনি কাঠের বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসা প্যান্থারের দিকে এগিয়ে দিল। প্যান্থার নিজের জায়গা থেকে চোখ দুটোকে দূরবীন বানিয়ে লোকটার মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে।

'ভাল করে চিনে নিয়েছ আশা করি?' গম্ভীর সে।

'নিয়েছি,' বলল দানব।

'যা যা বলেছি ভুলো না,' ছবিগুলো তুলে নিল প্যান্থার। 'আমার সব প্ল্যান তোমার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে।'

বাঁকা হাসি ফুটল দানবের মুখে। 'আমি ব্যর্থ হবো না।'

'না হলেই বাঁচি। এর বেলায় একবার এদিক-ওদিক হয়ে গেলে তা শোধরানোর সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

'কাজটা কবে করতে হবে বলুন।'

চুরুটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিল সে। ধোঁয়ার কুণ্ডলির পাক খেতে খেতে

অনেক উঁচু সিলিঙের দিকে উঠে যাওয়া দেখতে লাগল একদৃষ্টে। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত। আশ্চর্য! হাতের নাগালে এই সহজ সমাধানটা থাকতে কিনা অন্ধকারে হাতড়ে মরছিল সে? ভাবল পাইরেট। এত সহজ সমাধান, এত চমৎকার প্রতিশোধ! কোনও তুলনা হয়?

'মাসুদ রানা এখন ঢাকায় আছে। আগামী ছয় তারিখে লণ্ডনে আসছে। পাকা খবর। হাতে সময় বেশি নেই। প্রস্তুতি যা যা নেয়ার, এখনই নিয়ে রাখতে হবে তোমাকে। আগামী এক তারিখে লণ্ডনে আমার সাথে দেখা করছ তুমি।'

একটু থামল সে। গোটা প্ল্যানটার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে মনে নাড়াচাড়া করে সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। ঠিকই আছে। এরা যদি কোথাও গুবলেট পাকিয়ে না ফেলে, তা হলে ব্যর্থ হওয়ার চান্স নেই বললেই চলে।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এই প্ল্যান ঠিক করা হয়েছে। একবার যদি এটা কেঁচে যায়, সে যে কারণে বা যার কারণেই হোক না কেন, যদি মাসুদ রানা কোনওমতে টের পেয়ে যায় যে তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাহলেই শেষ। হাজারগুণ সতর্ক হয়ে যাবে রানা, জানে প্যান্থার। সে-ক্ষেত্রে জীবনেও এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।'

ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে আধ-খাওয়া চুরুট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল সে। আমি আগামীকাল সকালে যাচ্ছি। কালকের দিনটা প্যারিসে কাটাব। পরদিন বিকালে লণ্ডনে পৌঁছাব। তুমি এদিকের সবকিছু পাকা করে রেখে ডাক্তারকে নিয়ে লণ্ডনে রিপোর্ট করবে। এক তারিখে।'

প্রকাণ্ড মাথাটা দোলাল দানব। 'নিশ্চয়ই।'

'ঠিক আছে, হফম্যান। যাও। যাত্রার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দাও গিয়ে।'

দানবটার হেলেদুলে চলে যাওয়া দেখল গো-গেটার। তারপর হাত বাড়িয়ে ডেস্কের নীচের দিকে সেট করা একটা কলিং বেলের নবে চাপ দিল। একটা বেল বাজল, তবে অনেক দূরের কোনও রুমে। আওয়াজ সামান্যই কানে এলো।

চার

একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও চড়টা খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল রানা। বসে না থাকলে পড়েই যেতো হয়তো। 'চড়াৎ!' শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে উঠল ওর বনন্ করে। মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা এমনভাবে গরম হয়ে উঠল, মনে হলো যেন ঠাণ্ডা মগজটা বের করে গরম করার জন্য চুলোয় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখের সামনে হাজারো হলুদ ফুল নেচে বেড়াতে দেখল ও।

কটের কিনারা আঁকড়ে ধরে পতনটা কোনওমতে ঠেকাল। ভীষণ দুর্বল লাগছে দেখে অবাক হলো। এরকম লাগছে কেন? লোকটাকে বাধা দেয়া দূরে থাক, চেষ্টা করেও হাত-পা নাড়াতে পারছে না রানা। কেন? কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকল। দুলছে একটু একটু। খানিক পর চোখের ঝাপসা ভাবটা কাটতে

মুখ তুলে দেখল লোকটাকে।
লম্বায় পাক্কা সাড়ে ছয় ফুট। বুকের ছাতি আটচল্লিশের কম হবে না মনে হয়। শরীরটা ড্রামের মতো, প্রায় গোল। দু' বাহু যেন গাছের গুঁড়ি। মুখখানা পূর্ণিমার চাঁদের মত, সাইজটাও প্রকাণ্ড। ঘাড়ের চিহ্নও নেই তার নীচে। কোনও কিছুর সাথে মানুষটার তুলনা করার কথা ভাবলে প্রথমেই ষাঁড়ের কথা মনে পড়বে সবার। স্রেফ দানব একটা।
নাকটা খাটো, আস্ত একটা পিং পং বলের মতো গোল ডগা। ভেতরের ধূসর রঙের ঘন পশম বাইরে থেকে দেখা যায়। গা ঘিন ঘিন করে। তারওপর প্রতিবার দম নেয়ার সময় নাকটা স্ফীত হয় বলে আরও বিশ্রী লাগে। ছোটো ছোটো চোখ। হাতের থাবা ফুল সাইজ প্লেটের সমান। সব মিলিয়ে অনেকটাই সুমো কুস্তিগীরের মতো দেখতে।
অদ্ভুত চলন-বলন তার। হাঁটার সময় বাতাসে ঝড় উঠে যায়। স্থির হতে জানে না লোকটা, প্রতি মুহূর্ত নড়াচড়ার মধ্যে থাকে। 'কাকে ধরি, কাকে মারি' ভাব।
এ মুহূর্তে ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখছে। চড় মারার সময় ওজন ঠিক রাখতে না পারায় নিজের ওপর চটে আছে। প্রতিক্রিয়া দেখছে রানার। মারটা বেশি জোরে হয়ে গেল কি না ভেবে কিছুটা ভয় কাজ করছে মনে। তবে খানিক পর ওকে মুখ তুলতে দেখে দ্বিধার মেঘ কেটে গেল তার চেহারা থেকে। সোজা হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে নাকে হাসল। নিশ্বাসের বদ গন্ধ মুখ পিছিয়ে নিতে বাধ্য করলো রানাকে।
'তাঁর সম্পর্কে আরেকটা বাজে কথা বললে...' হুমকিটা শেষ না করেই থেমে গেল সে। কথা ইংরেজিতে বলল, কিন্তু তার মধ্যে কড়া জার্মান টান আছে।
বিরক্তি ফুটল রানার ফ্যাকাসে চেহারায়। 'আমি শ্বশুরের ছেলের নামটা জানতে চেয়েছি কেবল। কোন্ অপরাধে...'
আবার চড় আসছে দেখে চট্ করে মুখ পিছিয়ে নিল ও, মনে মনে অবশ্য। কেননা চড়টা আসলে মারেনি কুস্তিগীর, তাই বেঁচে গেছে রানা। নইলে যে গতিতে ওটা আসছিল, ওর নড়াচড়া সেই তুলনায় ছিল মাখ থ্রি গতির প্লেনের সঙ্গে পাল্লা দেয়া গরুর গাড়ির মত। সত্যি সত্যি মারলে ঠেকানোর কোনও উপায়ই ছিল না। আর ভয় নেই বুঝতে পেরে চেপে রাখা দম ছাড়ল রানা। লোক দুটোকে দেখল পালা করে।
'ঠিক আছে,' শ্রাগ করে দু' পা পিছিয়ে গেল দানব। 'এসব পরে দেখবো।'
এক পা পিছিয়ে গিয়ে রুমের একমাত্র কাঠের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল সে। তার মুখের দুর্গন্ধের ধাক্কা সামলাতে হবে না ভেবে কিছুটা স্বস্তি পেল রানা। দানবের পিছনে অনুগত কুকুরের মতো দাঁড়ানো ছোটোখাটো বামুন সাইজের ডাক্তার লোকটার দিকে তাকাল। আজব এক মানুষ। ষাঁড়টা রুমে পা রাখার পর থেকে সেই যে হেঁ-হেঁ করতে শুরু করেছে, থামাথামির নাম নেই। বিরক্ত হয়ে অন্যদিকে মন দেয়ার চেষ্টা করল ও।

আয়তাকার রুমটার ওপর চোখ বোলাল। আঠারো বাই বারো হবে সম্ভবত। ধপধপে সাদা পেইন্ট করা চার দেয়াল। সামান্য নীলচে টোন আছে তাতে। সিলিং অনেক উঁচুতে। হাসপাতালের মত নানান ওষুধের মিলিত গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে রুমে। কটের সঙ্গেই স্যালাইন স্ট্যাণ্ড।

একটা খালি স্যালাইন বটল ঝুলছে ওটা থেকে। বাঁ হাতে কনুইয়ের ভিতরদিকে কয়েকটা সুঁইয়ের ছিদ্র দেখল রানা। ছিদ্রগুলো কালো এবং তার চারদিক লালচে হয়ে আছে। কী পুশ করা হয়েছে ওকে? ভাবল রানা।

রুমটার একদিকের দেয়ালে দুটো বিশাল জানালা, অন্যদিকে শুধু দেয়াল। মাথা আর পায়ের দিকেও দেয়াল। জানালাগুলো ডাবল গ্লেজড কাঁচের। বুলেট প্রুফ সম্ভবত। উইণ্ডো সিল অনেক চওড়া। পুরনো দিনের বিল্ডিং।

জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যায়। বেশ অনেকটা দূরে অবশ্য। মাঝে-মধ্যে এক-আধটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। রোদের আলোয় ঝিলিক মেরে উঠছে। বিল্ডিংটা কতো তলা জানা নেই, তবে রাস্তার তুলনায় নিজের অবস্থান দেখে মনে হলো চারতলায় আছে ও। অনেক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিল্ডিং। দেয়ালের উপর কাঁটাতারের বেড়াও রয়েছে। এবং সম্ভবত কারেন্টও প্রবাহিত হয় সে বেড়ার মধ্য দিয়ে। কার বিল্ডিং? কী চলে এখানে?

কোনও কারণ নেই, তবু কেন যেন মনে হলো এ পরিবেশের সঙ্গে কোনও একটা যোগসূত্র সম্ভবত আছে ওর।

অথবা... হয়তো... কোনও একটা...দানবের কথায় সচকিত হলো রানা।

'নিজেকে রক্ষা করার চমৎকার একটা সুযোগ এসেছে তোমার সামনে। আমার মনে হয় এ অবস্থায় এমন সুযোগ পেলে যে কেউ খুশি মনে সেটা কাজে লাগাবে।' হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে বসল সে। কোটের সাইড পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল জাতীয় কিছু একটা বের করে নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'বুঝলে?'

'না, বুঝিনি।' হাতের তালু পরীক্ষায় মন দিল রানা। যদিও বুঝতে বাকি নেই কঠিন বিপদে পড়েছে ও। এ পেশায় যোগ দেয়ার পর থেকে অনেকেরই অনেক বড় বড় ক্ষতি হয়েছে ওর কারণে। এ নিশ্চয়ই সেসবের কোনও একটার কথা বলছে। কিন্তু কোন্‌টার? লোকটার কথায় চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর।

'অতীতের ক্ষতিটা এই চান্সে পুষিয়ে দিয়ে নিজেকে পাপমুক্ত করে নিতে পার তুমি,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল ড্রাম। 'তার ক্ষমা আদায় করে নিতে পারো।' ডাক্তারের উদ্দেশে প্রশ্রয়ের মৃদু হাসি হাসল।

চুপ করে থাকল রানা। মুখ বিকৃত করে ডান বাহুর মাঝামাঝি জায়গাটা কয়েকবার চাপল। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি ওখানটায়। মনে হয় ভেতরে কিছু একটা আছে।

'কার কথা বলছ? আমি কবে কোন্ উপলক্ষে তার লেজে পা দিয়ে ফেলেছি...'

দানব চেয়ার ছাড়তে যাচ্ছে দেখে মাছি তাড়ানোর মতো দ্রুত হাত নাড়ল রানা। অন্য একটা প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেছে। 'আজ কত তারিখ?'

ধীরে ধীরে হাসি ফুটল পালোয়ানের চাঁদ আকৃতির মুখে। 'বারোই মার্চ।'

মনে মনে আঁতকে উঠল ও। 'বারোই...! গুল মারার আর জায়গা পেলে না?'

'না,' সশব্দে হেসে উঠল এবার ডাক্তার। 'গুল নয়। যা সত্যি, তাই বলা হয়েছে তোমাকে।'

বামুনটাকে দেখল ও। 'বারোই মার্চ?'

'হ্যাঁ,' প্রথমজন বলল। 'আট তারিখ থেকে ঘুমিয়ে কাটিয়েছ তুমি। 'সেই হিসেবে আজ বারো তারিখই হয়। বুঝলে কিছু?'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল ও। মনের ভাব চেপে রাখার যতো চেষ্টাই করুক না কেন, লাভ হলো না এবার।

নিকট অতীত একটু একটু করে ছায়া ফেলছে যেন রানার মনের পর্দায়। খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু ও তার স্ত্রীর আবছা চেহারা ভেসে উঠল সেখানে। সাফোকে তাদের র‍্যাঞ্চ আছে। মিয়া-বিবির চাপে পড়ে অনেক আগেই তাদেরকে কথা দিয়েছিল ও, সুযোগ হলেই সেখানে বেড়াতে যাবে। একটা সাপ্তাহিক ছুটি কাটিয়ে আসবে। কিন্তু নানা ঝামেলায় সে কথা আর রাখা হয়ে ওঠেনি। আসলে ভুলেই গিয়েছিল রানা। এবার লণ্ডনে পা রেখেই পড়তে হলো ওদের খপ্পরে।

রানা লণ্ডন এসেছে মার্চের ৬ তারিখ, শনিবার সকালে। প্ল্যান ছিল কিছু ব্যক্তিগত কাজ গুছিয়ে নিয়ে সোমবার থেকে পুরোদমে অফিশিয়াল কাজে লেগে পড়বে। কিন্তু বিধি বাম। ডাবলিনে ব্যবসায়িক কাজ সেরে সেই বন্ধুটিও ওইদিনই সস্ত্রীক লণ্ডনে ফিরছিল। রানার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ঢাকা-লণ্ডন এবং তাদের ইজিজেট-এর ডাবলিন-লণ্ডন ফ্লাইট সেদিন প্রায় একই সময় ল্যাণ্ড করে হিথরোতে।

কপালে ভোগান্তি থাকলে যা হয়, ইমিগ্রেশন থেকে বেরিয়েই একেবারে ওদের সামনে পড়ে গেল রানা। সেদিন শনিবার থেকে সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হবে, কাজেই কোনও অজুহাতেই খসানো গেল না ওদেরকে। রানাকে রিসিভ করতে গাড়ি নিয়ে হিথরোয় এসেছিল রানা এজেন্সির লণ্ডন চিফ, তাকে ফেরত পাঠিয়ে গাড়ি নিয়ে সাফোকের পথ ধরতে হয়েছিল রানাকে।

সময়টা অবশ্য মন্দ কাটেনি। বনভোজন আর হই-চইয়ের মধ্য দিয়ে দুটো দিন মজা করেই কাটাল সবাই। তারপর ৮ তারিখ সোমবার খুব সকালে লণ্ডন ফেরার পথে বিপদে পড়া এক যুবতীকে গাড়িতে তুলে নিল রানা। উপকারটা করতে গিয়েই বাধল এই বিপত্তি।

কোলের সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল এক মাকে সাহায্য না করে উপায় ছিল না। জ্বরের ঘোরে প্রায় অজ্ঞান শিশুটিকে ডাক্তার দেখাতে ধারেকাছে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল সে। পথে টায়ার ফেটে যাওয়ায় আটকে গেছে। রাস্তায় অচল গাড়ির পাশে বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। রানাকে দেখে পাগলের মত হাত নাড়তে শুরু করে।

গাড়ি থামতে মেয়েটা কান্না জড়ানো গলায় হড়বড় করে ওর বিপদের কথাটা জানাল রানাকে। ও রাজি হতেই বাচ্চা সামলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল

গাড়িতে। রানা সামনের দরজা মেলে ধরেছিল, কিন্তু মেয়েটা খেয়াল না করে পিছনের সিটে উঠে বসল। রানাও সময় নষ্ট না করে গিয়ার এনগেজ করল। একটু খটকা লাগলেও তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ হলো না।

প্রায় অজ্ঞান কোলের শিশু নিয়ে একা ড্রাইভ করছিল মেয়েটা? সঙ্গে একজন পুরুষ সঙ্গী থাকা উচিত ছিল না? বাচ্চাটার ফ্যাকাসে চেহারা দেখে বোঝা যায় আগে থেকেই অসুস্থ ছিল ও। তা হলে অ্যাম্বুলেন্স না ডেকে... তা ছাড়া বাচ্চাটাকে একটুও নড়তে দেখা যায়নি। কেন?

এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে ছায়া ফেলল মনের মধ্যে, কিন্তু একটারও জবাব খুঁজল না ও।

ক্লাচ পেডাল ছাড়তে ছাড়তে বাচ্চাটার অবস্থা দেখার জন্য পিছনে তাকাতে গেল রানা, পরক্ষণে চমকে উঠল কানের লতির ঠিক নীচে সুঁইয়ের খোঁচা খেয়ে। রিয়ার ভিউ মিররে পলকের জন্য একটা মাঝারি আকারের সিরিঞ্জ চোখে পড়ল ওর!

কিছু বুঝে ওঠার আগেই নরম মাংসে ঢুকে গেছে সুঁইটা। মুহূর্তের মধ্যে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে এলো, দেখতে দেখতে জড় পদার্থ বনে গেল মাসুদ রানা। ঠিকমতো চালু হতে না হতেই দু-তিনটে ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল জাগুয়ার।

জোর করে চোখ খোলা রাখার চেষ্টা করল ও, কিন্তু পারল না। জ্ঞান হারানোর কয়েক সেকেণ্ড আগে মেয়েটাকে বাচ্চা ফেলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে বুঝল, ওটা আসলে একটা পুতুল ছিল। গরম কাপড়চোপড় দিয়ে এমনভাবে মোড়ানো ছিল যে কারও তা বোঝার উপায় ছিল না।

ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে রানার চোখে পড়ল ওর দিকের জানালা পুরোটা ঢেকে ফেলেছে বিশাল একটা মুখ। হাসছে। একটা হাত উঠল আর নামল তার, খুব দ্রুত। সামনের সবকিছু প্রবল একটা ঝাঁকি খাওয়ায় রানা বুঝল চড় মারা হয়েছে ওকে। কিন্তু চোখ উল্টে না যাওয়া পর্যন্ত অসহায়ের মতো চেয়ে থাকা ছাড়া কিছু করার ছিল না ওর।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলো ও। চার দিন তা হলে এখানেই... ডান বাহুর অস্বস্তিকর ভাবটা আবার ফিরে আসায় চোখ নামিয়ে সেদিকে তাকাল।

'এখানটায়...' কিছু বলতে গিয়েও লোকটাকে হেসে উঠতে দেখে থেমে গেল রানা।

'ঠিক ধরেছ। কিছু একটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখল রানা। 'জিনিসটা কি?'

'কম্পিউটার-কন্ট্রোলড একটা পিচ্চি বোমা, আর একটা মাইক্রোচিপ-সার্কিট।'

'কী?'

'মাইক্রোচিপ-সার্কিট।' হাসল লোকটা, 'ভুল শোনোনি তুমি।'

'কেন?'

আবার হাসল পালোয়ান। ফুল প্লেট সাইজের থাবা দুটো চিত করে শ্রাগ করল। 'ভুলে গেলে? বলিনি, কারও একটা বিরাট ক্ষতি করে পাপ করেছিলে

এক সময়? এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করানো হবে তোমাকে দিয়ে। তাই বসানো হয়েছে ওটা।'

আরও শীতল হয়ে গেল রানার চাউনি। কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে বলল, 'আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে আগ্রহী না হলে?'

ডাক্তারের দিকে ফিরে হাসল লোকটা। ভাবখানা যেনঃ শোনো ছেলের কথা! 'আগ্রহী না হয়ে উপায় নেই তোমার।'

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল দানব। 'কারণ তোমার হাতে ফিট করা ওটা একটা কমপিউটার প্রোগ্রামড মিনি বোমা। সঙ্গে আছে একটা কণ্ট্রোলড মাইক্রো ব্রেন। কিছু নির্দেশ ফিড করা আছে ওটায়। সেসব নির্দেশের কোনওরকম ব্যতিক্রম দেখলেই চাপ পড়বে একটা লাল বোতামে।' দু' হাতে বিশেষ একটা ভঙ্গি করল, 'ভিড়িম!'

এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে সামনের দিকে লম্বা করে মেলে আয়েশ করে বসল সে। তারপর জোরে জোরে দোলাতে লাগল পা দুটো। রানা চুপ করে থাকল। এরপর কী আসছে, শোনার অপেক্ষায় আছে। মনের মধ্যে উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা।

'তুমি তো বটেই, তোমার বিশ গজের মধ্যে আর যারা থাকবে ওই সময়, স্রেফ মিলিয়ে যাবে বাতাসে। কারণ বোমাটার মূল উপাদান হচ্ছে... থাকগে'। সব বলে দিলে এখনই হয়তো কাপড়-চোপড় ভিজিয়ে ফেলবে।' হেসে উঠল দানব। দেখাদেখি ডাক্তারও হেসে নিল একচোট।

'একটা বিশেষ কাজ দেয়া হবে তোমাকে। সেটা শেষ করে ফিরে এলে আমরাই খুলে নেবো বোমাটা। এমনিতে কোনও বিপদ ঘটার আশঙ্কা নেই। ওটার জন্য কাজ করতে কোনও অসুবিধা হবে না তোমার। তবে...' রানা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে ট্রাফিক পুলিশের মতো বিশাল পাঞ্জা তুলল সে।

'দাঁড়াও। কথা শেষ করে নিই,' পিং পং বলের মাঝখানটা চুলকে নিল। 'যদি ভেবে থাকো, আমাদের চোখের আড়ালে গিয়ে ওটা খুলে ফেলে নিজের কাজে যেতে পারবে, তা হলে মারাত্মক ভুল করবে। কারণটা আমি আগেই বলেছি, ওটা কমপিউটার প্রোগ্রামড ডিভাইস। কী ধরনের প্রোগ্রামিং এবং কোডটা কী, সেসব জানেন কেবল একজন। ওটা খোলার যে-কোনও চেষ্টা হলেই আমাদের সেনসরে ধরা পড়বে ব্যাপারটা, টের পাবেন তিনি, ফাটিয়ে দেবেন বোমা।' শ্রাগ করল দানব।

রিমোট কণ্ট্রোলটা নাচাল। ওটার ওপরের অংশে আধখানা চাঁদ আকৃতির একটা ডায়াল দেখল রানা। ভেতরে ঘড়ির মত লাল রঙের একটা ইণ্ডিকেটরও আছে।

'এটা হচ্ছে ডিভাইসটার মূল চাবিকাঠি। তুমি ভাবতে পারো আমি হয়তো তোমাকে মিথ্যেমিথ্যি ভয় দেখানোর চেষ্টা করছি, আসলে এসব বাকোয়াজ। তাই আমি যে সত্যি বলেছি, তার খানিকটা নমুনা এখনই দেখতে পাবে,' এক চোখ টিপল দানব। 'ডেমনস্ট্রেশন।'

কণ্ট্রোলের একটা বাটন টিপল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করল

রানার ডান হাত। কোনও ব্যথা নেই, জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, কিচ্ছু না। স্রেফ থর থর করে কাঁপছে। শত চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না রানা। এমন আজব অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি, তাই দু' মিনিটেই অসহ্য লেগে উঠল।

ওর চেহারা দেখে টের পেল দানব কখন থামতে হবে। আরেকটা বাটন টিপল। 'ঠিক আছে। এবার নাম্বার টু।'

প্রথমে কনুইয়ের কাছটা গরম হয়ে উঠতে শুরু করল ওর, তারপর ওপরে আর নীচের দিকে ধীর গতিতে ছড়াতে লাগল উত্তাপ। হাতের আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত গরম হয়ে উঠল ওর। ক্রমে বাড়তেই থাকল গরম।

কপালে ঘাম ফুটতে শুরু করল রানার। অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে আসতে লাগল বুকের ভিতর থেকে। দেখতে দেখতে ঘাম বেড়ে গেল, চুলের গোড়া বেয়ে অজস্র ধারায় গড়িয়ে নামছে স্রোতের মতো। গোঙানি ঠেকাতে প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না।

গোঙানি চিৎকারে পরিণত হওয়ার আগের মুহূর্তে অন্য একটা বাটন টিপল দানব। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হলো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে স্বাভাবিক হয়ে এলো হাতটা। এতই দ্রুত যে বিশ্বাসই হতে চাইল না। এক হাতে কপালের ঘাম মুছল রানা। স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল মনে মনে।

'ইচ্ছে করলে আরও কয়েক ধরনের ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা এখনই করতে পারি,' যন্ত্রটা কোটের সাইড পকেটে রাখার আগে উঁচু করে দেখাল লোকটা। 'কিন্তু আশা করি তার দরকার হবে না। সিগনাল পেয়ে গেছো তুমি। এইমাত্র যে হিট দেয়া হলো, তা আর তিন-চার ডিগ্রি বাড়ালেই আপনা-আপনি হিসি করে ফেলতে...' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। 'আর এই যে লাল বোতামটা—এটার কথা সারাক্ষণ মাথায় রেখো!'

তার ইঙ্গিতে রুমের আরেক প্রান্তের একটা লম্বা ল্যাবরেটরি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ডাক্তার। একটা ইঞ্জেকশন তৈরি করে নিয়ে এলো দু' মিনিটের মধ্যে।

'এখন তোমাকে আরও দুইটা দিন বিশ্রাম নিতে হবে,' আগের কথার খেই ধরল লোকটা। 'ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হবে। তোমার নিজের স্বার্থেই। প্রয়োজনের তাগিদে গত ক'দিন কিছু বিশেষ ওষুধ পুশ করা হয়েছে তোমার শরীরে। দুর্বলতা থেকে সেটা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছ, তা-ই না?'

রানা কিছু বলল না। ডাক্তারের বাড়িয়ে ধরা সিরিঞ্জটার দিকে তাকিয়ে থাকল মন্ত্রমুগ্ধের মতো। চেষ্টা করলে হয়তো এই অবস্থায়ও বামুন ব্যাটার হাতটা মট্ করে ভেঙে দিতে পারে ও। কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হবে না। তা ছাড়া সেরকম কিছু করার মতো মনের জোরও খুঁজে পেল না রানা। কিন্তু ডাক্তার ওর চোখে কী দেখে যেন ওর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। তাকে সাহায্য করতে চেয়ার ছাড়ল দানব।

'স্বেচ্ছায় ইঞ্জেকশনটা নেবে?' মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে। 'না আমাকে হাত লাগাতে হবে? হারানো বল ফিরে পেতে এর দরকার আছে।'

'এসব কার নির্দেশে ঘটছে জানতে পারি?' বলল ও।

কৌতুকের হাসি হাসল কুস্তিগীর। 'আমি শুনেছি মাসুদ রানার মাথায় নাকি অনেক বুদ্ধি। সে পৃথিবীর সেরা স্পাইদের একজন। সেই পরীক্ষাটাও হয়ে যাক এই সুযোগে। দেখি, আমাদের খোকাবাবু জবাবটা নিজে থেকে বের করতে পারে কি না।'

মনে মনে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা নিল রানা। মুখে বলল, 'তোমাদের কাজ হয়ে গেলে এই জিনিস সত্যি সত্যি খুলে নেয়া হবে, তার নিশ্চয়তা কী?' ডান হাতটা ইঙ্গিত করল ও।

মাথা নাড়ল দানব। 'কোনও নিশ্চয়তা নেই। তবে আমাদের বেঈমানি করার কোনও পরিকল্পনাও নেই। আরেকটা কথা। খুব ভাল করে মনের মধ্যে গেঁথে নাও। এখান থেকে বেরিয়ে তুমি দুনিয়ার যে প্রান্তেই যাও না কেন, সে উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু যেখানেই হোক, আমাদের কমপিউটারের চোখ এড়াতে পারবে না। আর...' হাসল লোকটা। 'তুমি যেন আমাদের কথা ভুলে না যাও, সেজন্যে ওই মাইক্রোব্রেন ক'দিন পরপর তোমাকে তোমার কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেবে। সেই সঙ্গে ফিডব্যাক পাঠাবে আমাদের মনিটরে। অসিলেশনের কাঁপন দেখে আমরা টের পাব কতটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তোমার মধ্যে, সব ঠিক থাকলে বন্ধ করা হবে তোমার অস্বস্তি। শেষ কথা হচ্ছে: আমাদের হাতে একটা লাল বোতাম আছে, সে কথা ভুলেও ভুলো না। তা হলে মরবে।'

ডাক্তারকে 'পুশ করুন,' বলে আবার রানার দিকে ফিরল সে। 'দু' দিন পর আবার আমাদের দেখা হবে। ততক্ষণ সুবোধ বালকের মত থাকার চেষ্টা করো।'

ডাক্তার সুঁই ঢোকালো। দানবের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কঠিন প্রতিজ্ঞাটা মনে মনে আওড়াল আবার।

সুঁই ভিতরে ঢোকার সময় এক চোখ বুজে ব্যথাটা সয়ে নিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে রাজ্যের ঘুম এসে আসন গেড়ে বসল, টেনে নামিয়ে আনল চোখের পাতা। এমন সময় দূর থেকে একটা কট-কট আওয়াজ ভেসে আসতে শুনল রানা। ধারে-কাছে কোথাও একটা হেলিকপ্টার ল্যাণ্ড করছে হয়তো।

১০ মার্চ। ঢাকা। সন্ধে হয়ে এসেছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে সন্ধের আযান ভেসে আসছে। আযান শেষ হতেই রাস্তায় একটা বাসের টায়ার ফাটার বিকট শব্দে কেঁপে উঠল মতিঝিল। একঝাঁক সরালি তাদের বর্তমান আস্তানা চিড়িয়াখানা বা সাভারের লেকের দিকে ফিরছিল, ভয় পেয়ে ডানা ঝাপটে দিক বদল করল ওগুলো।

বিসিআই হেড অফিস। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে সংস্থার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। সামনেই এক ফাইল উপচে পড়া কমপিউটার প্রিণ্ট আউটের দিকে মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে ও। ভিতরে ভিতরে অস্থির।

টেলিফোনে কথা বলছেন রাহাত খান। বলছেন মানে, ও প্রান্তের কথা শুনছেন। চিন্তিত। গম্ভীর। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে। সোহেলের দিকে

খেয়াল নেই। আরও কিছুক্ষণ কথা বললেন তিনি। তারপর, 'আমি অপেক্ষা করছি,' বলে রিসিভার রেখে দিলেন আলতো করে।

সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরালেন তিনি। হালকা নীলচে ধোঁয়া পাক খেয়ে সিলিঙের দিকে উঠে যেতে লাগল।

'বলো।'

অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল সোহেল। 'তিনদিন হয়ে এলো, সার,' একই বিষয়ে তৃতীয়বারের মতো রিপোর্ট করতে এসে হড়বড় করে উঠল ও। 'এখনও কোনও খোঁজ নেই।'

ভুরু কুঁচকে ছাই ঝাড়লেন বৃদ্ধ। ঘন, কাঁচাপাকা ভুরুর নীচ দিয়ে তাকিয়ে আছেন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সোহেলের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করছেন। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ রানার জন্য ওর উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন তিনি।

একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ৬ তারিখে লণ্ডনে গেছে রানা। মাঝে একদিনের বিরতি দিয়ে ৮ তারিখ থেকে কাজে লেগে পড়ার কথা। অথচ আজ ১০ তারিখ চলে যাচ্ছে, ওর কোনও খবর নেই। ৮ তারিখে সাফোক থেকে লণ্ডন ফেরার পথে স্রেফ উধাও হয়ে গেছে ও। বিসিআই এবং রানা এজেন্সির প্রতিটা এজেন্ট এই তিনদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে ওকে।

এখন লণ্ডন শহর উপুড় করে ঝাঁকিয়ে দেখা বাকি আছে কেবল, কোনও খবর নেই মাসুদ রানার। তবে কাল রাতে, নিখোঁজ হওয়ার প্রায় দেড় দিন পর হ্যারডস-এর সামনে ওর জাগুয়ারটা পাওয়া গেছে।

রানার পরিণতি নিয়ে যে-সব জল্পনা আর গোপন শঙ্কা চলছিল, এই আবিষ্কার তার গোড়ায় পানি ঢেলে দিয়েছে। যে বন্ধুর র‍্যাঞ্চে বেড়াতে গিয়ে রানা উধাও হয়েছে, সে বেচারা প্রচণ্ড অপরাধবোধে ভুগছিল। মালিকবিহীন, পরিত্যক্ত গাড়ি উদ্ধার হওয়ার পর সেটা আরও বেড়ে গেছে।

এ রকম জটিল, গুরুতর পরিস্থিতিতে সোহেলের উদ্বিগ্ন হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। হাত লম্বা করে দিয়ে আরেকবার ছাই ঝাড়লেন রাহাত খান।

'মনে হয় পাওয়া গেছে ওর খোঁজ,' শান্ত কণ্ঠে বললেন বৃদ্ধ। 'তবে নিশ্চিত হতে কিছু সময় লাগবে।'

'জী?' চোখ পিটপিট করে উঠল সোহেলের। 'কোথায়, সার? কোথায় রানা?'

কয়েক সেকেণ্ড দেরি করে মুখ খুললেন বৃদ্ধ। 'জার্মানিতে।'

'জার্মানিতে!'

মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'সেরকমই ধারণা করা হচ্ছে।'

'রানা... মানে...' আর কী বলবে খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল সোহেল।

'আট তারিখে গভীর রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে।'

'এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে?' অবাক হলো ও।

প্রায় আস্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'গ্যাটউইক এয়ার পোর্ট থেকে। প্লেনের পাইলট এয়ার ট্রাফিককে রোমে যাওয়ার কথা বলে

আকাশে উঠেছিল, কিন্তু সেখানে না গিয়ে মাঝপথ থেকে চলে গেছে আর কোথাও।'

'তাই?' রুদ্ধশ্বাসে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। চেহারায় চাপা উত্তেজনা। সামনের প্রিন্ট আউটের ফাইলটা টেনে নিয়ে গোছাতে গিয়ে আগোছাল করে ফেলল।

'কনফার্মেশনের জন্যে অপেক্ষা করছি। খবর...' থেমে গেলেন রাহাত খান। বাঁ দিকের চারটে টেলিফোনের মধ্যে লাল রঙেরটা বাজছে দেখে চট্ করে ওটার রিসিভার তুলে নিলেন।

'হ্যাঁ,' লম্বা বিরতি। 'তারপর?' বৃদ্ধের চোখেমুখে স্বস্তি ফুটতে দেখল সোহেল। 'কোনও ভুল হয়নি তো তোমার?' আবার বিরতি। 'একই প্লেন? ঠিক আছে। কড়া নজর রাখো। আবার যেন হারিয়ে না যায়।'

থেমে থেমে আটকে রাখা দম ছাড়লেন বৃদ্ধ। চেহারা দেখে মনে হলো বুকের ওপর থেকে একটা বিশ মণী পাথরের চাপ সরে গেছে যেন। 'খোঁজ পাওয়া গেছে ওর।'

লণ্ডন। শেষ সাক্ষাতের তিন সপ্তাহ পর আবার বসের রুমে ডাক পড়েছে পিটার মার্টিনের। এরমধ্যে বেশিরভাগ সময়ই লণ্ডনের বাইরে ছিল বস। কোথায় ছিল, কী কাজে জানে না সে। নিশ্চয়ই নতুন প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

মানুষটার কাজ আদায় করে নেয়ার কৌশল একেবারেই আলাদা, কারও কাজের ধরনের সঙ্গে মেলে না। মেধাও অসাধারণ, তুলনা হয় না কারও সঙ্গে। এ ছাড়া আরও কিছু বিশেষ কারণ আছে, যেগুলোর কারণে লোকটার প্রতি বিশেষ এক ধরনের শ্রদ্ধা আছে পিটার মার্টিনের।

একটা মোটাসোটা বাদামি খাম তার দিকে এগিয়ে দিল প্যান্থার। তারপর নির্দেশ দিতে শুরু করল।

মানুষটার বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটা পেশিও নাড়ল না মার্টিন। চুপ করে শুনে গেল। যাবতীয় তথ্য আর নির্দেশ মগজের একটা ছোট্ট খোপে ভরে রাখল। অচিরেই কাজে লাগবে ওসব।

বস কখনও শত্রু-মিত্র কারও মুখোমুখি হয় না, ভালই জানা আছে তার। যা করার দূর থেকে করে, অন্যদের মাধ্যমে। তবে যার পিছনে লাগে, তার বারোটা না বাজিয়ে ছাড়ে না। এ কাজে সে বেশিরভাগ সময় সফল হয় প্রতিপক্ষের যাবতীয় খুঁটিনাটি সম্পর্কে আগেভাগে জেনে রাখে বলে।

এই গুণটার কারণে বেশিরভাগ সময় প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপ্রস্তুত করা সহজ হয়। এবারও সেরকমই কিছু একটা ঘটাতে চলেছে মানুষটা। প্রস্তুতি ভালই হয়েছে, এবার দেখা যাক পরিণতি কেমন হয়। এ কাজে তার নিজেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বুঝতে পেরে মার্টিন রীতিমত পুলকিত। নিজের ওস্তাদি দেখানোর সুযোগ পাওয়া যাবে আগামী দিনগুলোতে।

উঠে পড়ল মার্টিন। খামটা বগলদাবা করে বেরিয়ে এল বসের রুম থেকে।

পাঁচ

পথ ভুল হয়েছে বুঝতে পেরে ব্রেক চাপল রানা। পরমুহূর্তে ছাঁৎ করে উঠল কলজেটা। একেবারে ঢিলেঢালা হয়ে আছে ব্রেক পেডাল, চাপ দিতেই বসে গেল ফ্লোরবোর্ডে। পলকের জন্য থমকে গেল ও। সত্যিই ব্রেক ফেইল করেছে কি না যাচাই করার জন্য আরও কয়েকবার চাপ দিল পেডালে। যা ভয় করেছিল! ব্রেক আসলেই কাজ করছে না!

কী করে হলো এমনটা? ঢোঁক গিলে ভাবল রানা। একটু আগেও তো একবার ব্রেক করেছিল, তখন তো... বরফের মত ঠাণ্ডা, ইস্পাত কঠিন একটা হাত ওর হৃৎপিণ্ডটা মুঠোয় নিয়ে চাপ দিতে শুরু করেছে।

ব্যস্ত হয়ে আবার ব্রেক চাপল রানা। নাহ্, কাজ হচ্ছে না। এক চুলও কমল না গতি। মুহূর্তের মধ্যে ঘাম ছুটে গেল ওর। বুক-পিঠ বেয়ে দরদর করে গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। মরিয়া হয়ে উঠল রানা। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আবার ব্রেক কষল।

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে কামানের গোলার মতো ছুটছে ওর অ্যাস্টন মার্টিন। চোখের একেবারে সামনে লাল রঙের 'ডেঞ্জার'! লেখা সাইনটা আবার দেখতে পেল ও। বড় হতে হতে পুরো আকাশ ঢেকে ফেলল, তারপর সাঁৎ করে পিছিয়ে গেল। পরক্ষণে দেখা দিল আরেকটা সাইন :

স্টপ!
রোড ক্লোজড ফর রিপেয়ারিং

তার ওপাশের মরণ ফাঁদটা এবার স্পষ্ট দেখতে পেল রানা! খুব বেশি হলে দু'শো গজ সামনে। ঝট্ করে গিয়ার ডাউন করল ও, থার্ড গিয়ারে নামিয়ে আনল গাড়ি। কাজ হলো না দেখে তৎক্ষণাৎ সেকেণ্ড গিয়ারে নামাল। তবু কাজ হচ্ছে না!

আর দেড়শ গজ সামনেই খাদ। কম করেও পঞ্চাশ ফুট চওড়া। ওর দিকে তীরবেগে ধেয়ে আসছে। ভয়ে, উত্তেজনায় স্টিয়ারিং হুইল ধরে প্রায় দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। হ্যাণ্ডব্রেক দিতে চাইল, ব্রেক চাপল ঘন ঘন। কিছুতেই কিছু হলো না। অমোঘ নিয়তির মত মৃত্যুকূপের দিকে ছুটে চলল গাড়ি।

কানের পাশের চুলগুলো জোর বাতাসের চাপে খুলির সঙ্গে লেপটে আছে। দাঁতে দাঁত চেপে গায়ের জোরে ব্রেক চেপে ধরে আছে ও, টানের চোটে হুইল উপড়ে আসার জোগাড়। কিন্তু গাড়িটাও যেন থামবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।

ক'দিন আগে প্রবল ভূমিকম্পে মাঝখান থেকে এই চওড়া ফাটলটা ধরেছে এই রাস্তায়, খবরটা ওর শোনা ছিল। কিন্তু মনে ছিল না। বিশ ফুটের মতো রাস্তা নেই হয়ে গভীর খাদে পরিণত হয়েছে। সেই খাদের দিকেই সাঁ সাঁ করে

ছুটে চলেছে রানার অ্যাস্টন মার্টিন।

বাঁচার কোনও উপায় নেই দেখে শক্ত হয়ে গেল ও। নির্মম বাস্তবতাকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। মনটা হঠাৎ করে উদার হয়ে উঠল রানার। ঠিক যেন সাগরের মত... না, অসীম আকাশের মত বিশাল... এসে পড়েছে খাদ। সমস্ত পেশি টান টান হয়ে উঠল ওর। দম আটকে গেল নাকের গোড়ায়।

হঠাৎ একটা চেনামুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। খুব চেনা, কিন্তু নামটা মনে করতে পারল না রানা। একটুপরই ভেসে উঠল আরেকটা চেহারা। কার ওটা? হ্যাঁ, সোহেলের। রানার প্রাণের বন্ধু সোহেল ওটা। কী যেন বলছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে না ও। মাইম শো-র মতো ওর মুখ নাড়া দেখতে পাচ্ছে কেবল। ওর অঙ্গভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রানাকে সতর্ক করছে সোহেল। মনে হয় সামনের খাদটা ইঙ্গিত করছে।

পরমুহূর্তে সাঁৎ করে আরেকটা মুখ হাজির হলো সেখানে। কার? কাঁচাপাকা... ঘন একজোড়া ভুরুর নীচ থেকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। এক বুড়ো। ব্যস্ত ভঙ্গিতে কিছু করতে বলছে। ধমক মারছে! কে রে বুড়ো? চেহারা খুব চেনা লাগছে, কিন্তু...

বিশ গজ... দশ গজ... পাঁচ গজ... সাঁৎ করে ওটার একেবারে কিনারায় পৌঁছে গেল অ্যাস্টন মার্টিন। তারপর চোখের পলকে শূন্যে ভেসে পড়ল। রানার পেটের ভেতরে যা কিছু আছে, সবকিছু লাফ দিল উপরদিকে।

রানাও লাফ দিয়েছিল জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে, কিন্তু পারল না। দড়াম করে কীসের ওপর যেন পড়ল বাঁ কাঁধ দিয়ে। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও। একই মুহূর্তে লোহা-লক্কড় আর কাঁচ ভাঙাচোরার বিকট শব্দ উঠল।

হুঁশ হতে বোকার মতো এদিক-ওদিক তাকাল রানা। বিছানার ওপর বসে বাঁ কাঁধ ডলছে। পুরু পর্দা ঢাকা জানালার বাইরে দিনের আলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গায়ে হাত বোলাল ও। ঘামে ভিজে গোসল হয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে ঝড়ের বেগে।

কপালের ঘাম মুছে বেড থেকে নামল ও। কী দেখে থমকে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। এটা কোন্ জায়গা? এক মুহূর্ত লাগল ওর জায়গাটা চিনতে। এটা লণ্ডনে ওর নতুন কেনা অ্যাপার্টমেণ্ট। সেটার মাস্টার বেডরুমে আছে ও এখন।

ব্যস্ত হয়ে চারদিকে দ্রুত নজর বোলাল ও। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। ভুল হয়নি। এটা রিজ হোটেলের পিছনে আর্লিংটন হাউজের থার্ড ফ্লোর অ্যাপার্টমেণ্টই। তাড়াতাড়ি ড্রেসারের বড় আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। কিছুক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থাকল নিজের চেহারার দিকে।

কোনও পরিবর্তন এসেছে কি না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নাহ্, আগের মতোই আছে ও। অন্তত চেহারায় কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ছে না। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও থমকে গেল পরনের স্লিপিং সুটটা দেখে। এটাও নিজের। রানাকে নিজের বাসায় এনে রেখে গেছে ওরা। তারপর ঘুম যাতে আরামের হয়, সে জন্য স্লিপিং সুটও পরিয়ে রেখে গেছে। প্রফেশনাল জব।

দেয়ালঘড়ির সুরেলা চাইম শুনে ঘুরে তাকাল। বারোটা বাজে। কতো তারিখ? আঠারো!

বারোই এপ্রিল কয়েক ঘণ্টার জন্য ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছিল, মনে আছে রানার। তারপর আরও পাঁচদিন পর একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে এইমাত্র আবার হুঁশ ফিরল। ওকে এখানে কখন নিয়ে এল ব্যাটারা? আর্লিংটন হাউজের সিকিউরিটি সিস্টেম নজিরবিহীন। সেই সিস্টেমকে কলা দেখিয়ে ওকে ওপরে এনে রেখে গেল কী করে? তা-ও একেবারে নিজেরই বেডরুমে!

কার হয়ে কাজ করছে ওরা? ভাবল রানা। ওকে দিয়ে কী করিয়ে নিতে চায়? নিজেকে বেশ চাঙ্গা লাগল। মনেই হয় না পাঁচদিন একটানা ঘুমিয়ে উঠেছে। একটু একটু খিদে পেয়েছে কেবল। হাতের সুঁইয়ের ছিদ্রগুলো দেখল রানা। সেদিনের পর আরও কয়েকটা যোগ হয়েছে মনে হলো ওখানটায়। একটা-দু'টো ছাড়া বাকিগুলো শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।

বেডের মাথার দিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটো সিঙ্গেল সোফা আর একটা সেণ্টার টেবিল সাজানো আছে। টেবিলটার ওপর একটা বই দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল ও। কার বই? ওটার নীচে একটা অ্যাটলাসও আছে দেখে কৌতূহল বেড়ে গেল।

বইগুলোর উপর এক টুকরো কাগজ দেখা গেল, পেতলের ভিনাস মূর্তির পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা। কাগজটায় ছাপার অক্ষরে লেখা: হোম টাস্ক। তার নীচে কয়েক পয়েণ্ট ছোটো অক্ষরে লেখা: রিড অ্যাণ্ড মেমোরাইজ।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ওটা রেখে সোফায় বসল। ওপরের বইটা তুলে নিল। নাম : হিস্ট্রি অভ আফ্রিকা।

আচমকা কানের কাছে টেলিফোন বেজে উঠতে প্রায় লাফিয়ে উঠল ও। চট করে ঘুরে তাকাল যন্ত্রটার দিকে। কয়েকদিন ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই বলে ওই জিনিসের অস্তিত্বের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিল রানা। হাত বাড়াতে গিয়েও মুহূর্তের জন্য থমকাল। কার ফোন?

'হ্যালো!'

'ফিজিক্যালি আপনার রিকভারিং পাওয়ারের তুলনা হয় না,' একটা অচেনা কণ্ঠ মোলায়েম সুরে বলল।

'সরি!'

'বলছি, আপনার রিকভারিং পাওয়ার দেখে আমরা অবাক হয়েছি। রিয়েলি, ইউ আর...'

মুহূর্তে মেজাজ খাট্টা হয়ে গেল মাসুদ রানার। 'কে বলছেন আপনি?'

'নেভার মাইণ্ড,' মৃদু হাসল লোকটা। 'বরং কী বলছি, সেদিকে মন দিন। আপনাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে নিজেকে যাতে স্বাধীন ভাবতে শুরু না করেন, সে ব্যাপারে সতর্ক করতে ফোনটা করলাম। বুঝতে পেরেছেন?'

জবাব দিল না ও। গা জ্বলছে রাগে।

'আপনার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা চোখ রাখছি আমরা। আপনার চলাফেরার স্বাধীনতায় বাধা দেয়া হবে না। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ান, যেখানে খুশি যান।

তবে এখন লম্বা সময়ের জন্য কোনও কাজে জড়িয়ে পড়তে যাবেন না। কারণ আপনাকে যে-কোনও সময় প্রয়োজন পড়বে আমাদের।'

চুপচাপ সহ্য করে গেল রানা। নজর রাখার হুঁশিয়ারি আর ফোন করার টাইমিং হিসেব করে বুঝল, ওর অ্যাপার্টমেন্টে গোপন ক্যামেরা সেট করা হয়েছে। নইলে ওর জ্ঞান ফেরার কথা জানা সম্ভব হতো না বাইরের কারও পক্ষে। তবে ওটা কোথায় সেট করা হয়েছে, তা দেখার চেষ্টা করল না ও। বরং কিছুই না বোঝার ভান করে স্থির বসে থাকল।

'আপনার সামনে যে কারেন্ট টাস্কটা আছে, সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করুন। মুখস্থ করে ফেলুন যাবতীয় তথ্য। কয়েকদিন পর আপনার পরীক্ষা নেয়া হবে। কোথায় হবে পরীক্ষা, সময়মত জানানো হবে। গুড বাই।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেও থেমে গেল রানা। লাইন কেটে দেয়া হয়েছে। রিসিভার রেখে আনমনে ডান বাহুতে হাত বোলাল ও। অজ্ঞাত ডিভাইসটার কথা ভাবল। এটা কী ধরনের?

পেটের মধ্যে মুচড়ে উঠতে আপাতত জিনিসটার ভাবনা মাথা থেকে দূর করে দিল। হিস্ট্রি অভ আফ্রিকা রেখে পা বাড়াল কিচেনের দিকে।

ঢাকা। বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব:) রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে সংস্থার চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। আগেরবারের তুলনায় আজ দু'জনকেই বেশ নিরুদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। কারণটা হলো, মাসুদ রানার সুস্থ অবস্থায় অজ্ঞাতবাস থেকে ফেরার খবর এসেছে।

দুপুরে লণ্ডন বিসিআই জানিয়েছে, কিডন্যাপাররা রাতের বেলা রানাকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে রেখে গেছে। অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের সিকিউরিটি গার্ডদের অজান্তে কাজ সারার জন্য তাদেরকে খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অজ্ঞান করে নেয়া হয়েছিল। বড়জোর পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মতো অজ্ঞান ছিল তারা। জ্ঞান ফেরার পর কিছু সন্দেহ করলেও কেউ তা নিয়ে মুখ খোলেনি। কারণ তাতে চাকরি নিয়ে টান পড়তে পারতো।

খবরটা সোহেলকে জানালেন রাহাত খান। তারপর লণ্ডন বিসিআইয়ের 'অ্যাওয়েটিং ইওর ইন্সট্রাকশনস'-এর জবাব দিলেন এভাবে : নো অ্যাকশন। রানার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টাও করা যাবে না। তাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। ও নিজে যোগাযোগ করে কি না, সেই অপেক্ষায় থাকতে হবে।

তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। সন্ধের পর রানাই যোগাযোগ করল ঢাকার সঙ্গে। জানিয়ে দিল, বিশেষ একটা কাজে আপাতত কিছুদিন ব্যস্ত থাকতে হবে ওকে।

রাহাত খান আর সোহেল, দু'জনেরই চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল মেসেজটা পেয়ে। কারণ যতো সাধারণই মনে হোক না কেন, ওটা আসলে সাঙ্কেতিক মেসেজ। কয়েকটা বাড়তি শব্দ বসিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে। কোড ভাঙলে তার অর্থ দাঁড়ায়: রানা সমস্যায় আছে। বিপদের প্রকৃতি অজ্ঞাত। পরে জানানো হবে।

তৎক্ষণাৎ নতুন নির্দেশ জারি করলেন রাহাত খান: কড়া নজর রাখতে হবে রানার চলাফেরার উপর। মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করা চলবে না।

লণ্ডন, ২১ মার্চ।

টেলিফোন বেজে উঠতে সচকিত হলো মাসুদ রানা। জাংগারোর ম্যাপ নামিয়ে রেখে রিসিভার তুলল। 'হ্যালো।'

'মিস্টার রানা!'

'বলছি।' রানা গম্ভীর।

'আজ সন্ধে আটটায় একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। আপনার অ্যাপার্টমেন্টে। তিনি যা নির্দেশ দেবেন, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে আপনাকে।'

রানা কোনও জবাব দিল না। কলারও সে জন্য অপেক্ষা করল না। কুট করে কেটে গেল লাইন।

রিসিভার জায়গায় রেখে দিল ও। গত কয়েক দিন মোটামুটি নিরুপদ্রবেই কাটিয়েছে। বাইরে গেছে। লণ্ডন বিসিআইতে ঢুঁ মেরেছে। রানা এজেন্সিতে অফিস করেছে। খোঁজ-খবর নিয়েছে সবার। ঢাকার সঙ্গে কথাও বলেছে। সবাই সতর্ক নজর রেখেছে ওর ওপর। তবে কোনও প্রশ্ন করেনি। কারণ ঢাকা থেকে সবাইকে এ ব্যাপারে বিশেষ করে বলে দেয়া হয়েছিল।

মনের মধ্যে যদিও একটা অনিশ্চয়তা প্রতি মুহূর্তের জন্যই ছিল। ফোনটা রিসিভ করার পর সেটা দূর হয়ে গেল। ভালই হলো, মনে মনে বলল রানা। অজানা জিনিসটা এবার সামনে আসতে যাচ্ছে। অনিশ্চয়তা অন্তত দূর হবে। ঘড়ি দেখল। সাতটা বাজে। তার মানে সময় আছে।

কিচেনে চলে এল রানা। বিশাল ফ্রিজের পিছনের দেয়ালে একটা আট ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চি কনসিলড ফোকর আছে। সেটার মধ্য থেকে একটা আনলিস্টেড সেল ফোন বের করল। বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ থাকে ওটা। একটা নাম্বারে রিং করে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল কাউকে।

সময়মত ডোর বেল বাজতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল রানা। দরজা খুলল। নির্বিকার। সামনে ওরই বয়সী এক যুবককে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে দেখা গেল। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। ব্যায়ামপুষ্ট, অ্যাথলিটদের মতো সুগঠিত দেহ। অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। ক্লিন শেভড।

মাথা ভর্তি কোঁকড়া, ঘন কালো চুল। চোখের রং গাঢ় নীল। যুবকের ঠোঁটজোড়ার গঠন বেশ আকর্ষণীয় লাগল রানার। সব মিলিয়ে চমৎকার লেডিহান্টার চেহারা। ওর চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল যুবক। আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে চেহারা থেকে। হাতে একটা চ্যাপ্টা ধরনের ব্রিফকেস।

'গুড ইভনিং।'

'ইভনিং!' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল মাসুদ রানা।

'আমার নাম ওয়াল্টার হ্যারিস। ব্যবসায়ী আমি। আপনার সাথে ব্যবসা

সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছি। অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

ব্যাটার ভনিতা দেখে গা জ্বলে গেল। দরজা পুরো মেলে ধরল রানা। 'আসুন।'

ভেতরে পা রাখল ওয়াল্টার হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিন। ড্রইংরুমের ওপর চোখ বুলিয়ে মুগ্ধ হলো। একেকটা জিনিসের ওপর চোখ পড়ে আর থমকে যায় দৃষ্টি। 'বাহ, আপনার ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন...'

'কাজের কথা শুরু করে দিন,' মৃদু গলায় বাধা দিল রানা। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করা পছন্দ করি না আমি।'

কৌতুকের দৃষ্টিতে রানার আপাদমস্তক নজর বোলাল যুবক। মনে হলো ভেতরের চাঞ্চল্য দমন করছে জোর করে। রানার এভাবে বাধা দেয়াটাকে ঔদ্ধত্য হিসেবে নিয়েছে লোকটা।

'ঠিক আছে। বসে বলি?'

'স্বচ্ছন্দে।'

চট করে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না। একটা সিঙ্গেল সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে টাইটা পেটের সঙ্গে ডলে মসৃণ করল। তারপর ব্রিফকেসটা রাখল কোলের উপর।

রানা বসল একটু দূরে। নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করছে আগন্তুককে। বুঝতে পারছে চেহারা যতই আকর্ষণীয় দেখাক, আসলে ভেতরে ভেতরে নির্দয় খুনী এ লোক। তার সাপের মত শীতল চাউনি সে কথাই ঘোষণা করছে।

'পশ্চিম আফ্রিকায় জাংগারো নামে একটা দেশ আছে,' শুরু করল সে। 'আমাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত সেই দেশের সাথে। এক সময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল, এখন স্বাধীন। আশা করি এর মধ্যে যা যা জানার, জানা হয়ে গেছে দেশটা সম্পর্কে!' সেন্টার টেবিলের উপর পড়ে থাকা বই আর ম্যাপ ইঙ্গিত করল যুবক।

'বলে যান।'

'ওই দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেছে। গত আট মাস আগে। আমরা ওই দেশে কোটি কোটি পাউণ্ড ব্যবসায় খাটিয়েছিলাম। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের কারণে সর্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে গেছে। পুঁজি আটকে যাওয়ায় খুব বাজে অবস্থায় আছি আমরা।'

'কীসের ব্যবসা?'

'অনেক কিছুর,' বলেই দ্রুত অন্য কথায় চলে গেল। 'দেশটা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য আপনার জানা থাকা দরকার, যা ওর মধ্যে নেই।' বইটা ইঙ্গিত করল সে।

রানা নীরবে মাথা দোলাল। অর্থাৎ বলে যান।

'জাংগারোতে আগে জাতি ছিল দুটো, কায়া আর ইরুবা। দুটোই দাঙ্গাবাজ জাতি। পরস্পরের সাথে কথায়-কথায় দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ত এক সময়। এখন অবশ্য পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। সে যাক, দেশটার সাগরে মাছ আর বনে পশু-

পাখি আছে অফুরন্ত, সেসব খেয়ে দিন পার করে জাংগারানরা। সন্তানদের লেখাপড়া বা তাদের ভবিষ্যৎ, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মত অভিভাবক খুব কমই আছে ও দেশে। কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, সেগুলো রফতানির ব্যবস্থা নিলে যে ভাল আয় হতে পারে, তা নিয়েও বিশেষ মাথা ঘামায় না ওরা।

'এক সময় ফ্রান্সের কলোনি ছিল জাংগারো। কলোনিয়াল প্রভুরা সাধারণত উপনিবেশের সম্পদ বিক্রির টাকায় নিজ দেশের সিন্দুক ভরে। কিন্তু এদের আলসেমির জন্য এ ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল উল্টো। ফ্রান্সকেই নিয়মিতভাবে সাহায্য করতে হতো জাংগারোকে। ফলে এক পর্যায়ে নিরুপায় হয়ে বিকল্প পদক্ষেপ নিতে হয় ফ্রান্সকে। মিশর আর সুদানের সীমান্তবর্তী মরু অঞ্চলে টিভ নামে একটা আদিবাসি জাতি ছিল। খুব অভাবি জাতি। তাদেরকে জাংগারোতে এনে পুনর্বাসিত করে তারা। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা।' পাশ বদল করে বসল লোকটা।

'টিভরা মুসলমান, কর্মঠ জাতি। তাদের নিয়ে আসা হয় যাতে তারা নিজেরা খেয়েপরে বাঁচতে পারে, দেশটার অর্থনীতিকেও সচল করে তুলতে পারে। ওদের জন্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাও করে ফরাসিরা। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে প্রতিটা ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অনেক মাইল পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় টিভরা। দু' বছর আগে জাংগারোতে সাধারণ নির্বাচন হয়েছে।

'ষাট বছরের মধ্যে প্রথম নির্বাচন। তাতে জয়ী হয় টিভদেরই নেতা, জাঁ বিডেল ইব্রাহিম। অক্সফোর্ড থেকে পিএইচডি করা। অসাধারণ একজন নেতা। টিভরা তো বটেই, কায়া-ইরুবারাও তাঁকে ভোট দেয়। সরকার গঠনও করেন ইব্রাহিম। কিন্তু...'

এসব মোটামুটি জানা, তাই হ্যারিসের বকবকানি শোনায় বিশেষ মন নেই রানার। ব্যাটা আসলে কী বলতে এসেছে, তাই শোনার অপেক্ষায় আছে ও।

'আপনি শুনছেন তো আমার কথা?' রানাকে শব্দ করে হাই তুলতে দেখে ভুরু কোঁচকাল ওয়াল্টার হ্যারিস।

মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। মাথা দোলাল হ্যারিসের প্রশ্নে। 'মিস করিনি কিছু।'

'ওকে,' আবার পাশ বদল করল সে। 'ইউ সি, জাংগারান আর্মিতে ইরুবা আর কায়াদের মধ্যে কে কাকে টপকে আগে যাবে, সে প্রতিযোগিতা চলে আসছে বহুকাল থেকে। অনেকটা ট্র্যাডিশনেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। এ ক্ষেত্রে ফরাসি উপনিবেশ থাকার সময় জাংগারো যা ছিল, চল্লিশ বছর পর আজও তাই আছে। একবার কায়াদের হাতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব থাকে তো পরেরবার ইরুবাদের হাতে চলে যায়। নির্বাচনে ইব্রাহিমের জয়ী হওয়াটা প্রভাবশালী ইরুবাদের একটা অংশ মেনে নিতে পারেনি। ফলে গৃহযুদ্ধ...'

'এসব পুরনো কথা,' বাধা দিল মাসুদ রানা। 'আসল কথায় এলে ভাল হয়।'

হাসার চেষ্টা করল হ্যারিস, কিন্তু মুখ ভ্যাংচানোর মত হয়ে গেল সেটা। নিম পাতার রস খাওয়া হাসি। রাগে গা জ্বলে উঠল তার। ব্যাটা ভাব দেখাচ্ছে যেন

জ্ঞানের জাহাজ! সব জেনে বসে আছে! অনেক কষ্টে নিজেকে সামাল দিল সে।

'সরি, এখনই আসছি। ইব্রাহিমকে নির্বাসনে যেতে বাধ্য করে ইরুবা বিদ্রোহীরা। ক্ষমতা দখল করে। কায়ারা পাল্টা ক্ষমতা দখল করে। এইভাবে দুই বছরে চারবার ক্ষমতা হাত বদল হয় জাংগারোতে। দেশটির বর্তমান শাসক কায়া গোষ্ঠির। আধা উন্মাদ। নাম ফ্রান্সিস কিমবা। আর্মিতে কর্নেল ছিল। ক্ষমতায় বসেই দুই লাফে মেজর জেনারেল হয়েছে। তারপর ফিল্ড মার্শাল এবং রিপাবলিক অভ জাংগারোর আজীবন প্রেসিডেন্ট। তার ওপর আবার কায়াদের সো কলড্ ধর্মীয় নেতা সে। গত আট মাসে কম করেও ত্রিশ হাজার জাংগারান মারা গেছে তার বিশেষ বাহিনীর হাতে।' ব্রিফকেসটার গায়ে হাত বোলাল সে।

'উন্মাদ কিসিমের মানুষ। সবাই তার ভয়ে কাঁপে। সে যা-ই হোক, এখন দিন যত যাচ্ছে, ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তার কাজকর্ম। প্রায় রাতেই তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে ধরনের "দুঃস্বপ্ন" দেখছে কিমবা, পরদিন তার সৈন্যরা সেসবের সাথে জড়িত সন্দেহে কাউকে না কাউকে পাকড়াও করে...'

থেমে তর্জনী গলায় বুলিয়ে জবাইয়ের ভঙ্গি করল যুবক। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আফ্রিকার এ ধরনের ব্যানানা রিপাবলিকগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ভালই ধারণা আছে আপনার। কী বলেন?'

কপাল কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। হ্যারিসের প্রশ্ন শুনেও শুনল না। 'তারপর?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল হ্যারিস। হাসি হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেছে চেহারা থেকে। মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিল সে, আজকের অপমানের শোধ না তুলে ছাড়বে না। ওই বেয়াড়া মুখটায় কয়েকটা লাথি না মারা পর্যন্ত শান্তি হবে না তার। আগে কাজটা শেষ হোক, তারপর দেখাবে সে কত ধানে কত চাল।

'সর্বশেষ দেশের আর্মি চিফ, লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল অ্যাণ্টনিও ববির পিছনে লেগে তাকেও দেশছাড়া করেছে সে। রাজধানী ক্লারেন্সে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাওয়ালা একটা হাসপাতাল আছে। জাতিসংঘের টাকায় চলে। তো, কিমবার শালা সেটার জন্য পাঠানো কয়েক লাখ ডলারের ওষুধ লোপাট করে দেয়ায় কর্নেল তার প্রতিবাদ করেছিল। কেন, তা সে-ই জানে।'

থেমে সোজা হয়ে বসল হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিন। কোটের পকেটে হাত ভরে দিল। 'সিগারেট?'

'না। ধন্যবাদ।' আলোচনা কোনদিকে গড়াচ্ছে ভাবছে রানা। ব্যাটার মতলব এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

'আমি পান করলে কিছু মনে করবেন না নিশ্চয়ই?'

নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল রানা। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাল, 'মনে করলে পান করবেন না বলতে চাইছেন?'

মেকি লজ্জিত হাসি হাসল যুবক। 'নট রিয়েলি। আপনি ননস্মোকার হলে অবশ্য বিবেচনা করে দেখতাম।' সিগারেট ধরাল সে। ধোঁয়া ছাড়ল এক গাল। 'যা বলছিলাম। এই ঘটনায় প্রেসিডেন্টের মাথা পুরো বিগড়ে যায়। কর্নেলকে

যেখান থেকে হোক ধরে আনার নির্দেশ দেয় সেনাবাহিনীকে। কিন্তু ববি জানে কী ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মানুষ সে। তাই আগেই সটকে পড়ে। বর্ডার পার হয়ে পাশের দেশে চলে যায়।'

অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। 'ববি হাফ ব্রিড। আধা ইরুবা, আধা কায়া। চল্লিশ বছর আগে দুই জাতির ভয়াবহ দাঙ্গায় ইরুবারা জয়ী হয়ে বিজয় উৎসবের নামে কায়া মেয়েদের পাইকারী ধর্ষণ করেছিল।' থেমে শ্রাগ করল। 'সবাই বলে তখনকার প্রোডাক্ট। আর্মিতে করপোরাল ছিল। পরে মেজর হয়। সিনিয়রদের নির্দেশ অমান্য করায় চাকরি হারাতে হয় তাকে, ছয় মাস আগে কিমবার দয়ায় সেটা ফিরে পায় আবার। কারণ ববি নাকি কিমবার সাথে দেখা করে ধর্মের নামে শপথ করে বলেছিল, সে কায়া। কিমবার প্রতি অনুগত থেকে দেশের সেবা করার সুযোগ চায়। কিমবাও মনে হয় ভেবেছিল, একজন পুরনো সৈনিক দলে থাকা ভাল। ট্রেইনিদের শেখাতে পারবে বন্দুকের নল কোনদিকে আর কুঁদো কোনদিকে। ববির কোনও আদর্শ নেই, যদ্দূর জানা গেছে। টাকাই তার আদর্শ। সিফিলিস আছে। সম্ভবত সে কারণেই কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল আবার হ্যারিস। রানার নীরবতা দেখে সন্দেহ হওয়ায় নড়েচড়ে বসল।

'মাফ করবেন। আপনি ফলো করছেন আশা করি?'

'করছি। কিন্তু গল্পদাদুর আসর রেখে তাড়াতাড়ি আসল কথায় এলে উপকৃত হতাম।'

রানার খোঁচা মারা মন্তব্যটা ও শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। বলল, 'এখন নিশ্চয়ই অভাবের মধ্যে আছে সে। টাকার লোভ দেখালে সুড়সুড় করে দলে ভিড়ে যাবে।'

রানা বসার ভঙ্গি বদলাল। ভাবল, কর্নেল ববি অভাবে আছে না প্রাচুর্যে আছে, তার সঙ্গে এ বৈঠকের সম্পর্ক কী?

সিগারেট নিভিয়ে হেলান দিল হ্যারিস। টাই মসৃণ করে দুই হাত বুকে বেঁধে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টে। ভাবখানা যেন, খেল খতম। আর কিছু বলার নেই।

'তারপর?' প্রশ্ন করল রানা।

'ব্যস,' মাথা ঝাঁকাল সে।

'এসব আমাকে বলার অর্থ? এর মধ্যে আমার ভূমিকা কী?'

'নতুন অভ্যুত্থান সংঘটকের,' মিটিমিটি হাসছে হ্যারিস ওরফে মার্টিন।

'বুঝলাম না,' বলল ও, যদিও বুঝতে কিছুই বাকি রইল না।

'না বোঝার কী আছে?' এতক্ষণে যেন ওকে বাগে পেয়েছে, এমন একটা ভঙ্গি করল যুবক। হাসির বেড় আরও প্রসারিত হলো। 'জাংগারোর ইতিহাসে আরেকটা কু যোগ করতে হবে আপনাকে। কিমবাকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে হবে যাতে আমরা কর্নেল ববিকে ক্ষমতায় বসাতে পারি।'

মার্টিন হয়তো ভেবেছিল এ কথা শুনে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের সাগরে হাবুডুবু খাবে মাসুদ রানা। আর সে তার অসহায়ত্ব রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করবে।

কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু ঘটল না। নীরবে তাকিয়ে থাকল কেবল রানা। নির্বিকার।

ওকে দিয়ে কঠিন কিছু একটা করিয়ে নেয়ার জন্যই যে এত আয়োজন, তা বুঝতে বাকি ছিল না। মনে মনে সেজন্য প্রস্তুতও ছিল ও। কিন্তু সেটা যে এ ধরনের কিছু হবে, তা ভাবেনি। প্রশ্নটা নতুন করে উঁকি দিল মনে। কার প্রতিনিধিত্ব করছে এ লোক? পিছনের মাস্টারমাইণ্ডটি কে?

'কাজটা এতই সোজা বলে মনে হচ্ছে আপনার?' একটু পর মুখ খুলল রানা। 'গেলাম আর কু ঘটিয়ে দিলাম?'

'না,' মাথা নাড়ল হ্যারিস। 'তা কেন হতে যাবে? আমরা ওরকম কিছু ভাবছিও না। তবে এ কাজ আপনার জন্য যে কঠিন কিছু হবে না, সেটাও জানি। এসব আগেও অনেকবার করেছেন আপনি। করেছেন না?'

'করেছি। কিন্তু তার পিছনে উপযুক্ত মানবিক কারণ ছিল। নীতি-আদর্শের প্রশ্ন ছিল।'

ঠোঁট বেঁকে গেল যুবকের। 'আপনার কী মনে হয়, এইসব ছেঁদো কথায় পিছিয়ে যাব বলে এত আয়োজন করেছি আমরা? পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে আপনার?'

চুপ করে থাকল রানা। না, স্বীকার করল মনে মনে। 'কার হয়ে কাজ করছেন আপনি, জানতে পারি?'

'পারবেন, পরে। টেকনিক্যাল কিছু অসুবিধা আছে বলে এখনই বলা যাচ্ছে না। সে যাক। আপনি নীতি-আদর্শের প্রশ্ন তুললেন না? ফর ইওর কাইণ্ড ইনফর্মেশন, এটারও মানবিক দিক আছে। কিমবাকে হত্যা করাই হবে অনেক বড় মানবিক কাজ, অন্তত জাংগারোর জন্য। লোকটা মরলে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে না। এর মধ্যে তাকে মেরে ফেলার দুয়েকটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু লোকটা বেশিরভাগ সময় তার জাতভাই কায়া বডিগার্ডদের কড়া পাহারায় থাকে বলে কাজ হয়নি।'

সোফার হাতলে শরীরের ভর রেখে একটু কাত হয়ে বসল সে। 'মাঝেমধ্যে নিজের গ্রামের বাড়িতে ছাড়া আর কোথাও খুব একটা যায় না সে। তা-ও হঠাৎ হঠাৎ যায়। গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে দুই-চার গ্রাম থেকে ধরে আনা কচি কচি মেয়েদের ধর্ষণ করে। প্রথমে নিজে করে, তারপর বডিগার্ড বাহিনীর মধ্যে হরিলুটের মাল হিসেবে বিলিয়ে দেয় ওদেরকে। তার প্রতিটা ট্রিপেই দু'-চারটা করে মেয়ে মারা পড়ে। লোকটা সম্পর্কে আরও অনেক কাহিনি চালু আছে যেসব শুনলে আপনার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাবে।'

ব্রিফকেস থেকে একটা বড় বাদামি খাম বের করল ওয়াল্টার হ্যারিস। ওটার মধ্য থেকে বের হলো এক লোকের রঙিন ছবি। দশ বাই বারো ইঞ্চি। অতিরিক্ত এনলার্জ করায় চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিনারাগুলো আবছা। তবে বোঝা যায়। রানার দিকে ওটা এগিয়ে দিল সে। 'দেখুন।'

দেখল ও। মাঝ বয়সী এক আফ্রিকান, সিল্ক-টপ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসে আছে। গায়ে কালো রঙের ফ্রক-কোট, পরনে স্পঞ্জ-ব্যাগ ট্রাউজার্স। মুখটা

লম্বাটে। কুঠারের মত বাঁকা। নাকের দু' পাশের চামড়ায় দুটো নিম্নমুখী গভীর দাগ। সর্বক্ষণ নাক কুঁচকে রাখলে এরকম হয়। ঠোঁটের দুই কোনাও তেমনি। নীচের দিকে নেমে আছে। ঘৃণা অথবা কিছু মেনে না নিতে পারার ক্ষেত্রে এরকম অভিব্যক্তি হতে পারে।

মানুষটার হাড়ের কাঠামো বিস্ময়কর রকম প্রশস্ত। এরকম সাধারণত খুব কমই চোখে পড়ে। ছবিটা সম্ভবত কোনও অনুষ্ঠানের সময় তোলা। অফ হোয়াইট রঙের বিশাল এক ভবনের সামনের সবুজ লনে সিংহাসনের মত চেয়ারে বসে আছে লোকটা। তার পিছনে, ভবনটার সিঁড়িতে কিছু আর্মি অফিসার দাঁড়ানো। ম্যানসনের ছাদ লাল টাইলের তৈরি।

লোকটার চোখ দুটো দেখার মত। অন্ধকার রাতে বেড়ালের চোখ যেমন আলো পড়লে জ্বলে ওঠে, অনেকটা সেই রকম চকচক করছে। স্থির দৃষ্টিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে। উন্মাদের দৃষ্টি এরকমই হয়, ভাবল মাসুদ রানা।

'ইনি হচ্ছেন রিপাবলিক অভ জাংগারোর হিজ এক্সেলেন্সি, প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস কিমবা,' হ্যারিস বলল।

রানা জবাব না দিয়ে তার পিছনের ভবনটা দেখল। ওটার গঠন প্রকৃতি ঔপনিবেশিক আমলের কথা মনে করিয়ে দেয়। যার কথা বর্তমানে মানুষের স্মৃতিতে হয়তো নেই, তবে ভাণ্ডার থেকে একেবারে মিলিয়েও যায়নি।

নাকের ডগা চুলকাল হ্যারিস। ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে। রানার অনেক মানবিক গুণ আছে, বস বলেছে তাকে। সেসবের অন্যতম হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রতি দুর্বলতা। যেমন নারীজাতির অবমাননা সহ্য করতে পারে না ও। কিমবা ধর্মের নামে মেয়েদের নিয়ে অনাচার করে, সেসব রানার কানে তুলতে পারলে তাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

খামটা এগিয়ে দিল হ্যারিস। 'এর মধ্যে এই প্যালেসের কিছু স্যাটেলাইট ইমেজ আছে। লং, ক্লোজ, দু'রকমই। আপনার কাজ সহজ করে দিতে চাই আমরা, মিস্টার রানা। তাই কষ্ট করে নিজেরাই এগুলো জোগাড় করেছি। অনেক দিন লেগেছে। কিন্তু আর বেশি সময় নেয়া যাবে না। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।' শ্রাগ করল লোকটা। 'বুঝতেই পারছেন।'

রানা চুপ। হাতে প্ল্যান্ট করা ডিভাইসটার কথা ভাবল। ওকে কিডন্যাপ করার নাটক সাজাতে এদেরকে অকল্পনীয় ঝুঁকি নিতে হয়েছে! ও কখন লণ্ডনে আসছে, খবরটা কষ্ট করে জানতে হয়েছে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হয়েছে। তারপর হাতের এটা... নিশ্চয়ই বেশ আগে থেকে ঠিক করা ছিল এটার সাহায্যে রানাকে এই কাজে বাধ্য করা হবে। ওর সত্যিকারের পরিচয় জানার পরেও! এদের স্পর্ধার কথা ভেবে অবাক হলো ও।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। একবারই হাতের জিনিসটার কেরামতি বোঝানো হয়েছে ওকে, সেই ক্লিনিকে। তারপর থেকে আর সাড়া নেই। জিনিসটার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়নি তো? নাকি... হ্যারিসের পরের কথায় চমক ভাঙল ওর।

'লোকটাকে মারলে আপনার পুণ্য বেশি হবে, মিস্টার রানা।' রানা কিছু বলছে না দেখে অস্বস্তি বোধ করছে হ্যারিস।

'আমার আমলনামা নিয়ে ভাবতে হবে না,' বলল রানা। 'এর পিছনে আপনাদের আসল মতলবটা কী, তাই বলুন।'

চাউনি কেঁপে গেল তার। 'মতলব?' মাথা নাড়ল। 'ব্যবসা ছাড়া কোনও মতলব নেই। বিলিভ মি।'

রানা নীরবে তাকিয়ে থাকল তার দিকে।

'আপনার পরিচিত অনেক মার্সেনারি এক্স-আর্মি ম্যান আছে, কমাণ্ডো আছে, আপনি বললে যারা এ কাজে খুশি মনে অংশ নেবে। তাদের যতজনকে প্রয়োজন মনে করেন, নিয়ে আসুন। সবাইকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়ার ক্ষমতা থাকবে আপনার। যতো আর্মস দরকার, কিনে নিতে পারবেন। এসবের কানেকশনও তো আপনার ভাল জানা।'

'আমার অনেক খবরই রাখেন দেখছি,' আনমনে বলল ও।

'রাখতে হয়। ব্যবসা করতে গেলে কখন কোন্ পুঁজি খাটাতে হবে না জানলে চলবে কেন? ইচ্ছে করলে হাতে প্ল্যান্ট করা ডিভাইসটার সাহায্যে আপনাকে রাজি করানো যেতো। তাতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হতো। কিন্তু আমরা বুঝি, সব কাজে মানুষকে বাধ্য করতে নেই।'

কিছুক্ষণ ওকে দেখল হ্যারিস। 'তারপর? কী ঠিক করলেন? নিজে থেকে করবেন কাজটা?'

শ্রাগ করল ও। যেখানে দর কষাকষির সুযোগই নেই, সেখানে অহেতুক সময় নষ্ট করে লাভ কি? এদের কথায় নাচা ছাড়া এখন কোনও পথ নেই ওর সামনে। কাজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

'আপনার ব্যবসার গল্প পুরোটা বিশ্বাস করি না,' বলল রানা। 'তবু... উপায় কি!'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল যুবক। একটা গোপন সার্চ লাইট জ্বলে উঠল তার মুখের চামড়ার নীচে। 'এখন আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং টার্গেট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা।'

'আপনি ওদিকে গিয়েছিলেন শুনলাম যেন!'

মাথা নাড়ল হ্যারিস। 'গিয়েছিলাম, কিন্তু জাংগারোতে ঢোকার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। প্রতিবেশী লাইবেরিয়া থেকে যদ্দূর সম্ভব রিপোর্ট সংগ্রহ করে ফিরে এসেছি।'

'আপনাদের তো ব্যবসা আছে। ব্যবসা দেখাশোনার কথা বলে যেতে পারতেন।'

'পাগল নাকি? কায়ারা কিছু টের পেলে জীবন নিয়ে ফিরে আসা যেতো? তার ওপর রাশান স্পাইরা আছে না?'

'আপনাদের দূতাবাসের মাধ্যমে চেষ্টা করেননি কেন?'

'জাংগারোতে ব্রিটিশ দূতাবাস নেই।'

'আমেরিকান?'

এতো প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু প্রকাশ করল না। 'আছে। কিন্তু কাজটা গোপনীয়। ঢাকঢোল পেটানো যাবে না বলে ওই চেষ্টা করিনি। তবে আপনার জন্য এ কাজ কঠিন হবে না। টুরিস্ট হিসেবে হলেও...'

'আপনার প্রাণ আর আমার প্রাণের মূল্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে বোঝাতে চাইছেন?' শান্ত গলায় বলল ও।

মাথা নাড়ল হ্যারিস। 'ভুল ধারণা আপনার।'

'তাই? তা হলে সঠিক ধারণাটা দিন।'

'এসব ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতার কোনও জুড়ি নেই। আপনি যতো অনায়াসে কাজটা করে আসতে পারবেন, তা আর কাউকে দিয়ে হবে না। আমি তো এ লাইনে শিশু।'

চুপ করে থাকল রানা। কথাটা মিথ্যে নয়। ওর নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ ভেবে সরু ব্রিফকেসটা খুলল যুবক। ভেতর থেকে কড়কড়ে একশ পাউণ্ডের এক তাড়া নোট বের করে সামনের টেবিলের উপর রাখল।

'প্যারিসে জাংগারোর এমব্যাসি আছে। ইওরোপের মধ্যে ওটাই একমাত্র এমব্যাসি ওদের। কিন্তু ওখান থেকে ভিসা দেবে বলে মনে হয় না। দিলেও দেরি করে দেবে। আপনার জন্যে লাইবেরিয়া হয়ে ওই দেশে ঢোকা সবচেয়ে সহজ হবে। ওখানে জাংগারান কনসুলেট আছে। তাই মনরোভিয়া হয়ে যাবেন আপনি। ওখানকার কনসালকে ঘুষ দিলে মাত্র দশ মিনিট লাগবে ভিসা পেতে। তারপর ক্লারেন্স। ইজি।'

মাথা দোলাল ও। 'তাই তো দেখছি।'

টিটকিরিটা গায়ে মাখল না হ্যারিস। 'আগামীকাল বিকেলে মনরোভিয়ার এয়ার টিকেট পেয়ে যাবেন। এয়ার আফ্রিক-এর।' হঠাৎ করেই গলার স্বর আর চেহারা পাল্টে গেল লোকটার। নির্দেশের সুর ফুটল কণ্ঠে। একটা ফোন নম্বর দিয়ে বলল, 'এটা আমার নাম্বার। দিনে-রাতে যখনই প্রয়োজন মনে করবেন, বিনা দ্বিধায় যোগাযোগ করবেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসার চেষ্টা করবেন। ফিরে জাংগারো সম্পর্কে লিখিত রিপোর্ট করবেন বিস্তারিতভাবে। আই মিন, আপনার সফরের ফলাফল। আপনি কীভাবে আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। কাজটা কত দ্রুত সারতে পারবেন। কী কী প্রয়োজন পড়বে। কত খরচ পড়বে, ইত্যাদি বিস্তারিত জানাবেন। আর...' বলে একটু থামল সে। 'দয়া করে হাতের জিনিসটার কথা ভুলবেন না। ওখানে কোনও রকম কারিগরি ফলাতে গেলেই আমরা টের পাব, এবং আগেই আপনাকে বলা হয়েছে: ফলাফলটা আপনার জন্যে ভাল হবে না।'

টাকা খরচ করতে যখন দ্বিধা নেই, এ কাজ তো মার্সেনারি দিয়েও করানো যেত, ভাবছে রানা। লণ্ডন বা প্যারিসের বিশেষ বিশেষ কিছু স্পটে ঢুঁ মারলেই গণ্ডা-গণ্ডা মার্সেনারি গ্রুপ পাওয়া যাবে, যারা এ ধরনের কাজ করার জন্য হাঁ করে বসে আছে। এরাও নিশ্চয়ই সে কথা জানে।

তারপরও রানাকেই কেন? ওকে নিয়ে এই টানাটানির অর্থ কী? ওর পিছনে

এত পরিশ্রমই বা করতে গেল কেন?

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা থাকল হ্যারিস। নানান বিষয়ে পরামর্শ দিল ওকে। লোকটা যাওয়ার ঠিক এক ঘণ্টা পর সেল ফোনটা বেজে উঠতে কল রিসিভ করল রানা। 'বলো।'

'লোকটা অসম্ভব চতুর, ভাইয়া,' একটা মেয়েকণ্ঠ বলল। 'এসেছিল কালো ক্যাবে করে। কয়টায় কে জানে। গেছে দুটো কালো ক্যাব আর দুটো বাসে করে।' লণ্ডন রানা এজেন্সির সার্ভেইলান্স টিমের প্রধান মেয়েটা, শায়লা।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'অর্থাৎ?'

'কেউ অনুসরণ করতে পারে ভয় ছিল লোকটার মনে, তাই ঘন ঘন ট্র্যান্সপোর্ট বদলেছে। আপনার ওখান থেকে গেছে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে, অথচ আমাদের চক্কর খাইয়েছে আঠারো কিলোমিটার।'

'আচ্ছা!'

'এক ক্যাবে কিছুদূর গিয়েই আরেক ক্যাবে চড়েছে। তারপর ক্যাব ছেড়ে বাস, সেটাও বদলেছে দু'বার। অসম্ভব চতুর মানুষ, ভাইয়া। দু'জনকে পিছনে লাগিয়েছিলাম। খুব ভুগিয়েছে ওদের।'

'কোথায় গেছে জানতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ। পিকাডিলি সার্কাসে। আর জি টাওয়ারে।'

'আর জি টাওয়ার?'

'ওটা এক জার্মান ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের ইনিশিয়াল, ভাইয়া। ভদ্রলোকের নাম রুডলফ গুন্থার।'

মুহূর্তের জন্য সমস্ত পেশি আড়ষ্ট হয়ে উঠল রানার। রুডলফ গুন্থার! কাউণ্ট কিসলারের মামা, নাৎসী যুদ্ধাপরাধী হেইনরিখ শোয়ার্য ওরফে রুডলফ গুন্থার!

'বুঝতে পেরেছি,' চেপে রাখা দম ছাড়ল ও। 'আর এই লোকটা কে ছিল?'

'এর নাম পিটার মার্টিন। রুডলফ গুন্থারের হাই অফিশিয়াল।'

পিটার মার্টিন! ওয়াল্টার হ্যারিস নয়? 'ঠিক আছে, শায়লা। অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে।'

'এনি টাইম, ভাইয়া।'

শূন্য দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। এতদিন মনে মনে অনেকের কথাই ভেবেছে ও। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছিল কবির চৌধুরীর কথা।

কিন্তু... শেষ পর্যন্ত... গুন্থার? তাই তো বলি, ভাবল ও। এই জন্যই সেদিনকার সেই মেকশিফট ক্লিনিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে জায়গাটা চেনা চেনা লাগছিল ওর। ওটা তা হলে গারমিশখের সেই ওবেরমিটেন দুর্গ ছিল!

মনটা চট্ করে অতীতে চলে গেল রানার।

কয়েক বছর আগে ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী, শংকরলালের মেয়ে শিখা শংকরকে কেন্দ্র করে তার সঙ্গে টক্কর লেগেছিল রানার। শংকরলালজির জনপ্রিয়তা ছিল অসম্ভব। তাই তিনি জয়ী হবেনই, এমনটা ধরে নিয়ে তাঁর পিছনে প্রচুর টাকা ঢেলেছিল জার্মান টাইকুন গুন্থার।

কথা ছিল, প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাকে নানান কণ্ট্রাক্ট পাইয়ে দেবেন শংকরলাল

যাতে তাঁর পিছনে লোকটার লগ্নি করা টাকার বহুগুণ উঠে আসে।

কিন্তু শংকরলালের পরিবারে ছিল অশান্তি। একমাত্র মেয়ে শিখা ছিল বাবার চরম অবাধ্য। তাঁর জয় ঠেকাতে সে খুব নোংরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছিল। সে সফল হলে শংকরলালজি কেবল পরাজিতই হতেন না, আত্মহত্যাও করতে হতো তাঁকে। এ অবস্থায় নিরুপায় গুন্থার নিজের পুঁজি রক্ষা করতে শিখাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রানার কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় সে।

আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা! ভাবল ও। সেই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে এই আয়োজন!

ঠিক আছে, গুন্থার। মনে মনে বলল ও। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম।

হাসি ফুটল রানার মুখে। ভয়াবহরকম শীতল, নির্দয় হাসি। অতি বড় সাহসীর বুকেও কাঁপন ধরিয়ে দেবে ওই হাসি।

ছয়

সকাল হয়েছে। আলো হয়ে উঠেছে আফ্রিকার আকাশ। পশ্চিম ও দক্ষিণের শুকনো, খাঁ খাঁ মরু অঞ্চলের ওপর ধুলোর মেঘ উড়তে শুরু করেছে গরম বাতাসে ভর করে।

প্রেসিডেনশিয়াল প্রাসাদের অফিসের জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে রিপাবলিক অভ জাংগারোর লাইফ প্রেসিডেন্ট, ফিল্ড মার্শাল উম *থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবা। *উম থাকাতি* অর্থ বিচক্ষণ ও সুবিবেচক। এটা তার একেবারে নতুন উপাধি। গোত্রের পুরোহিত ও বিজ্ঞ বয়স্কজনদের দেয়া।

আজ ভোরে বিছানা ছেড়েই সবার আগে কিছু ডেথ ওয়ারেন্টে স্বাক্ষর করতে হয়েছে কিমবাকে। বাকি কাজ সারবে তার বিশেষ কায়া ব্রিগেডের জওয়ানরা।

একটু পর গোলাগুলির শব্দে ভেঙে খান খান হয়ে গেল সকালের নীরবতা। কিছু পাখি বসা ছিল প্রাসাদের দেয়ালে, চমকে উঠে যে যেদিকে পারে ছুট লাগাল সেগুলো। পিছনদিকের উঠান থেকে আসছে গুলির আওয়াজ। প্রতিটা বিস্ফোরণের শব্দ উঁচু দেয়ালে বাড়ি খেয়ে বারেবারে প্রতিধ্বনিত হয়ে আসলের চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ করে তুলছে আওয়াজটাকে।

আফসোস! মাথা নেড়ে ভাবল কিমবা। দেবতাদের প্রিয়পাত্রের মর্যাদা লাভ করার সৌভাগ্য সবার হয় না। দেবতারা যাকে পছন্দ করবেন, একমাত্র সে-ই হতে পারে চুজেন ওয়ান। কিমবা সেরকমই একজন। তার পিছনে লাগতে যাওয়া যে কতবড় পাপ, তা সবাইকে বুঝতে হবে।

এই সরল-সোজা কথাটা যারা বুঝবে না, তাদের পরিণতি হবে বাইরের ওদের মত। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া বাইশজন ইরুবা আর টিভ নারী-পুরুষের মত—বেঘোরে মৃত্যু। এতে কিমবার কোনও হাত নেই। সবই দেবতাদের

ইচ্ছা।

কিমবার বাপ মরেছে অনেক আগে। উন্মত্ত বুনো হাতির পায়ের নীচে পড়ে। তার বয়স তখন বারো কি তেরো হবে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে সে ছিল বড়। তখন গ্রামে ক্রাল-এ বাস করত তারা। বন সাফ করে খানিকটা জায়গা ঘেরাও দিয়ে তৈরি আদিবাসীদের লোকালয়কে ক্রাল বলে আফ্রিকায়। অনেকটা খোঁয়াড়ের মত। একেকটা ক্রালে দশ-বিশটা বা আরও বেশি পরিবার বাস করে। ছনের ছাউনিওয়ালা কবুতরের খোপের মত ছোটো ছোটো ঘরে।

তেরো-চোদ্দো বছর বয়সেই কিমবা প্রমাণ করে দেয় তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। একদিন দুনিয়াজোড়া নাম করবে সে। কিশোর বয়সেই প্রচণ্ড দুঃসাহসী ছিল কিমবা। সব ধরনের প্রচলিত অস্ত্র; তীর-ধনুক আর বর্শা নিক্ষেপ, অ্যাসেগাই ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ওই বয়সেই সঙ্গী-সাথীদের বহু মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছিল।

চোদ্দো বছর বয়সে জীবনের প্রথম হিংস্র পশু শিকার করে সে। তারপর লেপার্ড ও সিংহ। কিমবার শরীরে আজও লেপার্ডের থাবার দাগ জ্বলজ্বল করে। এখন কিমবা জানে তার ভেতরে যে সমস্ত দেবতা বাস করে, তারাই ওই বয়সে সিংহ আর লেপার্ড হত্যা করার শক্তি জুগিয়েছিল তাকে। নইলে তার সমবয়সীদের মধ্যে দূরের কথা, তার চেয়ে অনেক বয়স্কদের মধ্যেও এরকম রেকর্ডওয়ালা কাউকে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

মৃত সিংহের গায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত কিমবা, হাতে তার প্রিয় বর্শা, কোমরে গোঁজা অ্যাসেগাই, আশপাশের পাঁচ-দশ ক্রালের নারী-পুরুষ, শিশু হাঁ করে তাকে দেখছে, সে স্মৃতি কখনও ভুলবে না সে। সে ঘটনা আজও অনুপ্রেরণা জোগায় তাকে।

কিমবার গোত্রের নিয়ম অনুযায়ী ছেলেরা সাবালক হয় ষোলো বছরে। ওই সময় ছেলের মা-বাবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, ক্রালের সবাই মিলে আনন্দ ফুর্তি করে। রাতভর মদ খায়। কিমবার বেলায় সময়টা আসার আগেই অন্য এক ঘটনা ঘটে যায়। তার দেহে একটা বিশেষ চিহ্ন ছিল, যা আগে কেউই খেয়াল করেনি। সবার আগে গ্রামের পুরোহিতের চোখ পড়ে সেটার ওপর। সে দেখায় কিমবার মা-কে।

ওটা ছিল তার জন্ম দাগ। সে যে একদিন এ দেশের শাসক হওয়ার নিয়তি নিয়ে জন্মেছে, তার নিশানা।

এরপর তার মা বেশ ঘটা করেই ছেলের সাবালকত্বের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। বাবা ছিল না, তাই মা একাই সব দায়িত্ব পালন করে। অনুষ্ঠানে নানান আচার-উপাচারের মধ্যে দিয়ে পুরোহিত ঘোষণা করে, কিমবার একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে জন্য দেবতারা তাকে পছন্দ করেছেন।

তারপর তাকে ক্রালের উঠানে ফেলে তিন দিন ধরে সরু কঞ্চি, ঈগলের পালকের ঝাড়ু, মড়ার খুলি এবং হাড় ইত্যাদি দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছে পুরোহিত। ঝাড়ফুঁক নামেই, আসলে করেছে মারধর। শনি ছাড়াতে। কী সব অশুভ শক্তি নাকি ভর করে ছিল কিমবার কাঁধে, সেগুলোকে তাড়াতে। তারপর ছুরি দিয়ে

তার মুখের চামড়া কাটাকুটি করেছে, মুখে আর বুকে চুন দিয়ে কী সব আঁকিবুঁকি করেছে। সবার শেষে তার গলায় একটা কড়ির মাদুলি ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অনুষ্ঠান শেষে কিমবার মনে হয়েছিল তার ভেতরে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করেছে। সেই থেকে সে অনেক কিছুই দেখতে পায় যা অন্যরা দেখে না। অনেক কিছুই বুঝতে পারে যা অন্যরা বোঝে না। এরপর দিনে দিনে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসতে থাকে। নিজেকে অনেক বিজ্ঞ ভাবতে থাকে সে।

কিমবা কয়েকবারই দেখেছে, সে কারও ওপর বেশি রেগে গেলে দেবতারা তাকে জুজু দেয়। অমনি সে চোখের সামনে কাটা মাছের মত তড়পাতে তড়পাতে অথবা মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যায়। অদৃশ্যমান অতিপ্রাকৃতদের ক্ষমতা কত অপরিসীম, জানে সে। তার ভেতরেই বাস করে তারা। তারাই তাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। তারাই তাকে বলে দেয় কারা তার শত্রু।

মাঝেমধ্যে গভীর রাতে আসে তারা। কিমবা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন। তাদের নির্দেশ মেনে না চললে কী পরিণতি হবে, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে তাকে। কাঁটা দেয়া কিছু নমুনাও দেখায় তাকে স্বপ্নে। অমনি ঘুম ভেঙে যায়। বাকি রাত বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে ভীত-সন্ত্রস্ত কিমবা।

তাই তাদের নির্দেশ মেনে চলে সে। তারা যা করতে বলে, তাই করে। তাতে যদি সাধারণ মানুষের কষ্ট হয়, কিমবার কিছু করার নেই। সবই তাদের মর্জি। দেবতাদের মনরক্ষা করে চললে তার ফলও হাতেনাতে পেয়ে যায় কিমবা। মনটা এক ধরনের প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। তখন সে আরও নিশ্চিত হয় যে দেবতারাই ঠিক। তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় কারও।

নীচে থেকে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ আসতে বোঝা গেল ফায়ারিং স্কোয়াড দ্বিতীয় দফা অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তার প্রিয় কায়া স্কোয়াড। একটা কমাণ্ড শোনা গেল, পরক্ষণে আরেক পশলা গুলি। কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর নিয়মিত বিরতি দিয়ে টাশশ! টাশশ! টাশশ! টাশশ!

এটা স্কোয়াড অফিসার ইন চার্জের কাজ। একাধিক গুলি খেয়ে মাটিতে পড়েও দেখা যায় অনেকে বেঁচে থাকে, মরে না। সেইসব মৃত্যুপথযাত্রীদের মাথার পিছনে একটা করে পিস্তলের গুলি ঢুকিয়ে দিতে হয় তাকে। তাদের নরকে যাওয়ার গতি দ্রুততর করতে। ফায়ারিং স্কোয়াডের অবশ্য পালনীয় নিয়ম।

দেবতাকুল ও তাদের একনিষ্ঠ সেবকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উপযুক্ত শাস্তিই পেয়েছে লোকগুলো, ভাবল *উম থাকাতি* কিমবা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ শেষ গুলিটার শব্দ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র তার দেহের ভিতর প্রস্রবণের মত একটা উষ্ণ ধারা বয়ে গেছে। পরম সন্তুষ্টির ধারা ছিল ওটা। পুলকিত হলো সে, শিউরে উঠল।

নড়ে উঠল অস্বাভাবিক প্রশস্ত কাঠামোটা। জানালার কাছ থেকে সরে এল সে। হাতে নকশা করা আবলুশ কাঠের বিশাল ডেস্কের পিছনে পুরু গদি মোড়া চেয়ারটায় বসল। জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে। জাংগারোর উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ে যে সমস্ত গরিলা থাকে, সেগুলোর সঙ্গে বিস্ময়কর মিল

আছে দুশো আশি পাউণ্ড ওজনের কিমবার।

হাত দু'টো ওদেরই মত, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। চওড়া কবজিতে প্রচণ্ড শক্তি ধরে সে। চওড়া, ঢালু কাঁধ। দুই বাহু কলাগাছের কাণ্ডের মত মোটা। বেশি রেগে গেলে শুধু হাতেই শত্রুর হাত গোড়া থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে কিমবা। দু'হাতে চাপ দিয়ে মাথার খুলি ভেঙে বসিয়ে দিতে পারে ভেতরে। এরকম রেকর্ড অনেকবার করেছে সে জীবনে।

তার মুখের চামড়ায় অজস্র কাটাচেরার দাগ। ট্রাইবাল স্কার বলে ওগুলোকে। দেশী রেওয়াজ অনুযায়ী বছরে কম করেও ডজনখানেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে হয় তাকে। সেটা সে ক্ষমতায় আসার আগেও ছিল, এখন তো আরও। সেসব অনুষ্ঠানে দেবতাদের একমাত্র পছন্দের ব্যক্তি বলে পুরোহিতরা ছুরি আগুনে পুড়িয়ে তার মুখে কাটাচেরা করে।

চুজেন ওয়ানদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাবালকত্বপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান থেকে শুরু হয়েছে এই কাটাচেরা। চলবে আমরণ।

আট মাসের বেশি হলো ক্ষমতায় বসেছে সে। এরমধ্যে ত্রিশ হাজারের মত ইরুবা ও টিভ হত্যা করতে হয়েছে। কায়াও ছিল কিছু তার মধ্যে। কাজটা অপ্রিয় সন্দেহ নেই, কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। দেবতাদের ইচ্ছা! ওরা তার শত্রু ছিল। যত শত্রু মরেছে, ততই কিমবা আরও বেশি নিরাপদ হয়েছে।

বাইরের পৃথিবী তাকে পাগল বলে, ডার্ক গডসদের অনুসারী বলে। দেশের ভেতরের ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে পাগল প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে আছে। কিছুই তার অজানা নেই। কিন্তু তারপরও সে অজেয়। আজও ক্ষমতায় বহাল আছে। এর আসল কারণ তার মধ্যে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে আগাম খবর পাওয়ার একটা অপার্থিব ক্ষমতা আছে। তার উপর দেবতাদের সহায়তা তো আছেই। অতএব কার সাধ্য আছে তাকে হটায়?

ক্ষমতায় বসেই কিমবা প্রথম যে কাজটা করে, তা হলো সাদা, মিশ্র রক্ত, বাদামী, পিঙ্গল, সবাইকে দেশ থেকে বের করে দেয়া। কালো আফ্রিকানদের বাদে অবশ্য। আগেরগুলো হচ্ছে আপদ। ওরা তার দেশে ব্যবসা করে খাবে কেন? তার নিজের লোকেরা আছে না? তারা বসে বসে আঙুল চুষবে? পরে অবশ্য কিছুটা ছাড় দিতে হয়েছে তাকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে।

জাতিসংঘ বিপুল পরিমাণে অর্থ সাহায্য দেয় জাংগারোকে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি দেয়। কাজেই তাদের চাপে কিছুটা ছাড় দিতেই হয়েছে। তবে বিদেশিদের উপস্থিতি সীমিত করে দিয়েছে সে। তাদের কাজকর্মের পরিধিও সীমিত করে দিয়েছে।

কখনও কখনও বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। তা ছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাকেও তো পুব বা পশ্চিমের ওপর নির্ভর করতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আধুনিক অস্ত্রপাতি। ওই জিনিস না হলে চলে না।

নইলে অনেক আগেই সবক'টাকে লাইনে দাঁড় করিয়ে অ্যাসেগাই দিয়ে কুপিয়ে কিমা বানাত সে।

কিমবার বিচারে সাদারা বেশি বিপজ্জনক। কারণ ওরা বেশি লেখাপড়া

জানা। ওদেরকে সে পছন্দ করে না। বিশ্বাসও করে না। কারণ ওরা সব সময় গোলমাল পাকিয়ে বেড়ায়। বিশেষ করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। ওরা সব সময় চেষ্টা করে মানুষকে তার বাপ-দাদার শিক্ষা ভুলিয়ে দিতে। যেখানেই যায়, সেখানেই স্থানীয়দের লিখতে-পড়তে শেখায় ব্যাটারা। যে কারণে তাদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব, পরিপার্শ্বিকতা ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে চরম অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়।

এদের কারণেই ক্লারেন্সের কিছু স্কুল-কলেজে হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছিল সে ক্ষমতা গ্রহণের পরপর। ছাত্রদের উৎসাহ জুগিয়েছিল তারা। তবে ভাগ্য ভাল যে ইওরোপিয়ান সিনেমায় কিমবা আগেই দেখেছে তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য দেশে দেশে কী পরিমাণ ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাই ও কাজটি এ দেশে যাতে ঘটতে না পারে, তার ব্যবস্থা আগেই নিয়েছে সে। বন্ধ করে দিয়েছে সব।

তারপর প্রতি তিনজন কলেজ গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে খতম করেছে নানান অভিযোগে। মিশনারিদের যেখানে পেয়েছে সেখানেই পিটিয়েছে তার লোকেরা। এখনও পেটায়। অবশ্য জাতিসংঘ পরিচালিত হাসপাতাল ও গির্জার মিশনারিদের কথা বাদ। ওরা কেবল মিশনারিই নয়, ডাক্তারও।

তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না কিমবা। ডাক্তার ছাড়া সমাজ সুস্থ থাকতে পারে না বলে ওদের সাত খুন মাফ তার কাছে। তা ছাড়া জাতিসংঘ যে বিপুল পরিমাণ সাহায্য দেয়, তা বিক্রি করে ভাল আয়ও হয় তার। তাই সে সংস্থাটিকে খেপাতে চায় না।

রাশা ছাড়া আর কোনও দেশের সাথে জাংগারোর সম্পর্ক নেই বলতে গেলে। তা-ও চলনসই সম্পর্ক। নিজের ক্ষমতা সংহত করতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, কায়াদের আধুনিক সামরিক ট্রেনিং, অনুগতদের 'টু পাইস' ধান্ধা করার জন্য বিভিন্ন প্রজেক্টের অনুকূলে অনুদান ইত্যাদির প্রয়োজন আছে কিমবার। সেই কাজ হয় ওদের দিয়ে। তাই রাশাকে কিছুটা খাতির করে সে।

অতীতে দেশের কোনও এক মস্কোপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিল কিমবা, কাজেই তাকে ক্ষমতায় বসানো গেলে সুবিধা হবে ভেবে না চাইতেই মস্কো তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে এ ব্যাপারে।

প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 'শুভেচ্ছা উপহার' দিয়েছে তাকে। তাদের বিশেষজ্ঞরা কিমবার কায়া ব্রিগেডের বাছাই করা চারশ' সদস্যের একটা অংশকে সেধে মস্কোয় নিয়ে আধুনিক যুদ্ধ কৌশল শেখাচ্ছে এখন। কোর্স শেষ করে তিন থেকে চার মাস পর দেশে ফিরবে তারা। এছাড়া জাংগারোর নানান প্রকল্পের জন্য প্রচুর টাকাও দিচ্ছে মস্কো, যার বেশিরভাগই ঘুরপথে কিমবার বিদেশী অ্যাকাউন্টে গিয়ে জমা হয়।

কিন্তু তাই বলে ওদের লাগাম একেবারে ছেড়ে দেয়নি সে। কারণ ওরা কোন ধাতুর, কিমবা তা ভালই জানে। চামড়া সাদা ওদের, কাজেই জাত বেঈমান ওরা। গাছেরটা খায়, তলেরটাও কুড়ায়। তার দেয়া সুবিধা ভোগ করেছে, আবার তলে তলে কিমবা বিরোধী একটা রাজনৈতিক দল গঠন করার জন্য কলকাঠিও নাড়ছে—পাকা খবর আছে তার কাছে। তাকে চাপের মুখে

রাখতে এ কাজ করছে ব্যাটারা, বোঝে সে। ঘুরে-ফিরে সেই বেঈমানিই তো হলো!

ওদের যেমন চোখ উল্টে নেয়ার অভ্যাস আছে, কিমবারও তেমনি আছে। কিমবা দেখাবে ওস্তাদের মার কাকে বলে। তার স্পেশাল কায়া বাহিনী মস্কো থেকে ফিরলে বিশ্বাসঘাতকদের পিছনে লেলিয়ে দেবে সে। কোনও বিচার নেই, শুনানি নেই, কিচ্ছু নেই। কথিত বিরোধীদের একটা একটা করে ধরা হবে আর সিটি স্কয়ারে ফেলে কচুকাটা করা হবে। তাদেরকে সাইজ করে রাশান দূতাবাসের যে সমস্ত শয়তানের অগ্রণী ভূমিকা ছিল এর পিছনে, সেগুলোকেও ধরা হবে।

কায়া ব্রিগেডের কথা মনে পড়তে কিমবার মনটা খুশি হয়ে উঠল। কয়েক মাস আগে গঠন করা হয়েছে এই বাহিনী। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য। এই বাহিনী দেশে ফিরে এলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে তার কায়া ব্রিগেড। গর্ব করার মত একটা কাজ হবে।

কিমবাকে ক্ষমতায় বসতে সহায়তা করেছে বলে রাশা ধরেই নিয়েছিল এ দেশে যা খুশি করার অধিকার জন্মে গেছে তার। তাই নিজেদের দূতাবাসের লোকসংখ্যা ইচ্ছেমত বাড়িয়ে নিয়েছে সে। ব্যাপারটা ভালভাবে নেয়নি কিমবা।

তাই আমেরিকান দূতাবাসকেও নিজেদের লোকসংখ্যা বাড়াবার অনুমতি দিয়েছে সে কিছুদিন আগে। ওই পক্ষ থেকেও কিছু কিছু অস্ত্র, প্রযুক্তি কবজা করতে হবে তাকে। শত হলেও, আমেরিকান প্রযুক্তিই বিশ্বের সেরা।

কিমবা নিজেকে রংকানা ভাবতে ভালবাসে। তা প্রমাণ করতে ক্ষমতায় বসেই আমেরিকান দূতাবাসের পরামর্শদাতাদের সঙ্গে ত্রিশজনের মত নিগ্রো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। কারণ সত্যিকারের আফ্রিকান ছিল না তারা। ছিল ক্রীতদাসদের বংশধর। যত বিপত্তির মূল।

অবশ্য তাদের মধ্য থেকে তিনজনকে দেশে ফিরে যেতে দেয়নি কিমবা, শেষ মুহূর্তে আটকে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নিজের হাতে হত্যা করেছে। আশ্চর্যের কথা যে ওদের দেশের স্টেট ডিপার্টমেন্ট তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেনি। জাংগারো দাবি করেছে, তাদের কাছে মাদক পাওয়া গেছে। ব্যস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এক কথায় মেনে নিয়েছে।

সবকিছু মিলিয়ে জাংগারোর লাইফ প্রেসিডেন্ট, উমু *থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবার ভালই চলছে বলতে হবে। যদিও একটা গুরুতর বিপদ এখনও রয়েই গেছে। সেটা হলো বিতাড়িত প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিমের দল, ন্যাশনাল ফ্রন্ট অভ জাংগারো তার নিয়ন্ত্রণে নেই।

ইরুবাদের তাড়া খেয়ে ইব্রাহিম আগেই পালিয়েছে। তার গুরুত্বপূর্ণ সহকর্মীরাও কেউ নেই। দেশের বাইরে থেকে কিমবার বিরুদ্ধে নানামুখী প্রচারণা চালাচ্ছে তারা। প্রতিবেশী এক দেশ তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছে, টাকাকড়ি দিয়ে সহায়তা করছে। স্থানীয় বিদেশী দূতাবাসগুলোতে এ নিয়ে আলোচনা হয়।

সেটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জানে ন্যাশনাল ফ্রন্ট অভ জাংগারো নির্বাচনে জয়ী হয়ে দেশের প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করেছিল।

কিন্তু তাদেরকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়া হয়েছে। সেজন্য কিমবা যদিও দায়ী নয়, তবু এটাও একটা সমস্যা। অবশ্য তা নিয়ে বেশি মাথা ঘামায় না সে। আরেক দেশে বসে ওরা যত খুশি লাফাক, কিছু হবে না।

একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করা গেছে, এই খুশিতে দিনটা মোটামুটি ভালই কাটল কিমবার। রাত নামতেই সদলবলে ক্রালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। অমাবশ্যার নিয়মিত 'উৎসর্গ' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছে। দল বলতে তার নিজ গোত্রের অতি বিশ্বস্ত দু'জন হাই অফিশিয়াল। আর পনেরজন তরুণ কায়া।

প্রথম দলের সদস্যদেরকে সে ক্রাল থেকে এনে ক্ষমতায় বসিয়েছে, ক্রমে শীর্ষে তুলে এনেছে। তাদের নিয়তি কিমবার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে। তার যে পরিণতি হবে, তাদেরও তাই হবে। এ কথা তারাও জানে। প্রয়োজনে কিমবার জন্য শত্রুর বন্দুকের সামনে নির্দ্বিধায় বুক পেতে দেবে এইসব লোক।

নিজের হাতে বুক চিরে কলজেটা বের করে তার পায়ে অর্পণ করবে। এর কারণ তারা অন্তরের অন্তস্তল থেকে জানে *উম থাকাতি* কিমবা তাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। সে আর কিছু।

অপরাধীদের হত্যার পর সে যে সমস্ত আচার ইত্যাদি পালন করে, দেখা তো দূরের কথা, সেসবের কথা তাদের বাপ-দাদারা পর্যন্ত কখনও শোনেনি। সবই অশ্রুতপূর্ব, বিশেষ কাজ। কাজেই কিমবাকে বিশেষ না ভেবে উপায় কী?

তখন কিমবার কাছে থাকতে হয়। সাজাপ্রাপ্তদের কলিজা, গুর্দা আর মগজ তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেতে হয়। তাতে নাকি মৃতের জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি নিজের মধ্যে চলে আসে। এইসব অফিসারদের সবাই গ্রাম থেকে আসা। দুনিয়ার হালচাল বোঝে কম। *উম থাকাতি* যা বলে, চোখ-কান বুজে তাই পালন করে যায়। পরের দলটা হচ্ছে কিমবার 'উৎসবের' অংশীদার।

কিমবার ক্রালে যাওয়ার খবর শুনেই প্রোটোকল অফিসারের লাফঝাঁপ শুরু হয়ে গেল। আধঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল চারটে ল্যাণ্ড রোভার জিপ। তারপর ডজনখানেক বডিগার্ড, পনেরজন তরুণ কায়া, প্রেসিডেন্টের একান্ত বিশ্বস্ত দু'জন হাই অফিশিয়াল এবং প্রোটোকল অফিসারসহ ক্রালের পথে রওনা হয়ে গেল প্রেসিডেনশিয়াল মোটরকেড।

নিতান্ত সাধারণ পোশাকে বেরিয়েছে কিমবা। তার উপর রাত হয়ে গেছে। কাজেই কেউ কিছু টের পেল না। ক্লারেন্স শহরের কোলাহল ছেড়ে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগল দলটা। সারারাত একনাগাড়ে ছোটার পর চিরচেনা ক্রাল এবং নিজ গোত্রের মাঝে পৌঁছল সে। দূষণমুক্ত, নির্মল প্রকৃতির কোলে।

একটা উপত্যকায় ঢোকার মুখে জিপ দাঁড় করাল ড্রাইভার। আরেকটু সামনে গেলেই তার ক্রাল। গাড়ির শব্দে তার ভাই-বোন এবং তাদের দুই কুড়ি ছেলে-মেয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরল কিমবাকে। মা নেই। মরে গেছে। সে থাকলে নিশ্চয়ই খুশি হতো ছেলেকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতার শীর্ষে দেখে, ভাবল সে। নিশ্চয়ই গর্ব হতো তার। মায়ের অভাব আজও অনুভব করে সে।

কুশল বিনিময় সেরে গোত্রের তিনজন পুরোহিতের দিকে ফিরল কিমবা। ধর্মীয় আচার পরিচালনা করবে তারা। তাদের সামনে গিয়ে বাধ্য ছেলের মত

নতমুখে দাঁড়াল সে। পুরোহিতরা আশীর্বাদ করল। এক এক করে তার পরনের সমস্ত পশ্চিমা পোশাক খুলে নিয়ে তাকে কলুষমুক্ত করল। গুপ্ত অঙ্গ আড়াল করতে গাছের পাতার তৈরি পর্দা ঝুলিয়ে দিল কোমরে।

এরপর পুরোপুরি দূষণমুক্ত করার জন্য পবিত্র তেল মালিশ করা হলো সারা শরীরে। তার উপরে মাখা হলো ছাই। ব্যস, সম্পূর্ণ জাগতিক ছোঁয়া মুক্ত হয়ে গেল কিমবা। জন্মের সময় যেমন পুত-পবিত্র, নিষ্পাপ ছিল, তেমনি হয়ে গেল।

এবার কিমবার একান্ত ভক্ত-অনুসারীর দল এসে একে একে তার সামনে মাটিতে মুখ গুঁজে শুলো। কাছে গিয়ে সবার মাথায় ডান পা রেখে তাদের আশীর্বাদ করল সে। এরপর হাঁটুতে ভর করে উঠে বসল তারা। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে কোমরে গোঁজা অ্যাসেগাই বের করে সামনে বাড়িয়ে ধরল। এটা করা হয় তারা *উম থাকাতি* কিমবার ইচ্ছায় বাঁচে-মরে বোঝাতে।

মাঝে-মধ্যে তাদের মনোবাসনা পূরণ করে কিমবা। অ্যাসেগাইয়ের তীক্ষ্ণধার ব্লেডের এক ঝটকায় কারও কারও উন্মুক্ত গলা স্রেফ দু' ফাঁক করে দেয়। টুঁ শব্দটিও করে না কেউ। করার কথাও না। কারণ *উম থাকাতি* কিমবার হাতে মরার সৌভাগ্য সবার হয় না। যার হয়, বিনা ওজরে তাকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়ে আসেন দেবতারা। তো করবে কেন?

অনুষ্ঠান চলার সময় ভ্যালির প্রবেশ পথ কিমবার লোকেরা পাহারা দিয়ে রাখে। তখন বাইরের কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না ভেতরে। কাউকেই না। যদি কেউ সে চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে, তা হলে তার পরিণতি হয় একটাই—মৃত্যু। এই এলাকার আশপাশে যতো পাহাড়ি উপজাতি আছে, তারা এই বিশেষ সময়গুলোতে তল্লাট থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকে।

যাত্রা করার আগে কিমবার দেহের এখানে-সেখানে সাদা রং দিয়ে বিদঘুটে সব আধ্যাত্মিক চক্র, বৃত্ত ইত্যাদি আঁকা হলো। নদীর লাল কাদা দিয়ে পুরু করে লেপে দেয়া হলো মাথা, খুলির সঙ্গে সমান হয়ে গেল চুল। আছে কি নেই, বোঝা যায় না। তার মধ্যে গুঁজে দেয়া হলো উট এবং অন্য এক পাখির পালক। পরেরগুলোর রং টকটকে লাল আর চোখ ঝলসানো নীল। এই পাখির ডাক এমন, শুনলে মনে হয় কোনও মেয়ে প্রসব বেদনায় চিৎকার করছে।

বনের অনেক গভীরে, মেঘের রাজ্যে মাথা লুকিয়ে রাখা পর্বতমালা যেখানে প্রায় খাড়াভাবে মাটিতে এসে ঠেকেছে, সেখানে অনেক পুরনো একটা ট্রেইল আছে। সেটায় এসে উঠল বিশালদেহী কিমবা। ধীর, প্রবল আত্মবিশ্বাসী পায়ে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

ঘাম আর তেলে ভেজা প্রায় উলঙ্গ মানুষটা হাঁটলেও মাটিতে পা পড়ছে বলে মনে হয় না। একটুও দুলছে না সে, ঝাঁকি খাচ্ছে না। যেন বাতাসে ভেসে ভেসে চলছে। কিছুদূর যেতে ছাই গলে গলে পড়তে শুরু করল ঘামের সঙ্গে। আধ্যাত্মিক চক্র আর বৃত্তের রংও গলতে শুরু করেছে।

কিমবার পিছন পিছন পরম ভক্তি আর ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে চলেছে সঙ্গে আসা পনেরোজন কায়া তরুণ। এরা আজকের 'বর'। তাদের চেহারা রং-চং মাখার ফলে কম-বেশি কিমবার মতই কিম্ভূত হয়েছে। ক্রালের তিনজন

পুরোহিত আছে তাদের সঙ্গে। 'বিয়ে' পরিচালনা করবে।

কিমবা আর তাদের মাঝখানে রয়েছে পাঁচটি মেয়ে। ওরা 'কনে'। বারো-তেরোর বেশি হবে না কারও বয়স। সবে নারীত্বের লক্ষণ ফুটতে শুরু করেছে দেহে। পাতার আচ্ছাদন দিয়ে বুক আর নিম্নাঙ্গ ঢাকা। কাঁধ, পিঠ আর কচি পুঁই ডাটার মত সরু সরু বাহু উন্মুক্ত। তাদের বাপ-মাকে আগেই 'কনের মূল্য' নগদ টাকায় পরিশোধ করে দিয়েছে কিমবার লোকেরা।

মেয়ের পরিণতি, উৎসর্গ, এসব নিয়ে মা-বাবাদের মাথাব্যথা নেই। কিমবা ওদেরকে বেছে নিয়ে যে অপরিসীম দয়া দেখিয়েছে, তাতেই তারা পরম কৃতজ্ঞ। চিরঋণী হয়ে গেছে।

মেয়েগুলোর চেহারায় মিশ্র অভিব্যক্তি খেলা করছে। কিছুটা টক-ঝাল মেশানো ভয়, জীবনের অজানা অধ্যায়ের স্বরূপ জানার সহজাত আকাঙ্ক্ষা, দুটোই আছে সেখানে। হাঁটার ফাঁকে সুযোগ পেলেই চট্ করে পিছনে তাকিয়ে নিচ্ছে ওরা। কোনটা তার 'বর' হবে, বোঝার চেষ্টা করছে।

আজ কনের তুলনায় 'বর' বেশি হয়ে গেছে। কাজেই সবার ভাগ্যে কনে জুটবে না। যাদের জুটবে না, তাদের কী হবে ওরা জানে না। হয়তো আগামীবার তাদের বিয়ে হবে। কিমবা আর পুরোহিতরা মিলে ঠিক করবে তা। মনে হয়। হতভাগ্য মেয়েগুলো জানে না, বরের সংখ্যা প্রতিবারই বেশি থাকে।

নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কের ব্যাপারটা বুঝতে পারে ওরা। প্রকৃতিই এসব প্রয়োজনীয় শিক্ষা যথাসময়ে দিয়ে থাকে তাদেরকে। 'বিয়ে' অর্থ কী, তা-ও মোটামুটি জানে। কিন্তু উৎসর্গ কাকে বলে জানে না। এটাও বোঝে না বিয়ে দিতে তাদেরকে নিজের ক্রাল, মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন সবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কেন।

কায়া যোদ্ধাদের সবার কাঁধে একটা করে ছোটো পোঁটলা ঝুলছে। ওতে যা আছে, পরে কাজে লাগবে সেসব। ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশায় ঢাকা গাছ-গাছালির মধ্য দিয়ে নীরবে এগিয়ে চলল দলটা। বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর দাঁড়িয়ে পড়ল কিমবা। মুখ তুলে তাকাল। কাছেই কোথাও জোরালো শব্দে পানি পড়ছে। বড় কোনও জলপ্রপাত হবে হয়তো।

মাথার উপর গাছের পাতার ঘন ছাউনি। ফাঁক দিয়ে হালকা ধোঁয়ার চাদর মুড়ি দেয়া পর্বতমালার চূড়ায় চোখ বোলাল সে। তার দেবতারা থাকে ওখানে। মায়ের মুখে শুনেছে কিমবা, সাবালকত্ব প্রাপ্তির দিন ক্রালের পুরোহিত ওখানকার দেবতাদের চরণেই নাকি তাকে নিবেদন করেছিল।

তবে সে জন্য যে তাকে ঠিক এই ধরনের আচার পালন করতে হবে, এমন কোনও কথা ছিল না। কিন্তু তাতেই বা কী? এখন কিমবা দেশের ক্ষমতায় আছে, নিজের চাহিদা অনুযায়ী আচার-প্রথা ইচ্ছামত বানিয়ে নিতে দোষ কোথায়? কে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে আসবে?

ধর্মের নামে যে নিজের জৈবিক খিদে মেটানোর জন্য এতসব উৎসবের প্রবর্তন করেছে সে, তা কেউ বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। মেয়েদের বাপ-মা নগদে 'কনের মূল্য' পেয়ে আর 'দেবতার ইচ্ছায়' সন্তানকে 'উৎসর্গ' করার

মাধ্যমে নিজেদের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয় বলে চুপ করে থাকে। কাজেই কিমবা নিশ্চিন্ত।

বিশাল এক জলপ্রপাতের কাছে ক্যাম্প করল দলটা। এটার শব্দই শোনা যাচ্ছিল এতক্ষণ। ব্রেথ অভ দ্য মাউন্টেন প্রপাতটার নাম। প্রতিবার উৎসর্গের সময় এখানে সঙ্গীদের নিয়ে তিনদিন উপবাস করে কিমবা। আগুন ঘিরে বসে রাত-দিন মন্ত্র উচ্চারণ এবং গান গেয়ে দেহ ও আত্মাকে 'পরিশুদ্ধ' করে।

মেয়েরা প্রপাত থেকে একটু দূরে নিজেদের থাকার জন্য পাম গাছের পাতার ছাউনি দেয়া ঘর তৈরি করে নিল। ওর মধ্যেই তিনটে দিন কাটাবে তারা। ইচ্ছে হলে একটু-আধটু ঘোরাঘুরিও করতে পারবে, কিন্তু চোখের আড়ালে যাওয়া নিষেধ আছে ওদের। সবার সামনে থাকতে হবে।

আগে থেকে খোঁড়া একটা লম্বা গর্তের মধ্যে শুকনো ডাল-পাতা ফেলে আগুন জ্বেলে দিল পুরোহিতরা। গর্তটাকে ঘিরে বসল কিমবা ও তার অনুসারীর দল। শুরু হয়ে গেল তাদের মন্ত্র উচ্চারণ এবং গান। মেয়েরা মিশ্র অনুভূতির সঙ্গে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

একটা হালকা ধোঁয়ার পর্দা সারাক্ষণ ঘিরে থাকল প্রপাতটাকে, ধ্যানমগ্ন পুরুষগুলোকে।

চতুর্থদিন ঊষা লগ্নে কিমবার 'আত্মশুদ্ধির' পালা শেষ হলো। তার ইঙ্গিতে পুরোহিত আগুনের মধ্যে বেশ কিছু শুকনো পাতা ও ঔষধি লতা ফেলে দিল। পরেরগুলো আসলে গাঁজা। তার ধোঁয়ায় লম্বা করে দম নিল সবাই যাতে তাদের বোধশক্তি বাড়ে। একটু পর মেয়ে পাঁচটাকে নিয়ে আসা হলো সেখানে।

পুরোহিত মাথা কামিয়ে দিল তাদের। তারপর গাঁজার ধোঁয়ায় জোরে জোরে দম নিতে বলল। কয়েকবার দম নিতেই চোখ জ্বলজ্বলে, লাল হয়ে উঠল মেয়েগুলোর। দর দর করে পানি গড়াতে লাগল গাল বেয়ে। এভাবে কিছুক্ষণ দম নিতেই ভয় দূর হয়ে গেল। পুরুষরা চারদিক থেকে ঘিরে বসল ওদেরকে। নাচতে শুরু করল মেয়েরা। দীর্ঘ সময় চলল নাচ। তাল-ছন্দ কিছু নেই, যার যেভাবে খুশি নাচল।

আগে কখনও এরকম নাচেনি ওরা। পুরোহিতরাও বলে দেয়নি কীভাবে নাচতে হবে। ওদের মন বলেছে এভাবে নাচতে হবে। ব্যস। এদিকে চূড়ান্ত পর্বের সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, কিমবার চকচকে দৃষ্টি আরও বেশি চকচকে হয়ে উঠতে লাগল। তার অনুসারীদেরও। পুরোহিতের হাঁকে নাচ থেমে গেল মেয়েদের। বসা থেকে উঠে এল *উম থাকাতি* কিমবা।

পর্বত চূড়ার দিকে মুখ করে কলা গাছের কাণ্ডের মত দু' হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দাঁড়াল। চোখ বুজে মন্ত্র আওড়াল কিছুক্ষণ। তারপর একটা দুর্বোধ্য হাঁক ছেড়ে হাত নামিয়ে মেয়েদের দিকে ঘুরল। ঘোলা হয়ে গেছে চাউনি।

এরপর একে একে পাঁচটা মেয়েকে ধর্ষণ করল সে। কোনও তর্জন-গর্জন বা হম্বি-তম্বি নেই। ধীর, অবিচল ভঙ্গিতে কাজটা সারল সে উচ্ছিষ্টভোগীদের সহায়তায়। এমন কায়দায়, ভাষায় যার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। পুরোহিতরা

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। লোকগুলোর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গিই বলে দেয় তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই।

কিন্তু কচি কচি মেয়েগুলোর কাছে বিষয়টা সেরকম মনে হলো না। তারা জানত *উম থাকাতি* কিমবার উপস্থিতিতে পুরোহিতরা আগে তাদের বিয়ে পড়াবে। তারপর উৎসর্গ না কী বলে, তাই করবে। এ ক্ষেত্রে ছেলেদের সংখ্যা বেশি হলে সবার বিয়ে হয় না। যারা বাড়তি থাকে, পরের অনুষ্ঠান পর্যন্ত স্থগিত থাকে তাদেরটা। পরেরবার তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

কিন্তু এ কোন ধরনের 'বিয়ে'!

মধুর কোনও স্বপ্ন আচমকা ভেঙে যাওয়ার পর বিপরীত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলে যা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা। প্রথম মেয়েটিকে নিয়ে কিমবার পৈশাচিক খেলা দেখে অন্যরা আঁতকে উঠল। আর যা-ই হোক, অন্তত এরকম 'বিয়ে'-র জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউ।

কোথায় রইল টক-ঝাল মেশানো ভয়, আর কোথায় জীবনের অজানা অধ্যায়ের স্বরূপ জানার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, সবকিছু তীব্র আতঙ্কে পরিণত হলো মুহূর্তের মধ্যে। কিমবার তাণ্ডব দেখে বিস্ময়ে, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেল তারা।

একটু পর ধাক্কাটা সামলে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল বোকার মত। তারপর হঠাৎ করেই কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে চতুর্দিকে ছোটাছুটি শুরু করল ওরা পালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ওদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল কিমবার উচ্ছিষ্ট ভোগ করতে আসা অনুসারীরা।

এক সময় 'পবিত্র আচার' শেষ হলো কিমবার। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত মাংসের পিণ্ডগুলোকে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় মোচড় খেতে দেখেও কোনও ভাবান্তর হলো না তার। কারণ সে তখন এসবের অনেক 'ঊর্ধ্বে বিচরণ' করছে। পালা করে পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, সবদিকে ঘুরল সে। জোরে জোরে দম নিল কয়েকবার। তারপর দু' হাত মাথার উপর তুলে পাহাড়ের মাথায় বসা দেবতাদের উদ্দেশে দুর্বোধ্য এক হাঁক ছাড়ল।

ওটা ছিল 'বরদের' জন্য সঙ্কেত। কায়া যোদ্ধার দল এবার একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল যন্ত্রণাকাতর মেয়েগুলোর উপর। আরও অনেকবার করে নির্দয় ধর্ষণের শিকার হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ল সবক'টা। অনেকের নড়াচড়া প্রায় থেমেই গেছে।

মহাযজ্ঞ শেষ হতে পুরোহিতদের উদ্দেশে আবার হাঁক ছাড়ল কিমবা। 'উৎসর্গ পূর্ণ করুন!'

পুরোহিতরা এগিয়ে এল এবার। কায়া বীরদের বীজ গর্ভে ধারণ করা নির্জীব রক্তমাংসের পিণ্ডগুলোকে টেনেহিঁচড়ে মাটি থেকে তুলল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল দু' দিন আগে তৈরি করে রাখা একটা ট্রেঞ্চের কিনারায়। ওটার পাশেই স্তূপ করে রাখা আছে লাল কাদার পাহাড়। গর্তের মধ্যে শুইয়ে দেয়া হলো মেয়েগুলোকে। তারপর ট্রেঞ্চের কিনারায় বসে প্রার্থনা করল যেন তাদের উৎসর্গ দেবতারা গ্রহণ করেন।

যোদ্ধারা এগিয়ে এসে ট্রেঞ্চের কিনারা ঘিরে দাঁড়াল। থকথকে লাল কাদা ঢালতে লাগল নিস্তেজ দেহগুলোর উপর। হতভাগ্য মেয়েগুলো একেবারে শেষ মুহূর্তে বুঝল কী ঘটতে যাচ্ছে। চিৎকার করতে চাইল তারা। কিন্তু এত দুর্বল যে কারও গলা দিয়ে চিৎকারও বের হলো না ঠিকমত। সরু সরু, অপুষ্ট পায়ের সাহায্যে নিজেদেরকে মরণ শয্যা থেকে ঠেলে দাঁড় করানোর মরিয়া চেষ্টা করল ওরা।

তাতেও সফল হলো না। প্রতি মুহূর্তে মাথার উপর আছড়ে পড়তে থাকা বড় বড় কাদার দলার আঘাতে সোজাই হতে পারল না কেউ। কাদার ওজনের সঙ্গে পেরে উঠল না হতভাগ্য মেয়েগুলো। ক্রমে চির অন্ধকার গ্রাস করল তাদের।

হৃষ্টচিত্তে জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়াল *উম থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবা। দীর্ঘ সময় ধরে বিদেশী সাবান ডলে ডলে গোসল করল। উৎসর্গ শেষে প্রতিবার যেমন হয়, এবারও তাই হলো।

অদ্ভুত একটা প্রশান্তি ফল্গুধারার মত বয়ে গেল তার দেহমনের উপর দিয়ে। লোকে এর ব্যাখ্যা করবে দেবতারা তার উৎসর্গ গ্রহণ করেছেন। একমাত্র কিমবা জানে ভেতরের কথাটা।

সাত

দেখতে দেখতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ হয়ে গেল। উপসাগর পিছনে ফেলে এল কনভেয়ার ৪৪০-এর পিচ্চি কানেক্টিং ফ্লাইট। অনেকখানি জায়গা নিয়ে চক্কর শেষ করল ওটা, তারপর সৈকতের বালুকাবেলায় পড়া নিজের ছায়াকে তাড়া করে ক্লারেন্স এয়ার-ফিল্ডের দিকে ছুটল।

আকাশ থেকে শহরটার ওপর চোখ বোলানোর সুযোগ পাওয়া যাবে বলে বাঁ দিকে বসেছিল রানা। সে ইচ্ছে পূরণ হলো। এক হাজার ফুট উঁচু থেকে পেনিনসুলার শেষ মাথায় গড়ে ওঠা ক্লারেন্স শহর ভালভাবেই দেখে নিল ও।

লম্বায় আট মাইলের কিছু বেশি হবে উপদ্বীপটা। এক মাথা সরু, চওড়ায় মাইলখানেক হবে। আরেক মাথা কিছুটা প্রশস্ত। মাইল তিনেকের মত। প্রশস্ত অংশের তিন দিকেই সাগর। ইংরেজি 'ইউ'-এর মত ঘিরে রেখেছে পেনিনসুলাটাকে। তার উপর আফ্রিকার সবচেয়ে ঘন গরান বনসহ অন্যান্য গাছপালার কারণে ওদিকটা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। সাগরপথে এসে ওদিক দিয়ে তীরে ওঠার কোনও সুযোগই নেই।

উপদ্বীপের সরু দিকটায় গড়ে উঠেছে ক্লারেন্স সিটি। পাকা রাস্তা বলতে যা বোঝায়, তা তিনটে কি চারটে আছে শহরে। তার মধ্যে একটা চওড়া। বাকিগুলো সরু, ভাঙাচোরা। চওড়া রাস্তাটায় দু'টো যাত্রীবোঝাই বাস দেখতে পেল রানা। একটা শহরের দিকে চলেছে। আরেকটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওই রাস্তার এক মাথা গিয়ে ঠেকেছে সৈকতে। আরেক মাথা কোথায় গেছে, কনভেয়ার ৪৪০ উচ্চতা কমিয়ে আনায় দেখার সুযোগ হলো না।

শহরের বেশিরভাগ ভাল দালান-কোঠা সৈকতের কাছাকাছি গড়ে উঠেছে। বোঝা যায় ঔপনিবেশিক প্রভুদের জন্য নির্মিত হয়েছিল ওগুলো। শানদার একেকটা বিল্ডিং, প্রতিটা এক একরের প্লটের ওপর নির্মিত। প্রত্যেকটির সীমানা দেয়ালের ভিতরে বাগান আছে। উপসাগর ছুঁয়ে আসা তপ্ত বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে বাগানের গাছ-গাছালি।

সৈকতের আশপাশের এলাকা দেখলে বোঝা যায় এদিকের মানুষজন মোটামুটি পয়সাওয়ালা। কিন্তু ভূ-ভাগের দিকে যতই বিস্তৃত হয়েছে ক্লারেন্স, দারিদ্র্যের চিহ্ন ততই প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশাল বস্তি এলাকা ওদিকে। পুরনো, ভাঙাচোরা টিনের তৈরি হাজার হাজার ঘর।

এশিয়ার সবচেয়ে বড় বস্তি, মুম্বাইয়ের ধারাবি-র আফ্রিকান সংস্করণ বোধহয় এটা, ভাবল ও। বস্তির ভিতরে ও চারদিকে শিরা-উপশিরার মতো বিছিয়ে আছে কাঁচা রাস্তা। নোংরা, আবর্জনা বোঝাই কালো পানির চওড়া ড্রেন।

শহরের ধনী অংশের ওপরই নজর বেশি সময় সেঁটে থাকল ওর। কারণ জাংগারোর সমস্ত সরকারী স্থাপনা ওই অংশেই আছে। কয়েকটা লরি, কার, মোটর সাইকেল ও ঠেলা গাড়ি চোখে পড়ল। শেষেরগুলোই বেশি আছে। কয়েকটা জনাকীর্ণ জায়গা দেখে মনে হলো ওগুলো বাজার।

শহরের মাঝখান দিয়ে কোনাকুনিভাবে চলে যাওয়া একটা নদী দেখতে পেল রানা। ওটা পারাপারের জন্য ব্রিজ আছে। কাঠের ব্রিজ।

পেনিনসুলার শেষ মাথায় আছে ক্লারেন্সের খুদে নৌ বন্দর। মেইনল্যাণ্ড থেকে স্ট্যাগ গুবরে পোকার ভেতরদিকে বাঁকানো শিং-এর মত একজোড়া সরু, নুড়ি বিছানো দীর্ঘ সৈকত চলে গেছে সাগরের এক মাইলের মত ভিতরে। দুই শিঙের মাঝখানে গড়ে উঠেছে বন্দর।

দশটা সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে নোঙর ফেলে থাকতে পারে ওর মধ্যে। এ মুহূর্তে যদিও একটাও নেই। ফাঁকা।

বাইরের খোলা পানিতে যথেষ্ট ঢেউ আছে, অথচ দুই শিং-এর ভেতরের পানি কাঁচের মত স্থির। এমন অদ্ভুত অ্যাঙ্কারেজ আর কোথাও দেখেনি রানা। প্রকৃতির খেয়াল। তীরে একটা কংক্রিটের বিরাট জেটি আছে। ফাঁকা। মানুষজন নেই। জেটির কাছে একটা ওয়্যারহাউসের মত আছে। সেটাও বন্ধ।

পাকা জেটির বাঁদিকের শিংটা জেলেদের ঘাঁটি। লম্বা লম্বা অনেকগুলো ক্যানো বাঁধা আছে সেটার তীর জুড়ে। মাটিতে জাল মেলে রাখা হয়েছে শুকানোর জন্য। ডানদিকের শিং ঘেঁষে আছে পুরনো বন্দর। বেশ কয়েকটা কাঠের জরাজীর্ণ জেটি আছে সেখানে। মূল কাঠামো থেকে খুলে খুলে পড়ছে পচা কাঠ।

ওয়্যারহাউসটার পিছনে সম্ভবত দুশো গজ এলাকা বুনো ঘাসে বোঝাই পতিত এলাকা। কিছু গরু চরছে সেখানে। রাখালও আছে দু'জন। কড়া রোদে তাদের কালো চামড়া চকচক করছে। তার ওপাশ দিয়ে গেছে ক্লারেন্সের প্রধান

রাস্তা। তারও ওপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অভিজাত ভবনগুলো।

ওগুলো থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, বিশাল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা এক ম্যানসনের ওপর চোখ আটকে গেল রানার। লাল টাইলের ঢালু ছাদওয়ালা অফ হোয়াইট রঙের ভবন। চারদিকে উঁচু দেয়াল। ভেতরে গাছ-গাছালি প্রচুর। ফুলের বাগানও আছে। সবুজ পাতার ছাউনির ফাঁক দিয়ে ওটার আঙিনায় অনেকগুলো গাড়ি দেখা গেল।

লোকজন জটলা করছে, হাঁটাহাঁটি করছে। কোনও সন্দেহ নেই ওটাই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ।

ওটার উত্তরের সীমানা দেয়াল ঘেঁষে তৈরি করা বেশ কয়েকটা ছোটো ছোটো কাঠের ঘর দেখা গেল। এগুলো নতুন তৈরি করা হয়েছে। কেন? তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। লাল বাহিনীর ঘাঁটি না তো? উপকূল থেকে প্রাসাদটার দূরত্ব মনে মনে হিসেব করে রাখল ও। পরে কাজে লাগবে। ক্রমাগত ক্যাঁচ-কোঁচ আর গোঙানির মধ্যে দিয়ে সোজা হলো কনভেয়ার।

চোখের কোণে আরেকটা সাদা কিছু ধরা পড়তে সেদিকে তাকাল। বড় একটা গির্জা ওটা। ঔপনিবেশিক ধাঁচের। প্লেনটা আরও নীচে নেমে পড়ায় ক্লারেন্স প্রায় হারিয়ে গেল। একটা হালকা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হেলান দিয়ে বসল ও।

দুই ইঞ্জিনের ছোটো প্লেন কনভেয়ার-৪৪০। প্রতিবেশী দেশ লাইবেরিয়ার রাজধানী মনরোভিয়া আর ক্লারেন্সের মধ্যে সপ্তায় তিনবার চলাচল করে। একটা ফরাসি প্রাইভেট বিমান কোম্পানি চালায় লাইনারটা। ভ্রমণ সঙ্গীদের দিকে মন দিল রানা। ওকে নিয়ে মোট সাতজন যাত্রী আছে আজকের ফ্লাইটে।

যার যেখানে খুশি বসেছে। মেয়ে আছে একজন। সম্ভবত আমেরিকান ত্রিশের মত বয়স। বেঁটে-খাটো। নাকের গোড়ায় ঝোলানো বেঢপ আকৃতির হাড়ের ফ্রেমের চশমার জন্য চেহারাটা বেশি ভোঁতা লাগছে। হাতে একটা মোটা বই। পণ্ডিত গোছের ভাবভঙ্গি মেয়েটার।

তার পাশের সিটে একজন ক্যাথলিক যাজক বসা। বয়স্ক মানুষ ছোটোখাটো। রানার মনে হলো সত্তর-পঁচাত্তরের মতো বয়স হবে তাঁর। বাকি চারজন যাত্রীর দু'জন কালো, দু'জন সাদা। সবাই যার যার ভাবনায় ডুবে আছে।

দেশটা কেমন চলছে, মনরোভিয়ায় জাংগারোর কনসুলেটে টুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করার সময়ই সে ব্যাপারে রানার প্রাথমিক জ্ঞান হয়ে গেছে। ওর আবেদন পড়ে জাংগারান কনসাল তো অবাক। এ জাতীয় প্রসিডিওর যে তার জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে, আচরণেই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে সে।

দ্রুত সার্ভিস পেতে নগদ নারায়ণই সেরা ওষুধ, তাই পাসপোর্ট জমা দেয়ার সময় ভেতরে একটা একশ' পাউণ্ডের বিল ভরে দিয়েছিল রানা। সেটা দ্রুত পকেটে পুরে বুঝিয়ে দিল এ কাজটা সে ভালই জানে।

তারপর পাসপোর্টটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরখ করল অনেকক্ষণ ধরে। প্রতিটা পাতায় চোখ বোলাল। আলোর সামনে ধরে আসল না জাল পরখ করে দেখল। পিছনের কারেন্সি ডিক্লারেশন দেখল।

তার ভাবভঙ্গি দেখে রানার সন্দেহ হচ্ছিল পাসপোর্টে সত্যি হয়তো কোনও গোলমাল দেখতে পেয়েছে ব্যাটা। নইলে অমন করে কী দেখছে এতক্ষণ ধরে? কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না ও। তখনই চোখ তুলল কনসাল।

'আপনি আমেরিকান!'

ওব্বাবা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবল রানা। ব্যাটা ডডনং! ভান করছিল এতক্ষণ! আর ও কি না মনে মনে টেনশনের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল! তারপর ভিসা পেতে পাঁচ মিনিটও লাগেনি। কিন্তু ক্লারেন্স এয়ারপোর্টে অত সহজে নিস্তার মিলল না।

এয়ার কণ্ডিশণ্ড প্লেন থেকে বের হতেই আফ্রিকার গরম হামলে পড়ল ওর উপর। গা চিড়বিড় করে উঠল। সঙ্গে একটা ব্রিফকেস ছাড়া আর কিছু নেই। ওটা হাতে ঝুলিয়ে জোর পায়ে মূল টার্মিনাল ভবনে এসে ঢুকল ও। অ্যাসবেস্টসের ছাদ ভবনের। উত্তপ্ত হয়ে আছে ভেতরটা। মাছি ভন ভন করছে।

ডজনখানেক সৈন্য আর আট-দশজন পুলিশ দেখা গেল সেখানে। সৈন্যদের তেল চকচকে নধর দেহ দেখে বুঝতে বাকি থাকল না ওরা কায়া। আর পুলিশদের চেহারা নিষ্প্রভ। দ্বিধাগ্রস্ত লাগছে তাদেরকে। সবকিছুতে ইতস্তত ভাব। ওরা নিশ্চয়ই ইরুবা, ভাবল রানা। প্রথম দলের কাঁধে ঝুলছে সাব মেশিনগান। পুলিশদের কাঁধে সাধারণ রাইফেল।

পুলিশগুলো একটু দূরে দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো। সবাই চুপচাপ। নিজেদের মধ্যেও তেমন কথা বলছে না। এদিকে সৈন্যরা অলস ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক হাঁটছে, উদ্দেশ্যবিহীন। যাত্রীদের ওপর ফাঁকা নজর বোলাচ্ছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কিছু লক্ষ করছে না। আসলে উল্টো। কিছুই নজর এড়াচ্ছে না তাদের। সবই খেয়াল করছে।

ওদের সবাই একেকটা চলমান বোমা। আফ্রিকা সম্পর্কে রানার যে অতীত অভিজ্ঞতা, তা থেকে নিশ্চিত জানে ও। এই ফাঁকা চাউনি আর অলস ভঙ্গি, দুটোই ওর খুব ভাল চেনা। আফ্রিকার আদি ও অকৃত্রিম ঐতিহ্যেরই একটা অংশ এটা। হাতে আধুনিক অস্ত্র আছে, ক্ষমতা আছে অঢেল। কাজেই যে-কোনও মুহূর্তে আচমকা বিস্ফোরিত হতে দোষ নেই। সেটা অযৌক্তিক হলেও কারও কিছু বলার নেই।

কাস্টমস থেকে দীর্ঘ একটা ফরম পূরণ করতে দেয়া হলো। এরকম একটা আগের দিনও পূরণ করতে হয়েছিল। কাজ শেষ করে ওটা জমা দিল রানা। হেলথ অ্যাণ্ড পাসপোর্ট কন্ট্রোলে চলে এল। এই দুই বিভাগের বেসামরিক অফিশিয়ালরাও কায়া।

এক কাস্টমস অফিসার হেলথ অ্যাণ্ড পাসপোর্ট কন্ট্রোলের দরজার সামনে কোমরে হাত রেখে অপেক্ষা করছিল রানার জন্য। ইচ্ছে করলে ওখানেই চেকিং সেরে ফেলতে পারত। কিন্তু আরও মানুষ আছে বলে করল না। চোখাচোখি হতে ভারিক্কি চালে মাথা দোলাল সে। পাশের একটা খালি রুম দেখিয়ে ভেতরে যেতে বলল ওকে। এগোলো রানা। এই সময় সৈন্যদের কয়েকজনের চোখ পড়ল ওর ব্রিফকেসের উপর। পিছন পিছন তাদেরকেও আসতে দেখে মাথার

মধ্যে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল রানার।

একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর কেসটা রাখতে বলল অফিসার। বিনা বাক্য ব্যয়ে নির্দেশ পালন করল রানা। পরক্ষণে ওটা খুলে হাত ভরে দিল সে। এমনভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করল, যেন নিশ্চিত জানে ভেতরে কামান না হলেও বন্দুক নিশ্চয়ই আছে। রানার ভারী ইলেক্ট্রিক শেভারটা হাতে ঠেকতে থেমে গেল লোকটা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে।

ধীরেসুস্থে বের করল ওর রেমিংটন শেভারটা। উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে না বুঝে 'অন' লেখা সুইচ টিপে দিতেই জোরাল গুঞ্জন করে উঠল শেভার। চমকে উঠে তাড়াতাড়ি ওটা 'অফ' করে দিল সে। নির্বিকার চিত্তে পকেটে ভরে ফেলল। একবার তাকালও না মালিকের দিকে।

কিন্তু রানা কিছু মনে করল না। ব্রিফকেসের ফলস চেম্বারে ওর ওয়ালথার পিপিকেটা আছে। লোকটা ওই পর্যন্ত যেতে পারেনি, সেই সান্ত্বনা নিয়েই খুশি। এরপর ওর দামি ক্যামেরাটা নিয়ে পড়ল অফিসার। কিছুক্ষণ জিনিসটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ওর দিকে তাকাল সে।

'আপনি সাংবাদিক?'

মাথা নাড়ল ও। 'টুরিস্ট।' চোখ ইশারায় পাসপোর্টটা দেখাল তাকে। 'ওটায় লেখা আছে।'

গম্ভীর হয়ে গেল লোকটা। 'ও, হ্যাঁ। দেখেছি।'

ব্রিফকেস ছেড়ে এবার রানার পকেট নিয়ে পড়ল সে। সৈন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখছে। আসলে কাজের মধ্যে বাঁ হাত ঢোকানোর সুযোগ খুঁজছে। পকেটে যা যা আছে, সব বের করে টেবিলে রাখতে ইশারা করল অফিসার।

শ্রাগ করে প্রথমে চাবি বের করল রানা। তারপর রুমাল। তারপর কয়েন, ওয়ালেট এবং সবশেষে পাসপোর্ট। প্রথমেই ওয়ালেটের ওপর চড়াও হলো অফিসার। ট্রাভেলার্স চেকগুলো দেখল। 'ঘোঁৎ!' জাতীয় একটা শব্দ করে ফিরিয়ে দিল।

কয়েনগুলো পকেটে পুরে কাগুজে নোটগুলোর দিকে নজর দিল সে। ছয়টা ৫ হাজার ফ্রেঞ্চ-আফ্রিকান ফ্রাঙ্ক নোট আর কয়েকটা পাঁচশ' আর একশ' ফ্রাঙ্ক নোট ছিল। তার মধ্যে থেকে দুটো পাঁচ হাজারী নোট তুলে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল।

হাত নিশপিশ করে উঠল রানার। ইচ্ছে হলো নোটগুলো কেড়ে নিয়ে ব্যাটার গালে কষে এক চড় লাগায়। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। এখানে ওরকম কিছু করতে যাওয়ার অর্থ হবে সেধে মরণ ডেকে আনা।

তবে অফিসারের হাত সাফাইয়ের ঘটনাটা একেবারে অগোচরে থাকল না। কাছেই ঘুরঘুর করতে থাকা সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজনের চোখে পড়তে দ্রুত এগিয়ে এল তারা। রানার পিছনে এসে আধখানা চাঁদ হয়ে দাঁড়াল। ওর কাঁধের উপর দিয়ে অফিসারের হাতে ধরা বাকি নোটগুলো দেখছে। লোভে আর উত্তেজনায় চকচক করছে সবার দৃষ্টি।

একজন দ্রুত এগিয়ে এল, অফিসারের হাত থেকে ছোঁ মেরে তিন-চারটে একশ' ফ্রাঙ্ক নোট তুলে নিয়ে হাসল দাঁত বের করে। অফিসারের অপ্রস্তুত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তেমন কিছু ঘটতে দেখল না রানা। বরং লোকটা ভাব করল যেন ওসব কিছু না। বাকি টাকাগুলো রানার পকেটে গুঁজে দিল সে।

অফিসারের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রানা। জবাবে লোকটা এমন ভাব করল, যেন সমস্ত অপরাধ ওরই। তাতেও রাগ কমল না তার। গায়ের আণ্ডারশার্টটা সামান্য উঁচু করে ধরে ট্রাউজার ব্যাণ্ডে গোঁজা একটা ব্রাউনিং নাইন এমএম শর্ট বা সেভেনসিক্সফাইভের মসৃণ বাঁটটা দেখিয়ে দিল ওকে।

'পুলিশ,' বলল গম্ভীর কণ্ঠে।

ভুলটা ভাঙল রানার। বেসামরিকই বটে, তবে সাধারণ কাস্টমস অফিসার নয়। ওদিকে বাকি সৈন্যরা এদিকেই আসছিল। পুরো ঘটনা দেখেনি তারা, তাই অফিসারকে মোটা গলায় 'পুলিশ' উচ্চারণ করতে শুনে ধরে নিল বিদেশী লোকটা নিশ্চয়ই ঝামেলা করছে। সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী একটা ভাব ফুটল তাদের চেহারায়। এক এনসিও-র নেতৃত্বে দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল দলটা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে অফিসার নিজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করল। তাড়াতাড়ি ব্রিফকেসের ডালা বন্ধ করে রানার দিকে ঘুরিয়ে দিল ওটা। মাথা ঝাঁকিয়ে গুছিয়ে নিতে বলল। একই সঙ্গে সৈন্যদের উদ্দেশে হাত নেড়ে কিছু বলল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল লোকগুলো। কয়েক মুহূর্ত পর শ্রাগ করে আরেকদিকে চলে গেল। চেহারা দেখে মনে হলো খুশি হতে পারেনি।

তারপর, যেন এক যুগ পর রানার দিকে ফিরল অফিসার। এক হাত লম্বা করে দরজা দেখাল। অর্থাৎ, এবার যেতে পারো তুমি। ব্রিফকেস তুলে নিয়ে পা বাড়াল ও। সুস্থ দেহে বাইরে আসতে পেরে সশব্দে চেপে রাখা দম ছাড়ল।

মেইন হলে বৃদ্ধ যাজকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল আমেরিকান যুবতীটিকে। প্রচণ্ড রাগে ফুঁসছে। চেহারা টকটকে লাল। সমানে বকাঝকা করছে। যাজক তাকে শান্ত হতে বলছেন বারবার। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ঘামে ভেজা নাকের ডগা থেকে বারবার পিছলে নেমে আসছে চশমা। ওটা সামলাতে গিয়ে রাগ আরও বাড়ছে মেয়েটার।

এতো রাগের প্রথম কারণ, অফিসার তার ব্যাগেজ চেকিং শেষে চক মার্ক দেয়ার পরও পুলিশ আর সৈন্যরা তার হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ভেতরে লাঙল চষেছে। জিনিসপত্রের সঙ্গে তার ব্রা, প্যান্টি ইত্যাদি খুলে-ছড়িয়ে একাকার করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, সে যখন ওগুলো গোছানোর চেষ্টা করছিল, অসভ্যগুলো তখন দূর থেকে দাঁত বের করে হাসছিল।

মেয়েটার চেঁচামেচি কিছুক্ষণ সহ্য করলেও পরে তা বিরক্তির কারণ হয়ে উঠল পুলিশের। জটলার মধ্যে থেকে দু'জন তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফাদার সময়মত ঠেকিয়ে দিলেন। ভাঙা ভাঙা, অশুদ্ধ স্থানীয় ভাষায় কী সব বলে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কিছুটা শান্ত করলেন লোকগুলোকে। গজ গজ করতে করতে আরেকদিকে চলে গেল ওরা।

পুলিশকে ম্যানেজ করে রানার দিকে নজর দিলেন ফাদার। এইমাত্র যে রুম থেকে বেরিয়েছে ও, সেটার ওপর চকিতে নজর বুলিয়ে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন। এমন একটা ভঙ্গি করলেন, যার অর্থ ও কিছু নয়। এ দেশে ওসব স্বাভাবিক। মেজাজ খাট্টা বলে সময় নষ্ট করল না রানা। হল থেকে বেরিয়ে এয়ারপোর্টের সামনের খুদে স্কয়ারে এসে দাঁড়াল। অসম্ভব গরম এখানে। রোদের ছ্যাঁকায় গা পুড়ে যাওয়ার দশা।

গাড়ি-টাড়ি কিছু একটার আশায় পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় ফাদার পিছন থেকে ডাকলেন। 'চাইলে আপনাকে শহর পর্যন্ত লিফট দিতে পারি, মাই চাইল্ড।' আইরিশ-আমেরিকান টানের ইংরেজিতে বললেন তিনি। 'চলে আসুন। নইলে হয়তো হেঁটেই পৌঁছতে হবে শহরে।'

ফাদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার তন্দুরের মতো গরম ফোক্সভাগেন বিটলের সামনের সিটে উঠল রানা। মেয়েটা আগেই পিছনের সিটে উঠে পড়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের অভব্য আচরণ আর ঔদ্ধত্যের নমুনা দেখে একেবারে শান্ত হয়ে গেছে বেচারী। লজ্জায়, অপমানে মুখ কালো করে ফ্লোর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। ফাদার মেয়েটার পরিচয় জানালেন। তাঁরই এক বন্ধুর মেয়ে, জুডি লিস্টার। পাশের দেশে নার্সের চাকরি করে।

ফাদারের নাম গর্ডন ব্রায়ান্ট। থ্রি ইন ওয়ান তিনি। এখানকার জাতিসংঘ হাসপাতালের মেডিসিনের ডাক্তার, ওটার নিজস্ব গির্জার যাজক এবং সমাজকর্মী। ক্লারেন্সের সবার প্রিয় ফাদার। এ দেশে শিশুরা অপুষ্টি আর অসুখ-বিসুখে আশপাশের অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি ভোগে, তাদের সেবা করার মত নার্সের সংখ্যাও কম, ফাদারের কাছে এসব শুনে এসেছিল জুডি। মনে ধরলে বর্তমানের চাকরি ছেড়ে এ দেশে চলে আসবে।

আপনমনে মাথা নাড়ল রানা। বেচারীর সদিচ্ছা আর এদের আচরণ তুলনা করতে গিয়ে করুণা হলো ওর জন্য।

'আপনারা দু'জনই আজ ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পেয়ে গেছেন,' গিয়ার দিয়ে রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'আরেকটু হলে ভাল বিপদ ঘটে যেতে পারত।'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল রানা।

'দেশটা এখন বিপদের ডিপো হয়ে আছে। এখানে প্রতি মুহূর্তের জন্য সতর্ক থাকা উচিত।' প্রসঙ্গ পাল্টালেন ফাদার। 'ইণ্ডিপেনডেন্সে উঠবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই। ওটার মালিক গোমেজ বেশ ভাল মানুষ। প্রয়োজন পড়লে আপনাকে গাইডের সার্ভিসও দিতে পারবে লোকটা।'

সাগরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা তিনতলা ইণ্ডিপেনডেন্স হোটেলের চেহারা-সুরত মোটামুটি পছন্দ হলো রানার। অস্তগামী সূর্যের লালচে আভায় রীতিমত মোহনীয় লাগল। বেশ পরিচ্ছন্ন, মানসম্মত হোটেল। বিদেশী টুরিস্টরা এটাতেই ওঠে বেশিরভাগ। ফাদারের সঙ্গে রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে তাকিয়ে থাকল গোমেজ। ওকে তার হাতে গছিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন ফাদার।

লোকটার পুরো নাম হেনরি গোমেজ। বয়স চল্লিশের মত। জন্ম বৈরুতে।

এক সময় কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবসা করত সেখানে। আশির দশকে গৃহযুদ্ধে বৈরুত নরকে পরিণত হতে ব্যবসা বেচে দিয়ে নতুন ধান্ধার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে সে। ইচ্ছে ছিল ইওরোপে কিছু একটা করবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই অঞ্চলের ঠাণ্ডার সঙ্গে সন্ধি করতে না পেরে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে সেটল করেছে। আগে মোটামুটি ভালই চলত তার ব্যবসা। তবে ইদানীং খুব খারাপ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট কিমবার নামান কীর্তির খবরে টুরিস্ট আসা একেবারেই কমে যাওয়ায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে তার ব্যবসা।

এখানে রাত আটটায় বার বন্ধ করার নিয়ম। বার যদিও নামেই। বিদেশী পানীয় আজকাল এ দেশে পাওয়া যায় না বললেই হয়। বিদেশী মুদ্রা খরচ করে ওসব আমদানী করার সামর্থ্য জাংগারোর নেই।

তবে গোমেজ মাঝেমধ্যে কিছু বিদেশী জিনিস পায়। মানুষটা সে ভাল, সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলে। তাই বিদেশী দূতাবাসগুলো, বিশেষ করে আমেরিকান দূতাবাস সূত্রে মাঝে-মধ্যে দু'-এক বোতল দামি জিনিস পায় সে। তাই ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের বারে সন্ধের পর মোটামুটি ভিড় হয়।

বার বন্ধ করেই নতুন বোর্ডারের খবর নিতে এলো গোমেজ। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করল রানাকে। 'আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি আমি।'

এই মরেছে! 'আমাকে দেখেছেন?' মনে মনে তটস্থ হয়ে উঠল রানা।

'নিশ্চয়ই! সেই জন্যই তো তখন থেকে ছটফট করছি কখন বার বন্ধ করে আপনার সাথে গল্প করতে আসব। কিন্তু... কোথায় দেখেছি আপনাকে?' প্রশ্নটা নিজেকে করল সে। আনমনে নাকের ডগা চুলকাল। 'উঁমম্!'

লোকটার অব-চক্কর সুবিধের মনে না হওয়ায় রুমের দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা। সবাইকে শুনিয়ে বেফাঁস কিছু বলে বিপদ ঘটিয়ে দিতে পারে। এক বোতল গ্লেনলিভেট উইস্কি এনেছিল ও। এয়ারপোর্টে যে ভাবে ব্রিফকেস চেক করা হচ্ছিল, তাতে নিশ্চিত ছিল জিনিসটা গেছে। কিন্তু ব্যাখ্যার অতীত কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত ছুঁয়েও দেখেনি কেউ। তাড়াতাড়ি ওটা বের করল।

'ড্রিংক?'

খাঁটি বিদেশী মাল দেখে সব ভুলে গেল গোমেজ। ওসবের স্বাদ প্রায় ভুলতে বসেছে সে। এ জিনিস কপালে একেবারেই জোটে না আজকাল। একে-তাকে ধরাধরি করে যাও-বা একটু জোগাড় করে, তার সবটুকুই গ্রাহক সেবায় লেগে যায়। নিজে চেখে দেখার সুযোগ পায় না।

লোকটাকে অফার করল রানা। বিশেষ উদ্দেশ্যে একটু বেশিই ঢালল তার গ্লাসে। গোমেজও অনেকদিন পর বলে অল্পেতেই তাল হারিয়ে ভ্যাড় ভ্যাড় শুরু করে দিল।

'টুরিস্ট?' ওর জাংগারো আসার কারণ শুনে বলল। 'জাংগারো দেখার কৌতূহল? পাগল হলে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু... হোয়াট দ্য হেল? মনে পড়ছে না কেন?'

'আগে আমাকে দেখেছেন, সে কথা প্রথমেই বলেননি কেন?' বলল রানা।

'যখন চেক ইন করি?'

'ওখানে আরও লোক ছিল, তাই মুখ খুলিনি। কিমবার চর থাকতে পারত ওর মধ্যে। তার ফল কী হতে পারতো অনুমান করাও সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে।'

'ও,' মাথা দোলাল রানা।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বকবক করে চলল গোমেজ। রুমে আর কেউ নেই, তবু নিচু গলায় কথা বলছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ দেশের আর সবার মত এর মনেও চাপা আতঙ্ক কাজ করছে। শুধু আর্মি আর পুলিশের আচরণে এটা দেখতে পায়নি রানা, নইলে আর সবার মধ্যেই আছে।

আধঘণ্টা কথা বলে লোকটার পেট থেকে যা উদ্ধার করা গেল, তাতে রানা মোটামুটি নিশ্চিত হলো ওয়াল্টার হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিনের তথ্য মোটামুটি ঠিকই আছে।

'আপনাদের লাইফ প্রেসিডেন্ট এখন কোথায়?'

মুখ ভ্যাংচালো গোমেজ। 'গ্রামের বাড়িতে গেছে। "গলার" নির্দেশে কচি কচি মেয়েদের নিয়ে "বিয়ের" উৎসব করবে, সেই আনন্দে...' হেঁচকি তুলল।

'"গলার নির্দেশ" মানে?'

'ব্যাটা জাহির করে বেড়ায় দেবতারা তার সাথে নিয়মিত কথা বলে। আধ্যাত্মিক কণ্ঠের নির্দেশে পরিচালিত হয় সে।'

'আচ্ছা।'

'এ দেশের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই এসব বোলচাল তারা বিশ্বাস করে। যমের মতো ভয় পায় কিমবাকে। তাদের কাছে কিমবা প্রচণ্ড ক্ষমতাধর কোনও জাদুকর, অথবা আরও ভয়ঙ্কর কিছু। এই সুযোগে শয়তানটা ইচ্ছেমত যা খুশি তাই করে বেড়ায়।'

'এসব নিয়মিতই ঘটে মনে হয়?'

'"বিয়ে" করার ব্যাপারটা? তা বলতে পারেন।' এক চুমুক উইস্কি পেটে চালান করল গোমেজ। 'হারামজাদা কাজটা কীভাবে করে আমি একবার লুকিয়ে দেখেছি।' শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল সে। 'ও মানুষ না। একটা বদ্ধ উন্মাদ।' একটু বিরতি। 'আরেকটু হলে ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম ওর বডিগার্ডদের হাতে, জানেন? ওফ! কীভাবে যে পালিয়ে এসেছিলাম, ঈশ্বর জানেন।'

পর পর কয়েক ঢোক মাল পেটে যেতে আরও একটু বেসামাল হয়ে পড়ল লোকটা।

'বিদেশী কূটনীতিকরা কিছু করে না?'

'না। তারা কোনও ঝুট-ঝামেলায় যেতে চায় না।'

'কয়টা দূতাবাস আছে ক্লারেন্সে?'

'সাত-আটটা। রাশান, ফ্রেঞ্চ, সুইস, আমেরিকান, পুব জার্মান, পশ্চিম জার্মান, চেক, চাইনিজ—এই ক'টাই।'

'ব্রিটিশ নেই?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'না।'

'কতজন কূটনীতিক আছে?'
'সব মিলিয়ে পঞ্চাশ-ষাটজন হবে মনে হয়। শুধু রাশারই আছে বিশজনের মতো।'
'ওদের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণ?'
'কোনো এক কালে নাকি মস্কোপন্থী রাজনীতি করত কিমবা, সেই সূত্রে (যদিও নিজেরাই এখন আর মস্কোপন্থী নেই) রাশানরা ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করেছে তাকে। ক্লারেন্সে ওদের দাপট তাই একটু বেশি। জাংগারোর মত দেশের তুলনায় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি সাইজের এমব্যাসি খুলে বসেছে।'
'ওরা ছাড়া আর কতো বিদেশী আছে?'
কর গুনল গোমেজ। 'উপকূলীয় প্লেইনে কয়েকজন আছে জাতিসংঘের অ্যাগ্রোনমিস্ট-টেকনিশিয়ান। জাতিসংঘ হসপিটালের স্টাফ আছে পাঁচজন। তারপর এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেটর, ওয়াটার সাপ্লাই ইত্যাদি দেখাশোনার জন্য আছে আরও পাঁচজন। তা ছাড়া সাধারণ ট্রেডার, ম্যানেজার, ব্যবসায়ী সব মিলিয়ে আরও জনা পঞ্চাশেক।' মাথা নাড়ল। 'খুব ভয়ে ভয়ে আছে সবাই। কারণ কয়েক সপ্তা আগে জাতিসংঘের এক কর্মীকে রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে আধমরা করেছে কিমবার বডিগার্ডরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাঁচজন নন-মেডিক্যাল ফরেন টেকনিশিয়ান কাজ বন্ধ করে নিজেদের এমব্যাসিতে গিয়ে বসে আছে। জানিয়ে দিয়েছে এ দেশে আর কাজ করবে না। তারা চলে গেলে পানি, ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই, এয়ারপোর্ট, সব বন্ধ হয়ে যাবে।'
'কূটনৈতিক দিক থেকে এদের কোনও বন্ধু আছে?'
'বন্ধু! অর্গানাইজেশন অভ আফ্রিকান ইউনিটি পর্যন্ত কিমবার কাজকর্মে বিব্রত। এত কুখ্যাত এ দেশ, কেউ নামই মুখে আনে না। বিদেশী সাংবাদিক, টিভি ক্রু—কেউ আসে না। এ দেশের কথা পৃথিবী জানতে পারে না। সর্বোচ্চ পদে চোর বসে আছে বলে কেউ পুঁজি বিনিয়োগ করতে আসে না। কিমবার পার্টি-ব্যাজ পরা থাকলে যা খুশি তাই করা যায়। পথেঘাটে যাকে ইচ্ছে ধরে পেটায় ওরা। তাড়া করে বাড়িতে ঢুকে পেটায়। জানে মেরে ফেলে। কারও মুখ খোলার সাহস নেই। অনেকটা হিটলারের ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের মত কাজকর্ম ওদের।'
হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখের দুই কষায় জমে ওঠা ফেনা মুছল গোমেজ।
'আস্ত উন্মাদ একটা। মেগালোম্যানিয়াক। সম্পূর্ণ নিজের মর্জি মত দেশ চালায়। একদল পলিটিক্যাল ইয়েস-ম্যান আছে, যারা তার প্রত্যেকটা কথায় সায় দেয়। যদি তাদের কারও সামান্য ভুলচুক হয় বা কারও আচরণ নিয়ে সন্দেহ হয়, তার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছাড়ে কিমবা। এখানকার পুরনো আমলের একটা পুলিশ ব্যারাক এখন হয়েছে বিশেষ কারাগার, উফা প্রিজন। সেখানে কিমবার সামনে বন্দিদের উপর টর্চার করা হয়। যে একবার বন্দি হয়ে উফা প্রিজনে গেছে, সে গেছে।' হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করল গোমেজ।

'এই যুগেও এ দেশে ওপেন পাবলিক একজিকিউশনের চল আছে। কিমবা চালু করেছে। ঘোষণা দিয়ে সিটি স্কয়ারে শত শত লোক হাজির করে তাদের সামনে একজিকিউট করা হয়। "অপরাধীকে" বলি দিয়ে মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে দেবতার ভোগের জন্য বনের মধ্যে ফেলে রেখে আসা হয়। সবাই জানে, রাতের আঁধারে সেই মাংস কিমবার লোকেরাই আবার তুলে নিয়ে আসে। অনেকে বলে কিমবা নিজেই নাকি খায় ওগুলো। দু'দিন আগেও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে তার সেনাবাহিনী। মহিলাও আছে তার মধ্যে। টিভ আর ইরুবা। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী। তারা নাকি কিমবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। বুঝুন অবস্থা। ইদি আমিন বা সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের সম্রাট বোকাসা কতোটা ভয়ঙ্কর ছিল? এ তাদের চেয়ে হাজার গুণ ভয়ঙ্কর।'

সিগারেট ধরাল রানা। গোমেজকেও অফার করল। লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে একটু একটু। 'অর্থনীতির অবস্থা কি?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। '"নীতি" মুখে মুখে আছে। কিন্তু "অর্থ" নেই। উপকূলের সমতল অঞ্চলে ফরাসিদের রেখে যাওয়া কিছু প্ল্যান্টেশন আছে। হাই গ্রেড কোকো, কফি, তুলা আর কলা চাষ হতো এক সময়। ওর মধ্যে টিভদের ছিল কয়েকটা। বাকিগুলো ইরুবাদের। কিমবা ক্ষমতায় আসার পর কায়ারা সব কেড়ে নিয়েছে। কোকো আর কফি রফতানী করে বছরে যা আয় হতো, তাতে ইওরোপ থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করার কাজটা চলে যেতো। এখন সব বন্ধ।'

গ্লাসে চুমুক দিল লোকটা। শ্রাগ করল। 'মালিক হওয়া আর জিনিসের যত্ন নেয়া এক জিনিস নয়। এই ক' মাসে বাগানগুলোর কী দশা হয়েছে, দেখলে আমার চোখে পানি আসে। আগাছায় ভরে গেছে সব। জাংগারোর প্রধান ফসল কোকো ছয় মাস আগেও উৎপাদন হয়েছিল ত্রিশ হাজার টন। গত মাসে হয়েছে মাত্র এক হাজার টন। তা-ও কোনও বায়ার আসেনি। সব গুদামে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'আর সব?' বলল রানা। 'কলা, কফি, তুলা?'

'বাগানের যত্ন নেয়া না হলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। কলা-কফি উৎপাদন জিরো। তুলারও সেই অবস্থা। গাছে পোকা ধরে বাজে অবস্থা, কিন্তু পোকা মারার ওষুধ নেই।' একটু থামল সে। 'জাতিসংঘ, রাশা আর ফ্রান্স সাহায্য দিতে দিতে ক্লান্ত। উপকূলে প্রচুর মাছ। ধরার মানুষ নেই। দুটো ফিশিং বোট ছিল টিভদের। কিমবার আর্মির মার খেয়ে পালিয়েছে তারা। ইঞ্জিনে জং ধরে বোট অচল হয়ে গেছে। গরু-ছাগল বা মুরগি যথেষ্ট নেই। তাই আমিষের অভাবে অপুষ্টির শিকার মানুষ।'

'কেন, নৌ-বাহিনীর জাহাজ নেই? বা কোস্ট গার্ড? সেগুলো দিয়েও তো মাছ...' লোকটাকে ঘন ঘন মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'প্রথমটা নেই। কোনও কালেই ছিল না। কোস্ট গার্ড ছিল দু'-তিনটে, সেগুলোও অচল হয়ে পড়ে আছে।'

'কোনও খনিজ সম্পদ নেই?'

'না,' মাথা নাড়ল গোমেজ। 'আমি শুনিনি সেরকম কিছু। অসুস্থ হলে মানুষ ডাক্তার দেখাবে, সে সুযোগও নেই,' আগের কথার খেই ধরল। 'একটামাত্র হাসপাতাল, জাতিসংঘ চালায়। সেখানে দু'জন দেশী ডাক্তার ছিল। একজন বিশেষ জেলখানায় আটক অবস্থায় মরেছে, আরেকজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের পূজারী বলে মিশনারীদের অনেককে বের করে দিয়েছে কিমবা। আসলে তারা ধর্মযাজক আর মেডিক্যাল মিশনারী ছিল। কিছু নান ছিল নার্সদের ট্রেনিং দেয়ার জন্য, তাদেরকেও তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'এখন বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজনের কথা বলে রাশান ফিশিং ট্রলারগুলোকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়েছে কিমবা। উপসাগর থেকে প্রতিদিন শত শত টন মাছ নিয়ে যাচ্ছে ওরা, টাকা যাচ্ছে কিমবার পকেটে—সাধারণ মানুষের কাছে কিছুই পৌঁছায় না—কিমবার গোপন অ্যাকাউন্টে জমা হয় তার শালার তত্ত্বাবধানে।'

গম্ভীর হয়ে উঠল গোমেজ। নিজের চারদিকে চোখ বোলাল। 'তবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদে মনে হয় আমিই পড়েছি। এরকম পরিস্থিতিতে আর কোথাও গিয়ে যে ব্যবসা করব, তা-ও পারছি না। এই হোটেল বেচতে না পারলে পুঁজি পাবো কোথায়? আর এই অচল ব্যবসা কে কিনবে? জাংগারান টাকার যা মূল্য, সাদা কাগজের মূল্যও তার চেয়ে অনেক বেশি।'

'শুধু রাশানদেরকেই মাছ মারার সুযোগ দিয়েছে কিমবা?' লোকটা মাথা দোলাতে বলল, 'তার মানে ওদের প্রভাবই বেশি লোকটার ওপর। উইস্কি?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আরও খানিকটা গ্লেনলিভেট ঢেলে দিল রানা।

'তা ঠিক। কিমবার অভিজ্ঞতার ঝুলি তো এই সাইজের,' পাঁচ আঙুল এক জায়গায় করে দেখাল সে। চুমুক দিল। 'নিজের দেশ আর বড়জোর আশপাশের দু'-একটা আফ্রিকান দেশ, এই পর্যন্তই দৌড় তার। দেশের বাইরের কিছু নিয়ে কাজ করতে গেলে পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে। তখন সে হয় রাশান নয়তো আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে। আমার বারে নিয়মিত আসে এক ফরাসি। তার কাছে শুনেছি, ওদের রাষ্ট্রদূত বা তার সহকর্মীদের কেউ না কেউ প্রায়ই প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে যায়।'

'ইব্রাহিম কেমন ছিলেন?' জানতে চাইল ও। 'টিভ লিডার?'

ঘুরে তাকাল লোকটা। 'তিনি যদি কয়েকটা মাসও দেশ চালানোর সুযোগ পেতেন, জাংগারোর চেহারা বদলে যেতো। বেচারা! টিকতে দিল না ওরা। আসলে... ভাল মানুষের জায়গা কোথাও নেই। আমি শিওর, ওরকম আরেকজন শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র নেতার দেখা পেতে এই কপালপোড়া দেশকে এক হাজার বছর সাধনা করতে হবে।' তর্জনী খাড়া করে অনেকটা যেন শাসাল গোমেজ। 'এক হাজার বছর!'

কিছু ভাবল মাসুদ রানা।

'জনসংখ্যা কতো জাংগারোর?'

ঠোঁট ওল্টাল গোমেজ। 'হবে লাখ বিশেকের মতো। আমি যদ্দূর জানি। সাত লাখের মতো ইরুবা, দশ লাখ কায়া। আর টিভরা তিন, সাড়ে তিন লাখের

মতো।'

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'এ দেশটা অনেক সম্ভাবনার দেশ। জনসংখ্যা অল্প, প্রয়োজন অল্প। খাদ্য-বস্ত্রসহ প্রত্যেকটা মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে এরা খুব সহজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত। নিজেদের মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে নিতে পারত। কেবল ভাল একজন পরিচালকের দরকার ছিল। বিদেশ থেকে যে পরিমাণ সাহায্য আসে, তাতেও এরা দু' বেলা দু'টো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারতো। যদি কিমবার পার্টি মেম্বাররা সবকিছু লুটপাট করে শুধু নিজেদের পেট না ভরাতো।'

গলা পুরোপুরি খাদে নামিয়ে বলল, 'একেকসময় খুব ইচ্ছে হয় একটা মেশিনগান নিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে ঢুকে ম্যাসাকার করে দিয়ে আসি। তারপর কপালে যা আছে হবে। আপনাদের মতো হলে...' থেমে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল গোমেজ। গ্লাসটা ঠক্ করে রেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'এইবার মনে পড়েছে!' গলা আরও খাদে নেমে গেল লোকটার। 'আপনি... আপনাকে আমি আতাসী-মার্সিয়ার বিয়েতে দেখেছি। আতাসী আপনাকে "বস্" বলে ডাকছিল। তার মানে আপনি... আপনি, কী যেন নাম?'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। এরপর আর মিথ্যে বলে লাভ নেই। তাতে পার পাওয়া যাবে না। গোমেজ নীরবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রানা ভাবছে কী বলবে। নীরবতা ভারি করে তুলল রুমের পরিবেশ।

এভাবে কতক্ষণ চলত বলা যায় না, হঠাৎ একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টা অটোম্যাটিক রাইফেলের কান ফাটানো হুঙ্কার শুনে চমকে উঠল ওরা। বেশ কাছেই হচ্ছে আওয়াজ। গুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়ে-পুরুষ আর শিশুদের আতঙ্কিত চিৎকার রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে দিল।

কয়েক মুহূর্তের বিরতির পর আবার শুরু হলো গুলি। তবে এবার একনাগাড়ে নয়, থেমে থেমে।

'কোথায় হচ্ছে গুলি?' বলল রানা।

গোমেজ পাত্তা দিল না। 'অবাক হবেন না। এসব রোজকার ঘটনা। কিমবার পার্টির ছেলেরা বনভোজন করতে এসেছে। এ সময় বাধা পেলেই হত্যার নেশায় মেতে ওঠে ওরা।'

একটু পর গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল। কিন্তু একাধিক নিস্তেজ কণ্ঠের কান্নাকাটি আর ছোটাছুটির আওয়াজ এখনও কানে আসছে। একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। কয়েকটা চড়া গলাও শোনা গেল।

'দাঁড়ান। পরিস্থিতি শান্ত হোক। তারপর খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি আজ কতজনকে খতম করল ওরা।'

রানা কিছু বলল না। স্তব্ধ হয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। রাস্তার, ঘরবাড়ির বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে। কিন্তু আলোর তেজ বেশ কম লাগল। রাস্তার একটা খুঁটিতে আলো জ্বলছে তো পরের দু'-তিনটে খুঁটি অন্ধকার। ছাড়া ছাড়া।

রাতের কালো আকাশ অনেকখানি জায়গা নিয়ে লাল হয়ে উঠেছে।

বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। উজ্জ্বল কমলা রঙের শিখা লকলক করছে। হোটেল থেকে খুব বেশি হলে আধমাইল দূরে হবে জায়গাটা।

একটা বাচ্চা চিৎকার করে কাঁদছে। অসহায় কান্না। আহত হয়েছে? কেউ থামানোর চেষ্টা করছে না কেন? কেঁদেই চলেছে শিশুটা। গলা ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে তার।

মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে উঠল রানার।

আট

সকালে নাস্তা খেয়ে শহর দেখতে বের হলো রানা। কাঁধে একটা ব্যাগ। হাতে ক্যামেরা। পথ প্রদর্শক হিসেবে দশ-এগারো বছরের এক কিশোরকে সঙ্গে জুটিয়ে দিল গোমেজ। হাড্ডিসার ছেলেটা। অভাব ফুটে বের হচ্ছে চেহারা থেকে। বয়স অনুপাতে একটু বেশি লম্বা। চোখ দুটো গর্তে বসা। ইরুবা ও। নাম মতুবা।

পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে ইদানীং কিছু বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে গোমেজ। কিমবার সাঙ্গপাঙ্গরা বিদেশী টুরিস্টদের মওকামত পেলে কী ঘটিয়ে বসে তার ঠিক নেই, তাই তারা হোটেল ছেড়ে বের হওয়ার সময় ছেলেটাকে পিছন পিছন পাঠায় সে। দূর থেকে টুরিস্টদের অনুসরণ করে মতুবা। টুরিস্ট বিপদে পড়লে বন-বাদাড় ভেঙে সংক্ষিপ্ত পথে ইণ্ডিপেনডেন্সে ছুটে এসে গোমেজকে খবর দেয়।

গোমেজ গিয়ে জানায় তার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ, সেই সুইস বা জার্মান এমব্যাসিতে। যাতে কিমবার পোষা গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়ে আধমরা হওয়ার আগেই টুরিস্টকে উদ্ধার করা যায়। তার ব্যবসার লালবাতি জ্বলে না যায়।

ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়েছে রানা। যা চোখে ধরছে, তারই ছবি তুলছে। পথচারীরা ঘুরে ঘুরে লক্ষ করছে ওকে। মতুবা দূর থেকে অনুসরণ করছে। ঘুরতে ঘুরতে আগের রাতে যেখানে গোলাগুলি হয়েছিল, সেখানে পৌঁছল রানা। ইণ্ডিপেনডেন্সের আধ মাইল দূরে, অভিজাত আবাসিক এলাকায় জায়গাটা।

গতরাতের ঘটনার উৎপত্তি এক পয়সাওয়ালা ইরুবার দুই বিঘা জমি। গোমেজ পরে জানিয়েছে রানাকে। জমিটার উপর কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের এক মাঝারি গোছের নেতার চোখ পড়েছিল বেশ আগেই। জমির মালিককে সে কয়েকবার তার নামে ওটা লিখে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু লোকটা তা না করে অর্গানাইজেশনের অন্য এক সিনিয়র নেতাকে ধরে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত গিয়েছিল বিপদ থেকে বাঁচার চেষ্টায়।

বোকা লোকটা জানত না কিমবার কাছে অর্গানাইজেশনের সিনিয়র নেতাদের চেয়ে কম বয়সীরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ওদের পেশিশক্তিই তার

ক্ষমতার জিয়নকাঠি। তাই সিনিয়র নেতাকে পাত্তা না দিয়ে ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের নেতাটিকে জমির দখল নেয়ার অনুমতি দেয় কিমবা।

কাল রাতে তাই করেছে ইয়ুথ নেতা। জমির দখল নিতে এসে মালিক এবং তার একমাত্র ছেলেকে মেরে রেখে গেছে।

এলোপাতাড়ি গোলাগুলিতে মারাত্মক আহত হয়েছিল তার তিন বছরের নাতি। জাতিসংঘ হাসপাতালের ডাক্তাররা শিশুটিকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারেনি। সে-ও ভোরের দিকে মারা গেছে। রানা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন তিন প্রজন্মের তিন লাশ সৎকার করতে যাচ্ছে মৃত ইরুবার আত্মীয়রা।

সবার চোখ খটখটে শুকনো। সাহস করে কাঁদতেও পারছে না কেউ। একজন বয়স্ক, মোটা মহিলা ছিল এর ব্যতিক্রম। রংচঙে গাউন পরা মহিলাকে বাড়ির উঠানে পা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখল রানা। সারা শরীর, চুল ধুলোবালিতে একাকার।

মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার ফল। তার সামনেই এক সারিতে রাখা আছে মৃতদেহ তিনটা। বোঝা গেল মহিলা বাড়ির কর্ত্রী।

এক রাতের মধ্যে স্বামী, একমাত্র ছেলে এবং প্রিয় নাতীকে হারিয়ে শোকে পাগল হয়ে গেছে বেচারী। নীরবে বুক চাপড়ে মাতম করছে। থেকে থেকে আকাশের দিকে হাত তুলে কী সব বলছে। মুখ দিয়ে শব্দ বের হচ্ছে না। এক বিন্দু পানি নেই চোখে। মহিলার জন্য দুঃখ হলো ওর। বাকি জীবন এই অসহনীয় কষ্ট বুকে নিয়ে বাঁচতে হবে বেচারীকে।

ওখান থেকে সরে এল রানা। এসব দৃশ্য দেখা যায় না। হেঁটে হেঁটে শহর দেখে দিনটা পার করল ও। মাইলের পর মাইল হাঁটল। মতুবাও নিরলসভাবে অনুসরণ করে চলল দূর থেকে। গোমেজের কাছ থেকে ক্লারেন্সের একটা পুরনো সিটি ম্যাপ নিয়ে এসেছিল রানা। ঘোরাঘুরির ব্যাপারে বেশ কাজে লাগল জিনিসটা। স্থানীয়দের অনেকেই লক্ষ করল রানাকে, ওর ছবি তোলা দেখল। কিন্তু বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে। সবাই নির্বিকার। যে যার কাজে ব্যস্ত।

শহরের আবাসিক এলাকাগুলোর রাস্তাঘাট বলতে গেলে ফাঁকা। গাড়ি চোখে পড়ল অল্প কয়েকটা। পথচারীর অবস্থাও সেইরকম। অবশ্য বাণিজ্যিক এলাকার পরিস্থিতি ভিন্ন। ওসব জায়গায় বেশ ভিড়। কর্মব্যস্ততার অভাব নেই।

একটাই ব্যাংক শহরে। সাব মেশিনগানধারী কায়া ব্রিগেড পাহারা দেয়। দূর থেকে এক পলক দেখে মনে হলো সংখ্যায় মোটামুটি এক কুড়ি হবে ওরা। ব্যাংক থেকে কিছু ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাল রানা। কাজের ফাঁকে দ্রুত চারদিকে নজর বোলাতে গিয়ে অনেকগুলো বেড রোল দেখল লবিতে। পাশাপাশি সারি দিয়ে রাখা। ওগুলো সৈন্যদের হবে নিশ্চয়ই, ভাবল ও। তার মানে রাতে ভেতরেই থাকে তারা।

দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে। একটু খিদে খিদে ভাব নিয়ে ব্যাংক ছাড়ল রানা। গোমেজ বলেছিল ব্যাংকের কাছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে। ওদের রান্না মোটামুটি ভাল। রানা ইচ্ছে করলে ওখানে খেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ওর মন

তাতে সায় দিল না। মতুবা না থাকলে এক কথা ছিল।

ছেলেটা খালি পেটে সকাল থেকে অনুসরণ করছে ওকে। আড়াল থেকে লক্ষ রাখছে। ওকে অভুক্ত রেখে একা খাওয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না। একটা বেকারি থেকে দুটো কালো বানরুটি আর দু' প্যাকেট বিস্কিট কিনে কাঁধের ব্যাগে ভরল রানা। হাঁটা ধরল নির্জন কোনও জায়গার খোঁজে।

কয়েক পা যেতে আরেক ভাগীদার জুটে গেছে দেখল রানা। একটা কুকুর পিছু নিয়েছে ওর। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। হাঁপাচ্ছে। কী মনে করে ওর পিছু নিয়েছে কে জানে! রানা ঘুরে দাঁড়াতে কুকুরটাও থেমে পড়ল। মুখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ইশারায় ওটাকে ডাকল রানা।

কৃতার্থ হয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল কুকুরটা। ছায়ার মত পিছু নিল ওর।

বাণিজ্যিক এলাকা থেকে বেরিয়ে আসতে হাতের বাঁ দিকে একটা খোলা মাঠ পড়ল। মানুষজন নেই ধারেকাছে। দূরে সাগর চিক্‌চিক করছে। মাঠের কিনারায় একটা বড় গাছ দেখে ওটার ছায়ায় দাঁড়াল রানা। একটু পরই দেখা দিল মতুবা। হাত তুলে ওকে ডাকল রানা। কাছে আসতে একটা রুটি খেতে দিল। এক প্যাকেট বিস্কিটও দিল। ইশারায় খেয়ে নিতে বলল ওগুলো। কিছুক্ষণ বোকার মত তাকিয়ে থাকল মতুবা, তারপর গোগ্রাসে গিলতে লাগল রুটি আর বিস্কিট।

তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল রানা। ওইটুকুন পেটে কী পরিমাণ খিদে জমে ছিল ভাবতে গিয়ে মনটা ভার হয়ে উঠল। বাংলাদেশেও এরকম কত গরীব ছেলে সারাদিন না খেয়ে পথে পথে ঘোরে, কাগজ টোকায়। কেউ দয়া করে কিছু খেতে দিলে এমনি গোগ্রাসে খায়, নইলে অভুক্তই কাটে তাদের দিন। ভাবনাটা কয়েক মিনিটের জন্য অচল করে দিল ওকে। নিজেকে নিতান্তই ক্ষুদ্র, অপদার্থ মনে হলো।

গোমেজের কথা মনে মনে নাড়াচাড়া করল। দেশটা অনেক সম্ভাবনার দেশ, বলছিল সে। জনসংখ্যা অল্প, প্রয়োজন অল্প। খাদ্য-বস্ত্রসহ প্রত্যেকটা মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে খুব সহজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারত এরা।

নিজেদের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে নিতে পারত। কেবল ভাল একজন পরিচালকের প্রয়োজন ছিল। বিদেশ থেকে যে পরিমাণ সাহায্য আসে, তাতেও এরা দু' বেলা দু'টো খেয়ে-পরে বাঁচতে পারতো। যদি কিমবার পার্টি মেম্বাররা লুটপাট করে শুধু নিজেদের পেট না ভরাতো।

বাকি রুটিটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কুকুরটাকে খাওয়াল রানা। অবশিষ্ট প্যাকেট থেকে কয়েকটা বিস্কিট নিজে খেল। তারপর ব্যাগ থেকে মিনেরাল ওয়াটারের বোতল বের করে ঢক ঢক করে কয়েক ঢোঁক খেয়ে বাকিটুকু মতুবাকে দিল।

একটু বিশ্রাম নিয়ে এবার দূতাবাস পাড়ার দিকে চলল ও। ছয়-সাতটা দূতাবাস আছে এখানে। তার মধ্যে রাশানটাই বড় আর বেশি কর্মব্যস্ত মনে হলো। আমেরিকানটাও মোটামুটি ব্যস্ত, তবে রাশানটার মত নয়। এগুলোও কায়া ব্রিগেড পাহারা দেয়। ব্যাংকের গার্ডদের তুলনায় এরা আরও বেশি স্মার্ট,

আরও বেশি আধুনিক প্রশিক্ষণ পাওয়া। দেখলেই বোঝা যায়, আত্মবিশ্বাসের কোনও অভাব নেই এদের।

প্রতিটা দূতাবাস আধ ডজন করে সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু রাশানটার সামনে আছে কম করেও এক কুড়ি। শহরের আর সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সৈন্যদের বিশ-বাইশটা দলকে টহল দিতে দেখল রানা। সংখ্যায় সব মিলিয়ে শ' দেড়েক হবে।

কয়েকবার টহল পুলিশের সামনে পড়ল ও। ক্যামেরাওয়ালা টুরিস্ট দেখে ছবির জন্য পোজ দিল কেউ কেউ। কেউ বা হেসে মুখের সামনে হাত নিয়ে সিগারেট ফোঁকার ভঙ্গি করল। সবাইকে একটা করে সিগারেট দিল রানা, লাইটার জ্বেলে ধরিয়েও দিল। খুশি মনে নিজেদের পথে চলে গেল ওরা। সৈন্য বা পুলিশ, কারও মধ্যে আক্রমণাত্মক কোনও মনোভাব চোখে পড়ল না।

শেষ দুপুরের দিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছল রানা, ক্লারেন্সের পুলিশ বাহিনী আসলে কোনও বাহিনীই না। শহরে হেঁটে-চলে আর চেহারা দেখিয়ে বেড়ানো ছাড়া করার মত কাজ আসলে নেই ওদের। কিছু করার যোগ্যতা আছে কি না, সেটাও অবশ্য গবেষণা করে দেখার বিষয়।

এয়ারপোর্টে আগেরদিন যে পুলিশ দেখেছে, তাদের তবু কিছুটা মর্যাদা আছে মনে হয়েছে ওর। সম্ভবত আসতে-যেতে তাদের ওপরই বিদেশীদের বেশি চোখ পড়ে, তাই একটু আলাদা কদর করা হয় ওদের। এদের বেলায় ওসবের বালাই নেই।

রং চটা ইউনিফর্ম, আর্মস, ফিতে ছেঁড়া-কিনারা ফাটা ক্যানভাসের জুতো, চলন-বলন ইত্যাদি দেখলে মনে হয় এসব দেখার কেউ নেই। এদের মাউজার সেভেন পয়েন্ট নাইন টু বোল্ট অ্যাকশন রাইফেলগুলো বেশ পুরনো। পৃথিবীর আর কোনও দেশে ওগুলোর চল এখনও আছে কি না, জানা নেই রানার।

প্রশিক্ষণের মানও এদের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর। ওয়েপনস ফ্যামিলিয়ারাইজেশন বা অস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান বলতে যা বোঝায়, তা মোটেই নেই। এই বাহিনীটাকে আসলে কাঁধে অস্ত্র দিয়ে পথে নামানো হয়েছে কর্মবিমুখ, হতদরিদ্র সিভিলিয়ানদের মানসিক চাপে রাখতে, ধারণা করল ও।

কিমবার বিরুদ্ধে তাদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ ঠেকানোর চেষ্টায়। কিন্তু যতই রাইফেল নিয়ে ঘুর ঘুর করুক, সত্যি সত্যি লড়াইয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে যে এরা পিঠটান দিতে দেরি করবে না, তাতেও কোনও ভুল নেই।

একটু পরই রানার ধারণা সত্যি প্রমাণ হলো যখন দেখা গেল ওদের অ্যামিউনিশন পাউচ সমতল। অর্থাৎ ভিতরে এক্সট্রা ম্যাগাজিন নেই। পাউচ খালি! অবাক হয়ে ভাবল রানা। তার মানে মাউজারের ফিক্সড ম্যাগাজিনে যে পাঁচটা বুলেট থাকে, সেগুলো ছাড়া এক্সট্রা বুলেট নেই পুলিশ বাহিনীর কাছে? সেই পাঁচটা বুলেট আছে কি না, তা-ই বা কে জানে?

বিকেলের দিকে পোর্ট এলাকায় এল রানা। আগেরদিন আকাশ থেকে যেমন দেখা গিয়েছিল, আজ মাটি থেকে ঠিক সেরকম লাগল না জায়গাটা। গুবরে পোকার শিঙের মত সাগরের ভেতরে মাইলখানেক এগিয়ে যাওয়া সরু

বালুকাবেলা দুটো গোড়ার দিকে বিশ ফুটমত উঁচু, মাথার দিকে ছয় ফুট উঁচু। দুটো ধরেই হেঁটে হেঁটে শেষ মাথা পর্যন্ত ঘুরে এল রানা।

দুটো বালুকাবেলাই হাঁটু থেকে কোমর সমান উঁচু বুনো ঝোপঝাড়ে আবৃত। দীর্ঘ শুকনো মওসুমের কড়া রোদে পুড়ে বাদামী হয়ে আছে বলে আকাশ থেকে বোঝা যায়নি। মাথার দিকে চল্লিশ ফুট প্রশস্ত, গোড়ার দিকে চল্লিশ গজ। দু'টোরই মাথায় গিয়ে ক্লারেন্সের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। ওয়াটারফ্রন্টের অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হলো। ছবি তুলতে লাগল একটার পর একটা।

কংক্রিটের বিরাট জেটিটা রয়েছে বন্দরের ঠিক মাঝখানে। বেশ উঁচু সেটা। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বড় একটা ওয়্যারহাউস। ওর ডানদিকে, অর্থাৎ উত্তরদিকের শিং ঘেঁষে আছে পুরনো বন্দর। কয়েকটা কাঠের জরাজীর্ণ জেটি আছে সেদিকে। বুড়ো মানুষের দাঁতের মত কাঠামো থেকে খুলে খুলে পড়ছে। দক্ষিণে রয়েছে নুড়ি বিছানো সৈকত।

ওই শিঙের মাথা থেকে ওয়্যারহাউসের জন্য প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ দেখা যায় না। তবে অন্য শিঙের মাথা থেকে ওটার সর্বোচ্চ তলার পুরোটা দেখা যায়। ওটার বাইরের অংশ জেলেদের দখলে আছে। মাছ ধরার বোট উল্টো করে শুকোতে দেয়া আছে ওই অংশে। মাটিতে জাল শুকোতে দেয়া আছে। হেঁটে সেই অংশে চলে এল রানা। এদিকের ঢালটা চমৎকার। ওর কাজের জন্য আদর্শ জায়গা হতে পারে এদিকটা।

চিন্তিত মনে কংক্রিটের উঁচু চাতালে উঠে এল মাসুদ রানা। হাঁটতে হাঁটতে ওয়্যারহাউসের পিছনদিকে চলে এল। বেশ উঁচু জায়গাটা। এখান থেকে প্রায় পুরোটা প্রাসাদই স্পষ্ট দেখতে পেল ও, মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে। অফ হোয়াইট রঙের, লাল টালির ছাদওয়ালা বিশাল প্রাসাদ।

এখানে আরও একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করল ও। ওয়্যারহাউসের পিছনে একটা দরজা আছে। সেখান থেকে একটা ইঁট বিছানো রাস্তা বেশ খানিকটা ঢালু হয়ে প্রাসাদের দিকে চলে গেছে। ইংরেজি 'টি'-এর মত হয়ে গেছে প্রাসাদের কাছাকাছি গিয়ে। এক মাথা গেছে প্রাসাদের দিকে, এক মাথা শহরের দিকে আর সর্বশেষ মাথা রানার হোটেলের দিকে।

হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তা। বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিসপত্র ওয়্যারহাউস থেকে গাড়িতে করে সরাসরি প্রাসাদে নেয়া হয় এ পথে, ভাবল রানা। নইলে ওয়্যারহাউসের পিছনের দরজা আর এই রাস্তা, কোনওটাই থাকার কথা নয়। যুক্তি নেই। কারণ একটা রাস্তা ওয়্যারহাউসের সামনে আছে। একটু ঘুর পথে প্রাসাদের দিকে গেছে। পুরনো রাস্তা।

সামনে কেউ আছে কি না ভাল করে দেখে নিল রানা। নাহ্, নেই কেউ। ধীর পায়ে প্রাসাদের দিকে হাঁটতে লাগল ও। যত কাছ থেকে সম্ভব দেখতে চায় প্রাসাদটাকে। কিন্তু দু' মিনিট যেতে না যেতেই হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো চারজন সৈন্য। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও থামল না রানা। রাইট টার্ন করে হোটেলের পথ ধরল।

একেবারে না তাকালে সন্দেহজনক মনে হতে পারে, তাই একটু পর তাকাল লোকগুলোর দিকে। প্রেসিডেনশিয়াল বডিগার্ড বাহিনীর সদস্য ওরা। কায়া ব্রিগেডের স্মার্ট জওয়ান। কাঁধে কালাশনিকভ একে ফোর্টি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল। নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। চেহারায় ভাবের লেশমাত্র নেই। প্রেসিডেনশিয়াল বডিগার্ডরা সাধারণত যেমন অতি সতর্ক থাকে, এদের মধ্যে সেরকম কিছু দেখল না রানা। নিশ্চয়ই প্রেসিডেন্ট শহরে নেই বলে, ভাবল ও।

রানা হাত নাড়ল। কিন্তু বডিগার্ড বাহিনীর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ওরা অনড়। হাঁটতে হাঁটতে স্বাভাবিকভাবেই বাঁ দিকে তাকাল রানা। ওর মাত্র ত্রিশ গজ দূরে প্রাসাদের অফ হোয়াইট পেইন্ট করা দেয়াল। রাস্তাটা সামান্য উঁচু বলে ওপর দিয়ে ভেতরের অনেক কিছুই দেখা যায়।

প্রথমেই যে জিনিসটা রানার নজর কাড়ল, তা হলো নীচতলায় জানালা নেই একটাও। ইঁট বসিয়ে সবগুলো বুজে দেয়া হয়েছে। ভবনে ঢোকার মূল দরজাটার উপর চোখ আটকে গেল। বুঝতে অসুবিধা হয় না ওটাও নতুন সংযোজন।

অত্যন্ত পুরু কাঠের তৈরি আট ফুট উঁচু এবং পাঁচ ফুট প্রশস্ত দুই পাল্লার দরজা। গঠন প্রকৃতিই বলে ভিতর থেকে বিশাল লোহার পাত দিয়ে বন্ধ করা হয় ওটা। ইঁট দিয়ে বুজে দেয়া জানালার সামনে আগে টেরেস ছিল, এখন সেটা অর্থহীন হয়ে পড়েছে কারণ টেরেসে আসার কোনও উপায় রাখা হয়নি।

দোতলায় সামনের দিকে এক সারিতে মোট সাতটা জানালা আছে। তিনটা বাঁ দিকে, তিনটা ডান দিকে। বাকিটা মাঝখানে, প্রকাণ্ড কাঠের দরজাটার ঠিক উপরে। সর্বোচ্চ তলায় আছে দশটা জানালা, ছোটো ছোটো। দোতলার জানালাগুলোর শাটার আছে মনে হলো রানার। সম্ভবত লোহার। দূরে চলে এসেছে বলে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারল না।

ঘোরাঘুরির ছলে দূর থেকে প্রাসাদটার চারদিকে মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিল ও। পিছনদিকের সীমানা দেয়াল অবাক করার মত লম্বা। প্রাসাদের সামনে যতটা জায়গা, পিছনে তারচেয়ে কম করেও চার গুণ বেশি আছে। অন্তত আশি গজ দীর্ঘ হবে ওই অংশ, অনুমান করল রানা। এবং তার বেশ খানিকটা নতুন। বেশিদিন হয়নি তোলা হয়েছে।

কারণটা অনুমান করে নিল ও। আগের দিন প্লেন থেকেই দেখেছে প্রাসাদের পিছনের অংশে অনেকগুলো নতুন কাঠের ঘর তোলা হয়েছে। নিশ্চয়ই কিমবার বিশেষ বডিগার্ড বাহিনী, কায়া ব্রিগেডের ব্যারাক ওটা। সীমানা দেয়ালটা সবখানে সমান উঁচু—আট ফুট। উপরে ভাঙা কাঁচের টুকরো বসানো।

তবে যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি অবাক করল রানাকে, তা হলো সামনের ওই একটা ছাড়া প্রাসাদে আর কোনও গেট নেই। রাখেনি প্রেসিডেন্ট কিমবা। সব বিকল্প গেট দেয়াল তুলে বন্ধ করে দিয়েছে। দৈর্ঘ্যে অনুমান দুইশ' গজ, প্রস্থে একশ' পঁচিশ-ত্রিশ গজ এলাকার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস। তাতে ঢোকা ও বের হওয়ার গেট রাখা হয়েছে মাত্র একটা।

কিমবা লোকটা উজবুক—পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা। বিকল্প কোনও পথ

না রেখে নিজেকে সুরক্ষিত করেছে বলে ভাবছে সে। আসলে কাজ হয়েছে উল্টো। ইঁটের তৈরি মজবুত ফাঁদ বানিয়ে তার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে রাম ছাগলটা। এখন বিপদ এলে পালাতেও পারবে না। এই দেয়ালই কাল হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চিত হলো রানা—এখান থেকে হারবার দেখা যায় না। অনেক আগে ফরাসিরা সাগরের তীর ঘেঁষে বাঁধের মত তৈরি করেছিল। সেটা হারবার দেখার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের উপসাগর দেখা যায়, অথচ কাছের বন্দর দেখা যায় না বাঁধটার জন্য।

সন্ধে হয়ে আসছে দেখে হোটেলের পথ ধরল রানা। দিনভর অর্জন করা জ্ঞান মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মতুবা তখনও দূর থেকে অনুসরণ করে চলেছে। ছেলেটার ধৈর্য আর দায়িত্ববোধ দেখে ভারী অবাক হলো ও।

ডিনার সেরে বারে এসে বসল রানা। সময় কাটানো দরকার, কিছু ভাবনা-চিন্তাও করা দরকার। গোমেজ হাসির ভঙ্গি করল ওকে দেখে। হাত নাড়ল। রানাও নীরবে জবাব দিল। বসে পড়ল কোনার দিকের একটা খালি টেবিলে। অল্প ওয়াটের কয়েকটা নীল আলো জ্বলছে ভেতরে। খদ্দের বেশি নেই। নিরিবিলি, শান্ত পরিবেশ। ভালই লাগল।

আগেরদিন ওকে ফাঁদে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছে গোমেজ, কিন্তু রানা তাতে পা দেয়নি। ওর পরিচয় নিয়ে তার ধারণাটা সত্যি না মিথ্যে তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। স্রেফ না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেছে। ভালই কাজে লেগেছে ওষুধটা।

রানার পরিচয় সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছে লোকটা, এবং লেবু বেশি কচলে তেতো করার চেয়ে মুখে তালাচাবি এঁটে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে চেপে গেছে।

চীনা এমব্যাসির দুই কর্মচারীকে বিয়ার পান করতে দেখল রানা। মাঝে-মধ্যে কথা বলছে, হাসাহাসি করছে। রুমের আরেক কোণে আরও তিনজন খদ্দের আছে, ইওরোপিয়ান মনে হলো তাদের। ঠিক আটটায় উঠে পড়ল সবাই। গোমেজ বার বন্ধ করে রানার সঙ্গে উঠে এল উপরতলায়।

এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না, তাই খোলা ব্যালকনিতে পাতা চেয়ারে বসল রানা। গোমেজও বসল। হঠাৎ করে অন্ধকার গ্রাস করল ক্লারেন্সকে। বিদ্যুৎ চলে গেছে।

কথায় কথায় গোমেজের কাছ থেকে একটা নতুন তথ্য জানা গেল। কিমবা জাংগারোর জাতীয় বেতার কেন্দ্রের অফিস কিছুদিন আগে তার প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে ঢুকিয়েছে। বর্তমানে ওখান থেকেই রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচার হয়। প্রাসাদের বাইরে থেকে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও উপায় নেই।

বিষয়টা নিয়ে ভাবল রানা। অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদলের ক্ষেত্রে রেডিও সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ওটাকে তাই নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

পরের দু' দিনে আরও জানল রানা, কিমবার গোটা চারেক আর্মার্ড কার

থাকলেও ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে সেগুলো অচল। ওগুলোর মেইনটেন্যান্স কর্মীরা ছিল ইরুবা। সামান্য কারণে কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের এক পাতি নেতার মার খেয়ে পালিয়ে গেছে তারা।

সেই থেকে কারগুলো প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের পিছনের গ্যারাজে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া এদের আর্টিলারি পাওয়ার বলে কিছুই নেই। পুলিশ বাহিনীর সদস্য সব মিলিয়ে শ' চারেক হবে। সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী, দুটোই থাকে জাংগারো নদীর ওপারে নিজেদের ব্যারাকে। পাশাপাশি ব্যারাক। প্রাসাদ থেকে আধমাইলের মত দূরে। সৈন্য সংখ্যাও প্রায় ওই রকম। সব মিলিয়ে পাঁচ-ছয়শর বেশি না।

নৌবাহিনী নেই, বিমান বাহিনীও তথৈবচ। এক সময় কয়েকটা মিগ নাইনটিন ছিল, এখন সব অচল হয়ে পড়ে আছে। পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে আকাশে ওঠেনি একটিবারও।

সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা ও রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ানো সৈন্যরাও আছে। আর আছে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস পাহারা দেয়ার জন্য কিমবার বিশেষ বডিগার্ড বাহিনীর টেনেটুনে শ'খানেক কায়া।

এরা থাকে প্যালেস কমপাউণ্ডের পিছনদিকের কাঠের ঘরগুলোতে। সর্বসাকুল্যে এই হলো কিমবার পুঁজি।

রাশান সৈন্যরা তাকে পাহারা দেয় বলে যে ধারণা ছিল, সেটা সত্যি নয় বুঝতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেল রানা। ওদেরকে মোকাবেলা করতে হলে মুসিবত হয়ে যেত। অবশ্য কিমবার ভাণ্ডারে রাশান আধুনিক অস্ত্র আছে প্রচুর। প্রাসাদের পুরনো ওয়াইন সেলারে সেগুলো মজুত করে রেখেছে সে। সেলারের চাবি নিজের কোমরে গুঁজে রাখে সব সময়।

তিন দিনের দিন আর্মি আর পুলিশ বাহিনীর ব্যারাকের পরিস্থিতি দেখতে এল মাসুদ রানা। ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না, তাই ব্যারাক সংলগ্ন একটা খুদে গির্জায় ঢুকে পড়ল ও। সবার অলক্ষে বেল টাওয়ারে ওঠার ঘোরানো ইঁটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়ল। বেলফ্রাই দিয়ে নীচে উঁকি দিল।

ব্যারাক বলতে আছে স্কুল ঘরের মত মুখোমুখি, লম্বা দুটো দোচালা টিনের ঘর। দুটোরই সামনে লম্বা দড়িতে প্রচুর কাপড়চোপড় শুকোতে দেয়া আছে। একটা দোচালার শেষ মাথায় উন্মুক্ত কিচেন। বড় বড় পাত্রে স্টু রান্না হচ্ছে। ভিতরে লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে। বেশিরভাগই সিভিলিয়ান পোশাকে আছে। কে কোন্ বাহিনীর বোঝার উপায় নেই।

ঘোরাঘুরির ছলে পর পর তিনদিন প্রাসাদের ওপর সতর্ক নজর রাখল মাসুদ রানা। কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সব একই নিয়মে চলছে। একঘেয়ে।

কিন্তু পঞ্চমদিনে ঝামেলায় জড়িয়ে গেল রানা। ঠিক সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ চলে যেতে অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। এই সুযোগে প্রাসাদের দেয়াল কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছে জাগল ওর। কোথাও কোনও ট্র্যাপ ডোর আছে কি না নিশ্চিত হওয়া দরকার।

হোটেল থেকে প্রাসাদমুখী 'টি' রাস্তা ধরে এল রানা। প্রাসাদ ছাড়া কোথাও বিদ্যুৎ নেই। দু' পাশের বারগুলোয় প্যারাফিনের আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে একটা-দু'টো করে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলাল ও। চাঁদ উঠবে খানিক পর। আকাশে তার আভাস ফুটতে শুরু করেছে।

উঁচু রাস্তা ছেড়ে প্রাসাদের গ্রাউণ্ড লেভেলে নেমে পড়ল রানা। এদিকে কারও খেয়াল নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত। চারদিকে সতর্ক নজর রেখে লম্বা পায়ে এগিয়ে চলল ও দেয়ালের দিকে। একটা ভারী গুম গুম শব্দ আসছে। মাটি কাঁপছে শব্দটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ওটা প্রাসাদের জেনারেটরের শব্দ।

বিশ-পঁচিশ পা যেতে পেরেছে কি পারেনি, ডানদিক থেকে একটা নারী কণ্ঠের করুণ চিৎকার উঠল হঠাৎ। যেন প্রাণ ভিক্ষা চাইছে, 'না, না!' করছে। চমকে উঠে ব্রেক কষল রানা। অভ্যাসবশে হাত উঠে গেছে শোল্ডার হোলস্টারের দিকে, কিন্তু জিনিসটা সঙ্গে নেই খেয়াল হতে আত্মরক্ষার সহজাত ভঙ্গিতে দু' হাত সামনে বাড়িয়ে দিল। আঁধার ফুঁড়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল সামনে কী ঘটছে।

ওদিকে করুণ চিৎকারটার পরই প্রচণ্ড চটাশ! চটাশ! চড় মারার শব্দ উঠল। পুরুষ কণ্ঠের দুর্বোধ্য একটা হাঁক শোনা গেল, পরক্ষণে খসড় খসড় এবং মাটিতে পা আছড়ানোর আওয়াজের সঙ্গে জবাই করার পর পশুর গলা দিয়ে যেমন ঘড় ঘড় শব্দ হয়, সেই রকম আওয়াজ উঠল।

আওয়াজটা শোনামাত্র ঘাড়ের পিছনে খাটো খাটো চুলগুলো সর সর করে দাঁড়িয়ে গেল ওর। আকাশের গায়ে ফুটতে থাকা একটা কাঠামোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল কেউ একজন। ঠিক দাঁড়াল না, গ্যাস বেলুনের মত ভেসে উঠল অনেকটা। তার হাতে লম্বামত কী যেন। অ্যাসেগাই! তার পায়ের কাছে লম্বামত কিছু একটা পড়ে আছে। একটু একটু নড়ছে, থেমে আসছে নড়াচড়া। চোখের পলকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে।

ধর্ষণের পর জবাই। লোকটা যে-ই হোক, নিজের কাজে এতই মশগুল যে দুনিয়াদারির কথা মাথায়ই ছিল না।

হঠাৎ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা রানার উপর চোখ পড়ল তার। থমকে গেল। কয়েক মুহূর্ত স্থির তাকিয়ে থাকল। তারপর বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে এল। টলছে। পুরো মাতাল। আবছা আলোয় ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল কিমবার বডিগার্ড বাহিনীর সদস্য। অ্যাসেগাই সামনে বাড়িয়ে ধরে আছে। রানা অনড়।

চোখ আরেকটু সয়ে আসতে মাটির দিকে তাকাল ও। একটা নয়, দু'টো লাশ পড়ে আছে লোকটার পায়ের কাছে। একটা লাশ শিশুর। দুটোরই গলার কাছের মাটির রং কালো। তার মানে শিশুটিকেও জবাই করা হয়েছে! কেন কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করল ও, কিন্তু মাথাটা বিদ্রোহ করে বসল। গোলমাল হয়ে গেল সব। মুহূর্তের জন্য দিশাহারা বোধ করল রানা।

কিন্তু নিজেকে কঠোর হাতে দমন করল ও। শাসাল. এখন ওটার গরম হলে

চলবে না। ঠাণ্ডা রাখো ওটাকে। ঠাণ্ডা রাখো।

রানাকে অনড় দেখে লোকটা ভাবল ভয় পেয়েছে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এ দেশে সেটাই স্বাভাবিক। আরও দু' পা এগিয়ে এসে ঘোঁৎ করে উঠল। এই সময় উঁকি দিল চাঁদ। সামনের সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। লোকটাকে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দু' পা একটু ফাঁক করে দাঁড়াতে দেখল। আরেক হাঁক ছেড়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে অ্যাসেগাইটা দু' হাতে মাথার উপরে তুলতে শুরু করেছে।

ঠাণ্ডা রাখার নিকুচি করি!

অন্ধ হয়ে গেল রানা। বিদ্যুৎ-গতিতে এক পা সামনে এগিয়ে ফুটবলে কিক মারার মত ডান পা-টা চালাল, সর্বশক্তি দিয়ে দড়াম করে মারল জানোয়ারটার দু' পায়ের ফাঁকের মোক্ষম জায়গায়। 'ঘ্যাঁক' করে উঠল সে। অ্যাসেগাই ফেলে দু' হাতে জায়গাটা চেপে ধরল। চোখ বিস্ফারিত। অসহ্য যন্ত্রণায় ভাঁজ হয়ে গেছে।

মাথা খারাপ হয়ে গেছে রানার। পরের কিকটা কায়ার বাচ্চার উন্মুক্ত চিবুকের নীচে মারল, একই কায়দায়। ঠকাশ্ আওয়াজ করে ঠিক জায়গা মতই লাগল সেটা। ছায়াছবির দৃশ্যের মত দর্শনীয় ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল তার কোমরের উপরের অংশ। কুঁচকি ছেড়ে এক হাতে চোয়াল ধরতে গেল সে, এই সময় পা মাটিতে রেখে দাঁড়াল রানা। রাস্তায় পড়ে থাকা অস্ত্রটা তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার বুকের মাঝখানে গেঁথে দিল।

ঠেসে ভরে দিল যতদূর যায়। দু' হাতে বাঁট ধরা অবস্থায়ই লোকটার পেটে পা বাধিয়ে লাথি মারল ও, একই সঙ্গে হ্যাঁচকা টানে বের করে আনল অস্ত্রটা। আরও একবার কাজটা করতে গিয়েও থেমে গেল শেষ সময়ে। আর দরকার নেই।

রানার চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে লাগল লোকটা। শেষ মুহূর্তে ঝপ্ করে বসে পড়ল। দু' হাত দেহের পাশে ঝুলছে মরা সাপের মত। দুলছে। হঠাৎ কেশে উঠল খক খক করে। চিৎকার করার জন্য হাঁ করল, কিন্তু মুখ দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে এসে চিৎকারের পথ আটকে দিল। থোক করে একদলা রক্ত ফেলল লোকটা।

হাঁটু আর দু' হাতে ভর রেখে সামনে ঝুঁকল সে চারপেয়ে জন্তুর মত। তারপর যেন সেজদায় যাচ্ছে, এমনভাবে আস্তে আস্তে কপালটা ঠেকাল রাস্তায়। বুকের ক্ষত থেকে স্রোতের মত রক্ত বেরিয়ে আসছে। শব্দ হচ্ছে ছর ছর ছর ছর।

কিছুক্ষণ ওভাবেই থাকল লোকটা, তারপর দুই কনুই হঠাৎ বাইরের দিকে ভাঁজ হয়ে গেল। নিজের তাজা রক্তের পুকুরে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে। দু'-এক মুহূর্ত পর নীরবে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল, ঠিক একটা শিশুর মত।

দ্রুত এদিক-ওদিক চোখ বোলাল রানা। কেউ দেখেনি ঘটনাটা। এদিকে কেউ আসছেও না। অ্যাসেগাইটা রাস্তার পাশের ড্রেনে ফেলে দিল চট্ করে। পানিতে ওর হাতের ছাপ মুছে যাবে। যদিও এ দেশে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট আছে

বলে মনে হয় না। লাশটার কাছ থেকে সরে এসে জবাই হওয়া মেয়েটাকে দেখল রানা। পরনে কিছু নেই তার।

চাঁদের আলোয় কালো দেহ চিকচিক করছে। পাশে পড়ে ছিল হতভাগ্য মেয়েটার গাউন, ওটা দিয়ে ঢেকে দিল দেহটা। শিশুটার মুখও ঢেকে দিল।

এ দেশে ধর্ষণ কোনও বিষয় নয়। ধর্ষণের পর হত্যা, সেটাও না। কিন্তু এই নির্জন পরিবেশে কোলের বাচ্চা নিয়ে একটা মেয়ে কীভাবে এসে হাজির হলো, কীভাবে মাতাল গার্ডটার হাতে পড়ে দু'টো প্রাণ এমন আচমকা ঝরে গেল, বুঝতে পারল না।

কী করবে ভাবছে, এমন সময় প্রাসাদের দিকে একটা তৎপরতা চোখে পড়ল। কয়েকটা গাড়ি গিয়ে ঢুকল ভিতরে। ভারী গলার হাঁকডাক ও কর্মব্যস্ততা বেড়ে যেতে দ্রুত সরে পড়ার তাগিদ অনুভব করল রানা। এ অবস্থায় কারও চোখে পড়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কাজেই দ্রুত সরে পড়ল।

উম থাকাতি কিমবা ফিরেছে ক্রাল থেকে।

পরদিন গোমেজের মুখ থেকে প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে গেল রানা। লোকটা জানাল: চার-পাঁচদিন আগে ফায়ারিং স্কোয়াডে কিছু ইরুবা ও টিভের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। মৃতদের মধ্যে জবাই হওয়া সেই মেয়েটির স্বামীও ছিল। আর খুন হওয়া কায়া গার্ড ছিল মেয়েটার দেশী ভাই। স্বামীকে ছাড়িয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে তার কাছ থেকে মোটামুটি ভাল টাকা নিয়েছিল লোকটা।

পরে কাজ না হওয়ায় টাকা ফেরত চায় মেয়েটা। কাল সন্ধ্যায় তাকে টাকা নিতে আসার কথা বলে দিয়েছিল সে। তারপর কীভাবে কী ঘটে গেল কে জানে! এই নিয়ে সারা শহরে চাপা গুঞ্জন চলছে।

গোমেজের সঙ্গে নিভৃতে এক ঘণ্টার মত কথা বলল মাসুদ রানা। তারপর অক্লান্ত পরিশ্রম করার জন্য মতুবার হাতে একটা পাঁচশ' ফ্রেঞ্চ-আফ্রিকান ফ্রাঙ্ক নোট গুঁজে দিয়ে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল।

নয়

মানুষ সাধারণত দুই জগতের বাসিন্দা। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। বিশেষ করে পেশাগত জীবনে পা রাখার সময় সৃষ্টি হওয়া বিভেদ থেকে এই দুই জগতের উৎপত্তি হয়ে থাকে বেশিরভাগ সময়।

পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির কারণে যাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত, তারা বাদে অন্যদের পেটের দায়ে কোনও না কোনও ধান্ধায় জড়াতেই হয়। যাদের মামা-খালুর জোর থাকে, চাকরির ক্ষেত্রে তারা ভাল সুযোগ-সুবিধা পায়। যাদের থাকে না, তাদেরকে সন্ধি করতে হয় সাধারণ চাকরি-বাকরির সঙ্গে। এরা প্রথম জগতের সাধারণ মানুষ। স্ট্যাটাসবিহীন।

দ্বিতীয় জগতের বাসিন্দারা একটু ব্যতিক্রমী ধরনের হয়ে থাকে। সামর্থ্যের

অভাবে বাসনা পূরণ করতে না পারা, সমাজের নানান বঞ্চনা ইত্যাদি তাদের বেশিরভাগের মনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ফলে অনেকে অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায়। নেতিবাচক লাইনে চলে যায়।

কিন্তু তাদের মধ্য থেকেও যে অনেক সময় অনেক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে, এমন নজির প্রচুর আছে। আইনের চোখে তারা যা-ই হোক। এরা সমাজ বা আইনের সহযোগিতা পায় না, তাই তাদের অর্জন সীমিত থাকে। বরং 'ক্রুকেড্' বা বিপথগামী খেতাব পায় এইসব 'প্রতিভা'।

প্রথম জগতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যত মজবুত হয়, দ্বিতীয় জগতের প্রতিভারা তা ভাঙার তত কৌশল বের করে। আর সব ক্ষেত্রের মত কমপিউটারের ক্ষেত্রেও আছে এটা। কারও বহুদিনের সাধনার ধন, জটিল কোনও প্রোগ্রামিং বা অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড সফটঅয়্যার চুরি করে ওরা, কিংবা অনর্থক ভাইরাস ছড়িয়ে বরবাদ করে দেয়। এছাড়া পাসওয়ার্ডের জাল ছিন্ন করা, হ্যাকিঙের মাধ্যমে ভেতরের শাঁস বের করে নেয়া, এসব তো আজকাল এমনিতেই ডাল-ভাত।

মাসুদ রানা এ মুহূর্তে যার সামনে বসা, সে-ও এক প্রতিভা। তবে এই লোক উভচর প্রতিভা। হ্যাকিং বা কাউণ্টার হ্যাকিং, কোনওটাতেই তার সামনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। অঘোষিত ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন এ ক্ষেত্রে, মাইক্রোসফটের গ্লোবাল টেকনিকাল ও ট্যাকটিকাল চিফ সে। প্রতিভার তারকালোকের শুকতারা।

বাঙালি সে। বয়সে রানার চেয়ে কিছু ছোটো হবে। লম্বায় একই রকম। হালকা-পাতলা গঠন। লালচে চুল। চেহারা সাদামাটা। তবে মানুষটার চোখজোড়া দেখার মত। মনে হয় সারাক্ষণ বুদ্ধির ছটা বের হচ্ছে ও দুটো দিয়ে।

ঢাকায় গত শতাব্দীর শেষ দিকে তার পরিচিতি ছিল বিলাই হ্যাকার নামে। বাপের দেয়া নাম বাকি বিল্লাহ মেস জীবনের বন্ধুদের মুখে মুখে কখন যে বিলাই হয়ে গিয়েছিল, তার নিজেরও আজ মনে নেই। খুব গরীবের ছেলে ছিল সে। তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে পড়ত। থাকত আরামবাগের এক মেসে। ডিভি লটারির আবেদন পাঠিয়ে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখত।

টিউশনি করে খাওয়া-পরা আর লেখাপড়ার খরচ জোগাত। বাড়তি দু'টো টাকা রোজগারের জন্য মহল্লার এক রেডিও-টিভি মেরামতের দোকানে চুক্তিতে কাজও করত। গ্রাজুয়েশন করার পর চাকরির খোঁজে নামে বিল্লাহ, কিন্তু মামা-খালুর জোর না থাকায় অনেক চেষ্টার পরও সোনার হরিণটাকে ধরতে পারেনি।

এক সময় বিরক্ত হয়ে ভাবল চাকরির পিছনে আর ছুটবে না। কমপিউটার প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন ইত্যাদির কাজ কিছু কিছু আগে থেকেই জানা ছিল। ঠিক করল, সেসব আরও ভাল করে শিখে ব্যবসায়ে নেমে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে। এরপর পুরানা পল্টনের এক কমপিউটার স্কুলে ভর্তি হলো সে। তখনই প্রমাণ হয় বিল্লাহ কেবল একটা প্রতিভাই নয়, বিরল প্রতিভা।

কয়েক মাসের মধ্যে নানান প্রোগ্রামিং, কিছু কিছু সফটওয়্যার তৈরি,

গ্রাফিক্সসহ আরও কী কী সব মিলিয়ে কমপিউটারের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রের মহাওস্তাদ হয়ে উঠল সে। কয়েকটা কোম্পানির হয়ে আমেরিকার কিছু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির জন্য বড় ধরনের আউটসোর্সিঙের কাজও করল। মোট কথা যে কাজেই হাত দেয় সে, তাতেই ঈর্ষা জাগানো সাফল্য অর্জন করে।

সেই স্কুলে কিছু বন্ধু জুটে গেল বিল্লাহর। একদিন তাদের একজন ঠাট্টা করে বুদ্ধি দিল, 'সবই তো হলো। এবার হ্যাকিংটাও শিখে রাখ। কাজে লাগতে পারে।'

এসব যখনকার কথা, তখন বিশ্বের প্রায় সব দেশে হ্যাকিং আর হ্যাকারদের নিয়ে তোলপাড় চলছে। কিছুদিন পর পর ভাইরাস ছড়িয়ে বিশ্বের বেশিরভাগ কমপিউটার অচল করে দিচ্ছে তারা, প্রতিরোধকারীদের নাকের পানি চোখের পানি এক করে ছাড়ছে। তাই অনেকের কাছেই হ্যাকাররা তখন হিরো। মিডিয়া সরব তাদের নিয়ে। অতএব বুদ্ধিটা মনে ধরল বিল্লাহর। নির্দোষ মজা হিসেবেই নিল সে ব্যাপারটাকে।

আরেক বন্ধুর বুদ্ধিতে নীলক্ষেতের বাকু শাহ মার্কেটের এক 'ওস্তাদের' কাছে হ্যাকিং-এ হাতেখড়ি নিল বিল্লাহ। ক্রমে বিলাই হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যে শিখে ফেলল কিছু কিছু কাজ। তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালাল। বন্ধুরাও পরীক্ষার ছলে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কমপিউটারে হানা দিতে বলল। দেখা গেল তাতেও ভালভাবেই উৎরে গেছে।

এরপরই বিপদে পড়ে গেল বিল্লাহ। এক রবিবার সন্ধ্যার পর কয়েক বন্ধু মিলে বেড়ানোর নাম করে উত্তরার এক নির্জন বাড়িতে নিয়ে গেল তাকে। বিদেশী স্টাইলের দোতলা বাড়ি। ফাঁকা ছিল সে সময়। লোকজন নেই।

দোতলায় নিয়ে যাওয়া হলো বিল্লাহকে। এ-কথা সে-কথার পর বন্ধুদের একজন জানাল, পরের বৃহস্পতিবার গুলশান দুই নম্বরের অমুক বিদেশী ব্যাংকের লকার খোলার ব্যবস্থা করে দিতে হবে তাকে। কমপিউটার কন্ট্রোলড লকার। কাজটার বিনিময়ে নগদ পাঁচ লাখ টাকা পাবে সে।

চমকে উঠল বিল্লাহ। মজা করতে গিয়ে নিজের কতবড় বিপদ ডেকে এনেছে বুঝতে পেরে আহাম্মক হয়ে গেল। কিন্তু তখন ভুল শোধরানোর উপায় ছিল না। তখন সে ওদের মুঠোয়। এদিক-ওদিক হলে প্রাণটা খোয়াতে হতে পারে। এক কথায় রাজি হলেও সন্দেহ হতে পারে ওদের, তাই প্রথমে একটু আঁইগুঁই করল বিল্লাহ। তারপর রাজি হওয়ার ভান করল।

ভেবেছিল ও রাজি আছে জানলে বন্ধুরা আটকে রাখবে না। ছেড়ে দেবে। কিন্তু ভুল ভেবেছিল। ছাড়া হলো না বিল্লাহকে। বলা হলো, বৃহস্পতিবার কাজটা শেষ করে যেখানে খুশি যেতে পারবে সে। তার আগে না। কমপিউটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হলো বিল্লাহকে। পায়ে শেকল পরিয়ে চেয়ারের পায়ার সঙ্গে তালা মেরে আটকে দেয়া হলো।

দু'দিন বিষয়টা নিয়ে অনেক মাথা ঘামাল বিল্লাহ। গরীবের ছেলে বলে দু' বেলা পেটের ভাত জোগাতে জীবনে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে তাকে। এত কষ্ট, যা অনেকে কল্পনাও করতে পারবে না। এমন দিনও গেছে, শুধু পানি খেয়ে

কাটিয়েছে। তবু অসৎ পথে টাকা রোজগারের কথা কখনও মাথায় আসেনি বিল্লাহর। আসেনি কারণ তার চিন্তার দৌড় সীমিত।

বেড়ার এপাশে থাকতে চায় ও। ওপাশের অন্ধকার, অনিশ্চিত জীবনের টানে ভেসে যেতে চায় না। কখনও ভুলেও চায়নি। 'বন্ধুদের পরামর্শে' ভিমরতিতে ধরেছিল বিল্লাহকে, তাই হ্যাকার হতে গিয়েছিল। কিন্তু আর না। জীবন গেলেও তাদের এই দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করবে না সে।

মঙ্গলবার সকালে ঘুম ভাঙতে ঠিক করল—রাতে বাথরুমের জানালা গলে পালাবে। তারপর পিছনের পাইপ বেয়ে একবার নেমে যেতে পারলে তাকে আর পায় কে! বাথরুমে যাওয়ার সময় পা থেকে শেকলটা খুলে নেয়া হয় বলে ওই সময়টাতেই একটু স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে পারে সে। কাজেই সুযোগটা তখনই নিতে হবে। তারপর যা থাকে কপালে।

ভাগ্যই বলতে হবে তার, ওইদিন সন্ধ্যার পর পরই শুরু হলো আকাশ ফুটো করা বজ্রবৃষ্টি। রাতে শুতে যাওয়ার আগে বাথরুমে যেতে চাইল বিল্লাহ। তাস খেলায় ব্যস্ত এক 'বন্ধু' শেকল খুলে পৌঁছে দিল ওকে। ঢোকার সময় বুদ্ধি করে তার কাছ থেকে একটা সিগারেটও চেয়ে নিল সে, ভেতরে বসে টানবে। এতে কিছুটা বাড়তি সময় পাওয়া যাবে।

চার-পাঁচ মিনিটের মরিয়া চেষ্টার পর জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল বিল্লাহ। পানির পাইপ বেয়ে নেমে এল। ওই বাড়িতে যে একটা বিদেশী কুকুর আছে, জানা ছিল না তার। তবে বৃষ্টির ভয়ে সে সময় বারান্দায় গুটিশুটি মেরে শুয়েছিল ওটা। বিল্লাহকে যখন দেখতে পেল, ও তখন নাগালের বাইরে চলে গেছে। এক দৌড়ে সামনের গেটের ওপরে গিয়ে চড়ে বসেছে।

কুকুরের ডাকাডাকি শুনে সবাই বেরিয়ে এল, তাড়া করল ওকে। সেদিন জীবনের সেরা দৌড়টা দিয়েছিল বিল্লাহ। যদিও প্রাণের ভয় আর প্রবল বৃষ্টিতে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে, কোন্‌দিকে যাচ্ছে হুঁশ ছিল না।

একটু পর ঢাকা-টঙ্গী রোডের কাছে পৌঁছল সে। পিছনে 'ছপাৎ, ছপাৎ!' শব্দ তুলে ছুটে আসছে 'বন্ধুরা', তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দু'টো গুলির শব্দ কানে এল। পরক্ষণে মাঝপিঠে হাতুড়ির বাড়ি খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল বিল্লাহ। বুঝল গুলি লেগেছে।

দম বন্ধ হয়ে এল। মৃত্যুভয়ে হাত-পা কুঁকড়ে যেতে চাইল, কিন্তু হাল ছাড়েনি সে। মরিয়া হয়ে মাটি খাবলে ধরে, হাঁটু দিয়ে ঠেলে নিজেকে রাস্তার দিকে কয়েক গজ এগিয়ে নিল।

জানে, পালাতে না পারলে ওরা প্রাণে মেরে ফেলবে। তাই যে ভাবে হোক... গায়ের ওপর একটা তীব্র আলো পড়তে দেখে অনেক কষ্টে ঘুরে তাকাল বিল্লাহ।

একটা গাড়ি!

এয়ারপোর্টের দিক থেকে ঝড়ের গতিতে এদিকেই আসছে। অনেক কষ্টে একটা হাত তুলল সে। আরও একটা গুলি হলো পিছনে। গাড়িটা এসে থামল। চোখের সামনে একজোড়া চকচকে কালো শু দেখতে পেল বিল্লাহ, পরমুহূর্তে কে

যেন এক টানে গাড়িতে তুলে নিল তাকে। তারপর সব অন্ধকার।

দু'দিন পর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরল বিল্লাহর। জানল, মরতে মরতে বেঁচে গেছে সে এ যাত্রা। গুলিটা আরেকটু বাঁ দিক ঘেঁষে লাগলে সোজা হার্টে গিয়ে বিঁধত।

নতুন জীবনদাতার সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম মাসুদ রানা। ওই দিন লণ্ডন থেকে ঢাকায় ফিরছিল ও। এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় যাওয়ার পথে... ইত্যাদি।

পুরো ঘটনা শুনল রানা। বিল্লাহর বন্ধুরা একে একে ধরা পড়ল। এদিকে তার কাজ দেখে রানার চক্ষু চড়কগাছ। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে ওর জন্য চাকরির চেষ্টা করবে কি না ভাবছিল, এই সময় ডিভি লটারি জয়ী হওয়ার সুখবর নিয়ে আমেরিকান এমব্যাসির চিঠি এল। স্বপ্ন পূরণের দেশে পাড়ি জমাল বিল্লাহ, সাধ্যমত সহযোগিতা করল রানা।

সাত বছর হলো ঢাকা ছেড়ে এসেছে সে। কিন্তু রানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। প্রায়ই টেলিফোনে কথা হয় ওদের। বিল্লাহর সমস্ত খবর রানার নখদর্পণে। মাইক্রোসফটে যোগ দেওয়ার সুবাদে লোকটার প্রতিভা যে আরও বহু গুণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, জানা ছিল রানার।

তাই দেরি না করে মনরোভিয়া থেকে প্যারিস হয়ে চলে এসেছে সিলিকন ভ্যালিতে। কারণ ওর বিশ্বাস, এই কঠিন বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করতে পারবে বিল্লাহ।

মাসুদ রানা সশরীরে উপস্থিত হওয়ায় বিস্ময় কাটিয়ে সুস্থির হতে অনেক সময় লেগেছে বিল্লাহর। তারপর আসার কারণ শুনে হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। তারপর মহা লাফঝাঁপ শুরু করে দিয়েছে। 'কী সর্বনাশ! বলেন কী, মাসুদ ভাই! এটাকে তো এখনই ইনঅ্যাকটিভেট করা দরকার।'

বাঙালি এক লেডি ডাক্তারকে দিয়ে কয়েক ধরনের এক্স-রে করাল সে রানার মাইক্রোচিপ সার্কিট বসানো জায়গাটার। নিজে বিভিন্ন মিটারওয়ালা যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল জিনিসটা কী ধরনের, তৈরি করতে কোন্ কোন্ কম্পোনেণ্ট ব্যবহার করা হয়েছে, কী ধরনের রিডিং পাওয়া যায় ইত্যাদি।

তিন ঘণ্টা পর রায় দিল বিল্লাহ, জিনিসটার প্রকৃতি সম্পর্কে আইডিয়া করতে পারছে, তবে নিশ্চিত হতে কিছু দিন সময় লাগবে। কয়েকটা ব্যাপারে গবেষণা করতে হবে তাকে।

রানা ঠিক কী চায় বুঝিয়ে বলল। শুনে চোখ কপালে উঠে গেল যুবকের। 'বলেন কী, মাসুদ ভাই! ওগুলো যেমন আছে তেমনি থাকবে?'

'শুধু একটা বাদে।'

'কিন্তু... কিন্তু আমি তো...'

'কেন এ-কথা বলছি, তার উপযুক্ত কারণ আছে, বিল্লাহ। পরে তোমাকে সব খুলে বলব। ঠিক আছে?' একটা ভিজিটিং কার্ড টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল রানা। 'তুমি পরীক্ষা চালিয়ে যেতে থাকো। আমি যা বললাম সেটা সম্ভব হলে সবচেয়ে ভাল হয়। যদি না হয়, তা হলে হয়তো সবই ইন্যাকটিভেট করার চেষ্টা করতে হবে। কার্ডে আমার সেল নাম্বার আছে। দরকার হলে যোগাযোগ করতে পারবে।'

'মানে?' কার্ড নিল সে। 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'
রানা হাসল। 'আপাতত প্যারিসে। আর তিন ঘণ্টা পর আমার ফ্লাইট।'
বসা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বিল্লাহ। 'কী উল্টাপাল্টা বলেন? পাগল নাকি? এই অবস্থায় আপনাকে যেতে দেব ভাবলেন কী করে? অসম্ভব! আপনি...'
রানা হাত তুলতে থামল সে। 'শোনো। এটা বিপজ্জনক আমি জানি। তার প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু এখনই আমার কোনও ক্ষতি হবে না। ক্ষতি যদি কিছু হয়, অন্তত তিন মাস পরে হবে। এখনই অস্থির হওয়ার কিছু নেই।'
'তিন মাস পরে মানে? সময় বেঁধে দিল কে?'
অনেক রেখেঢেকে ঘটনা সম্পর্কে তাকে সামান্য কিছু আভাস দিতেই হলো। রানা বুঝিয়ে বলল, বিষয়টা গোপনীয়। গোপনই রাখতে চায় ও। এবং এখনই এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই।
'তাই?'
'তুমি ধীরেসুস্থে জিনিসটার ব্যাপারে কী করা যায়, ভেবে বের করার চেষ্টা করতে থাকো। তারপর দুজন মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে। কী বলো?'

বিল্লাহ যে সমস্ত এক্স-রে আর টেস্ট করেছিল, সবগুলোর ডুপ্লিকেট কপি অ্যাটাশে কেসে ভরে উঠতে যাচ্ছিল রানা। এমনি সময়ে প্রবল বেগে কাঁপতে শুরু করল ডান হাতটা।
'এই শুরু হলো!' বিড়বিড় করে বলল ও। অন্য হাতে জায়গাটা চেপে ধরে বসে পড়ল চট্ করে। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ বুজে বসে থাকল।
'কী...?' অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বিল্লাহ। প্রথমে বুঝতে পারেনি কী ঘটছে। একটু পর রানার কপালে ঘাম ফুটতে শুরু করেছে দেখে অনুমান করল। উঠে দাঁড়াল অজান্তেই, ডেস্কের ওপর দিয়ে ঝুঁকে এল। কী করবে বুঝতে পারছে না।
দুই মিনিট পর থামল রানার কাঁপুনি, তারপরই শুরু হলো দ্বিতীয় ধাক্কা। দ্রুত গরম হয়ে উঠল হাত। চামড়ার নীচ দিয়ে জ্বলন্ত লাভার ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল যেন। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করল কিছুক্ষণ ও, গোঙাচ্ছে অজান্তেই।
চেয়ারে বসে একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ছে না। একটু পর রানাকে সুস্থির হতে দেখে মুখ খুলল সে। ভীষণ গম্ভীর, থমথমে কণ্ঠে চিবিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। আপনি যান। আমি আজ, এই মুহূর্ত থেকে এটার পিছনে লাগলাম। কসম করে বলছি, যে-শালা এই জিনিস বানিয়েছে, তার ... দিয়ে ওটা ভরে না দেয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব না।'
এত পথ ছুটে আসা বিফলে যায়নি দেখে মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল মাসুদ রানার। প্রবল আত্মবিশ্বাসের বলে বলিয়ান হয়ে একই দিনে দ্বিতীয় দফা আটলান্টিক পাড়ি দিল ও।

ক্লারেন্স ছেড়ে আসার চারদিন পর, লণ্ডন সময় সন্ধে সাড়ে ছয়টায় হিথরোয়

নামল রানা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্যারিস-টু-লণ্ডন ফ্লাইট থেকে।

তারও চারদিন পর, শেষ বিকেলে ওয়াল্টার হ্যারিসের হাতে জাংগারো অভিযান সম্পর্কে নিজের ছয় শিটের খামবন্দি মূল্যায়ন তুলে দিল। ওটা খামে ভরার সময় খুব ইচ্ছে করছিল প্রাপকের নামের জায়গায় লেখে: ফর হের রুডলফ গুন্থার'স আইজ ওনলি। পরে ইচ্ছেটাকে দমন করে হ্যারিসের নামই লিখল।

খামটা হাতে পেয়েই খুলল গুন্থার। দ্রুত চোখ বোলাল টাইপ করা শিটগুলোয়। ভাগ ভাগ করে কয়েকটা হেডে রিপোর্টটা লিখেছে রানা। শিটগুলো গুনে দেখে চেহারা ঝলমল করে উঠল তার। হ্যাঁ, কাজ বোঝে লোকটা, সত্যিই।

নিরিবিলিতে মন দিয়ে পড়বে বলে ওটা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল পাইরেট। বাসায় ফিরে কোনওমতে ডিনার সেরে স্টাডিতে বসল এসে। একটা চুরুট ধরিয়ে খাম থেকে বের করল রিপোর্টটা। ওটা শুরু হয়েছে এভাবে:

অভিযান: অভ্যুত্থান সফল করার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হবে অভ্যুত্থান পরবর্তী বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়া। সংশ্লিষ্ট দেশের দুই পাশে লাইবেরিয়া ও আইভোরি কোস্ট, দুটোই গণতান্ত্রিক দেশ। যথেষ্ট উন্নত। সামরিক শক্তির দিক থেকেও ...র তুলনায় অগ্রগামী। তাদের যদি মনে হয় ...র রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে দেশ দু'টি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নিজেদের সেনাবাহিনী মার্চ করিয়ে দিতে পারে। তেমন পরিস্থিতি এড়াতে আয়োজকদের অভ্যুত্থানের পরপরই নতুন একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। নইলে বিপদ ঘটবে।

একটা ধাক্কা খেল জার্মান ব্যারন। দিব্য চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। এসব নিয়ে তো মাথা ঘামানো হয়নি! ভাবল সে। এ সব আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয় তো তার জ্ঞানের বাইরে! এ লাইনের চিন্তা একেবারেই করা হয়নি। ঠিকই তো বলেছে লোকটা। পরের প্যারায় মন দিতে বেশ কিছুক্ষণ লাগল তার।

অভিযানের রুট: আকাশপথ। বাইরে থেকে অন্য এক দেশে গিয়ে কম্যাণ্ডো হামলা চালাতে আকাশপথে যাওয়ার বিকল্প নেই। কিন্তু... এয়ারপোর্টের অবস্থা সুবিধার নয় বলে এ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না। ছোটো প্লেন ব্যবহার করা গেলে হয়তো পারা যেত, কিন্তু রিফুয়েলিং ছাড়া টানা কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা ছোটো প্লেনের থাকে না। প্রতিবেশী কোনও দেশের সহায়তা পেলেও চলত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাতেও অসুবিধা আছে। পঞ্চাশ-ষাটজন সন্দেহজনক আরোহীবাহী প্লেন যে দেশেই ল্যাণ্ড করুক, কর্তৃপক্ষ আটকে দেবে। বিশেষ করে যেখানে ...র সঙ্গে প্রতিবেশী কারও সদ্ভাব নেই।

সড়কপথ। সড়কপথে গেলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হবে। কারণ লাইবেরিয়া বা আইভোরি কোস্ট হয়ে ঢুকতে গেলে মানুষ-অস্ত্রশস্ত্র, সবকিছু

তাদের বর্ডার গার্ড বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে ঢোকাতে হবে। কিন্তু তা অসম্ভব। এভাবে গার্ডদের ফাঁকি দেয়া যাবে না। ...র উপকূলীয় অঞ্চলের কোথাও পৌঁছে সেখান থেকে হেঁটে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ ...র তিনদিকের উপকূল ঘন গরান বন দিয়ে ঘেরা। তাই ওদিক দিয়ে পৌঁছারও কোনও উপায় নেই।

চোরা সীমান্তপথ দিয়ে মানুষ কিংবা অস্ত্র চালান করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। কারণ কমাণ্ডোরা হবে বহিরাগত। তাদের গায়ের রং, ভাষা, প্রকৃতি, সবকিছুই ভিন্ন হবে। সহজেই স্থানীয়দের নজর কাড়বে তারা। তা ছাড়া এ পথে সফল হতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের ভিতর থেকে স্থানীয় কোনও সশস্ত্র সংগঠনের সহায়তা পাওয়া জরুরি। কিন্তু কনসোর্টিয়ামকে সেই ধরনের সহায়তা করার কেউ নেই বলে সেটাও সম্ভব নয়।

অতএব এ ক্ষেত্রে একমাত্র পথ হচ্ছে জাহাজে করে ...র বহির্নোঙ্গরে পৌঁছে ছোটো ছোটো আউটবোর্ডে ...র হারবার হয়ে তীরে ওঠা এবং অন্ধকার গভীর রাতে আক্রমণ চালানো। অবশ্যই সূর্যোদয়ের আগে মিশন শেষ করতে হবে কমাণ্ডো বাহিনীকে স্থানীয়রা যাতে বুঝে উঠতে না পারে এসবের পিছনে বিদেশীদের হাত রয়েছে।

অ্যাসল্ট ক্র্যাফট: ভেসেল চার্টার করা হলে সেটার পে-রোলভুক্ত কর্মচারীদেরকে দিয়েই কাজ চালাতে হয়। ... মিশন যেহেতু জটিল, সেহেতু এ-ক্ষেত্রে তাদের যে-কোনও একজনের জন্য গোটা মিশনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তার উপর ওই অঞ্চলে সেই ভেসেলের কোনও দুর্নাম থাকলে আরও বেশি সমস্যা। যখন-তখন ভেসেল সার্চ করার নামে যে কোনও দেশের নেভাল শিপ হাজির হতে পারে। এতে সঙ্গে থাকা হার্ডওয়্যারের অস্তিত্ব ফাঁস হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। তাই ভাড়া করা ভেসেল ব্যবহার করা যাবে না। একটা মাঝারি আকারের ফ্রেইটার কিনে নিতে হবে।

এরপর রয়েছে বিভিন্ন অস্ত্র আর গোলা-বারুদের ফিরিস্তি, রেডিও এবং তার অ্যানসিলারি বা সহায়ক ইকুইপমেণ্টস, আউটবোর্ড ইঞ্জিন, ফ্লেয়ার, ইউনিফর্ম, ওয়েবিং, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য রসদ সামগ্রীর বিবরণ এবং প্রতিটা আইটেম কী পরিমাণ দরকার ইত্যাদি।

তারপর মিশন কমাণ্ডারের একা কাজ করার স্বাধীনতা প্রসঙ্গ। সেটা এরকম—

হার্ডওয়্যার ক্রয় ও কমাণ্ডারের নিরাপত্তা: ওয়াল্টার হ্যারিস ছাড়া তার বিজনেস কনসোর্টিয়ামের বাকি সদস্যরা কমাণ্ডারের অপরিচিত। নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টা এই দু'জনের মধ্যেই সীমিত রাখতে হবে—একটা পর্যায় পর্যন্ত। দু' পক্ষের মধ্যে যোগসূত্রের দায়িত্ব পালন করবে হ্যারিস। প্ল্যান নিয়ে কিছু বলার থাকলে বলতে পারবে সে, কিন্তু কমাণ্ডারের কাজে খবরদারী করতে পারবে না। তাতে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। মিশনের পূর্ণ

নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে কমাণ্ডারের হাতে। মিশনের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কালোবাজার থেকে নগদ টাকায় কিনতে হবে। এ ব্যবসায়ে মানি রিসিটের কারবার নেই। কাজেই ওগুলো পাওয়া যাবে না। কেনাকাটার সময় প্রথমত নিজের নিরাপত্তা, দ্বিতীয়ত ডিলারদের নিরাপত্তা, এই দুইয়ের স্বার্থে এ কাজ কমাণ্ডারের সম্পূর্ণ একা করার সুযোগ থাকতে হবে। হ্যারিস্ বা আর কারও থাকা চলবে না। কারণ, সেখানকার ডিলাররা অচেনা কারও সামনে মুখ খুলবে না। বরং অবাঞ্ছিত কেউ নাক গলানোর চেষ্টা করলে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। তখন সারা ইওরোপ ঘুরেও একজন ডিলারের খোঁজ পাওয়া যাবে না। কনসোর্টিয়াম ইচ্ছে করলে এই সতর্কতা অগ্রাহ্য করতে পারে। সে-ক্ষেত্রে খালি হাতে বাজার থেকে ফিরতে হলে তার দায়-দায়িত্ব তাদেরকেই নিতে হবে।

থামল পাইরেট। থেমে থেমে আরও দু'বার পড়ল এই অংশটা। চোখমুখ কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর সম্মতি জ্ঞাপনের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। ঠিকই আছে। তারপর শেষ প্যারায় মন দিল।

হ্যারিসের সঙ্গে কমাণ্ডারের যোগাযোগ রক্ষা করার স্বার্থে কনসোর্টিয়াম আনসারিং মেশিনসহ আনট্রেসেবল টেলিফোন ইনস্টল করবে একটা, যাতে যখনই প্রয়োজন পড়বে তখনই ওই নাম্বারে ফোন করে মেসেজ দিতে পারে কমাণ্ডার।

এরপর পুরো মিশনের খরচের খাতওয়ারি একটা হিসাব এভাবে দিয়েছে ও:

মিশনে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন পার্সোনেলের ফি...
মোট প্রশাসনিক ব্যয় : যাতায়াত, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি...
হার্ডওয়্যার ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ব্যয়...
ভেসেল ক্রয় বাবদ ব্যয়...
সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়...
রিজার্ভ...

তারপর মিশন শেষ করার সময়সীমার হিসাব এভাবে লিখেছে রানা :

প্রিপারেটরি স্টেজ: পার্সোনেল নিয়োগ ও একত্রিত করা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সেটিং ইত্যাদি—২০ দিন
পার্চেজিং স্টেজ: প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়—৪০ দিন
অ্যাসেম্বলি স্টেজ: জাহাজে যন্ত্রপাতি ও পার্সোনেলদের তুলে নিয়ে যাত্রা করা—২০ দিন
শিপমেন্ট স্টেজ: নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছানো—২০ দিন

সব মিলিয়ে ১০০ দিন।

কমাণ্ডারের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হওয়ার দিন থেকে এই গণনা শুরু হবে। এ ব্যাপারে রানা পরামর্শ দিয়েছে, এত বড় অংক কোনও নতুন অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামে একবারে জমা হলে কারও সন্দেহ জাগতে পারে। তাই টাকাটা ছয়টি সমান কিস্তিতে জমা করতে হবে। কখন পরবর্তী কিস্তি জমা করতে হবে, তা কমাণ্ডার জানিয়ে দেবে।

সামারি দিয়ে রিপোর্টটা শেষ করেছে রানা। সেটা সাজিয়েছে এভাবে : '...কে ক্ষমতাচ্যুত করা অসম্ভব হবে না, তবে খুব কঠিন হবে নিঃসন্দেহে। কারণ সে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত মানুষ। কাউকে বিশ্বাস করে না। প্যালেসের মধ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ পাওয়া বডিগার্ড বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে সারাক্ষণ প্রায় বন্দি করে রাখে নিজেকে। ওই নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে তাকে খতম করতে কম করেও এক কুড়ি কমাণ্ডোর প্রয়োজন হবে। বাকি কমাণ্ডোরা তার গার্ড বাহিনীকে খতম করবে।

'নিখুঁত আক্রমণ পরিকল্পনা ও ভাগ্য, দুটোরই সমান প্রয়োজন পড়বে কমাণ্ডো বাহিনীর। নইলে ...কে হত্যা করা গেলেও কমাণ্ডোদের নিরাপদে সরে আসা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই এক্ষেত্রে নিখুঁত এসকেপ প্ল্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কাজ শেষে নিরাপদে সরে আসার নিশ্চয়তা না থাকলে কেউ তাতে অংশ নেবে না। তবে এ-ধরনের কাজে ক্যাজুয়াল্টিজ হতেই পারে। যদি কেউ নিহত বা আহত হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

'এ ক্ষেত্রে এস্কেপ রুট হিসেবে মিশন শেষে নতুন সরকার গঠন বোঝানো হয়েছে। নতুন সরকারই তাদের রক্ষাকবচ হবে।

'ওই প্যালেস অতীতে ঔপনিবেশিক গভর্নর হাউস ছিল। অত্যন্ত সুরক্ষিত। দেয়াল খুবই পুরু। প্রবেশ পথও মজবুত। অতর্কিত হামলা চালিয়ে গোটা প্রাসাদ কমপ্লেক্স, ...র গার্ড বাহিনী, অস্ত্র ভাণ্ডার, ট্রেজারি ও রেডিও স্টেশন, সবকিছু একসঙ্গে কবজা করতে হবে। সেটা খুব বেশি অসুবিধার ব্যাপার হবে না, উল্লিখিত সবকিছু এক ছাদের নীচেই রয়েছে।

'যে কোনও মূল্যে ...কে ও তার বডিগার্ড ব্রিগেডকে প্রাসাদ কম্পাউণ্ডেই ধ্বংস করতে হবে। তারা প্রেসিডেন্টকে দেবতার মত ভক্তি করে। তার মুখের কথায় বাঁচে-মরে। ...র জন্য নিজ হাতে বুক চিরে কলজেটা বের করে তার পায়ে অর্পণ করতেও দ্বিধা করবে না।

'এ ধরনের একটা বাহিনী যদি ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগ পায়, তা হলে সেটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেবে। তাই সুদক্ষ কমাণ্ডো বাহিনী ছাড়াও টেকনিকাল পর্যায়ের সর্বাধুনিক লজিস্টিক সাপোর্টেরও প্রয়োজন পড়বে।'

শেষ কথা: মিশনের ব্যাপারে পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে হবে। সংশ্লিষ্ট কেউ যদি ভুলেও এ প্রসঙ্গে বাইরে কোথাও মুখ খোলে, যদি সিআইএ, ব্রিটিশ

সিক্রেট সার্ভিস, ফ্রেঞ্চ সিউর্তে, কেজিবি—এদের কারও কানে যায় ভিতরে ভিতরে কী চলছে, তা হলে পরিণতি কী হবে তা সবাই বোঝে। অতএব...

রিপোর্টটা কয়েকবার করে পড়ল পাইরেট। বিশেষ বিশেষ কয়েকটা অংশ বারবার পড়ল। সঙ্গে জুড়ে দেয়া পুরো মিশনের সম্ভাব্য খরচের খসড়া হিসাবটা দেখল।

পঞ্চাশজন কমাণ্ডোর বেতন হিসেবে বিশাল একটা অংক ধরেছে মাসুদ রানা। সঙ্গে আছে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, রকেট-বাজুকা, অতি আধুনিক কমিউনিকেশন গ্যাজেট, জাহাজ কেনা ইত্যাদি বাবদ আরও অনেক খরচের হিসাব।

সব মিলিয়ে জাংগারোর বাৎসরিক বাজেটের চেয়েও অনেক বেশি হবে অংকটা।

নিজের প্রিয় ব্র্যাণ্ড আপম্যান করোনাস-এর তিন নম্বরটা ধরাল চিন্তিত জার্মান ব্যারন। খেয়াল করল হাত দু'টো একটু একটু কাঁপছে। কারণটা বুঝল না যদিও। সামনের রিচ উড প্যানেলিঙে সাজিয়ে রাখা মরক্কান লেদারে বাঁধানো মোটা মোটা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল একভাবে। বিরাট একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দিতে চলেছে সে এবার। কী হবে কে জানে!

দ্রুত কয়েকটা টান দিয়ে চুরুট নিভিয়ে ফেলল পাইরেট। রিপোর্টটা নিয়ে দোতলায় বেডরুমের দিকে চলল। সব ঠিকমত বুঝতে হলে আরও কয়েকবার পড়তে হবে ওটা।

দশ

পরদিন অফিসে পৌঁছেই মার্টিনকে ডেকে পাঠাল গুন্থার।

'কর্নেল ববির সঙ্গে চুক্তিটা সেরে ফেলতে হয়।'

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো যুবককে। 'আগে মাসুদ রানার রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে নিলে হতো না, সার? ওটা কতখানি পজিটিভ আর কত...'

'তা নিয়ে ভাবতে হবে না,' তর্জনী তুলে বাধা দিল গুন্থার। 'ওই লোকের কাজ নিয়ে চিন্তা নেই।'

শূন্যে নাচতে থাকা বসের বেঁটে খাটো তর্জনীর দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল যুবক। মাসুদ রানার উপর এই লোকের এত আস্থার রহস্যটা কী? দু'জনের পরিচয় কবে, কীভাবে? রানার উপর তার এতই যখন আস্থা, সে নিজে কেন কথা বলছে না? এর মধ্যেই বা কী রহস্য লুকিয়ে আছে?

'তুমি ববিকে আমাদের প্রস্তাব দেবে। চুক্তিতে সই করিয়ে কিছু অ্যাডভান্সও দিয়ে আসবে।'

'ঠিক আছে।'

'কোথায় আছে লোকটা?'

'কে?' তাল হারিয়ে ফেলল মার্টিন।

'ববি।'

লজ্জা পেল সে। 'ওহ, বেগ ইওর পার্ডন, সার। রওয়াণ্ডায়।' কিমবার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া জাংগারোর সাবেক আর্মি চিফকে খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে তার। কোনওরকম সূত্র ছাড়া এতবড় পৃথিবীতে একজন মানুষকে খুঁজে বের করা কী মুখের কথা?

'রাজধানী কিগালিতে আছে। তাকে খুঁজে বের করতে অনেক কষ্ট হয়েছে।'

'লোকটার হাতে টাকা-পয়সা আছে কেমন?'

মাথা নাড়ল পিটার মার্টিন। 'থাকলে আর সমস্ত নির্বাসিতরা যেমন থাকে, সে-ও তেমনি জেনিভা বা লণ্ডনে শানদার ভিলা ভাড়া করে মউজে থাকত, সার। ওরকম ব্যাকওয়ার্ড জায়গায় থাকত না। তা ছাড়া রওয়াণ্ডান সরকার বের করে দিতে পারে, এই ভয়ে কোনমতে নাকটা শুধু জাগিয়ে রেখেছে বলে শুনেছি।'

'কেন?'

'কিমবা নাকি লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিকে দেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছিল।'

'তারপর?'

'কিগালি রাজি হয়নি। কিমবাও আর বেশি চাপাচাপি করেনি। কারণ লোকটা এখন এত দূরে যে আর কখনও তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।'

'আই সি।'

একটু পর সাহস করে আবার প্রসঙ্গটা তুলল মার্টিন। 'সার, মাসুদ রানার রিপোর্টটা কেমন মনে হয়েছে আপনার?'

'মন্দ না। ভালই।' মাথা দোলাতে লাগল সে। ব্রিফকেস থেকে ওটা বের করে এগিয়ে দিল। 'নাও। তুমিও পড়ে দেখো।'

'থ্যাংক ইউ, সার।'

'মনে মনে এরকম একটা কিছুই আশা করছিলাম আমি, বুঝলে?' ঝুঁকে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল সে। 'মিস কুক। দু' কাপ কফি প্লিজ!'

দম বন্ধ করে দ্রুত, প্রায় এক নিঃশ্বাসে গোটা রিপোর্ট পড়ে ফেলল মার্টিন। তারপর অবাক হয়ে মুখ তুলল। 'খরচের বহরটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি মনে হয়নি আপনার?'

'তা হয়তো কিছুটা হয়েছে! কিন্তু কী আর করা! এ কাজ তো আর তোমাকে-আমাকে দিয়ে হবে না। তা ছাড়া ব্ল্যাক মার্কেটে তো সবকিছুরই দাম চড়া। বাড়াবাড়ি...' কথা অসমাপ্ত রেখে শ্রাগ করল।

'না... মানে...' কী বলবে ভেবে না পেয়ে মাথা চুলকাল মার্টিন। 'তা ছাড়া... এই যে, প্রজেক্ট কমাণ্ডারের নিরাপত্তার প্রশ্নে এত অতিরিক্ত গোপনীয়তা... এসব কী? এ তো রীতিমত...' আবার খেই হারিয়ে ফেলল সে। 'এত নগদ টাকা নিয়ে সবার চোখের আড়ালে বসে লোকটা কী না কী করবে...'

'সন্দেহটা অমূলক নয়,' বলল পাইরেট। 'কিন্তু প্যারাটা ভাল করে আবার পড়লে আশা করি তোমার সন্দেহ দূর হবে। এখানে অযৌক্তিক একটা কথাও নেই। ভেবে দেখো, রানা একা গেলে সমস্যা হবে না, কারণ আগে অনেকবার এ কাজ করেছে ও। তুমি সম্পূর্ণ অচেনা। তুমি গেলে ডিলাররা কেন স্বীকার করতে যাবে তারা ওই ব্যবসা করে? রানাকে সে-অসুবিধায় পড়তে হবে না। কারণ ও আগে বেশ কয়েকবার এই কাজ করেছে। ওই পথের আটঘাট চেনে। তা ছাড়া রানার দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাপারটাকে দেখতে হবে। এ কথা তো ঠিক যে, এ-মুহূর্তে তুমি ওর মাথায় জোর করে চাপিয়ে দেয়া জগদ্দল পাথর। তোমাকে ওখানে নিয়ে গেলে ও যে বিপদে পড়বে না বা সবকিছু গুবলেট হয়ে যাবে না, তার গ্যারান্টি দিতে পারবে তুমি? আর দিলেই মাসুদ রানা তা বিশ্বাস করবে কেন? ভেবে দেখো।'

মিস কুক কফি নিয়ে ঢুকতে তাকে ধন্যবাদ জানাল সে। মার্টিনের দিকে মন দিল। চুপ করে আবার কাগজগুলো উল্টে যাচ্ছে যুবক। কফিতে চুমুক দিল গুস্তার।

'এবার টাকার প্রসঙ্গ। তোমার মনে হতে পারে অঙ্কটা বাড়িয়ে লিখেছে রানা। কিন্তু আমি তাকে যতটুকু চিনি, তাতে আমার সেরকম মনে হয় না। আমি জানি, টাকার ব্যাপারে কোনও রকম ছ্যাঁচড়ামি ওকে দিয়ে সম্ভব নয়, বুঝলে?'

'কিন্তু কোথাও কোথাও ওকে অতি বিশ্বস্ত বলে মনে হয়েছে খেয়াল করেছেন? মনে হয়েছে আমাদের মিশন সফল হওয়া নিয়ে আমাদের চেয়ে রানাই বেশি উদ্বিগ্ন!'

'স্বাভাবিক না?' মাথা ঝাঁকাল পাইরেট। 'মিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো ওর মুক্তি নেই। কাজেই আমাদের চেয়ে ওরই তো বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার কথা। বিশ্বস্ত না থেকে আর কোনও উপায় আছে? ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো। তুমি কী করতে?'

চুপ করে থাকল মার্টিন। বুঝতে পেরেছে উল্টোপাল্টা প্রশ্ন তুলে বসের কাছে নিজেকে ঈর্ষাকাতর বলে প্রমাণ করছে। কাজেই ব্রেক কষল সে। কিন্তু খরচের অঙ্কটা...

'তোমার কাজ হবে মাসুদ রানাকে সহযোগিতা করা, বিপদে ফেলা নয়। কন্ট্রোলার হিসেবে তাকে নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই করবে তুমি, কিন্তু সেটা সময় বুঝে। সময় বুঝে হাওয়া দেবে পালে, সময় বুঝে স্ক্রু টাইট দেবে। দুনিয়ার হাল-হকিকত তুমি নিশ্চয়ই কম বোঝো না যে রানা তোমাকে বোকা বানিয়ে চলে যাবে আর তুমি বসে বসে আঙুল চুষবে!' মৃদু হাসল সে।

'সে তো বটেই, সার,' তাড়াতাড়ি বলল মার্টিন। 'আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব নাকি?'

'তা হলে আর চিন্তা কীসের? আসল কলকাঠি তো আমাদের হাতে থাকছেই। মাঝে মাঝে বোতাম টিপে ওকে আমাদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেবো। তাতে আমাদেরও জানা হয়ে যাবে প্ল্যান্ট করা জিনিসগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কি না।'

'এই পয়েন্টটাও আমি তুলতে চেয়েছিলাম, সার। ও যে পরিমাণ স্বাধীনতা চাইছে, তা দেয়া হলে মাসুদ রানা ওগুলো শরীর থেকে বের করে ফেলে দিতে...' বসকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল মার্টিন।

'অসম্ভব! পারবে না,' বলল গুন্থার। 'ওখানে কেউ হাত দিলেই আমার সেনসরে ধরা পড়বে—সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে সতর্ক করব, তারপর ফাটিয়ে দেব বোমা। ব্যাপারটা ওকে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে ভালমত বুঝিয়ে বলা হয়েছে।'

'কিন্তু, আমবা বোতাম টিপলে ওর মধ্যে রিঅ্যাকশন হচ্ছে কি না বুঝছি কী করে?'

'ও, তোমাকে বলা হয়নি বুঝি? ফিডব্যাকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ওর শারীরিক প্রতিক্রিয়ার গ্রাফ দেখতে পাব আমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে। অভিনয় করে পার পাওয়ার উপায় নেই।'

রানার সতর্কবাণীগুলো বারবার পড়ার ফলে চোখ খুলে গেছে গুন্থারের। আস্ত একটা দেশ হজম করতে চলেছে সে। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতি জড়িত। রানা ঠেকায় পড়ে কাজটা করতে বাধ্য হলেও কর্মপদ্ধতি ঠিক করার সময় নিজের স্বার্থের দিকে সতর্ক নজর অবশ্যই রেখেছে। যে কেউ রাখবে।

কাজেই প্রথম দেখায় ওর দাবিগুলোকে সন্দেহজনক মনে হলেও আসলে তা নয়। মার্টিনের সন্দেহ ঠিক নয়। ওর সর্দারীর মাত্রা কমে যাচ্ছে দেখে হয়তো একটু ক্ষুণ্ন হয়েছে।

টাকার অংকটার কথা ভাবল পাইরেট। যত বিশালই হোক না কেন, কাজটাও তো সেইরকম। সবই গোপনে কালোবাজার থেকে কিনতে হবে। কাজেই খরচ বেশি পড়বে, এ আর নতুন কথা কী!

দুনিয়ার আরেক মাথার একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মধ্যে ঢুকে সেটার সরকারের পতন ঘটানো; হোক ছোটো আর গরিব দেশ, হোক স্বৈরাচারী সরকার—চাট্টিখানি কথা নয়। আর, আসল উদ্দেশ্য কেউ টের পেলে যে কী ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে, ভাবতেও তো গায়ে কাঁটা দেয়।

সবচেয়ে বড় কথা, ক্রিস্টাল মাউন্টেন থেকে যা আয় হবে, রানার বাজেটের অংকটা তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও না। কাজেই ওসব নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামানোর দরকারটা কী?

'আমাদের হচ্ছে কাজটা সমাধা হওয়া নিয়ে কথা। যত খুশি চোখের আড়ালে থাকুক না গিয়ে, আমরা একশ' দিনের মধ্যে মিশন অ্যাকমপ্লিশড্ হলেই খুশি।'

শ্রাগ করল মার্টিন। 'তার মানে আমরা এই লোকের নির্দেশ মতই চলব।' প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের মত শোনাল তার কথাটা।

'সামরিক প্রশ্নে "হ্যাঁ"। আর সব প্রশ্নে...' থেমে শ্রাগ করল। 'আমি তো বিকল্প কোনও পথ দেখছি না।' যুবককে দেখল গুন্থার। 'তুমি দেখো?'

যুক্তিটা মেনে নিল মার্টিন। 'আরেকটা কথা, সার। ওই রিমোট কন্ট্রোলটা আপনার কাছে। অনেকদিন হয়ে গেল রানাকে রিমাইণ্ড করা হয়নি ডিভাইসটার ব্যাপারে।'

'একবার করেছি। সময় হোক, আবারও আমি ওকে মনে করিয়ে দেব। তুমি তোমার কাজে মন দাও। ওকে?'

'ওকে, সার।'

কিছু ভাবল পাইরেট। মাথা ঝাঁকাল। 'লোকটার নার্ভ আছে। কমাণ্ডো আক্রমণ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির কথা এমনভাবে লিখেছে, যেন একজন জেনারেলের লেখা। মাথা দোলাল সে। 'আমি জানতাম ওর অ্যাসেসমেণ্ট এরকমই কিছু হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা কি আসল কাজ সফলভাবে শেষ করতে পারবে?'

অবাক হলো মার্টিন। 'সে কী! আপনিই না...'

'না, না। আমি আসলে সেই অর্থে কথাটা বলিনি,' দ্রুত বলল গুন্থার। 'বলেছি অন্য কথা ভেবে। যাকগে, এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।' কফিতে চুমুক দিল।

'সার, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করো।'

'মাসুদ রানা কে? আপনি তাকে ভালই চেনেন বোঝা যায়, অথচ কাজটা নিয়ে যত আলোচনা...'

'আর কিছু জিজ্ঞেস করো,' বাধা দিল গুন্থার। 'এটার জবাব আপাতত দিতে পারছি না। টেকনিকাল প্রব্লেম আছে।'

'আমরা এসব কেন করছি? জাংগারোর মত একটা দেশে এমন কী আছে যার আশায় এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা? কিমবাকে সরিয়ে কেন কর্নেল ববিকে বসাতে চাইছি?'

'লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল অ্যাণ্টনি ববি।'

'রাইট, সরি।'

কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল গুন্থার। তারপর উঠে পায়ে পায়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল। নীচের যান ও জনস্রোত দেখল কিছুক্ষণ। কোনও জটিল বিষয় নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখা দিলে সব সময় এ-ই করে সে।

'কাজের প্রশ্ন করেছ। সাইমন এনডিনকে আসতে বলো,' পিছন ফিরেই বলল। 'তারপর বলছি কেন তাকে বসাতে চাইছি।'

সাইমন এনডিন! বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল সে। ওই লোকের সামনে তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা! গুন্থার কখনও তার কোনও বিশেষ মিশনের সঙ্গে দু'জনকে জড়িত করে না। করলেও এমনভাবে করে যাতে দু'জনের কেউই টের না পায় যে তারা একই কাজ করছে। এটা সে করে কর্মচারীরা যাতে কাজ নিয়ে অফিসে গাল-গল্প করার, কানাঘুষা করার সুযোগ না পায়। বসের হলো কী? ভাবল সে।

ওদিকে গুন্থার ভাবছে, এবার সময় হয়েছে এদেরকে সামনাসামনি করার। এতদিন যা করেনি, তাই করার। এটা এমন এক কাজ, যার সঙ্গে অন্য হাজারো কাজের তুলনা হয় না। তাই এটার ক্ষেত্রে আগের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করতে হচ্ছে

তাকে। না করলে হবে না।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতা আছে বলেই এই দুই তরুণ প্রতিভাকে ডেকে চাকরি দিয়েছে সে। কল্পনাতীত বেশি বেতন, সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চলেছে। সব জটিল কাজে আগে তাদেরকেই ডাকে। কারণ ওরা তারই মত বিবেক বিবর্জিত মানুষ। তার উপর উচ্চশিক্ষা হচ্ছে এদের বাড়তি যোগ্যতা যা গুন্থারের নেই। দয়ামায়া বলে কিছু নেই এদের অন্তরে, ন্যায়-অন্যায়ের তফাত বোঝে না। নৈতিকতার সামান্যতম বালাই নেই। লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে গুন্থারের মতই নির্দয় ওরা।

এদের দু'জনকে যোদ্ধা হিসেবে দেখে সে। নিজের মত। জীবন যুদ্ধে টিঁকে থাকতে যা সামনে আসে সবই করে। বাছ-বিচার নেই। কিন্তু গুন্থার এবং মার্টিন-এনডিন, দু' পক্ষকে আলাদা করে রেখেছে সাফল্যের মাত্রা। এতদিন একটা বেড়া মাঝখানে মাত্রাটা টেনে রেখেছিল। আজ সেটা তুলে ফেলার সময় এসেছে। মার্টিন-এনডিনের সঙ্গে তার নিজের এবং ওদের দু'জনের পরস্পরের মধ্যে যে গোপনীয়তার চল ছিল, দু'টোই আজ ভেঙে ফেলতে হবে। চিন্তা নেই, গুন্থার জানে কেমন মূল্য দিলে মানুষের পূর্ণ আনুগত্য কেনা যায়।

কাজে নেমে রানা যদি ঘাপলা করে, তখন সে, মার্টিন আর এনডিন, সবাই মিলে যাতে এক হয়ে তার মোকাবেলা করতে পারে, সে জন্য এই ঐক্যের প্রয়োজন। রানার হাতে অবশ্য একটা রক্ষাকবচ প্ল্যাণ্ট করা আছে, তেমন বেয়াড়াপনা করতে পারবে না। তবু বাড়তি সতর্কতা নিয়ে রাখা প্রয়োজন। এমন প্রজেক্ট সাত জনমের সাধনাতেও মানুষের কপালে জোটে না।

এনডিন রুমে ঢুকতে নিজের চেয়ারে ফিরে এল পাইরেট। ঠোঁট টিপে হাসল নবাগতের উদ্দেশ্যে।

'সিট ডাউন, এনডিন। প্রথম কথা হলো,' ভূমিকা ছাড়াই শুরু করে দিল সে। 'এ মুহূর্তে একই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছ তোমরা দু'জন। তাই তোমাদের মুখোমুখি হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে এই মিটিঙের আয়োজন করেছি। দ্বিতীয় কথা, তোমাদের জন্যে আমার একটা প্রস্তাবও আছে।'

এনডিনের চোখ একবার গুন্থার, একবার মার্টিনের উপর ঘুরতে লাগল। মার্টিন বলল, 'কী প্রস্তাব, সার?'

'ধরো, যদি সুইস ব্যাংকে তোমাদের নামে আমি এক মিলিয়ন পাউণ্ড করে জমা করে দিই, তোমরা সেটাকে ঠিক কীভাবে গ্রহণ করবে?'

মার্টিন সতর্ক চোখে তাকিয়ে থাকল বসের দিকে। সে জানে, একটা দেশ নিয়ে যখন টাকার খেলা শুরু হয়ে গেছে এবং সে তার একটা অংশ হয়ে গেছে, তখন টাকাকড়ি তার পকেটেও কিছু না কিছু পড়বে। তাই অনেকটা সহজভাবেই নিল সে। যদিও অনেক প্রশ্নের জবাব এখনও পায়নি। ওদিকে আইরিশ ষাঁড়টাকে একটু বেহাল মনে হলো।

'কীভাবে এত টাকা জমা হবে, সার?' প্রশ্ন করল সে।

শুরু করল গুন্থার। পাক্কা এক ঘণ্টা নিচু কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে গেল তাদের উদ্দেশে। মিস কুককে দু'বার কফি সার্ভ করতে হলো এরমধ্যে। দুটো চুরুট

শেষ করল গুন্থার।

তার বক্তৃতা শেষ হতে সতর্ক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করল মার্টিন। 'জি-ই-জা-স্!'

সাইমন স্পিকটি নট। জবান বন্ধ হয়ে গেছে।

'এ কাজে সফল হতে হলে পাশাপাশি দু'টো হাইলি সিক্রেট অপারেশন একযোগে চালাতে হবে আমাদেরকে। প্রথমটায় রানা জাংগারোর প্রেসিডেন্ট এবং তার দলবলকে খতম করবে আর মার্টিন নির্বাসিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিকে নিয়ে তার পরদিন ভোরে জাংগারোতে যাবে। ববি নিজেকে নতুন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করবে। দ্বিতীয় সিক্রেট অপারেশনে এনডিন এখানে বসে একটা শেল কোম্পানি কিনবে। কে সেটার নিয়ন্ত্রক হতে চায়, কেন হতে চায়, সমস্ত তথ্য গোপন রেখে।'

সামনে ঝুঁকে বসল এনডিন। 'শেল কোম্পানি কী, সার?'

'শেল কোম্পানি হচ্ছে এমন লিমিটেড কোম্পানি যার ট্রেডিং অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে, বহুদিনের পুরনো। শেয়ার অত্যন্ত সস্তা। ধরো, একেকটার দাম একেক শিলিঙে নেমে গেছে।'

'ওরকম কোম্পানি কিনে কী হবে, সার?' হতভম্ব দেখাল সাইমন এনডিনকে।

গুন্থার মৃদু হেসে মার্টিনের দিকে ফিরল। 'তুমিই বুঝিয়ে বলো ওকে, প্লিজ।'

নড়েচড়ে বসল মার্টিন। জুনিয়রের সামনে বিদ্যা জাহির করার সুযোগ পেয়ে খুশি। 'বিষয়টা এরকম : মনে করো, আমাদের বস এরকম এক শেল কোম্পানির নিয়ন্ত্রক। গোপনে কিনেছেন অজ্ঞাত নমিনি আর সম্ভবত একটা সুইস ব্যাংকের সহযোগিতায়। সবই ঠিকঠাক, আইনের ফাঁক নেই কোথাও। ধরা যাক সেটার এক মিলিয়ন শেয়ার আছে, প্রতিটার দাম এক শিলিং করে। যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার আছে, তারা জানে না কোম্পানির মালিকানা হাত বদলের কথা। বোর্ড অভ ডিরেক্টরস বা স্টক এক্সচেঞ্জও জানে না। তবে ব্যাংক জানে, মিস্টার গুন্থার সেই দশ লাখ শেয়ারের মধ্যে ছয় লাখ শেয়ারের মালিক।

'তারপর মনে করো কর্নেল—বেগ হিজ পার্ডন—প্রেসিডেন্ট ববি সেই কোম্পানিকে যে কারণেই হোক জাংগারোর বিশেষ একটি এলাকায় খোঁড়াখুঁড়ি চালানোর জন্য দশ বছরের এক্সক্লুসিভ মাইনিং রাইটস দিয়ে দিলেন। তারা গিয়ে সেখানে ক্রিস্টাল মাউন্টেন আবিষ্কার করে বসল। খবরটা যখন লণ্ডনের স্টক মার্কেটে হিট করবে, তখন সেই শেল কোম্পানির শেয়ারের দাম কী হবে বলে মনে করো তুমি?'

হাসি ফুটল সাইমনের মুখে। 'লাফ দিয়ে বেড়ে যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল মার্টিন। 'ঠিক,' বলল সে। 'কায়দা-কসরত করে তখন প্রতিটা শেয়ারের দাম এক শিলিং থেকে একশ' পাউণ্ড, এমনকী আরও কিছুটা ওপরেও তুলে নেয়া যাবে। এবার হিসেব করো, এক শিলিং দরে ছয় লাখ শেয়ার কিনতে খরচ হয়েছিল তিরিশ হাজার পাউণ্ড। সেগুলোই এরপর বিক্রি হবে প্রতিটা

একশ' বা তারও বেশি পাউণ্ড দরে। ফলাফল? সুইস ব্যাংকে জমা পড়বে ষাট মিলিয়ন পাউণ্ড। রাইট, সার?'

'রাইট,' মাথা ঝাঁকাল পাইরেট।

খুক্ করে কাশল আইরিশ। জ্ঞানের আলোয় এইমাত্র উদ্ভাসিত হয়েছে যেন, এমনভাবে বসের দিকে চেয়ে থাকল কিছু সময়। 'ফিনানশিয়াল টার্মিনোলজিতে একে কী বলে, সার?'

শুনেও না শোনার ভান করল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। উইস্কি পরিবেশন করল দুই সহকর্মীকে। নিজের গ্লাস মুখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'আর ইউ অন, জেণ্টলমেন?'

নিজেদের অজান্তেই মাথা দোলাল তারা।

'দেন হিয়ার ইজ টু দ্য ক্রিস্টাল মাউণ্টেন।'

পান করল সবাই।

একটু পর পিটার মার্টিন বিদায় নিল। এনডিনও দরজার দিকে এগোলো। কিন্তু বের হতে গিয়েও কী ভেবে দরজার নব ধরে ঘুরে তাকাল সে। দ্বিধাগ্রস্ত।

'ইউ নো, সার, এটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাকফায়ার করতে পারে। একটা দেশকে নক আউট করা...' বসকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'কিছুই করবে না,' চেয়ার ছেড়ে উঠল গুন্থার। ধীর পায়ে পিকচার উইণ্ডোর কাছে গিয়ে দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। নজর নীচের রাস্তায়। 'ওরকম ব্যানানা রিপাবলিক পকেটে পোরার আর্ট মাসুদ রানা খুব ভাল জানে। এ কাজ আগেও করেছে সে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

ঢাকা। বিসিআই-প্রধান, রাহাত খানের সামনে বসে আছে সংস্থার তিন নম্বর ব্যক্তি, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সোহেল আহমেদ। কয়েকটার মধ্য থেকে একটা এক্স-রে ফিল্ম আলোর দিকে তুলে ধরে মন দিয়ে দেখছে। লণ্ডন থেকে এসেছে এগুলো। রানা পাঠিয়েছে বিস্তারিত নোটসহ।

'জিনিসটা কী, সার?' বেশ কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল ও। হতভম্ব দেখাচ্ছে।

'মিনি বোমা, কমপিউটার কণ্ট্রোলড্,' বললেন রাহাত খান। 'রানা ওদের ইচ্ছেমত না চললে ফাটিয়ে দেয়া হবে। ওটা ফাটলে রানা ছাড়াও ওর আশপাশের বিশ গজের মধ্যে আর যারা থাকবে, সবাই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'

ফিল্মটা আস্তে করে রেখে দিল সোহেল, যেন ওটাই সেই বোমা। হাঁ করে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল।

গোটা বিষয়টা হজম করতে অনেক সময় লাগল সোহেলের। 'রানা এখন কোথায়?'

'লণ্ডনেই। তবে রুডল্ফ্ গুন্থারের মুঠোর মধ্যে।'

'আমরা কিছু করছি না কেন, সার?'

'কিছু একটা করার কথা ভাবছি,' আমতা আমতা করে বললেন বৃদ্ধ। 'তবে বিষয়টা জটিল বলে একটু সময় লাগছে সিদ্ধান্ত নিতে।'

বৃদ্ধের কপালের একপাশে একটা নীল শিরা দপ্-দপ্ করে লাফাচ্ছে, খেয়াল করল সোহেল। খুব চেনা লক্ষণ। রাহাত খান উদ্বিগ্ন হলে কপালের ওই শিরাটা লাফায়। বেশি উদ্বিগ্ন হলে তার সঙ্গে যোগ হয় একটু পর পর চোখের কোনা চুলকানো। এ মুহূর্তে দু'টোই চলছে। বৃদ্ধের উদ্বেগ সোহেলের মধ্যেও সংক্রমিত হলো।

'আমার এক সিনিয়র বন্ধু আছেন, এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ,' বললেন তিনি। 'এখন ইন্টেল-এর চিফ। এক সপ্তার মধ্যে ঢাকায় আসছেন উনি। একটা উপায় আশা করি হয়ে যাবে। তুমি নিজের কাজ আপাতত আর কাউকে বুঝিয়ে দাও। বাইরে ছোটাছুটি করতে হতে পারে।'

'জী।'

'চিন্তা নেই,' রানাকে আশ্বস্ত করলো মার্টিন। 'ক্ষমতায় বসার মত একজন প্রস্তুত থাকবে।'

'আমার কেন হবে, আপনাদের চিন্তার বিষয় ওটা। এই লোক জাংগারোর ভেতরে আছে না নির্বাসনে?' সতর্ক প্রশ্ন করল রানা।

'নির্বাসনে,' খানিক ইতস্তত করে বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল ও। 'অপারেশন শেষ হলেই তাকে প্যালেসে হাজির করতে হবে। রেডিওতে নিজ মুখে তাকে ঘোষণা দিতে হবে, সে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেছে।'

একটু ভেবে মাথা দোলাল পিটার মার্টিন। 'অসুবিধা হবে না। করা যাবে সে ব্যবস্থা।'

রানার আর্লিংটন হাউসের অ্যাপার্টমেন্টে বসে কথা বলছে ওরা। সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়।

'আর, নতুন সরকারের একটা অনুগত বাহিনীও থাকতে হবে। ছোটো হোক, কিন্তু থাকতে হবে।'

মার্টিনের সুন্দর ভুরু কুঁচকে উঠল। 'কেন?'

'অভ্যুত্থানের পর উৎসুক জনতা যাতে দেখে বুঝতে পারে ওই বাহিনীই অভ্যুত্থানটা ঘটিয়েছে।'

'তার কী প্রয়োজন?'

'আমাদের পিঠ বাঁচানোর জন্যে প্রয়োজন আছে। স্থানীয়রা যদি সন্দেহ করে বাইরের লোক এনে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে, তখন পাল্টা হামলা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। সেটা ঠেকাতে।'

'তাই নাকি?'

'আপনাদের এই নির্বাসিত নেতার ব্যাক-আপ ফোর্স আছে তো? নইলে ক্লারেন্সে পৌঁছেই ঝটপট একটা বাহিনী দাঁড় করিয়ে ফেলার প্রয়োজন হবে।'

একটু ভাবল মার্টিন। 'এ কথা আপনার রিপোর্টে ছিল না বোধহয়।'

'থাকতেই হবে এমন কোনও বিষয় নয় ওটা।' শ্রাগ করল রানা। কিছুক্ষণ চিন্তা করল। 'এটা তো কমনসেন্সের ব্যাপার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমিই না

হয় একটা ব্যবস্থা করে নেব।'

'কীভাবে?' সন্দেহ ফুটল মার্টিনের চেহারায়।

'এখনই বলতে পারছি না। ভেবে দেখতে হবে।'

ওর চেহারায় হন্যে হয়ে কিছু খুঁজল যুবক। না পেয়ে একটু হতাশই হলো হয়তো।

'না, থাক। আপনাকে বাড়তি কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু প্যালেস দখল আর কিমবার ব্যবস্থা করুন, তা হলেই চলবে। বাকি সব আমরাই সামলাব।' বলে একটু থামল। 'কিমবার নাকি আবার কী সব ক্ষমতা আছে, যা দিয়ে...'

'জুজু,' রানা বলল।

'কী?'

'মানুষ বশ করার ক্ষমতা। জুজু।'

কিছু ভাবল মার্টিন। 'এর কথা আগেও মনে হয় শুনেছি। কী জিনিস সেটা!'

'আফ্রিকানদের মতে বিশেষ ক্ষমতা। যা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে, অমরত্বের নিশ্চয়তা দেয়।'

চিন্তিত দেখাল যুবককে। 'একসময় কঙ্গোতেও নাকি এরকম একজন জুজুওয়ালা ছিল শুনেছি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সিমবাদের নেতা। পিয়েরে মুলেলে।'

'লোকটা নাকি গর্ব করে বলত ইচ্ছে করলেই সে তার জুজু যাকে খুশি দান করে দিতে পারে। অমর করে দিতে পারে। অনুসারীরা তার প্রতিটা কথা বিশ্বাস করত।'

'কিমবাও তার গোত্রের লোকদের কাছে সেইরকম।'

মার্টিন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'এখনও এত কুসংস্কারে ডুবে আছে ওরা?'

রানা শ্রাগ করল। 'নিজেদের বেলায় এগুলোকে পুণ্যাত্মা, ঐশ্বরিক সুরক্ষা কবচ, সম্মোহনী শক্তি বলে থাকেন আপনারা। অন্যদের ক্ষেত্রে বলেন কুসংস্কার।'

'গোল্লায় যাক। মোট কথা কিমবাকে মরতে হবে।'

কী আছে ও দেশে? মনে মনে মার্টিনকে প্রশ্ন করল রানা। জাংগারোর পিছনে কেন লেগেছে গুন্থার? কী চায়? জানতে হবে, নিজেকে শোনাল ও। নিশ্চিত হতে হবে। তারপর...

মিশনের টুকিটাকি নিয়ে আরও প্রায় আধ ঘণ্টা ইনটেনসিভ সেশন চলল দু'জনের মধ্যে। অবশ্য সেশন না বলে মার্টিনের নির্দেশনা বলাই ভাল সেটাকে। কারণ কথাবার্তা যা বলার মার্টিন একাই বলল। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে ইত্যাদি বলে অবশেষে উঠল সে।

'আগামী দু'তিনদিন আমাদের দেখা হচ্ছে না। আমি ব্যস্ত থাকব। আপনিও অ্যাকাউন্ট খোলাসহ জরুরি কাজগুলো সেরে ফেলুন।' একটা নম্বর দিল। 'এই যে, আপনার আনট্রেসেবল নাম্বার। অ্যাকাউন্ট খোলা হলে এই নাম্বারে

মেসেজটা দেবেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা জমা হয়ে যাবে।'

ঘুরে দাঁড়াল মার্টিন। করিডরে বেরিয়ে গিয়ে কী মনে করে থামল। হঠাৎ মুড বদলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত সাপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

'একটা কথা, মিস্টার রানা। মিশনের ফিজিবিলিটি নিয়ে আপনার লেখা রিপোর্ট আমি কয়েকবার পড়েছি। আমাকে আপনি আর্মস কেনাকাটার সময় রাখতে চান না, সব কিছু একা একা করতে চান, ভাল কথা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুক্তি আছে। কিন্তু...'

'রাখতে "চাই না" কোথাও বলা হয়নি,' মৃদু অথচ দৃঢ় ভঙ্গিতে বাধা দিল রানা। 'বলা হয়েছে "ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে রাখা সম্ভব নয়।"'

'ওই হলো,' বিরক্ত হয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল যুবক। 'দু'টোর মধ্যে বেশি তফাত দেখি না আমি।'

শান্ত, নিরুত্তাপ চেহারায় তাকিয়ে থাকল রানা।

'যদি ভেবে থাকেন চোখের আড়ালে বসে...'থেমে শ্রাগ করল। 'আই মিন, দয়া করে এমন কিছু করে বসবেন না যাতে আমাকে কঠোর কোনও পদক্ষেপ নিতে হয়। প্লিজ!'

জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না রানা। তার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

সামনের বাধাটার দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকল মার্টিন। অসহ্য রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু করার নেই। রানা যতই তাদের মুঠোর মধ্যে থাকুক না কেন, সে জানে ও যেভাবে খেলাবে, এখন সেভাবেই খেলতে হবে তাদেরকে। কারণ এ মুহূর্তে রানা এমনকী ক্রিস্টাল মাউন্টেনের চেয়েও মহামূল্যবান অ্যাসেট তাদের কাছে। তাকে ছাড়া এক পা-ও চলা যাবে না।

অবশ্য মিশনটা ভালয় ভালয় শেষ হলে অবস্থা পাল্টে যাবে। তখন এ অপমানের শোধ তুলবে সে। দেখবে ও ব্যাটা কোথাকার কতবড় মস্তান। কাজেই ঘটনাটা আপাতত ভুলে থাকার চেষ্টা করল মার্টিন। শ্রাগ করে লিফটের দিকে পা বাড়াল।

সারারাত বলতে গেলে না-ঘুমিয়েই কাটল সাইমন এনডিনের। টেনশনে চোখের ত্রিসীমানায়ও আসেনি ঘুম। কারণ সে জানে আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাওয়া আড়াই দিনের উইক এণ্ড তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে।

এই সময়ের মধ্যে সিটি অভ লণ্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জ বা কোম্পানিজ হাউসের রেজিস্টার্ড সাড়ে চার হাজার পাবলিক কোম্পানির সবগুলোর ইনডেক্স কার্ডের উপর নজর বোলাতে হবে তাকে। সেগুলোর যাবতীয় বেসিক ডিটেইলসের খোঁজে।

লণ্ডনে দুটো প্রতিষ্ঠান আছে যারা সাবস্ক্রাইবারদেরকে ব্রিটিশ পাবলিক কোম্পানি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যের ব্যাপারে সার্ভিস ও সহযোগিতা দিয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে মুডিজ এবং এক্সচেঞ্জ টেলিগ্রাফ বা এক্সটেল।

এ মুহূর্তে মুডিজ-এর সরবরাহ করা কার্ডের পাহাড় সামনে নিয়ে বসে আছে

সাইমন এনডিন। এর মধ্য থেকে উপযুক্ত একটা শেল কোম্পানি খুঁজে বের করতে হবে তাকে।

শেয়ার মার্কেটের ঘাই-ঘাপলা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামায়নি সে তেমন একটা। মোটামুটি কাজ চালিয়ে নেবার মত বোঝে। কিন্তু মুডিজ যে পাহাড় সমান কার্ড পাঠিয়েছে, তাই দেখে তালগোল পাকিয়ে গেছে ওর।

তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, জানে সে। যে-কোনও কাজ শুরু করাটাই হচ্ছে আসল। তারপর গড়গড় করে হয়ে যায়।

সেদিন বসের নির্দেশ পেয়ে এক লইয়ারের ফার্মে গিয়েছিল এনডিন। বসের নাম গোপন রেখে তাদেরকে এক সেট মুডিজ কার্ড পাঠিয়ে দেয়ার অর্ডার দিতে। এ জন্য খরচ পড়েছে বারোশ' পাউণ্ড। ছয়শ' কার্ডের জন্য, তিনশ' তিনটে গ্রে ফাইলিং কেবিনেটের দাম—যেগুলোয় করে এসেছে কার্ডগুলো এবং বাকি তিনশ' লইয়ারের ফি। একটা রিমুভারস ফার্মকেও পয়সা দিতে হয়েছে কেবিনেটগুলো তার হ্যামস্টিড গার্ডেন সাবার্বের বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য।

এগারো

যারা 'গোপন অথচ বেআইনি নয়' ধরনের অ্যাকাউন্ট খুলতে চায়, তাদের জন্য পৃথিবীজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন সুইস ব্যাংকের তুলনায় বেলজিয়ামের ব্যাংকগুলো যে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে, সে কথা অনেকেই জানে না।

জার্মান ও সুইস ব্যাংকের মত বেলজিয়ান ব্যাংকগুলোও তাদের অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদেরকে ইচ্ছেমত টাকা জমা রাখার ও বাইরে পাঠানোর সুযোগ দেয়। সরকার তাতে বাধা দেয় না, কোনওরকম খবরদারিও করে না। একই নিয়ম লাক্সেমবার্গ আর লিয়েখটেনস্টেইনের ব্যাংকগুলোও অনুসরণ করে থাকে বলে তাদেরও ওই খাতের ব্যবসা দিন দিন ফুলেফেঁপে উঠছে।

পরদিন সকাল দশটায় ব্রাসেলস পৌঁছল রানা। এয়ারপোর্ট থেকে বিশ মিনিটের পথ ব্রাগ। শহরে পৌঁছে ক্রেডিয়েটব্যাংকের হেড অফিসে চলে এল। একটা অপ্রশস্ত পথের পাশে সেটা। ঠিকানা ২৫ প্লামিংস্ট্রাট।

পথের দু'পাশে আঠারো শতকের ফ্লেমিশ আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের সারি সারি বাড়ি। বাড়িগুলো অনেক যত্নে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটার নীচতলায় একটা করে দোকান।

ব্যাংকের ফরেন অ্যাকাউন্টস সেকশনের প্রধান, মিস্টার গুজেনস-এর সঙ্গে দেখা করল রানা। পরিচয় দিল জেমস ব্রাউন বলে। পাসপোর্টও দেখাল। প্রাথমিক আলাপ সেরে আধঘণ্টার মধ্যে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল ও।

ব্যাংকের রেকর্ডের জন্য জেমস ব্রাউনের কিছু স্পেসিমেন সিগনেচার জমা রেখে গুজেনসকে জানাল, দু'-চারদিনের মধ্যে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে কিছু টাকা

ট্রান্সফার হয়ে আসবে ওর নতুন অ্যাকাউন্টে। ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসার কাজে দুনিয়া চষে বেড়াতে হয় বলে টাকা তোলার জন্য সব সময় সশরীরে আসা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই ওর মৌখিক নির্দেশে ক্রেডিয়েটব্যাংক প্রয়োজনীয় টাকা তার লণ্ডনের অ্যাকাউন্টে জমা করবে অথবা আর কোনও অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করবে।

মৌখিক নির্দেশ যে মিস্টার জেমস ব্রাউনই দিচ্ছেন, ব্যাংক তা বুঝবে কীভাবে?

টেলিফোনে প্রথমে নিজের ষোলো ডিজিটের অ্যাকাউন্ট নাম্বার উল্টো করে পড়বে সে। তারপর যেদিন ফোন করা হবে, সেদিনকার তারিখটাও বলবে। ব্যস।

রানার প্রস্তাবে রাজি হলো গুজেনস। তবে শর্ত জুড়ল: যেহেতু তার ব্যাংক এ ধরনের কাজ করে না, সেহেতু কোনও সমস্যা হলে পুরো দায়-দায়িত্ব অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকেই নিতে হবে। এক কথায় রাজি হলো রানা। একটা নিরাপত্তা বণ্ডে সইও করতে হলো।

কাজ শেষ করে একটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ও। টাউন হলের উল্টোদিকের কাফে দে আর্টস-এ লাঞ্চ খেয়ে মেইন পোস্ট অফিসে এসে পাঁচ-ছয়টা লং ডিসট্যান্স কল করল। সাংকেতিক ভাষায় কথা বলল প্রতিটা রিসিভারে।

রিটার্ন ফ্লাইট ছাড়তে তখনও দু'ঘণ্টা বাকি আছে। কিছু করার নেই বলে ব্রাসেলস চলে এল রানা। দু'-একটা দর্শনীয় জায়গায় ঘোরাঘুরি করে সময়টা পার করল। স্থানীয় সময় রাত দশটার দিকে হিথরোয় ল্যাণ্ড করল ওর প্লেন।

পিটার মার্টিনও ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই কাটাল দিনটা। সকালের প্রথম ফ্লাইট ধরে জুরিখ যাত্রা করল সে। ক্লটেন এয়ারপোর্টে পৌঁছল দশটার খানিক পর। এক ঘণ্টা পর ৫৮, টালস্ট্রাস-এ হ্যাণ্ডেলসব্যাংকের হেড অফিসের কাউন্টারে এসে নিজের নামে একটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলল।

কিছু নির্দেশ দিল ব্যাংক ম্যানেজারকে। তাকেও একটা দীর্ঘ কণ্ট্রাক্টে সই করতে হলো যাতে স্পষ্ট লেখা আছে, নিয়ম বহির্ভূত লেনদেনের কারণে কোনও সমস্যা ঘটলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। সেটা এমনকী শাস্তিযোগ্য অবহেলা হলেও না। এক কথায় সুইস ব্যাঙ্কিং আইনে যত গালভরা সুযোগ-সুবিধার কথাই লেখা থাকুক, মার্টিনের বিশেষ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে সেসব কাগজ-কলমেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

অবশ্য বাস্তবে সেসবের প্রয়োগ থাকলেও মার্টিনের কিছুই আসত-যেত না। কারণ কোনও সুইস ব্যাংককে সুইস কোর্টের সামনে হাজির করে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ার স্পটলাইটে পরিণত হওয়ার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না সে।

সেখান থেকে বেরিয়ে জুইংলি ব্যাংকে এল মার্টিন। একটা ওয়াক্স-সিলড্ খাম পৌঁছে দিল ডক্টর মার্টিন স্টেইনহফারের সেক্রেটারির হাতে। রুডলফ গুন্থারের লেখা একটা চিঠি আছে ওতে। বিশেষ কিছু নির্দেশ আছে চিঠিটায়।

সন্ধ্যার পর লণ্ডন ফিরে এল পিটার মার্টিন।

মঙ্গলবার দুপুরের পর অফিসে উদয় হলো সাইমন এনডিন। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। ঘুমের অভাবে চোখ লাল। লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ বা কোম্পানিজ হাউসের রেজিস্টার্ড সাড়ে চার হাজার পাবলিক কোম্পানির মুডিজ ইনডেক্স কার্ডের প্রত্যেকটির উপর নজর বোলাতে গিয়ে বারোটা বেজে গেছে। সবগুলো অবশ্য দেখা হয়ে ওঠেনি। এখনও কিছু বাকি রয়েছে।

ওগুলোর মধ্যে একটা শেল কোম্পানি খুঁজে ফিরছে সে। একটা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান, কোম্পানিজ হাউসে তালিকাভুক্ত হয়েও কোনও কারণে ব্যবসায় মার খেয়ে গেছে। বসে গেছে, নয়তো গত তিন বছর ধরে লোকসান দিয়ে চলেছে। নয়তো বছরে দশ হাজার পাউণ্ডের নীচে ব্যবসা করেছে, এরকম একটা।

সেটার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আবার দুই লাখ পাউণ্ডের নীচে হতে হবে। এরকম দুই ডজন কোম্পানির খোঁজ বের করে বসকে দিয়েছে সে। গুন্থার সেগুলোকে গুরুত্ব অনুযায়ী এক থেকে চব্বিশ পর্যন্ত নম্বর দিয়ে তালিকাভুক্ত করে রেখেছে।

দুপুরের দিকে সিটি রোডের ইসি টু, কোম্পানি হাউজে এল এনডিন। নিজের তৈরি তালিকার কোম্পানিগুলোর মধ্য থেকে প্রথম আটটার নাম আর্কাইভিস্টকে দিল সেগুলোর যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে আসতে—পরীক্ষা করবে। ওগুলোর কোনওটার শেয়ারের দামই তিন শিলিঙের বেশি নয়।

এ জন্য একটা ফি দিতে হয়। সেটা পরিশোধ করে রিডিং রুমে আটটা পেটমোটা ফোল্ডারের আসার অপেক্ষা করতে লাগল আইরিশ। সামনে লেটেস্ট স্টক এক্সচেঞ্জ অফিশিয়াল লিস্ট পড়ে আছে দেখে চোখ বোলাল। আকর্ষণীয় কিছু নেই। ফোল্ডারগুলো পৌছতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

মুডিজ কার্ডে উল্লেখ নেই, এরকম তিনটে জিনিস খুঁজছে সে বাছাই করা কোম্পানিগুলোর তথ্যভাণ্ডারের মাঝে। যেগুলো আসলে সিনোপসিস, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি সম্পর্কিত তথ্যাবলীর সারাংশ। কম্বাইণ্ড বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স নিয়ন্ত্রণ করে না, এমন একটা কোম্পানি খুঁজছে সে। কোনও একক ব্যক্তি বা অ্যাসোশিয়েটেড গ্রুপ নতুন করে যেটার শেয়ার-হোল্ডিংস বিল্ড-আপের ঘটনা ঘটায়নি। লণ্ডন জঙ্গলের আর কোনও প্যান্থার একই লাইনে খাবার সন্ধান করছে কি না, সেটা জানা খুব জরুরি।

কোম্পানি হাউস বন্ধ হওয়ার আগে সাতটা ফোল্ডার ঘাঁটার কাজে সেরে ফেলল এনডিন। একটা রেখে দিল। পরেরদিন বাকি ষোলোটার সঙ্গে চেক করবে। তবে যে সাতটা দেখা হয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয়টা নিয়ে সে কিছুটা আশান্বিত।

তার দৃষ্টিতে ওটা চমৎকার হয়। এতদিন যে কেউ ওটা হাতিয়ে নেয়নি, সেটাই বরং অবাক করল তাকে।

রুডলফ গুন্থার সাধারণত নিজস্ব জেট ছাড়া চলাফেরা করে না। কিন্তু আজ তা না করে ট্রাইডেন্ট থ্রি-র ফার্স্ট ক্লাসে জুরিখ যাত্রা করল সে। প্লেনেই পেট পুরে

নাস্তা খেয়ে নিল। দুপুরের একটু আগে সসম্মানে ডক্টর মার্টিন স্টেইনহফারের প্যানেলড অফিসে নিয়ে আসা হলো তাকে।

এই দু'জনের পরিচয় ও বন্ধুত্বের বয়স এক যুগেরও বেশি। বিভিন্ন সময়ে গুন্থারের অনুরোধে তার হয়ে শেয়ার ব্যবসা পরিচালনা করেছে স্টেইনহফার, বিশেষ করে যখন তার শেয়ার কেনার জন্য নমিনির প্রয়োজন হয়েছে এবং যার পিছনে গুন্থারের মত ব্যারন আছে জানাজানি হলে দাম তিনগুণ বেশি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে।

এগিয়ে এসে মূল্যবান ক্লায়েন্ট হের গুন্থারকে রিসিভ করল ডক্টর মার্টিন স্টেইনহফার, হ্যাণ্ডশেক করে একটা আরামদায়ক আর্মচেয়ারে বসতে দিল। চুরুট অফার করল তাকে সুইস ব্যাংকার। কফি নিয়ে এল সুন্দরী সেক্রেটারি। সে বেরিয়ে যেতে আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল টাইকুন।

'অল্পদিনের মধ্যে একটা ব্রিটিশ কোম্পানির নিয়ন্ত্রক হওয়ার ইচ্ছে আছে আমার। ছোটো পাবলিক কোম্পানি। এ মুহূর্তে সেটার নাম আপনাকে জানাতে পারছি না, কারণ আমি নিজেই এখন পর্যন্ত সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারিনি। দু'-চার দিনের মধ্যে জেনে যাব আশা করি।'

কফিতে চুমুক দিল স্টেইনহফার। নীরবে মাথা দোলাল। 'বলে যান, প্লিজ!'

'শুরুর দিকে অপারেশন হবে ছোটো স্কেলের। অল্প টাকাকড়ি লেনদেন হবে। পরে কোনও এক সময় স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানিটার খবর জানাজানি হয়ে গেলে আশা করি শেয়ারের দাম নাটকীয়ভাবে অনেক গুণ বেড়ে যাবে।'

বলে চলল সে। যদিও লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার লেনদেনের আইন এই সুইস ব্যাংকারকে শেখানোর প্রয়োজন নেই, কারণ গুন্থারের চেয়ে ওসব কোনও অংশে কম জানে না সে। সারা পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় শেয়ার মার্কেটের আইন তার পকেটে থাকে। পেশার খাতিরে জানতে হয়।

ব্রিটিশ কোম্পানি আইনে আছে, যে ব্যক্তি কোনও পাবলিক কোম্পানির দশ পার সেণ্ট শেয়ারের মালিক হবে, তার পরিচয় গোপন রাখা চলবে না। চোদ্দ দিনের মধ্যে সেই কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে হবে তাকে। এটা করা হয়েছে সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা যাতে জানতে পারে সেটার মালিক কে এবং সে কত পার সেণ্টের মালিক।

একই কারণে যদি লণ্ডনের কোনও নামকরা স্টকব্রোকিং হাউস তার ক্লায়েন্টের হয়ে শেয়ার কেনাকাটা করতে চায়, তাকেও অন্য ডিরেক্টরদেরকে জানাতে হবে কার হয়ে কাজ করছে সে। যদি তা দশ পার সেণ্টের নীচে হয়, তা হলে অবশ্য জানাতে হবে না। সে ক্ষেত্রে ক্রেতা চাইলে নিজেকে আড়ালে রাখতে পারে।

আইনটা করা হয়েছে আসলে ধনীদের সাহায্য করতে। তারা যাতে নমিনি বায়ারদের সহযোগিতায় গোপনে কোনও কোম্পানির মালিক হতে চাইলে হতে পারে, সেই জন্য। তবে এর বিপরীত বিধানও আছে। স্টক এক্সচেঞ্জের নামকরা কোনও স্টকব্রোকিং হাউস যদি বুঝতে পারে পর্দার আড়াল থেকে আসলে এক ব্যক্তিই নমিনিদের সহায়তায় শেয়ার কিনছে, তা হলে তারা তা প্রকাশ করে

দিতে বাধ্য। নইলে বিপদ হলে সে-ও বাঁচবে না।

কিন্তু সুইটজারল্যাণ্ডে এই আইন আলাদা। এ দেশের স্টক এক্সচেঞ্জ বা ব্যাংক কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয়। কে কোন্ কোম্পানির মালিক, তাদের কাছে তা জানতে চাওয়ারও অধিকার কারও নেই। রুডলফ গুন্থার ও ডক্টর স্টেইনহফার, দু'জনেই খুব ভাল করে জানে ব্রিটিশ আর সুইস আইনের ফাঁক-ফোকর। সুইস ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুবিধা।

'শেয়ারের মালিকানার প্রশ্নে আমি ছয়জন পার্টনার নিয়ে কাজ করব ঠিক করেছি,' বলল গুন্থার। 'অন্যরা আমার তরফ থেকে শেয়ার কিনবে। তারা সবাই আপনার জুইংলি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে রাজি হয়েছে। আপনি দয়া করে ওদের সবার হয়ে শেয়ার কেনার কাজটা করবেন।'

ডক্টর কাপ রেখে নীরবে মাথা দোলালেন। 'কোনও অসুবিধা দেখছি না। আপনার বাকি পার্টনাররা সবাই অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে সশরীরে এখানে আসছেন?'

চুরুটের সুগন্ধী ধোঁয়ার মেঘ ছড়াল পাইরেট। 'আসলে তারা সবাই খুব ব্যস্ত মানুষ। আসতে পারবে কি না সন্দেহ। আমি নিজের কাজের জন্য একজনকে ফিনানশিয়াল অ্যাসিসটেণ্ট নিয়োগ করেছি।' শ্রাগ করল। 'বুঝতেই পারছেন, সময় বাঁচাতে। আমার পক্ষেও বারবার আসা সম্ভব হবে না। বাকি ছয়জনও হয়তো সেভাবেই কাজ করতে চাইবেন। এতে আপনার কোনও আপত্তি নেই আশা করি?'

'নিশ্চয়ই না,' বলল স্টেইনহফার। 'আপনার ফিনানশিয়াল অ্যাসিসটেণ্ট কে হচ্ছেন?'

'মিস্টার সাইমন্ এনডিন।' পকেট থেকে একটা খাম বের করল গুন্থার। 'এই হচ্ছে আমার পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি। অ্যাজ পার ল নোটারাইজড্ অ্যাণ্ড উইটনেসড্। আমার স্বাক্ষর এবং স্পেসিমেন সিগনেচার, সবই আছে এর সঙ্গে। সাইমন এনডিনের পুরো নাম আর পাসপোর্ট নাম্বারও আছে। আগামী সপ্তাহে সে আসবে আপনার ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করতে। তারপর থেকে আমার জায়গায় কাজ করবে সে।' একটু বিরতি দিল। 'কোনও সমস্যা হবে না নিশ্চয়ই?'

খামের ভেতর থেকে একটাই কাগজ বের হলো। ওটা ভাল করে পড়ে মাথা দোলাল ব্যাংকার। 'নিশ্চয়ই না, হের গুন্থার। আমি তো কোনও অসুবিধা দেখছি না।'

চুরুট নিভিয়ে রেখে উঠে পড়ল জার্মান ব্যারন। 'এবার তা হলে বিদায় নিতে হয়, ডক্টর। এরপর থেকে আমার যাবতীয় স্বার্থ মিস্টার এনডিনই দেখাশোনা করবেন।'

পিকাডিলির অন্যতম উঁচু আর সুন্দর ভবন আর জি টাওয়ার। ওটার মালিক একজন জার্মান শিল্পপতি, তার নাম রুডলফ গুন্থার। সৌন্দর্যের দিক থেকে আশপাশের অন্য অনেক ভবনের মালিকের ঈর্ষার বস্তু আর জি টাওয়ার।

ভবনটায় বাইরের কোনও ভাড়াটিয়া নেই, পুরোটা জুড়ে রয়েছে মালিকেরই বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অফিস।

সর্বোচ্চ তলার পুরোটাই গুস্থারের একার দখলে। এক পাশের সবটুকু নিয়ে তার বিলাসবহুল অফিস। অন্য পাশে ভিভিআইপি গেস্টদের শানদার রেস্ট হাউস।

মালিক একদিনের জন্য লণ্ডনের বাইরে গেছে, তাই তার পি.এস. মিস কুকের হাতে কোনও কাজ নেই। নির্জন টপ ফ্লোরে একা একা অফিস আগলে বসে আছে সে, একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছে অলস ভঙ্গিতে। আসলে দেখছে না, মনটা তার পড়ে আছে আর কোথাও।

এক সময় সে-ও এদেরই মতো ছিল, ভাবছে মিস কুক। ফ্যাশন পত্রিকার এইসব উদ্ভিন্ন যৌবনা, ক্ষীণকটিদের মতো। কত যুবকের রাতের ঘুম হারাম হয়েছে তাকে দেখে, তাকে আপন করে পেতে কত কিছুই না করেছে তারা।

তারপর, ফাস্ট মোশন ছায়াছবির মত দেখতে দেখতে ত্রিশটা বছর পেরিয়ে গেল। অথচ ভাবতে গেলে মনে হয় এই তো, মাত্র সেদিনের কথা। অতীত মনে পড়লে একেকসময় খুব কষ্ট হয় বেচারির। এখানকার কেউ জানে না আজ যাকে তারা আড়ালে-আবডালে 'দ্যাট ওল্ড ব্যাট' বা 'শ্রিভেলড অ্যাপেল' বলে, এক সময় তারও একটা সুন্দর ডাক নাম ছিল।

মারজোরি—সুগন্ধী লতা। অনেক আগে অবশ্য।

আর দশটা মেয়ের মত একদিন তারও বিয়ের ফুল ফুটেছিল। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী... ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল তার। চোখ মেলে চমকে গেল সামনেই গ্যাস মাস্ক পরা এক যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তার পিছনে আরও তিনজন আছে। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল সিম কুক। মাস্কের স্বচ্ছ আবরণের পিছনে যুবকের চোখ দুটো হেসে উঠল যেন।

'আপনারা?' সামনের লোকগুলোকে দেখল সে বোকার দৃষ্টিতে। 'কী হয়েছে?'

'সরি টু ডিসটার্ব ইউ, ম্যা'ম,' যুবক বলল। 'আপনাদের বিল্ডিঙের গ্যাস আর টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা এসেছি সেগুলো ঠিক করতে।'

'আমাদের গ্যাস লাইন...'

মনোযোগ ছুটে গেছে যুবকের। পিছনে দাঁড়ানো তিন সঙ্গীর উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। 'আগে এই রুমের লাইনগুলো সব চেক করো। তারপর,' গুস্থারের রুম দেখাল, 'ওটার।'

দলটাকে দেখে রীতিমত বোকা হয়ে গেল মারজোরি। এত কিছু কখন ঘটল বুঝে উঠতে পারছে না। কে আবিষ্কার করল এসব? কে খবর দিল এদেরকে? কখন? এরকম কিছু ঘটলে তো তারই খবর দেয়ার কথা, কিন্তু...

দলে একটা মেয়ে আছে দেখল মারজোরি। কথার ফাঁকে কাছে এসে পড়েছিল। তার গা থেকে বের হওয়া মিষ্টি একটা গন্ধে সারা শরীর অবশ হয়ে এল তার। পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, মেয়েটা সময়মত ধরে ফেলল। সাবধানে

বসিয়ে দিল চেয়ারে। মেয়েটাকে তার পাহারায় রেখে অন্যরা সংযোগ দরজা দিয়ে গুন্থারের খাস কামরায় সেঁধিয়ে গেল।

টেলিফোন বাদে আর সব চেক করতে লাগল ব্যস্ত হাতে। সেফের তালা ভাঙার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল দলটা, কিন্তু তার দরকার হলো না। ড্রয়ার খুলেই পেয়ে গেল যা খুঁজছিল। ডিজিটাল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠতে লাগল ঘন ঘন।

বিশ মিনিটের মধ্যে আর জি টাওয়ার ছেড়ে চলে গেল দুই মেইনটেন্যান্স টিম। কারণ হিসেবে বলা হলো, গোলমাল আসলে ভবনের ভিতরে নয়, সাপ্লাই লাইনের কোনও এক জায়গায় ঘটেছে। সেটা কোথায়, খুঁজে দেখতে যাচ্ছে তারা।

১৭ এপ্রিল ব্যাঙ্কিং আওয়ার শেষ হওয়ার একটু আগে মাসুদ রানার ক্রেডিয়েটব্যাংকের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির টাকাটা জমা হলো। অংকটা দেখে বেশ অবাক হলো ব্যাংকের ফরেন অ্যাকাউন্টস সেকশনের প্রধান, গুজেনস।

মিস্টার জেমস ব্রাউনের কথা ছিল সুইটজারল্যাণ্ড থেকে 'কিছু টাকা' ট্রান্সফার হয়ে আসবে তার নামে। কিন্তু এ যে বিশাল অংকের টাকা! বিষয়টা কী?

এদিকে খেয়াল রাখতে হবে তো, নিজেকে বলে রাখল সে। তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে।

সামনের টেবিলটায় ছড়িয়ে থাকা ফোটোগ্রাফগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। ওর মধ্যে একটা প্রিন্টের পুরোটা জুড়ে আছে একটা ফোল্ডারের ছবি। সেটার উপরে পেস্ট করা সাদা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

ক্রিস্টাল মাউণ্টেন
রিপাবলিক অভ জাংগারো

বাকিগুলোয় আছে কোনও এক রিসার্চ সেণ্টারের রক আর সয়েল স্যাম্পল অ্যানালাইসিসের বড়সড় রিপোর্ট—প্রতি পৃষ্ঠার একটা করে ছবি তুলে আনা হয়েছে সেটার। জটিল বিষয়। রিসার্চ সেণ্টারের নাম পড়ার উপায় নেই, কারণ যত্নের সঙ্গে কালি লেপে দেয়া হয়েছে নামটার উপর। ইচ্ছে করেই এ কাজ করা হয়েছে, সন্দেহ নেই।

অ্যানালাইসিসের রিপোর্টটার সঙ্গে আছে প্রেশাস মেটালের উপর আরেক দীর্ঘ রিপোর্ট। প্লাটিনামের সঙ্গে বাকি সব মেটালের দামের পার্থক্য নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি।

সবশেষে আছে শেয়ার মার্কেটের একটা শেল কোম্পানি কেনার প্রসঙ্গ। এই অংশটা হাতে লেখা।

অপলক তাকিয়ে থাকল রানা। বোঝার চেষ্টা করছে কী চলছে জার্মান নেকড়েটার গর্তে।

অবশেষে টানা পাঁচদিনের গাধার খাটুনির পর সাইমন এনডিনের খোঁজাখুঁজি শেষ হলো। অবশিষ্ট সতেরোটা ফোল্ডারের মধ্যে থেকে পাঁচটা কোম্পানি আলাদা করে রেখেছিল সে। পরদিন চেক করতে গিয়ে দেখা গেল তার প্রথমটার মত একটা কোম্পানিই মনে মনে খুঁজছিল সে।

দুপুরের মধ্যে ওটা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য পড়ে ফেলল সে। বস তখন জুরিখে। ফিরতে আরও দেরি হবে। এ মুহূর্তে হাতে কিছু করার নেই বলে দিনের বাকি সময়ের জন্য নিজেই নিজেকে ছুটি দিয়ে দিল সে। বাকি যে সামান্য কাজটুকু আছে, কাল সকালে অফিসে এসে করবে।

চারটার আগে নিজের হ্যামস্টিড গার্ডেন সাবার্ব-এর বাড়িতে ফিরে মোয়ার দিয়ে লনের ঘাস কাটতে লেগে পড়ল সে।

বারো

রাত আটটায় টেলিফোন বেজে উঠল রানার অ্যাপার্টমেন্টের। দ্বিতীয়বার রিং হতে রিসিভার তুলল ও। 'হ্যালো।'

'বউ কথা কও!'

নীরবে হাসল রানা।

'বউ কথা কও!' একটু পর, 'মরুভূমির উট শহরে এসে পথ হারিয়েছে, বস!'

'আতাসী!' বিস্তৃত হলো রানার হাসি। 'তোমরা এসেছ?' অনেকদিন পর এতগুলো প্রিয় মানুষের সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে ভেবে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল রানা।

'অপমান করছ মনে হয়? তোমার ডাকে আমরা না... ?' একটা বোয়িং উড়ে যাওয়ার প্রচণ্ড শব্দে চাপা পড়ে গেল বাকি কথা। হিথরো থেকে ফোন করেছে বেদুইন।

'একটা ঠিকানা লেখো,' রানা বলল।

লিখে নিল আতাসি। 'এই ঠিকানায় চলে যাও তোমরা। রেস্ট নাও। আমি আসছি।'

'ওকে, বস।'

ঠিক এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয়বার ফোন বাজল। 'হ্যালো!'

'আমি, ওস্তাদ।'

'খান?'

'হাঁ জ্বি।'

তাকেও একই ঠিকানা দিল ও। বলল, 'এখনই চলে যাও। আমিও আসছি।'

প্রথমবার ফোন বাজার এক ঘণ্টা বিশ মিনিট পর লণ্ডনের বো রোডে নাক ঢোকাল রানার অ্যাস্টন মার্টিন। জায়গাটা শহরের একদম প্রাণকেন্দ্রে। ব্যস্ততম এলাকা মে ফেয়ার সংলগ্ন। একটু পর চারপাশে উঁচু দেয়ালঘেরা একটা চারতলা বাড়ির গেটে এসে থেমে দাঁড়াল সেটা। আধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম চালিত গেট আপনাআপনি খুলে গেল। ঢুকে পড়ল ও।

রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউজ এটা।

দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ হওয়ার ধকল থেকে রেহাই পেতে মিনিট পাঁচেক লেগে গেল। ফায়জা আর মার্সিয়ার আলিঙ্গনের কবল থেকে মুক্তি পেতে তিন মিনিট লাগল রানার। আতাসির হাত থেকে ছাড়া পেতে লাগল বাকি দুই মিনিট।

ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ বেদুইন আগের মতই আছে। তেমনি হাসিখুশি, প্রাণবন্ত, ছটফটে।

মার্সিয়ার মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ল না। আগের মতই আছে, ভাবল রানা। হাসিটা তেমনি আছে। যেদিন তাকে ইসরাইলের আরব দলন কেন্দ্র, বারাক বেন কানানে প্রথম দেখেছিল ওরা, যেদিন পথহারা বেদুইন তার পার্থিব ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিল, সেদিনের মতই মোহনীয়।

কালোকেশিনী ফায়জা সামান্য মুটিয়ে গেছে। নইলে বাকি সব আগের মতই। সেই ভরাট, বঙ্কিম দেহ। চুলের ব্র্যাকেটে বন্দি ফরসা মুখ। সবুজ চোখ, ছোট্ট নাক, একটু ভারী ঠোঁট। একটু পর পর অকারণে হেসে উঠছে সে। উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারছে না।

একটু পর রুমে উপস্থিত পঞ্চমজন এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করল রানার সঙ্গে, তারপর জড়িয়ে ধরল। 'কেমন আছেন আপনি, ওস্তাদ?'

মিশ্রী খান পাঞ্জাবী। পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেন ছিল। প্রকাণ্ড একজোড়া কালো গোঁফ তার। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি পঞ্চাশ। হাড্ডিসার মস্ত কাঠামো শরীরের। দেখলেই বোঝা যায় বহু ঘাটের পানি খাওয়া চিজ। এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারে আশ্চর্য এক প্রতিভা। দুই-আড়াইশ' গ্রাম বারুদ হাতে ধরিয়ে দিলেই বোমা বানিয়ে ফেলবে। কর্মঠ এবং ভয়ঙ্কর। দুনিয়াতে সম্ভবত রানাকেই একমাত্র ওস্তাদ ডাকে লোকটা, আর সবাই তার ভাতিজা।

'ভাল। তুমি কেমন আছ, খান?'

'আমিও ভাল, ওস্তাদ!' মাথা দোলাল সে ঘন ঘন। একভাবে রানাকে দেখছে। 'জীবনে আর কখনও আপনাকে দেখব চিন্তাই করিনি। শুকর আলহামদুলিল্লাহ!' আতাসির উপর দিয়ে ঘুরে এল তার চকিত দৃষ্টি। 'বুড়ো হাড়ে এত কোস্তাকুস্তি সহ্য হবে না বলে এতক্ষণ দূরে সরে ছিলাম।'

হাসল রানা। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই তোমাদের।'

পরিচয় পর্ব সেরে পুরনো দিনের গল্পে মেতে উঠল সবাই।

নিজের আবিষ্কার নিয়ে রুডলফ গুন্থারের অফিসে ঢুকল সাইমন এনডিন। রাত

দশটার বেশি বাজে। স্টাফরা সবাই অনেক আগেই চলে গেছে। আছে কেবল সে আর বস। এত রাত পর্যন্ত কাজ করার অভ্যাস নেই। অসহ্য লাগছে এনডিনের।

কিন্তু কী করা! এক মিলিয়ন পাউণ্ড রোজগার করতে চাইলে কষ্ট না করে উপায় কী? মাসুদ রানার জাংগারো অভিযানের সময় যত এগিয়ে আসছে, বসও অফিসে ততই বেশি বেশি সময় কাটাচ্ছেন। আর কতদিন এ অবস্থা চলবে কে জানে!

এনডিনের তৈরি করা তালিকার উপর চোখ বোলাল পাইরেট। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিং পরিদর্শনে লাগল। চিন্তিত। 'বোরম্যাকের ব্যাপারে তোমার ধারণায় কোনও ভুল নেই, এনডিন,' একটু পর মুখ খুলল সে। 'কিন্তু এতদিনেও এটার ওপর কারও নজর পড়ল না, এ কেমন কথা?'

এই একই প্রশ্ন কাল সারাদিন সারারাত নিজেকেও করেছে সাইমন এনডিন। কিন্তু জবাব পায়নি।

বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড ছিল অনেকগুলো রাবার প্ল্যান্টেশন নিয়ে গঠিত অনেক পুরনো একটা প্রতিষ্ঠান। ১৯২০ সালের। চীনা স্লেভ লেবারদের কাজ করতে বাধ্য করা হতো সেই প্ল্যান্টেশনে। সেটার প্রতিষ্ঠাতা ছিল মাঝবয়সী এক নির্দয় স্কট, আয়ান ম্যাকালিস্টার। প্ল্যান্টেশনগুলো বোর্নিওতে। মাঝবয়সী স্কটের স্ত্রীর বয়স ছিল তখন মাত্র সতেরো বছর।

১৯৩০ সালে আয়ান ম্যাকালিস্টার লণ্ডনের একদল ব্যবসায়ীকে নিয়ে পার্টনারশিপে বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি খোলে এবং পরের বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ সাধারণ শেয়ার বাজারে ছাড়ে। তার ভাগে পড়ে দেড় লাখ শেয়ার, কোম্পানির বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স-এর একটা পদ এবং রাবার এস্টেটের আজীবন ম্যানেজারশিপ।

এর দশ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা যুদ্ধকে পুঁজি করে রাবারজাত সামগ্রী সরবরাহের বড় বড় কণ্ট্রাক্ট হাতিয়ে নেয়, ফলে শেয়ারের দাম শুরুর দিকের চার শিলিং থেকে এক লাফে দুই পাউণ্ডেরও বেশি হয়ে যায়।

কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে রাবারের প্রয়োজন কমে যায়, ফলে শেয়ারের দামও পড়তে শুরু করে। মাঝে গাড়ির জন্য রাবারের টায়ারের প্রয়োজন বেড়ে যাওয়ায় কিছুদিনের জন্য কিছুটা চাঙ্গা হয়েছিল। ততদিনে সার ম্যাকালিস্টারের শেয়ারের পরিমাণ বেড়ে তিন লাখ হয়েছে। তারপর আর কোনও শেয়ার ইসু হয়নি বোরম্যাকের।

পরে ১৯৪৮ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হল্যাণ্ডের নিয়ন্ত্রণ থেকে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ ও বোর্নিওকে ছিনিয়ে নেয়। ফলে বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানির মৃত্যু ঘণ্টা বেজে যায়। এর কিছুদিন পর ইন্দোনেশিয়ান বোর্নিও এবং ব্রিটিশ নর্থ বোর্নিওর বর্ডার নতুন করে আঁকা হয়। দুর্ভাগ্যবশত বোরম্যাকের প্ল্যান্টেশন এস্টেট পড়ে যায় ইন্দোনেশিয়ার অংশে।

সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে জাতীয়করণ করে নেয় দেশটি, কোনও ক্ষতিপূরণ

ছাড়াই। সেই থেকে বোরম্যাক কোম্পানি প্রায় আধ শতাব্দী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। হাজার চেষ্টা করেও নিজের সম্পদ আর ফিরে পায়নি কোম্পানিটি। প্রেসিডেণ্ট সুকর্ন আর সুহার্তোর সঙ্গে একের পর এক অর্থহীন ল সুইটে জড়িয়ে একদিকে নিজের পুঁজি হারিয়েছে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম পড়তে পড়তে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

সাইমন এনডিনের নজর যখন পড়ে, তখন ওটার প্রত্তিটা শেয়ারের দাম এক শিলিং মাত্র। তার আগের বছর ছিল এক শিলিং তিন পেন্স করে। ওটার বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। এই কোম্পানির আইন অনুযায়ী পাঁচজনের মধ্যে দু'জন ডিরেক্টর একমত হলেই যে কোনও রেজলিউশন পাস করা যাবে।

কোম্পানির হেড অফিস হিসেবে যে ঠিকানা দেয়া আছে, সেটা সিটি সলিসিটরের অনেক পুরনো এক প্রতিষ্ঠানের। নিজেদের আসল অফিস অনেক আগেই হাওয়া হয়ে গেছে। বোর্ড মিটিং শেষ কবে হয়েছে, সে রেকর্ড আছে কি না সন্দেহ।

বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যানের বয়স অনেক, সার আয়ান ম্যাকালিস্টারের আণ্ডার-ম্যানেজারের ছোটো ভাই সে। সাসেক্সে থাকে। এখন বড় ভাইয়ের শেয়ারগুলোর মালিক সেই লোক। আরেক সদস্য হলো কোম্পানি সেক্রেটারি, সিটি সলিসিটর। একমাত্র শেষেরজন ছাড়া অন্য চারজনের সবাই লণ্ডন থেকে অনেক দূরে দূরে বাস করে। আজকাল আর মিটিং-সিটিং হয় না বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের।

এই পাঁচজন ডিরেক্টর এক মিলিয়ন শেয়ারের মাত্র আঠারো পার সেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি বাহান্ন পার সেণ্টের মালিক সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সাড়ে ছয় হাজার শেয়ারহোল্ডার। তাদের বেশিরভাগই বিবাহিত ও বিধবা মহিলা। সন্দেহ নেই, নিজেদের শেয়ারের পোর্টফোলিওর কথা এতদিনে তারা ভুলেই গেছে। ব্যাংকের ডিড বক্সে নয়তো সলিসিটরের অফিসে পড়ে পড়ে পোকার খাদ্য হচ্ছে সেগুলো।

কিন্তু ওসব গুন্থারের কাম্য নয়। সে যদি বাজার থেকে শেয়ার কিনে বোরম্যাকের কণ্ট্রোলিং ইণ্টারেস্টের মালিক হতে চায়, তা হলে প্রথমত সময় লাগবে বছরের পর বছর, দ্বিতীয়ত ব্যাপারটা চট্ করে শহরের আর সব ধুরন্ধর স্টক মার্কেট ওয়াচারদের চোখে পড়ে যাবে। তারা বুঝে ফেলবে বড়সড় কোনও বোয়াল মাছ বোরম্যাককে গিলে ফেলার চেষ্টা করছে।

তাই তার লক্ষ্য হচ্ছে কেবল বিধবা লেডি ম্যাকালিস্টার এবং তার মালিকানাধীন তিন লাখ শেয়ার।

কেন কেউ তার কাছ থেকে এত বছরেও ওগুলো কিনে নেয়নি, গুন্থার ভেবে অবাক হলো। নেয়নি যখন ভালই হয়েছে। মনে হয় তার ভাগ্যে লেখা ছিল বলে নেয়নি। বা নিতে পারেনি।

ওটার মেমোরেণ্ডামে লেখা আছে, বোরম্যাক ইউনাইটেড কিংডমের বাইরের যে কোনও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়েও ব্যবসা করতে পারবে।

'মহিলার বয়স এতদিনে নিশ্চয়ই পঁচাশি-নব্বই হয়েছে,' এনডিন বলল এক সময়।

'কেউ নিশ্চয়ই গিয়েছিল ওগুলো কিনতে,' গুন্থার বলল চিন্তিত চেহারায়। 'কেন বিক্রি করেনি মহিলা?'

'হয়তো মহিলা বেচতে চায় না,' সাইমন এনডিন বলল। 'অথবা যারা কিনতে গিয়েছিল তাদেরকে পছন্দ হয়নি।' শ্রাগ করল। 'বুড়ো মানুষদের মন বোঝা ভার।'

স্টক আর শেয়ার কেনাকাটার ক্ষেত্রে বুড়ো মানুষরা অযৌক্তিক কাজ করে, এটা ঠিক সেরকম কিছু নয়। মনে মনে বলল গুন্থার। সে জানে উপযুক্ত, বরং কখনও কখনও বেশি দাম প্রস্তাব করার পরও অনেক সময় ক্লায়েন্ট নিজের শেয়ার বেচতে রাজি হয় না, বেশিরভাগ স্টেকব্রোকারের এ অভিজ্ঞতা আছে। এর একমাত্র কারণ তারা স্টকব্রোকারদের পছন্দ করে না। এ পেশাকেই ঘৃণা করে—পুরনো মূল্যবোধ।

সামনে এগিয়ে এসে টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে বসল পাইরেট। 'এনডিন, এই মহিলাকে খুঁজে বের করো। জানার চেষ্টা করো সে কে, তার চিন্তাধারা কেমন। কী তার পছন্দ, কী পছন্দ না। সবচেয়ে বড় কথা, তার দুর্বলতা কীসে, সেটা জানার চেষ্টা করতে হবে তোমাকে। নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দুর্বলতা আছে তার। থাকতেই হবে। সেই দুর্বল জায়গা চিনে নিয়ে টোকা দিতে পারলেই শেয়ার বেচতে রাজি হবে মহিলা।

'হয়তো টাকা নয় সেটা। কারণ কেউ ওগুলো কেনার চেষ্টা করে থাকলে নিশ্চয়ই টাকা অফার করেছে। আমার ধারণা সেটা আর কিছু হবে। খুঁজে বের করো।'

চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়েছিল সাইমন এনডিন, গুন্থারের ইশারায় আবার বসল। নিজের ড্রয়ার থেকে ছয়টা ছাপানো ফরম বের করল পাইরেট। সবগুলো একই রকম দেখতে এবং সবগুলোই জুরিখের জুইংলি ব্যাংকের একটা নাম্বারড অ্যাকাউন্টের অ্যাপ্লিকেশন ফরম।

ওগুলো দিয়ে কী করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠল আইরিশ।

'কাল সকালের প্রথম ফ্লাইটের সিট বুক করে ফেলো। তা হলে রাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে।'

'আচ্ছা।' লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেল গুন্থারের এইড।

একে একে সবার মুখের উপর দিয়ে ঘুরে এল রানার দৃষ্টি। তাদেরকে ডেকে পাঠানোর কারণ এইমাত্র অল্প কথায় ব্যাখ্যা করেছে ও। গুন্থারের ভূমিকার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অবশ্য। ওটা এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

একটা দেশের নির্যাতিত, অসহায় সাধারণ মানুষের মাথার উপর থেকে একটা অপশক্তিকে সরিয়ে তাদেরকে অসহনীয় দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দিতে ওরা রাজি কি না, সেটাই এখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আসা-যাওয়ার প্লেন ভাড়া আর

অ্যাডভেঞ্চারের গ্যারান্টি, এ ছাড়া বিনিময়ে দেয়ার কিছু নেই রানার।

'ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে যেয়ো না। এটা আগেরগুলোর মত অফিশিয়াল নয় যে যেতেই হবে। কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এবার। রাস্তাও মোটামুটি লম্বা, তাই আমি ঠিক করেছি জাহাজে করে যাব। সুবিধা হবে তাতে, আবার ঝুঁকিও আছে। অ্যাকশনের সময়কার মৃত্যু ঝুঁকি তো থাকছেই, পথেও নানান গোলমালে জড়াতে হতে পারে।' শ্রাগ করল রানা।

প্রতিক্রিয়া যেমন হবে আশা করেছিল, তেমনই হলো। নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাল কম্যাণ্ডোরা, সামান্যতম দ্বিধা নেই কারও মধ্যে। আতাসি শার্টের মধ্যে হাত ভরে দিয়ে রোমশ বুকটা খসড় খসড় করে চুলকাল খানিক। মিশ্রি খান বিশ্রী গন্ধওয়ালা বগা, মানে কিং স্টর্ক সিগারেট ধরাল। রানাকেও সাধল, কিন্তু মাথা নাড়ল ও। ফায়জা নির্বিকার। মার্সিয়া ফ্লোর টাইলস পরখ করছে মন দিয়ে।

এক সময় মুখ তুলল মার্সিয়া। 'ধরো, তোমার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আমরা ফিরে গেলাম। কাজটা কীভাবে করবে তুমি?'

'একভাবে না একভাবে করতে তো হবেই,' জোর দিয়ে বলল ও। 'যেভাবেই হোক।'

'বিকল্প ব্যবস্থা যদি থাকেই, তা হলে আমাদেরকে ডেকে আনার দরকার কী ছিল?'

রানাকে উপযুক্ত শব্দ হাতড়াতে দেখে মিশ্রি খান সাহায্য করল। 'এটাকে এভাবেও দেখা যায়, মেজর আমাদেরকে এ কাজে ডেকে এনে সম্মানিত করেছেন। আসলে এটাকে আমরা পুনর্মিলনী হিসেবেও ধরে নিতে পারি।'

নীরবতা নেমে এল রুমে। সবার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে বুঝতে পেরে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'তা হলে আর এসব মারফতি আলাপ কেন, মেজর?' আতাসি বলল। 'বাকি কথাবার্তা সেরে ফেলা যাক।'

ফ্লোরে একটা বড়, হাতে আঁকা ম্যাপ বিছাল রানা। সবাই মন দিয়ে দেখল ওটা। আফ্রিকান উপকূলের একটা অংশের ম্যাপ, এক সারি বিল্ডিংও আছে সাগরের তীরজুড়ে। আর আছে স্ট্যাগ গুবরের দুটো শিং এবং তার মধ্যখানের হারবার। ওসব কোথাকার, কেউ জানে না।

রানা দেশটার নাম বলেনি, কম্যাণ্ডোরা জানতেও চায়নি। তাদের জানার দরকার নেই। অবিশ্বাসের কারণে রানা বলেনি, আসলে তা নয়। নিরাপত্তার খাতিরে বলেনি। এটাই নিয়ম।

যাত্রা করার পর জায়গামত পৌঁছতে আনুমানিক কতদিন লাগবে, কীভাবে মিশন শুরু এবং শেষ করার পরিকল্পনা করেছে, সবকিছু নিয়ে বিশ মিনিট ধরে একনাগাড়ে বলে গেল ও।

মূল প্রসঙ্গ শেষ হতে বলল, 'এই হচ্ছে ঘটনা। প্রস্তুতি পর্বের দুটো কাজ নিরুপায় হয়ে বেআইনী পথে করতে হচ্ছে আমাকে। নইলে আর সবকিছু আইন

মেনেই করা হবে। বেআইনী কাজ দুটোর একটা হচ্ছে বেলজিয়াম থেকে ফ্রেঞ্চ বর্ডার অতিক্রম করা, আরেকটা হচ্ছে নর্দার্ন ইওরোপের কোথাও থেকে আমাদের জাহাজে কিছু বাক্স তোলা।'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

সবার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল ও। 'খান, মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল তোমার ভাল চেনা। ওখানে গিয়ে আমাদের জন্য একটা ভাল বোট খুঁজে বের করো গিয়ে। নগদ টাকায় কিনে নেব আমরা। ক্লিন রেকর্ডের হতে হবে। কাগজপত্র আপ-টু-ডেট চাই। একশ' বা দুইশ' টনী হলেই চলবে। কোস্টার বা কনভার্টেড ট্রলার, যা পাওয়া যায়। কনভার্টেড নেভি জাহাজ হলেও চলবে। স্পিড চাই না, নির্ভরতা চাই। জেনারেল ফ্রেইটার হিসেবে রেজিস্টার্ড ধরনের। দাম যা-ই হোক, পরোয়া নেই। কাজ-টাজ কিছু করানোর থাকলে মালিকপক্ষ করিয়ে রেডি করে দেবে। ট্যাংক ভর্তি ফিউয়েলসহ। সময় বেশি দেয়া যাবে না। আজ থেকে দু' সপ্তার মধ্যে ওটা চাই। বুঝতে পেরেছ?'

সিগারেট অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে দিয়ে মাথা দোলাল পাঞ্জাব রেজিমেন্টের রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন মিশ্রি খান।

আতাসির দিকে ফিরল রানা। 'মেডিটারেনিয়ানের কোন্ শহর বেশি পরিচিত তোমার?'

'মার্সেই, বস্।'

'ওকে। কাল মার্সেই যাচ্ছ তুমি। ওখান থেকে তিনটে বড় ইনফ্লেটেবল সেমি-রিজিড ক্রাফট জোগাড় করবে। জোডিয়াক টাইপের। যেগুলো মেরিন কমাণ্ডো অ্যাসল্ট ক্রাফটের ডিজাইন অনুযায়ী ওয়াটার স্পোর্টের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কালো রঙের। ভিন্ন ভিন্ন সাপ্লাইয়ারের কাছ থেকে কিনবে। কারণ বলবে: হলিডে রিজোর্টে ওয়াটার স্কিইং আর সাবঅ্যাকুয়া ডাইভিঙের জন্য কিনছ। জানতে চাওয়া হলে বলবে। নইলে না। তারপর মরক্কোয় এক্সপোর্ট করার জন্য কোনও নামকরা শিপিং এজেন্টের বণ্ডেড ওয়্যারহাউসে বুক করে দেবে। তিনটে আউটবোর্ড ইঞ্জিনও কিনতে হবে, ব্যাটারি-স্টার্টেড। দশ নট গতিতে চলার উপযুক্ত। মোটামুটি ষাট হর্স পাওয়ার হলেই চলবে। ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে এক টন করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নীরবে চলার জন্য ইঞ্জিনগুলোর আণ্ডারওয়াটার একজস্ট থাকতে হবে। তা যদি না পাও, একজন ভাল মেকানিককে দিয়ে প্রয়োজনীয় আউটলেট ভালভসহ ইঞ্জিনের উপযোগী তিনটে একজস্ট পাইপ এক্সটেনশন তৈরি করিয়ে নেবে। তারপর সেগুলোকেও একই বণ্ডেড ওয়্যারহাউসে বুক করে দেবে। কারণ দেখাবে একই। আর মার্সেই গিয়েই মঁশিয়ে ফ্রান্সিস ছদ্মনামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলবে তুমি। অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা জানাবে আমাকে। আমি ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়ে দেব। বুঝতে পেরেছ সব?'

মাথা ঝাঁকাল বেদুইন। 'পেরেছি, বস্।'

মার্সিয়ার দিকে ফিরল রানা। 'তুমি এক বেলজিয়ানের কথা বলেছিলে একবার। লোকটা আল ফাত্তাহর কাছে হাজারখানেক ব্র্যাণ্ড-নিউ জার্মান স্মাইজার

সাবমেশিন পিস্তল বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল। অসটেণ্ড-এ থাকে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মার্সিয়া। '১৯৪৫ সালে জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম থেকে রিট্রিট করার সময় ওগুলো কোনভাবে তার বাবার হাতে পড়েছিল।'

'তুমি অসটেণ্ড-এ যাচ্ছ কাল। দেখো, এখনও সেগুলো তার হাতে আছে কি না। বেচবে কি না। আমি দুশো কিনতে চাই। ফার্স্ট ক্লাস ওয়ার্কিং কণ্ডিশনের হতে হবে। একেকটার দাম দুশো ডলার করে দেব। আশা করি যথেষ্ট বেশিই বলেছি দামটা।'

নবাগতরা একে অন্যের দিকে তাকাল। সবার চেহারায় প্রশ্ন, এতগুলো সাবমেশিন পিস্তল কেন? কিন্তু মুখ খুলল না কেউ।

'লোকটাকে খুঁজে বের করবে তুমি,' রানা বলে চলেছে। 'এই প্রস্তাব দেবে। তারপর সব ঠিকঠাক থাকলে আমাদের আলোচনার ব্যবস্থা করে খবর দেবে আমাকে।'

সবশেষে ফায়জার দিকে ফিরল ও। 'তুমি এখানেই থাকছ আপাতত। দরকারী জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে হবে। কমব্যাট আউটফিট। এই যে,' পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে চোখ বোলাল রানা। 'একশ' সেট টি-শার্ট, একশ' সেট আণ্ডারপ্যান্টস আর দু-শ' সেট নাইলন সকস। এক সেট করে স্পেয়ার। রিজার্ভ থাকবে। তারপর ম্যাচিং জ্যাকেটসহ একশ'টা কমব্যাট ট্রাউজার্স। জাঙ্গল ক্যামোফ্লাজের হলে ভাল হয়। একশ'টা কমব্যাট ব্লাউজ, জিপ-ফ্রন্টেড। একই রকম ক্যামোফ্লাজের।'

'এতো দিয়ে কী হবে?' মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ছিল, সামলে নেয়ার চেষ্টা করল ফায়জা। 'আই মিন...'

'সময় হলে দেখতে পাবে। যাক, এগুলো পাবে খোলা ক্যাম্পিং শপ, স্পোর্টর্স শপ বা আর্মি সারপ্লাস শপে। এসব আজকাল য়্যার খুশি সে পরে। কোনও বিধিনিষেধ নেই। ভেস্টস, সকস আর আণ্ডারপ্যান্টস তুমি ইচ্ছে করলে একই স্টকিস্টের কাছ থেকে কিনতে পারবে। কিন্তু ট্রাউজার্স আর ব্লাউজ আলাদা আলাদা কিনবে। তারপর একশ' জোড়া বুট আর একশ'টা গ্রিন বেরেটও দরকার হবে। ট্রাউজার্স বড় সাইজের কিনবে। পরে ছোটো করে নেয়া হবে। ব্লাউজগুলোর অর্ধেক কিনবে লার্জ সাইজের, অর্ধেক মিডিয়াম সাইজের। বুট কিনবে কোনও ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টের দোকান থেকে। আর্মি বুট না। ওয়াটার-প্রুফড সবুজ ক্যানভাস জ্যাকবুট, ফ্রন্ট লেসিংসহ।

'আর কী? ওয়েবিং। ওয়েবিং বেল্ট, অ্যামো পাউচ, ন্যাপস্যাক আর হালকা টিউবের তৈরি ফ্রেমের সাপোর্টারওয়ালা ক্যাম্পার্স হ্যাভারস্যাক। প্রতিটা আইটেম একশ'টা করে। ইয়েলো পেজ টেলিফোন ডাইরেক্টরির সারপ্লাস স্টোর্স-এর তালিকায় এসবের স্টকিস্টদের খোঁজ পাবে তুমি। জ্যাকেট, ব্লাউজ, বেল্ট, বেরেট, ওয়েবিং হার্নেস ন্যাপস্যাক, হ্যাভারস্যাক আর বুট ভিন্ন ভিন্ন দোকান থেকে নগদ টাকায় কিনবে। আসল নাম ঠিকানা দেবে না। কেউ তা জানতেও চাইবে না অবশ্য।' তালিকাটা ফায়জার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'তোমার কাছে রাখো।'

‘কেনা শেষ হলে একটা নর্ম্যাল স্টোরেজ ওয়্যারহাউসের হাতে তুলে দেবে সবকিছু। আলাদা আলাদা ফ্রেইট এজেন্টের মাধ্যমে মার্সেই পাঠিয়ে দেবে। আতাসী পরে কালেক্ট করে নেবে। বাকি আলোচনা কাল সকালে হবে। কারও কোনও প্রশ্ন?’

নেই।

‘কালই কাজে নেমে পড়তে হবে। আমি ক’দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে যোগাযোগ করব। আতাসি, মার্সিয়া আর খান, তোমরা যে যেখানে উঠবে সেখানকার ফোন নাম্বার আর নিজের ছদ্মনাম জরুরি ভিত্তিতে আমাকে জানাবে যোগাযোগের জন্য, এই নাম্বারে।’ একটা নম্বর লিখল ও। ‘মুখস্থ করে নাও। ফোনে সংক্ষেপে মেসেজ দেবে। সম্ভব হলে কোডে দেবে। আর... আমার পরিচয়, আমি জেমস ব্রাউন। গট দ্যাট?’

মে ফেয়ারের নামকরা বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট মেঘনায় ডিনার খেল সবাই। তারপর নবাগতদের সেফ হাউসে পৌঁছে দিয়ে রাতের মত বিদায় নিল রানা। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি লিখতে বসল।

দেয়াল ঘড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা পড়তে মুহূর্তের জন্য হাত থেমে গেল ওর। কান পেতে বাকি ঘণ্টাগুলো শুনল।

তেরো

সোমবার দুপুরের একটু পর লাক্সেমবার্গ পৌঁছল মাসুদ রানা। ব্যাংক ডি ক্রেডিট-এ জেমস ব্রাউনের নামে আরও একটা আকাউণ্ট খুলে তাতে এক লাখ পাউণ্ড জমা রাখল নতুন একটা কোম্পানি ‘ফ্লোট’ করার জন্য।

সেখান থেকে বেরিয়ে ভাল একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারল ও। তারপর হগস্ট্রাট চলল অ্যাকাউন্টেন্টদের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ল্যাং অ্যাণ্ড স্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে।

বেলজিয়াম আর লিয়েখটেনস্টাইনের মত ডিউকশাসিত রাজ্য লাক্সেমবার্গও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে ব্যাঙ্কিঙের ক্ষেত্রে একান্ত গোপনীয় কিছু সার্ভিস দিয়ে থাকে। সঙ্গে কোম্পানি পরিচালনার নানান সুযোগ-সুবিধাও।

এখানে রেজিস্ট্রি করা কোনও কোম্পানি আর্চডাচির আইন ভেঙেছে অথবা বেআইনী আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সন্দেহাতীতভাবে জড়িত, যতক্ষণ না এমন কিছু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করা যাবে, ততক্ষণ ইন্টারপোলও সেটার ব্যাপারে কোনও তদন্ত চালাতে গেলে পাত্তা পাবে না। এ ধরনের সুবিধার খোঁজেই লাক্সেমবার্গে এসেছে রানা।

এ ব্যাপারে লণ্ডন থেকে তিন দিন আগে টেলিফোনে স্থানীয় এক অভিজাত প্রতিষ্ঠানের পার্টনার, এমিল স্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেট করে রেখেছিল

রানা। লোকটা মাঝবয়সী। চুল সব ধপধপে সাদা। স্বাস্থ্য কুমড়োপটাশ টাইপের।

রানা নিজের পরিচয় জানিয়ে বলল, 'আমাদের ক'জন বন্ধুর একটা বিজনেস কনসোর্টিয়াম আছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে কিছু ব্যবসায় হাত দেয়ার ইচ্ছে আমাদের। স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, এইসব দেশে। তাই এখানে একটা হোল্ডিং কোম্পানি খুলতে চাই। আমি ব্রিটিশ রেসিডেন্ট। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ইওরোপে কাজ করতে গেলে আমাদের মত ব্যবসায়ীদের কতো জটিলতার মোকাবেলা করতে হয়। তাই ট্যাক্সের স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট থেকে মনে হয়েছে আপনাদের লাক্সেমবার্গই উপযুক্ত হবে এ জন্যে।'

সাদা চুল ভর্তি মাথাটা দোলাল এমিল স্টাইন। আইনগত সুবিধা আছে বলেই তার পিচ্চি দেশে এরকম অজস্র হোল্ডিং কোম্পানির জন্ম হয়েছে। রোজ রোজ হচ্ছে। আর অ্যাকাউন্টেন্টস ফার্মও প্রতিদিনই এ ধরনের প্রস্তাব পেয়ে আসছে।

'তাতে আমাদের কোনও আপত্তি নেই, মিস্টার ব্রাউন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সে ক্ষেত্রে আপনাকে আর্চডাচি অভ লাক্সেমবার্গের সমস্ত আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে এগোতে হবে? তা যদি হয়, তা হলে আপত্তির কোনও কারণ আমি দেখি না। দুনিয়ার আর সব দেশের রেজিস্টার্ড হোল্ডিং কোম্পানির মত আপনারটাও মেজর শেয়ার হোল্ড করতে পারবে। ইনভেস্টিগেট করা দূরে থাক, উঁকিও দিতে পারবে না কোনও ফরেন ট্যাক্স ইনভেস্টিগেটর।'

'আমিও সেরকম সুবিধের খোঁজেই এসেছি,' রানা বলল। 'এবার বলুন, এ ধরনের কোম্পানি ফ্লোট করতে হলে প্রথমে কী কী করতে হবে আমাকে।'

নড়েচড়ে বসল কুমড়ো। 'আমাদের এখানে রেজিস্টার্ড সব লিমিটেড কোম্পানিতে অন্তত সাতজন শেয়ারহোল্ডার থাকতে হবে। ডিরেক্টর থাকতে হবে তিনজন। নতুন কোম্পানি গঠনের স্বার্থে প্রায় সময়ই সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানিকে ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যানশিপের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানানো হয়ে থাকে। কোম্পানির অন্য দু'জনকে তার জুনিয়র পার্টনার হিসেবে নেয়া হয়। তারা সবাই হয় মামুলি শেয়ার হোল্ডার। সামান্য কিছু শেয়ারের মালিক। যে কোম্পানি খুলতে চায়, এই প্রক্রিয়ায় সে হয়ে যায় সাত নম্বর শেয়ারহোল্ডার। অবশ্য বেশিরভাগ শেয়ারের মালিক হওয়ায় সে-ই হয় কোম্পানির আসল নিয়ন্ত্রণকারী। ডু ইউ ফলো মি, মিস্টার ব্রাউন?'

মাথা দোলাল রানা। 'ইয়েস, গো অ্যাহেড, প্লিজ।'

'গুড। এরপর স্বাভাবিকভাবে শেয়ারহোল্ডারদের নামে শেয়ার রেজিস্ট্রি করাতে হয়। এ ছাড়া বেয়ারার শেয়ার ইসু করা যাকে বলে, সেটা তো থাকছেই। সে ক্ষেত্রে কোম্পানির মেজর শেয়ারহোল্ডারের পরিচয় রেজিস্ট্রি করানো জরুরি নয়। তবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, বেয়ারার শেয়ার কথাটার যা অর্থ, এ ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থেও কিন্তু সেটা তাই। যদি কেউ তার শেয়ার হারিয়ে ফেলে বা সেগুলো চুরি হয়ে যায়, তা হলেই গেল। ওগুলোর

তখনকার মালিকই হবে কেম্পানির নতুন নিয়ন্ত্রক। এ জন্য তাকে কোনও রকম প্রমাণ হাজির করতে হবে না যে সে কী করে শেয়ারগুলোর মালিক হলো, ওগুলো কোথায় পেয়েছে সে। হাউ অ্যাণ্ড হোয়েন। ক্লিয়ার?'

মাথা দোলাল রানা। এমন কিছুই চাইছিল ও। এর ফলে আতাসী আইনের আওতায় থেকেই জাংগারো অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় জাহাজটা কিনতে পারবে, কিন্তু ওটার মালিক কে, তা চেষ্টা করেও জানতে পারবে না কেউ।

'নাউ, হোল্ডিং কোম্পানি হলেই যে তাকে ব্যবসা করতে হবে এমন কোনও কথাও নেই,' বলল এমিল স্টাইন। 'সেটা যদি শুধু অন্যান্য কোম্পানির শেয়ার হোল্ড করে, তাতেও চলবে। টেল মি, আপনার অ্যাসোশিয়েট গ্রুপের কী আরও শেয়ার আছে? সেগুলোও কী লাক্সেমবার্গে নিয়ে আসার ইচ্ছা আপনাদের?'

'এখনই সেরকম ইচ্ছে নেই,' রানা বলল। 'আমরা আপাতত সুবিধাজনক জায়গা দেখে আমাদের বর্তমান ব্যবসাগুলোই অপারেট করব। আরও কিছু লিমিটেড কোম্পানি ফ্লোট করার ইচ্ছে আছে, ধীরে ধীরে। সেসবের মেজরিটি শেয়ারহোল্ডিংস এখানে ট্রান্সফার করব অবশ্যই। নিরাপত্তার খাতিরে।'

অফিস আওয়ার এক ঘণ্টামত বাকি থাকতেই সমঝোতায় পৌঁছে গেল দু' পক্ষ। ব্যাংক ডি ক্রেডিট-এর নতুন অ্যাকাউন্টের কাগজপত্র দেখিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সচ্ছলতার বিষয়টা প্রমাণ করল রানা। এমিল স্টাইনের কোম্পানিতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জমা করল ডিপোজিট মানি হিসেবে।

তক্ষুণি কাজে লেগে পড়ল স্টাইন। তার প্রতিষ্ঠানে এরমধ্যে যত হোল্ডিং কোম্পানি রেজিস্টার্ড হয়েছে, সেগুলোর নামের বিশাল তালিকা চেক করে দেখল। তার মধ্যে রানার প্রস্তাব করা নামটা নেই দেখে ওটাই রাখা হবে নিশ্চিত করল—টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ।

মোট শেয়ার মূলধন হবে চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের, যার মধ্যে এক হাজার শেয়ার তাৎক্ষণিকভাবে ইসু করা হবে। প্রতিটা বেয়ারার শেয়ারের দাম হবে এক পাউণ্ড। স্টাইন একটা শেয়ার এবং বোর্ডের ডিরেক্টর্স বোর্ডের চেয়ারম্যানশিপের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আরও দুটো শেয়ারের একটা ইসু হবে তার পার্টনার, মিস্টার ল্যাং এবং অন্য এক জুনিয়র পার্টনারের নামে।

এই তিনজন মিলে বোর্ড গঠন করবে। স্টাফদের মধ্য থেকে আরও তিনজনের নামে তিনটে শেয়ার ইসু করা হবে। এই হলো এক হাজার শেয়ারের মধ্যে ৬টা। বাকি ৯৯৪টা শেয়ার হোল্ড করবে জেমস ব্রাউন। অর্থাৎ টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ-র নিয়ন্ত্রক হবে সে।

ঠিক হলো, ঠিক বারোদিন পর একটা সাধারণ সভার মাধ্যমে নতুন হোল্ডিং কোম্পানি ফ্লোট করা হবে। অথবা তার পরেও যে কোনদিন সেটা হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে মিস্টার ব্রাউনকে লিখিতভাবে তারিখটা জানাতে হবে, যাতে স্টাইন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারে।

বিষয়টার এখানেই ইতি ঘটিয়ে বেরিয়ে এল রানা। অফিসের সময় শেষ হওয়ার বিশ মিনিট আগে ব্যাংক ডি ক্রেডিট-এ ফিরে এল ও। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ট্রান্সফার করল নিজের লণ্ডনের অ্যাকাউন্টে। তারপর ফিরে চলল।

ব্রাসেলস। জেমস ব্রাউনের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির সমান টাকা দফায় দফায় জমা হচ্ছে দেখে পুরোপুরি বেকুব বনে গেছে ক্রেডিয়েটব্যাংকের ফরেন অ্যাকাউন্টস সেকশন প্রধান, গুজেনস।

জমা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তুলেও নেয়া হচ্ছে—মিস্টার ব্রাউনের টেলিফোন নির্দেশে আরেক ব্যাংকে চলে যাচ্ছে। টাকার স্রোতটা আসছে ট্রান্সফার হয়ে। কোনও এক ওয়াল্টার হ্যারিসের অ্যাকাউন্ট থেকে।

এ ব্যাপারে কিছু একটা করা উচিত ভাবছে সে। কিন্তু কী যে ঘোড়ার ডিম করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। টাকার অংকটাই যা একটু বড়, নইলে জেমস ব্রাউনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না সে। তা হলে কী করার আছে তার?

চুপচাপ পরিস্থিতির ওপর নজর রাখো, নিজেকে বলল সে। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই তোমার। ক্রেডিয়েটব্যাংকের আইন যখন ভঙ্গ হয়নি, তখন শুধু শুধু তড়পানো কেন?

লাঞ্চের একটু আগে জুইংলি ব্যাংকে এসে পৌঁছল সাইমন এনডিন। রুডলফ গুন্থার নিজের মুখে তাকে নিজের ফিনানশিয়াল পার্টনার বলে পরিচয় দিয়ে গেছে, কাজেই ডক্টর স্টেইনহফারের কাছে গুন্থারের মতই লাল গালিচা আতিথেয়তা পেল সে।

ছয়টা নাম্বারড আকাউন্টের জন্য ছয়টা অ্যাপ্লিকেশন ফরম হাজির করল এনডিন। সবগুলোই যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষর করা। অ্যাকাউন্ট খুলতে আগ্রহী কোম্পানিগুলো আলাদা আলাদা কার্ডে নমুনা স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারা হচ্ছে মেসার্স অ্যাডামস, বল, কার্টার, ডেভিস, এডওয়ার্ডস এবং ফ্রস্ট।

প্রতিটা ফরমের সঙ্গে দুটো করে চিঠি জোড়া আছে। একটা পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি—যার মাধ্যমে উপরের কোম্পানিগুলো সাইমন এনডিনকে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করে জুইংলি ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট অপারেট করার ক্ষমতা দিয়েছে। আরেকটা গুন্থারের লেখা চিঠি। যেটায় সে তার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে এই ছয় কোম্পানির নতুন অ্যাকাউন্টে পাঁচ লাখ পাউণ্ড করে মোট ত্রিশ লাখ বা তিন মিলিয়ন পাউণ্ড ট্রান্সফার করার অনুরোধ জানিয়েছে স্টেইনহফারকে।

ব্যাংকার স্টেইনহফার এত উজবুক নয় যে গুন্থারের এই ছয় 'বিজনেস অ্যাসোশিয়েটের' নামের আদ্যাক্ষরগুলোর ভেলকি বুঝতে পারবে না বা কিছু সন্দেহ করবে না। তবে এটাও সে বোঝে যে এই ছয়টা নামের পিছনে কারও অস্তিত্ব থাক বা না থাক, তার কিছু যায়-আসে না তাতে। সে এসব বিচার করার কেউ নয়। যদি কোনও টাকার কুমির একঘেয়ে আইনকে পাশ কাটিয়ে চলতে চায়, সেটা তার নিজস্ব অভিরুচি। তা ছাড়া স্টেইনহফার অনেক দেশের অনেক ব্যবসায়ীকে চেনে, যাদের এ ধরনের কার্যকলাপের উপর নজর রাখতে গেলে

দেশে দেশে ডিপার্টমেন্ট অভ ট্রেড এনকোয়্যারি খুলতে হবে।

তা ছাড়া সাইমন এনডিনের কাছ থেকে তার অ্যাপ্লিকেশন ফরমগুলো গ্রহণ করার আরও একটা বিশেষ কারণ আছে। যদি এসব নামের পিছনের শেয়ারগুলো গুন্থার গোপনে কিনে নেয় এবং ভবিষ্যতে সেগুলোর দাম সত্যি সত্যি রকেটের গতিতে আকাশের দিকে ছোটে, তা হলে সে-ও নিজের লাভের জন্য এর থেকে কিছু কিনতে পারবে।

স্টেইনহফারের আস্থা আছে এই জার্মান ব্যারনের ওপর। সে জানে, এ ব্যবসা সম্পর্কে লোকটা যা বলেছে, ভবিষ্যতে তাই ঘটবে। অতীতেও সব সময় ঘটেছে। লোকটা শুধু শুধু কোনও কিছুর পিছনে লাগে না।

'যে কোম্পানির ওপর আমাদের নজর আছে, সেটার নাম বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি,' মৃদু গলায় বলল এনডিন। লেডি ম্যাকালিস্টারের কথা, তার তিন লাখ শেয়ারের মালিকানার কথা, সব খুলে জানাল। 'আমাদের ধারণা, নিজের শেয়ারগুলো বিক্রি করে দেয়ার জন্য অতীতে কেউ না কেউ অবশ্যই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু কাজ আদায় করতে পারেনি। এবার আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব। এখানে যদি ব্যর্থও হই, তবু আমাদের মিশন চলবে। আর কোনও শেল কোম্পানির পিছনে লাগব আমরা,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল যুবক।

তার কথা মন দিয়ে শুনছে ব্যাংকার। চুরুট টানছে নীরবে।

'আপনি জানেন, ডক্টর, এতগুলো শেয়ার নিজের নাম গোপন রেখে একজনের পক্ষে কেনা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মিস্টার অ্যাডামস, মিস্টার বল, মিস্টার কার্টার এবং মিস্টার ডেভিস, এই চারজন বায়ার কোম্পানির সাড়ে সাত পার সেন্ট করে শেয়ারের মালিক হবেন। আমরা চাই আপনি এই চারজনের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করুন।'

মাথা নাড়ল স্টেইনহফার। 'শিওর, মিস্টার এনডিন।'

'আমি দেশে ফিরে গিয়ে চেষ্টা করব লেডি ম্যাকালিস্টারকে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো ট্র্যান্সফার করাতে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল ব্যাংকার। 'তা হলে এভাবেই থাকুক। আগে আপনি লেডি ম্যাকালিস্টারের সঙ্গে কথা বলুন, তারপর আমরা ভেবে দেখব কী উপায়ে সামনে এগোনো যায়। আর হের গুন্থারকে বলবেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই। যতো আইনী ঝামেলা আছে, সব আমি সামাল দেব।'

'ধন্যবাদ।'

পৃথিবীতে ব্যবসার সবচেয়ে লোভনীয় জায়গা দখল করে রেখেছে মাদকদ্রব্য, তার পরেরটাই আগ্নেয়াস্ত্র।

এই কারণেই প্রায় প্রতিটা উন্নত দেশের সরকার প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে এ ব্যবসা করে থাকে। নিজেদের অস্ত্রের বাজার ধরে রাখার জন্য বিশ্বের কোথাও না কোথাও সারা বছর যুদ্ধ জিইয়ে রাখে। দেশের মাটিতে নিজেদের একটা আধুনিক আর্মস ইণ্ডাস্ট্রি থাকবে, ১৯৪৫ সাল থেকে বেশিরভাগ উন্নত দেশের

জন্য এটা রীতিমত জাতীয় মর্যাদার ইসু হয়ে দাঁড়ায়।

সত্তরের দশকে অস্ত্র উৎপাদনের প্রতিযোগিতার মুখে বিষয়টা এক ধরনের উন্মাদনায় পরিণত হয়। সে সময় দেশে দেশে এত বেশি অস্ত্র উৎপাদিত হতে থাকে যে একবার এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছিল, সেই আমলে বিশ্বে মানুষ ছিল যত কোটি, অস্ত্রও ছিল তত কোটি।

যুদ্ধ ছাড়া স্বভাবতই উৎপাদিত বিপুল অস্ত্র ব্যবহার করার জায়গা কোথায়? তাই উৎপাদনকারীদের সামনে বিকল্প ছিল: হয় বাড়তি অস্ত্র রফতানি করো, নয়তো কোথাও বৈরিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে যুদ্ধ বাধানোয় উৎসাহ দাও। কিছু উৎপাদনকারী নিজেরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া থেকে সযত্নে দূরে সরে থাকত, অথচ উৎপাদনও বন্ধ করত না যে-কোনও সময় অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে ভেবে। ফলে বেশ কয়েক বছর যাবৎ অস্ত্র বিক্রির প্রতিযোগিতা ছিল রমরমা।

এ জন্য বৃহৎ শক্তিগুলো চড়া বেতনের সেলসম্যান নিয়োগ করত। তাদেরকে বিভিন্ন দেশে সেলস প্রমোশন ট্রিপে পাঠাত। তারা গিয়ে সেসব দেশের সরকারকে বোঝাত, বাইরের দেশের হুমকি মোকাবেলা করার মত পর্যাপ্ত অস্ত্র তাদের নেই। অথবা যা আছে তা আধুনিক নয়। নতুন অস্ত্র আমদানি করা খুব প্রয়োজন।

বিক্রেতারা নগদ অর্জনের মোহে অন্ধ ছিল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা বিবেচনা করতে চাইত না যে তাদের বিক্রি করা পঁচানব্বই ভাগ অস্ত্রই আমদানীকারক দেশের যারা সত্যিকারের মালিক, তাদের প্রয়োজনে ব্যবহার হয় না। যেমন পিটার বোথার দক্ষিণ আফ্রিকা, সাবেক রোডেশিয়া ইত্যাদি।

ওইসব দেশের সরকারগুলো অতীতে যে-সমস্ত অস্ত্র আমদানী করত, তা বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য নয়। বরং সে দেশের যারা সত্যিকারের মালিক, সেই আফ্রিকানদেরকেই দমন করে রাখার জন্য।

এক সময় কেবল পশ্চিমা দেশগুলোই এ ব্যবসা করত। ক্ষমতা আর ব্যবসায়ীক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে থাকত। পরে রাশা ও চীন ব্যাপক হারে অস্ত্র উৎপাদন ও রফতানি শুরু করায় সেসবের ব্যাপ্তি বেড়ে যায় অনেক গুণ। প্রতিদিন বৃহৎ শক্তিগুলোর রাজধানীতে অস্ত্রের বাজার এবং রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ও কাঙ্ক্ষিত লাভ নিয়ে নতুন হিসাব-নিকাশ হতে থাকে। নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগ করে নেয় তারা।

একটা শক্তি রিপাবলিক এ-র কাছে অস্ত্র বিক্রি করে, বি-র কাছে করে না। আরেক শক্তি বি-র কাছে বিক্রি করতে শুরু করে, এ-র কাছে না। এই অশুভ তৎপরতাকে ক্ষমতার ভারসাম্য বা শান্তিরক্ষার প্রক্রিয়া বলে লেবাস পরানো হয়। অস্ত্র বিক্রি স্থায়ী লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। যদিও সেটা সব সময় তা-ই ছিল। এই জন্যই বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর পররাষ্ট্র দফতর ও প্রতিরক্ষা দফতরের মধ্যে একটা আন্তরিক সখ্য গড়ে ওঠে।

আর্মস ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা জটিল কিছু নয়। রাইফেল বা সাবমেশিনগান এবং সেসবের বুলেট তৈরি করা বরং বেশ সহজ। হ্যাণ্ড গ্রেনেড আর হ্যাণ্ড গান তৈরি করাও সহজ। এ জন্য যে মানের কারিগরি জ্ঞান ও উন্নত কারখানা এবং

বিভিন্ন কাঁচামালের প্রয়োজন পড়ে, তা বিরল কিছু নয়।

ছোটো দেশগুলো সাধারণত বড় দেশগুলোর কাছ থেকে রেডিমেড অস্ত্র কিনে কাজ চালায়। কারণ তাদের প্রয়োজন এত সীমিত যে সে জন্য কারখানা খোলার প্রয়োজন হয় না। অস্ত্র রফতানী করার সুযোগ থাকলে অবশ্য অন্য কথা।

তারপরও ষাট ও সত্তরের দশকে অনেক মধ্যম আকারের দেশও নিজ নিজ অস্ত্র কারখানা স্থাপন করে নিয়েছে। এতে কাজের কাজ হয়েছে এই, জটিলতা বেড়েছে। অস্ত্র বিক্রির প্রতিযোগিতায় বাজার হিসাবে পরিচিত দেশের সংখ্যা কমেছে।

স্মল আর্মস তৈরি করা যত সহজ, আর্টিলারি, আর্মার্ড কার এবং ট্যাংক তত সহজ নয়। আধুনিক যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করতে সক্ষম গোটা একটা শিপ বিল্ডিং ইণ্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে সবচেয়ে কঠিন হয়ে দেখা দেয় ফাইটার প্লেন ও বম্বার তৈরি করা।

বিশ্বের প্রধান অস্ত্র নির্মাণকারী দেশের তালিকায় আছে আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, সুইটজারল্যাণ্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, ইজরাইল আর দক্ষিণ আফ্রিকা। নিরপেক্ষ দেশ সুইডেন ও সুইটজারল্যাণ্ডের রফতানি করা অস্ত্র হয় অনেক দেশের তুলনায় উন্নতমানের।

ইজরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ত্র নির্মাণ শুরু করে নিজেদের অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবেশ সামাল দিতে। প্রথমটা নিজের জবরদখল করা অবস্থান ধরে রাখতে, আর দক্ষিণ আফ্রিকা সাদা চামড়াওয়ালাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে। এই দুই দেশ অস্ত্র রফতানিও করে, তবে সামান্য। আর সব দেশের মত রফতানি করার জন্য তৈরি করে না।

বাকি দেশগুলো ন্যাটো ভুক্ত এবং তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্মিলিত। কোনও দেশের কাছে অস্ত্র বিক্রি অনুমোদনের ক্ষেত্রে তাদের কড়া কিছু আইন-কানুন আছে। এই কারণে সীমিত অস্ত্রের ক্রেতা দেশকে এই মর্মে লিখিত আণ্ডারটেকিং দিতে হয় যে, সরবরাহকারী দেশের লিখিত অনুমতি ছাড়া সে তৃতীয় কোনও পক্ষের কাছে আমদানী করা অস্ত্র বিক্রি করতে পারবে না।

আরেক কথায় বিষয়টা যতটা না অস্ত্র বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের বিবেচ্য থাকে, তারচেয়ে বেশি হয়ে যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবেচ্য বিষয়। অর্থাৎ এক সরকারের সঙ্গে অপর এক সরকারের ডিলের বিষয়।

অতীতে রাশা ও চেকোস্লোভাকিয়ার নির্মিত অস্ত্রের মান ছিল মোটামুটি। চীনও পরে সেই দলে যোগ দেয়। কমিউনিস্ট চীন মাও-এর গেরিলা মতবাদ সমুন্নত রাখতে ভিন্ন আর্মস পলিসি অনুসরণ করত। সোভিয়েত ইউনিয়নও তাই। দেশে দেশে নিজস্ব ব্র্যাণ্ডের 'কমিউনিজমের' প্রভাব ধরে রাখতে সমমনা বামপন্থী গ্রুপগুলোর কাছে অস্ত্র 'উপহার' হিসেবে পাঠাত তারা। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাতে সহায়তা করত।

মাও-এর বিখ্যাত উক্তি 'বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস' প্রমাণ করতে চীনও সেই পথ অনুসরণ করে।

তাদের অস্ত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিক্রি হতো না, শুভেচ্ছা উপহার হিসাবে পাঠানো হতো সমমনা 'মুক্তিকামী' সংগঠনগুলোর জন্য। দুনিয়ার কোথাও কোনও গেরিলা যুদ্ধ প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারের অভাবে ব্যাহত হয়েছে, এমন কোনও রেকর্ড পাওয়া যাবে না। রাশানরা উপহার দেয়া ছাড়াও সরকারী সূত্রসহ বিভিন্ন বেসরকারী সূত্রের কাছে সরাসরি অস্ত্র বিক্রিও করত।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এ কাজটা সরাসরি করতে লজ্জা পেত, তাই প্রাইভেট আর্মস ডিলারের মত এক শ্রেণীর পেশাদারের জন্ম হয়। ক্রমে তারা হয়ে ওঠে লাইসেন্স পাওয়া আর্মস ডিলার। এইসব ডিলারদের প্রতিষ্ঠান হয় সাধারণত বিশাল। স্টকহোল্ডার হয় তারা। এটা হচ্ছে প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজ আর্মস বিজনেসের সর্বোচ্চ মাত্রা।

গভীর পানিতে অন্য মাছও বাস করে। তারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্মস ডিলারদের মতো ওয়্যারহাউসে অস্ত্র মজুদ করে ক্রেতার অপেক্ষায় বসে থাকে না বা সেলস প্রমোশনের মিশন নিয়ে এ-দেশ সে-দেশ করে না। তারা হয় সরকারী মালিকানাধীন অথবা নিয়ন্ত্রণাধীন অস্ত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের ডিলারের মত।

মক্কেল ও নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেনাবেচায় মধ্যস্থতা করে, ডিল হলে নিজের কমিশন পকেটে ভরে। আরেকটা দল আছে একই কাজ করে, তবে গোপনে। তাদেরকে বলা হয় ব্ল্যাক মার্কেট আর্মস ডিলার। এদের লাইসেন্সের বালাই নেই, তাই অস্ত্র স্টক করারও প্রশ্ন আসে না। তারা যে যার মতো চলে। গোপন ক্রেতাদের কাছে কদর আছে বলেই তারা ব্যবসায়ে টিকে আছে।

আর্মস ডিলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা ডকুমেণ্ট, যার নাম এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট।

এই সার্টিফিকেট হচ্ছে এক ধরনের অফিশিয়াল স্বীকৃতি, যাতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে যে, এই অস্ত্র কেনা হয়েছে 'অন বিহাফ অভ অমুক এণ্ড ইউজার-এর' জন্য বা পক্ষ থেকে। প্রশ্নাতীতভাবে সেই এণ্ড ইউজারকে হতে হবে একটা স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের সরকার।

কোনও সিক্রেট সার্ভিস যদি অনিয়মিত আর্মিকে অস্ত্রশস্ত্র গিফট করে, অথবা যদি তা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কেনা হয়, সে ক্ষেত্রে এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন পড়ে না। ক্যাস্ট্রোকে ক্ষমতাচ্যুত করতে অ্যাণ্টি-ক্যাস্ট্রো ফোর্সকে সিআইএ বিনামূল্যে যে অস্ত্র দিয়েছিল, বা কঙ্গোলিজ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সিআইএ মার্সেনারিদের যে অস্ত্র গিফট দিয়েছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রে এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট লাগেনি।

অন্যদিকে প্রভিশনাল আইআরএ-র জন্য ইওরোপিয়ান ও আমেরিকান বিভিন্ন বেসরকারী সূত্র থেকে যখন জাহাজ বোঝাই করে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল, তখন এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন পড়েছিল।

এটা আন্তর্জাতিক ডকুমেণ্ট বলে এর নির্দিষ্ট কোনও আকার-আকৃতি বা মাপ নেই। তাতে অমুকটা-তমুকটা লেখা থাকতেই হবে, এমন কোনও আইনও নেই। তবে এই কথাগুলো থাকতে হবে : এই সার্টিফিকেট বেয়ারার/ডিলার, মিস্টার এক্সকে দেশের পক্ষ থেকে এই পরিমাণ অস্ত্র ক্রয় ও রফতানী করার

জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদন প্রদান করা হলো।
এই সার্টিফিকেটের সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও তেমনি আছে। কোনও কোনও দেশ সার্টিফিকেট দেখে চুপ করে গেলেও অনেক দেশ সহজে সন্তুষ্ট হয় না। ওটা আসল না নকল, তা চেক করতে অনেক সময় স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় করে।
তবে যে সমস্ত সার্টিফিকেট 'নো কোয়েশ্চেনস আস্কড্' ধরনের সরবরাহকারীদের তরফ থেকে আসে, সেসব ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হয় না।
তবে বলাই বাহুল্য যে দুনিয়ার আর সব ডকুমেন্টের মত এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটও জাল হয়।
শুক্রবার হ্যামবার্গে এইসব জিনিস কেনাকাটার জগতে পা রাখল মাসুদ রানা। বন্ধু গগল মুক্ত থাকলে এ পথ কস্মিনকালেও মাড়াত না ও। কারণ এসব ভীষণ ঝামেলার কাজ। যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি জটিল।
কিন্তু উপায় নেই। বর্তমানে একটা অস্ত্র মামলায় সিসিলিতে জেল খাটছে ভিনসেন্ট গগল। তাই ওকেই যা করার করতে হবে এখন।

চোদ্দ

জাংগারোর বিষয়টা যথাসম্ভব আইনের বেড়ার মধ্যে থেকেই করার ইচ্ছা রানার। কিন্তু চাইলেই তো কোনও ইওরোপিয়ান দেশ ওর কাছে অস্ত্র বিক্রি করবে না।
ফেব্রিক ন্যাশনেল অভ বেলজিয়ামের মত নেতৃস্থানীয় কোনও সরকারী মালিকানাধীন অস্ত্র নির্মাতার কাছে সরাসরি যাওয়ার উপায় নেই ওর। সেরকম কিছু করতে হলে বেলজিয়ান সরকারের মাধ্যমে যেতে হবে।
একই কারণে লণ্ডনের বড় প্রাইভেট আর্মস ডিলার কগসওয়েল অ্যাণ্ড হ্যারিসন বা বার্মিংহামের পার্কার হেলের কাছে যাওয়ারও উপায় নেই। সুইটজারল্যাণ্ডের ওয়েরলিঙ্কন, সুইডেনের বফোর্স, স্পেনের সিইটিএমই, জার্মানির ওয়ের্নার বা আরও যারা আছে, চেকোস্লাভাকিয়ার ওমনিপল এবং ইটালির ফিয়াট, কারও কাছেই যাওয়ার উপায় নেই।
তা ছাড়া ওর প্রয়োজনও সীমিত। বড় ডিলারদের কাছে সরাসরি যাওয়ার উপায় যদি বা থাকত, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের ব্যবসায় অভ্যস্ত তারা, ওর প্রয়োজনকে পাত্তা দিত কি না সন্দেহ। তাই যারা ছোট ব্যবসায়ী, তাদের কাছে যেতে হবে রানাকে।
তাদের মধ্যে আছে জার্মান ডিলার গুন্থার লিয়েনহসার, সাম কামিংস-এর প্রাক্তন অ্যাসোশিয়েট। আর আছে পিয়েরে লোরেজ, মরিস হার্সকিউ এবং পল ফ্যাভিয়ার। তাদেরকেও বাদ রেখেছে ও কিছু কিছু কারণে। আরও নীচের লেভেলের দু'জন ডিলার আছে হ্যামবার্গে, তারাই আপাতত রানার ভরসা।
একাধিক ডিলারের কাছে যাবে ও। একেকজনের কাছ থেকে একটা করে

আইটেম কিনবে।

প্রথমে চার লাখ নাইন এমএম বুলেট প্রয়োজন। পিস্তল বা সাবমেশিন কারবাইন, দুটোতেই ব্যবহার করা যায় ওগুলো। এ ধরনের একটা কনসাইনমেন্ট ব্ল্যাক মার্কেট থেকে কিনে সবার চোখ এড়িয়ে জাহাজে বোঝাই করা অনেক কঠিন হবে। কারণ ক্রেটটা যেমন বড় হবে, ভারীও হবে তেমনি।

জিনিসগুলো একটা ছোটো দেশের পুলিশ বাহিনীর জন্য পর্যাপ্ত আর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হতে পারে। আবার কেউ শুধু বুলেট দেখে সন্দেহও করতে পারবে না কারণ ওগুলো যার সাহায্যে ব্যবহার হবে, সেই অস্ত্র প্যাকেটে থাকবে না। ওগুলোকে স্রেফ অ্যামিউনিশনের চালান বলে চালানো যাবে।

এর জন্য একজন লাইসেন্সওয়ালা আর্মস ডিলারের দরকার হবে রানার, যে এরকম ছোটো একটা অর্ডারের মাল বড় চালানের মধ্যে ভরে দিয়ে বেড়া পার করে দিতে পারবে। তা ছাড়া লাইসেন্সওয়ালা হলেও তাকে জাল এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটে কাজ করার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। এরকম ক্ষেত্রেই নো কোয়েশ্চেনস আস্কড শ্রেণীর দেশের সহায়তার প্রয়োজন হয়।

অতীতে এক সময় ইওরোপের প্রাইভেট আর্মস ডিলারদের হাতে বিশাল অস্ত্রের মজুত থাকত। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের মাঠ থেকে কৌশলে সরিয়ে আনা অস্ত্র। আলজিরিয়া থেকে আসা ফ্রেঞ্চ অস্ত্র, কঙ্গো থেকে আসা বেলজিয়ান অস্ত্র। বেহিসেবি, অনেকটা খোলামেলা হাতবদল হত সেসব। এখন আর সে দিন নেই।

রানাকে এখন বাধ্য হয়ে এমন একজন লাইসেন্সওয়ালা ডিলার খুঁজে বের করতে হবে যে জাল এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট নিয়ে কাজ করবে। এ জাতীয় এক অস্ত্র বিক্রেতা এমন এক সরকারের কাছে যাবে, যে প্রশ্ন তুলবে না। তুললেও কম তুলবে। এক সময় চেকোস্লোভাকিয়া ছিল এরকম ক্রেতাদের স্বর্গরাজ্য। যে কেউ ব্রিফকেস ভর্তি ডলার নিয়ে গেলেই যত খুশি অস্ত্র কিনে ফিরতে পারত। সে দিনও ফুরিয়েছে।

তবে দু'টো দেশ আজও আছে যারা প্রশ্ন করে কম। একটা স্পেন, অন্যটা ইউগোস্লাভিয়া। এ দুটোই রানার আসল ভরসা। ইউগোস্লাভিয়া ক্ষেত্রবিশেষে আজও 'আস্ক নো কোয়েশ্চেনস অ্যাণ্ড ইউ উইল গেট নো লাইজ ইন আনসার' নীতি অনুসরণ করে। ওদের লাইট কোম্পানি মর্টার আর বাজুকা এক কথায় অতুলনীয়। পরেরটা চেক আরপিজি সেভেনের সমতুল্য।

বেলগ্রেডের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে, এমন একজন ডিলার চাই মাসুদ রানার। জিনিস অল্প বলে ওরা সহজে বেচতে রাজি না-ও হতে পারে। তাই ডিলারকে একটু চতুর হতে হবে। ক্রেতা নতুন, টেস্ট করে দেখতে চায়, পছন্দ হলে অনেক বড় অর্ডার প্লেস করবে ইত্যাদি বলে পটাতে হবে বেলগ্রেডকে।

প্রথমটার জন্য স্প্যানিশ সিইটিএমই-র লাইসেন্সধারী এক ডিলারের কাছে যাওয়ার ইচ্ছে রানার। তবে সে লোক আবার জাল এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটের কারবার করে না। দ্বিতীয় আইটেমের জন্য যাবে এখানকার এক অভিজ্ঞ ট্রেডারের কাছে। ইউগোস্লাভ আর্মস ইণ্ডাস্ট্রির শিশুকালে এই লোক একাই

বলতে গেলে সেটাকে ইওরোপের বাজারে পরিচিত করেছে। এ জন্য দু পক্ষের সম্পর্ক অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু তার আবার লাইসেন্স নেই।

কিন্তু ওর পক্ষে লাইসেন্সবিহীন ডিলারের কাছে যাওয়ার যুক্তিও নেই। সে তার বেআইনী স্টক থেকে রানার প্রয়োজন মেটাতে পারলে কথা ছিল না। কিন্তু তা সে পারবে না। তাই এখন রানার একটা কাজেই লাগতে পারে সে, তা হলো একটা এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট জোগাড় করে একজন লাইসেন্সধারী ডিলারকে সেটার বিপরীতে কাজ করতে রাজি করানো।

তখন সরকারের বৈধ অনুমোদন পাওয়া সেই ডিলার বাকিটা অনায়াসে করতে পারবে।

নিজের বৈধ মজুদ থেকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সরবরাহ করতে পারবে, অথবা সেই জাল এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট কোনও সরকারের সামনে হাজির করতে পারবে। নিজ প্রতিষ্ঠানের সুনামের গ্যারান্টির বিনিময়ে অর্ডার প্লেস করতে পারবে। তবে মাঝে-মধ্যে অন্য কাজেও লাগে এসব মানুষ।

আর্মস মার্কেট সম্পর্কে সব খবর রাখে বলে এদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে বাজার পরিস্থিতি জানা যায়। কখন কোথায় গেলে প্রার্থিত বস্তু নিশ্চিতভাবে পাওয়া যাবে, জানা যায়।

এই জন্য ওর হ্যামবার্গ লিস্টের দু' নম্বর ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করে এসেছে রানা।

রুডলফ গুন্থারের মুখোমুখি বসে আছে সাইমন এনডিন। 'আমরা যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই ঠিক হয়েছে, সার,' বলল সে। 'আমার আগে দু'বার দুই পার্টি লেডি ম্যাকালিস্টারের কাছ থেকে তার বোরম্যাকের শেয়ারগুলো কিনে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, দু'জনই ভুল পথে এগোবার চেষ্টা করেছে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে।'

'মহিলার বয়স কেমন?' গুন্থার জানতে চাইল।

'ছিয়াশি। আধা ভিমরতিগ্রস্ত। সেইসঙ্গে ভারি রগচটা। মহিলা স্কটিশ। তার শেয়ার ইত্যাদি দেখাশোনা করে তাদের পারিবারিক সলিসিটর, ডালগ্লেইশ অ্যাণ্ড ডালগ্লেইশ। সেটার অফিস আবার ডানডিতে। এই যে, লেডি ম্যাকালিস্টার সম্পর্কে আমার বিস্তারিত রিপোর্ট।'

একটা ফোল্ডার এগিয়ে দিল সে। ভুরু কুঁচকে সেটা দেখল গুন্থার। নিয়ে উল্টে চলল নীরবে। একটু পর পর 'ঘোঁৎ, ঘোঁৎ!' করল কয়েকবার। কিছুক্ষণ মন দিয়ে পড়ল এনডিনের বক্তব্য। সেশন শেষ করল, 'ডামকফ!' দিয়ে।

'বুঝতেই পারছ,' বলল সে, 'আমি ওই তিন লাখ শেয়ার চাই। তুমি একটু আগে বলছিলে, অন্যরা ভুল পথে এগিয়েছে। কী সেটা? আর ঠিক পথটাই বা কী?'

'আমার মনে হয়েছে মহিলার একটা গূঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে। সেটা টাকা হাতে পারে না, আর কিছু। এমনিতে যথেষ্ট ধনী সে। বিয়ের আগে থেকেই স্কটিশ বাবার তরফ থেকে পাওয়া প্রচুর জমিজমা আর নগদ টাকার মালিক। মাইলের

পর মাইল বিরান, পতিত জমি। গত বিশ বছর সেখানে টুরিস্টদের যাওয়া-আসা, মাছ ধরা, পশু পাখি শিকার, এইসব মিলিয়ে বিপুল টাকা এসেছে। তারপর কিছু জমি শিল্প-কারখানার জন্য বিক্রি করে দেয়ায় অকল্পনীয় ধনী হয়েছে মহিলা। নিজের ব্রোকারকে দিয়ে সে-টাকা ব্যবসায় খাটিয়েছে। হিউজ আয় হয় প্রতি মাসে।'

'বুঝলাম,' গুস্থার বলল। ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মত বসে আছে। 'কিন্তু আগের সব পার্টি ভুল পথে এগিয়েছে বলছিলে কেন?'

'কারণ তারা ভদ্রমহিলাকে শুধু টাকা-পয়সাই সেধেছে—যে জিনিসে তার প্রয়োজন বা আগ্রহ, কোনওটাই নেই। অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছে।'

'টাকায়-পয়সায় আগ্রহ নেই?' আকাশ থেকে পড়ল যেন পাইরেট। 'তা হলে কীসে আগ্রহ আছে?'

'দু' নম্বর পৃষ্ঠার দ্বিতীয় প্যারাটা দেখুন, সার,' এনডিন বলল। 'স্বামীর প্রত্যেক মৃত্যুবার্ষিকীতে মহিলা সিটি কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছে সার আয়ান ম্যাকালিস্টারের একটা মূর্তি স্থাপন করা হোক শহরের কোথাও। অনেক বছর ধরে। কিন্তু কাউন্সিল কানে তোলে না। তাই নিজের গ্রামে ওটাকে বসিয়েছে সে। ওটাই বুড়ির একমাত্র অবসেশন। তার স্লেভ-ড্রাইভার স্বামীর মূর্তি কোনও পাবলিক প্লেসে শোভা পাক। সবাই দেখুক।'

'রাইট,' চিন্তিত মনে মাথা দোলাল গুস্থার। 'মনে হচ্ছে, ঠিকই ধরেছ তুমি। তা... এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কী?'

সময় নিয়ে নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল সাইমন এনডিন। পাইরেট শুনে গেল চুপ করে। শেষের দিকে চেহারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো তার।

'হতে পারে,' এনডিনের বক্তব্য শেষ হতে বলল সে। 'হতেও পারে। অনেক অদ্ভুত ঘটনাই তো ঘটে পৃথিবীতে। কিন্তু মুশকিল হলো, মহিলা যদি এটাও ফিরিয়ে দেয়, তা হলে...' থেমে শ্রাগ করল। 'ওকে। তোমার পরিকল্পনা মতই খেলে যাও। যেভাবে পারো বুড়িকে শেয়ার বিক্রির ব্যাপারে রাজি করানো চাই।'

বেরিয়ে গেল এনডিন।

হ্যামবার্গ। পরদিন সকালে জোহান শ্লিংকারের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করতে এল মাসুদ রানা। ছোটো অফিস, কিন্তু চমৎকার সাজানো-গোছানো। মানুষটা খাটো, গোলগাল। রসিক টাইপের। জেমস ব্রাউনের পাসপোর্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করল সে। কিছু সন্দেহ করল কি করল না, তা তার চেহারা দেখে অনুমান করতে ব্যর্থ হলো রানা।

'বসুন, প্লিজ,' পাসপোর্ট ওর হাতে ফিরিয়ে দিল শ্লিংকার। 'বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি।'

'পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়, এমন একজন বিশ্বস্ত আর্মস ডিলার খুঁজছি আমি, হের শ্লিংকার,' কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই শুরু করল ও। 'মিলিটারি ও পুলিশের কাজে ব্যবহৃত হয়, এমন কিছু হার্ডওয়্যার কিনব, নগদে।'

চোখের পাতা একটুও কাঁপল না লোকটার। 'আমার কাছেই সেসবের খোঁজ পাওয়া যাবে বুঝলেন কী করে আপনি, জানতে পারি?'

'আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছে।'

'কে সে?'

'ভিনসেন্ট গগল।'

শ্লিংকার নির্বিকার। 'এই নামে কাউকে চিনি না।' একটু বিরতি। 'আপনার নামটা যেন কী?'

'জেমস ব্রাউন।'

'একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ।' অফিস সংলগ্ন পিছনের ছোট্ট রুমে গিয়ে মাঝের দরজাটা লাগিয়ে দিল জোহান শ্লিংকার। আধ ঘণ্টার মত সাড়া নেই। তারপর বেরিয়ে এল।

'বসিয়ে রাখার জন্য আন্তরিক দুঃখিত,' ক্ষমা চাওয়ার হাসি হেসে বলল সে। 'একটা জরুরি ফোন করার ছিল। বোঝেনই তো। যাকগে, তারপর বলুন।'

'আমি অল্প কিছু নাইন এমএম অ্যামিউনিশন কিনতে আগ্রহী,' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল ও। 'ছোটো অর্ডার। কিন্তু যে কাজে ওগুলো কেনা, সে কাজ সফল হলে ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় অর্ডার প্লেস করা হবে।'

'অ্যামিউনিশনের পরিমাণ কেমন হবে?'

'চার লাখ রাউণ্ড।'

নাক টানল শ্লিংকার। 'অনেক কম হয়ে যায়।'

'জানি। কিন্তু এ মুহূর্তে এরচেয়ে বেশি প্রয়োজন নেই। তবে আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে বড় অর্ডার আসবে। সেগুলো যাতে আপনি পান, আমি অবশ্যই সে চেষ্টা করব।'

মাথা ঝাঁকাল জার্মান। এ লাইনে এরকম হয়েই থাকে। প্রথমে আসে ছোটো অর্ডার। তারপর বড়।

'আপনার এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট নেই নিশ্চয়ই?'

'নো, আ'য়্যাম অ্যাফ্রেড। আশা করছি আপনি সেটারও ব্যবস্থা করে দেবেন।'

মাথা দোলাল জার্মান। 'দেয়া যাবে। তবে সময় লাগবে। টাকার অংকও বাড়বে। ২ হাজার ডলার এক্সট্রা। আর... মাল আমার ভিয়েনা স্টকে আছে। আপনি চাইলে ওখান থেকে সরবরাহ করা যাবে। তা হলে আর এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটের প্রয়োজন পড়বে না।'

'আমি এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটই প্রেফার করব, হের শ্লিংকার,' রানা বলল। 'কারণ মাল জাহাজে করে নেয়া হবে জায়গামত। ভিয়েনা থেকে অস্ট্রিয়া-ইটালির মধ্য দিয়ে এত ওজনদার প্যাকেট হ্যামবার্গ পর্যন্ত বয়ে এনে বোটে তোলা খুব ঝামেলার কাজ হয়ে যাবে। তা ছাড়া পথে যদি কোনও দেশের বর্ডার কন্ট্রোল অথরিটি ইন্টারসেপ্ট করে বসে, তা হলে কী ঘটবে বুঝতেই পারছেন। মালটা আপনার স্টক থেকে এসেছে, সেটাও ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

জোহান শ্লিংকার হাসল। সে জানে তার কিছু হবে না, তবে বর্ডার

নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী সম্পর্কিত ধারণাটা অমূলক নয় মিস্টার ব্রাউনের। ইদানীং এই অঞ্চলে কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের এপার-ওপার করা রহস্যময় কার্গোর কারণে অস্ট্রিয়া, জার্মানি আর ইটালিকে নিজেদের বর্ডারে খুব কঠোর খবরদারির ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

'মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল সে। 'ঠিক আছে। আমি আপনাকে নাইন এমএম বল দিতে পারব প্রতি হাজার সাড়ে ছয়শ ডলার করে। মোট দাম যা আসবে, তার দশ পার সেন্ট ফ্রি অন বোর্ড চার্জ।'

দ্রুত হিসেব করল রানা। ফ্রি অন বোর্ড অর্থ হলো এক্সপোর্ট লাইসেন্সসহ কমপ্লিট কার্গো কাস্টমস পার করে জাহাজে তুলে জাহাজকে হারবার মাউথ পার করে দেয়া। দাম আসে ২ লাখ ৬০ হাজার ডলার। প্লাস ২৬ হাজার ডলার ফ্রি অন বোর্ড চার্জ।

'পেমেন্ট কীভাবে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সারচার্জের টাকা কাজ শুরু করার আগেই দিতে হবে,' শ্লিংকার বলল। 'সার্টিফিকেট নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হবে আমাকে। প্লাস পার্সোনাল ট্রাভেলিং আর কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খরচও আছে। আমি সার্টিফিকেট জোগাড় করলেই মালের পুরো দাম দিতে হবে। আমি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলার। ক্লায়েন্টের নগদ টাকায় বৈধভাবেই মাল কিনতে পারি, রাখ-ঢাকের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু যদি আমি গাঁটের টাকায় মাল কিনি আর কেনার পর ক্লায়েন্ট যদি কোনও কারণে তা ডেলিভারি না নেয়, তা হলে আমি ফেঁসে যাব। বিক্রেতা পার্টি তখন মাল ফেরত নিতে চাইবে না। নেয় না সাধারণত। তাই পুরো টাকাটাই অগ্রিম দিতে হবে। তা ছাড়া এক্সপোর্ট পারমিটে এন্ট্রি করানোর জন্য আপনার এক্সপোর্টিং ভেসেলের নামও লাগবে। সেটাকে আবার শেডিউলড় লাইনার বা ফ্রেইটার হতে হবে। কোনও রেজিস্টার্ড শিপিং কোম্পানির মালিকানাধীন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। শর্তগুলো কঠিন, কিন্তু না মেনে উপায় নেই। 'কতদিন লাগবে মাল পেতে?'

'মোটামুটি চল্লিশ দিনের মত লেগে যাবে,' হিসেব করে বলল জার্মান।

পকেট থেকে একটা তালিকা বের করল রানা। 'এগুলোও প্রয়োজন আমার। দেখুন তো, আপনার পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না?'

লিস্টে চোখ বোলাল জোহান শ্লিংকার। এক জোড়া রকেট লঞ্চিং টিউব, যেগুলো কোস্টগার্ড ভেসেল ডিসট্রেস ফ্লেয়ার ছুঁড়তে ব্যবহার করে থাকে। দশটা ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার, উইথ ম্যাক্সিমাম ইন্টেনসিটি অ্যাণ্ড প্যারাশুট ড্রপিং ডিউরেশন। কম্প্রেসড গ্যাস ক্যানিস্টার পাওয়ারড় পেনিট্রেটিং ফগ হর্ন দুই জোড়া, বিশ সেট নাইটগ্লাস, পাঁচ মাইল রেঞ্জের এক কুড়ি ফিক্সড় ক্রিস্টাল ওয়াকি-টকি। আর এক কুড়ি রিস্ট কম্পাস।

'নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে পারব,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা, চওড়া হাসি দিল। 'সাধারণ মানুষের কাছে আমি এসব জিনিসের বিক্রেতা হিসেবেই তো বেশি পরিচিত।'

'সবগুলোর দাম কত পড়বে, মার্সেইয়ে আমার এক্সপোর্টিং এজেন্টের

ঠিকানায় পাঠানোর খরচসহ?'

দ্রুত হিসেব করল শ্লিংকার। দশ পার সেন্ট ফ্রেইটসহ মোট ষোলো হাজার আটশ' ডলার।

ওকে কোটের ভিতরের পকেট থেকে কড়কড়ে একশ' ডলার বিলের বাণ্ডিল বের করতে দেখে খানিকটা অবাক হলো আর্মস ডিলার। সন্দেহ ফুটল চেহারায়। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না দেখার ভান করল রানা।

সারচার্জ ২৬ হাজার, পরের আইটেমগুলোর দাম ১৬ হাজার ৮শ এবং এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটের ২ হাজার, মোট ৪৪ হাজার ৮শ ডলার আলাদা করে দিল তাকে।

নোটগুলো দু'বার করে গুণল্ লোকটা। আসল না জাল, পরখ করে দেখল ভালভাবে। তারপর সন্তুষ্ট মনে পিছনের রুমের সেফে রেখে এসে মানি রিসিপ্ট লিখল। ওটা নিয়ে উঠল রানা।

'বারোদিন পর আবার আমাদের দেখা হবে আশা করছি। এরমধ্যে আপনি সবকিছু ফ্রেইটিঙের জন্য রেডি রাখবেন, প্লিজ। আমার মার্সেইয়ের এক্সপোর্টিং এজেন্টের নাম-ঠিকানা পাঠাব আমি। সঙ্গে থাকবে বাকি দু' লাখ ষাট হাজার ডলারের ব্যাংকার্স চেক। তবে ক্যারিইং ভেসেলের নাম জানাতে সময় আরও কয়েকদিন বেশি লাগতে পারে।'

'নো প্রবলেম।'

আটলান্টিক হোটেলে ডিনারের টেবিলে তালিকার দু' নম্বরের মুখোমুখি হলো রানা। তার নাম অ্যালান বেকার। স্কট। বয়স পঞ্চাশের মত। দীর্ঘদেহী। ধীরস্থির, অবিচল ধরনের মানুষ। আগে ব্রিটিশ রয়্যাল মেরিনে চাকরি করত। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে বাঁ হাতের তিনটে আঙুল উড়ে গেলে অবসরে যেতে হয়। তারপর কীভাবে যেন এক জার্মান মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাকে বিয়ে করে এখন এ দেশে স্থায়ী হয়েছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিলার।

সেটল করার পর পশ্চিম থেকে পুবে ছোটোখাটো এটা-সেটা অনেক কিছুই পাচারের কাজ করেছে লোকটা। নাইলন, হাতঘড়ি, রিফিউজি, পারফিউম, সিগারেট। এরপর ক্রমে বেআইনী অস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ইদানীং ইউগোস্লাভ অস্ত্রের বড় এক চালান জোগাড়ে ব্যস্ত এলটিটিইর জন্য।

বছর কয়েক আগে ফিফথ অ্যাভিনিউর এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিউ ইয়র্ক পুলিশ সন্দেহের উপর আটক করেছিল বেকারকে। কারণ, সে ওই সময় রেস্টুরেন্টের কাছেই ছিল। কোনওভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পেরে স্ত্রীর মাধ্যমে রানা এজেন্সির সাহায্য চেয়েছিল লোকটা। রানা তখন নিউ ইয়র্কে। তিনদিনেই সেই বোমাবাজির রহস্য ভেদ করে রানা প্রমাণ করে দেয়, কাজটা সাদা আর কালো চামড়ার দলাদলিকে কেন্দ্র করে ঘটেছে। ফলে মুক্তি পায় অ্যালান বেকার। সেই থেকে রানার প্রতি দুর্বল লোকটা।

খেতে খেতে মন দিয়ে রানার বক্তব্য শুনল সে। চোখ সামনের প্লেট আর রানার মুখের উপর ঘোরাফেরা করছে, ওর বলা শেষ হতে মাথা দোলাল

অ্যালান বেকার।

'কোনও ব্যাপার না। পরীক্ষা করে দেখার জন্য কেউ যদি একজোড়া মর্টার আর একজোড়া বাজুকা এবং তিনশ' মর্টার বোমা আর চল্লিশটা বাজুকা রকেটের অর্ডার দিতে চায়, বেস-প্লেট আর সাইটিং মেকানিজমসহ,' শ্রাগ করল সে। 'আমি তো কোনও সমস্যা দেখি না। এরকম হতেই পারে। আরে না। আমার ঝামেলা হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। বেলগ্রেডের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল। তবে এখানে অন্য একটা কথা আছে।'

'কী কথা?' রানা বলল।

'এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট,' বেকার বলল। 'আমার চেনা একজন ছিল বনে। এক পশ্চিম আফ্রিকান দেশের ডিপ্লোম্যাট। টাকা পেলে যে কোনও ডকুমেণ্টে সই করে দিত। এসব ব্যাপারে "না" ছিল না তার। কিন্তু মাত্র দুই সপ্তা আগে নিজের দেশে বদলি হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে ওরকম কেউ নেই আমার চেনা।'

'বেলগ্রেড কোনও নির্দিষ্ট এণ্ড ইউজার চায় না তো?'

'নোপ। কাগজপত্র ঠিক থাকলে আর কিছুই দেখে না ওরা। তবে সার্টিফিকেট একটা থাকতে হবে এবং তাতে নির্ভেজাল গভার্নমেণ্টাল স্ট্যাম্পও থাকতে হবে। দ্যাট'স অল।'

কিছু ভাবল রানা। আরেকবার জোহান শ্লিংকারের শরণ নিতে হবে মনে হচ্ছে। 'সব মিলিয়ে দাম আসছে কত?'

দ্রুত হিসেব কষল লোকটা। '২ লাখ ৪০ হাজার ৪শ ডলার। প্লাস দশ পার সেণ্ট ফ্রি অন বোর্ড চার্জ।'

আধ ঘণ্টা ধরে নানান খুঁটিনাটি নিয়ে লোকটার সঙ্গে কথা বলল ও। তারপর সারচার্জের ২৪ হাজার ডলার দিয়ে উঠল।

পরদিন সকালের ফ্লাইটে লণ্ডন ফিরে চলল মাসুদ রানা।

পনেরো

ভিক্টোরিয়ান আমলের ফার্নিচারে ঠাসা লেডি ম্যাকালিস্টারের ড্রইং রুম। ভারী পর্দা টানা বলে দিনের আলো তেমন ঢুকতে পারছে না। তবে দেখার সুবিধার জন্য এক জায়গার পুরু নেট কার্টেন খানিকটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। কেনসিংটন হাই স্ট্রিটের কাছে জায়গাটা। কটেসমোর গার্ডেনসে।

রুমের এক কোণে জবরজং কারুকাজ করা চারটে বিশাল ফ্যামিলি চেয়ার সাজানো রয়েছে। যত্রতত্র রাখা আছে অনেকগুলো ছোটো ছোটো টেবিল। তার উপর দুনিয়ার হাবিজাবি। দাদার আমলের ইউনিফর্মের বোতাম। ইতিহাসে যাদের কথা নেই, বোর্নিওর গভীর জঙ্গলে বসবাসকারী সেইরকম প্রাচীন দু'-একটা উপজাতির সঙ্গে যুদ্ধ জয় করে অর্জিত মেডেল, ড্রেসডেন চায়না পুতুলের

পেপারওয়েট, হাইল্যাণ্ড সুন্দরীদের ক্যামিও, আজব কিসিমের হাতপাখাসহ আরও কত কী।

রুমটার চার দেয়ালে ঝুলছে লেডি ম্যাকালিস্টারের পূর্ব পুরুষদের পোর্ট্রেট। মন্ট্রোস আর মণ্টিগল, ফারকুহার ও ফ্রেজার, মুরাই ও মিণ্টো, সবাই আছে তাদের মধ্যে। একজনের এত গোত্রের পূর্ব পুরুষ! শ্রাগ করল এনডিন, স্কট বলে কথা।

অনেক পুরনো সেগুলো, কালো হয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পোর্ট্রেটে এক দীর্ঘদেহী স্কট ঝালরওয়ালা ঘাগরা জাতীয় পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ইয়া চওড়া গোঁফ তার, অনেকটা মাংস কিমা করার দায়ের মত। উদ্ধত ভঙ্গি। জ্বলন্ত চাউনি। যেন প্ল্যাণ্টেশনের কোনও নেটিভ কুলি কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে তার চোখে।

ওটার নীচে সোনালি রঙে বড় বড় করে লেখা : সার আয়ান ম্যাকালিস্টার, কেবিই।

এই পোর্ট্রেট নতুন লাগল। কারণ রংটা বেশ উজ্জ্বল। একটা ফায়ারপ্লেসের উপরে টাঙানো। ওই প্লেসে কখনও আগুন জ্বলেছে কি না সন্দেহ।

দৃষ্টি ওটার ওপর থেকে জোর করে টেনে সরিয়ে আনল এনডিন। সামনের চেয়ারে কাপড়চোপড়ের বড় একটা দলার মত পড়ে থাকা লেডি ম্যাকালিস্টারের দিকে তাকাল। ছোটোখাটো মানুষ। চামড়া কুঁচকে গেছে। তোবড়ানো গাল। দাঁত নেই অনেকগুলো। চাউনি নিষ্প্রাণ, ঘোলাটে।

বুকের কাছে ঝোলানো হিয়ারিং এইড নিয়ে নাড়াচাড়া করছে দলাটা। এই মিনমিন করে কথা বলছে, পরক্ষণে তর্জন-গর্জন করছে। যদিও সবই দুর্বোধ্য লাগছে এনডিনের। রীতিমত গবেষণা করতে হচ্ছে বুড়ি কী বলছে বোঝার জন্য।

'আগেও অনেকে এসেছে কিনতে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। কেন হব? ওসব আমার স্বামীর। ওর জীবনের সবকিছু। এখন এক এক করে অনেকে আসছে... আমার কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে যাবে... বাড়ি করবে, কারখানা করবে। কিন্তু আমি তো বিক্রি করব না। ওসব আমি... প্রশ্নই আসে না।'

'কিন্তু...'

'ইউ সি, মিস্টার এনডিন? আমার প্রিয়তম স্বামী, ঈশ্বর তার আত্মার মঙ্গল করুন, আমাকে এসব দিয়ে গেছে। চাইনিজ ডাকাতগুলো ওকে যখন কুপিয়ে কুপিয়ে মারল, ওহ্, গড! আমি তখন স্কটল্যাণ্ডে। এই হরিবল্ খবর শুনে ওদিকে আর যাইনি কখনও। সবাই দু' হাতে বারণ করল। সেই মানুষের দেয়া সম্পত্তি আমি বিক্রি করি কীভাবে, বলুন?'

প্রায় চল্লিশ মিনিট অসহায়ের মত বসে বসে শুনতে হলো বৃদ্ধার ভাষণ। মুখ খোলার সুযোগই পাওয়া গেল না। অবশেষে এক সময় ধৈর্য হারাল আইরিশ। লেডি ম্যাকালিস্টারের সঙ্গিনী-কাম-হাউজকিপারের দিকে তাকাল, 'কী করি বলুন তো!' ভঙ্গিতে। ষাট-পঁয়ষট্টির মত হবে মহিলার বয়স। গোলগাল স্বাস্থ্য। বিষণ্ন চেহারা।

'কাছে গিয়ে হিয়ারিং এইডের মাধ্যমে চড়া গলায় কথা বলুন,' পরামর্শ দিল মহিলা। 'নইলে টায়ার্ড হয়ে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত এই বকবকানি চলতেই থাকবে।'

'ধন্যবাদ,' উঠল সে। এইডের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগল, 'লেডি ম্যাকালিস্টার, আমরা আপনার কোম্পানির ক্ষতি চাই না। বরং ওটায় আরও অনেক পুঁজি খাটাতে চাই। আগের চেয়ে আরও বিখ্যাত করে তুলতে চাই বোরম্যাককে, ইউ সি? ম্যাকালিস্টার এস্টেটকে সারাবিশ্বে পরিচিত করে তুলতে চাই।'

এক ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম মহিলার চোখে কিছুটা দীপ্তির আভাস ফুটতে দেখল এনডিন। 'কী বললেন?'

'যা শুনেছেন ঠিকই শুনেছেন, লেডি ম্যাকালিস্টার।' দেয়ালে ঝোলানো স্বেচ্ছাচারী লোকটাকে দেখাল সে। 'সার ম্যাকালিস্টার যেভাবে চাইতেন, আমরা সেভাবেই নতুন করে গড়ে তুলব তাঁর স্বপ্নের এস্টেট। ওটার মাধ্যমেই তাঁকে পৃথিবীতে অমর করে তুলব আমরা সবাই মিলে।'

'ওরা আমার প্রিয় আয়ানের স্মৃতি রক্ষায় কিছুই করেনি, জানেন? আমি অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক আবেদন জানিয়েছি ওর একটা মূর্তি কোথাও স্থাপন করার। কিন্তু... শুনল না ওরা। কী বলে জানেন? জায়গা নেই। জায়গা নেই! কত মূর্তি দেখি এখানে-সেখানে, তখন জায়গার অভাব হয় না। অথচ আমার আয়ানের মূর্তির জন্যে জায়গা নেই!'

'বোরম্যাক যদি আবার আগের মত ধন-সম্পদের মালিক হয়, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই সার আয়ানের মূর্তি স্থাপন করবে,' এইডে প্রায় চিৎকার করে বলল এনডিন। 'করতেই হবে। কোম্পানি ধনী হলে আমরা চাপ দিয়ে কাজটা করাতে পারব। সার ম্যাকালিস্টার ট্রাস্ট গঠন করতে পারব। স্কলারশিপ, ফাউণ্ডেশন।'

'কিন্তু এত টাকা আমি কোথায় পাব বলুন?' মিনমিন করে বলল সে। 'আমি তো অত ধনী নই।'

এনডিনের প্রায় নিভু নিভু আশার আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'আপনাকে একটা কানাকড়িও খরচ করতে হবে না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমরা করব যা করার।'

'আমি জানি না! আমি জানি না!' বিলাপ করে উঠল মহিলা। ঘন ঘন নাক টানতে লাগল। হাউজকিপার তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার রুমাল এগিয়ে দিল। 'আমি এসব বুঝি না। মিস্টার ডালগ্লেইশ থাকলে হতো। সে-ই আমার সব কাগজপত্রে সই করে। মিসেস বার্টন, আমি টায়ার্ড। রুমে নিয়ে চলুন আমাকে।'

তাকে রুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল মহিলা। কিছুটা বিরক্ত, কিছুটা হতাশ এনডিনের উদ্দেশে বলল, 'লেডি এখন ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করবেন। আপনি চা খাবেন?'

মুখে 'না' এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল আইরিশ। তার মন বলল, এখন একমাত্র এই মহিলাই তাকে সাহায্য করতে পারে। 'খাব।'

তার পিছন পিছন কিচেনে চলে এল এনডিন। চারদিক তাকিয়ে অনেকটা নিজের বাড়ির মত লাগল পরিবেশ। তার মায়ের কিচেনটাও দেখতে প্রায় এরকমই। মিস বার্টনের মধ্যে অদ্ভুত এক আকর্ষণ আছে। ভাল লাগল যুবকের। চা খেতে খেতে গল্প জমে উঠল দু'জনের।

'লেডি আপনার প্রস্তাবের মর্ম বুঝতে পারেনি মনে হয়, মিস্টার এনডিন।'

'আপনি একটু বুঝিয়ে বললে হয়তো বুঝবেন,' অনুনয়ের সুরে বলল ও। পরক্ষণে আহাম্মক হয়ে গেল। কথাটা ও নিজে থেকে বলেনি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কী করে যেন। কেউ তাকে দিয়ে বলিয়েছে কথাটা। 'মানে...'

'আরেক কাপ চা খাবেন?' চা ঢালতে লাগল মহিলা। মৃদু গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তা হয়তো বুঝবে। সবকিছুতেই তাকে আমার উপর নির্ভর করতে হয় তো! তাই আমাকে একটু অন্য চোখে দেখে। আমি চলে গেলে এরকম সঙ্গিনী সে আর পাবে না। নিজেও তা জানে সে। এখানে আমাকে যে সব কাজ করতে হয়, আজকাল কেউ সেসব করে না। টাকা দিলেও করে না।'

'এ জীবন ভাল লাগে আপনার?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মিসেস বার্টন। 'মাথার উপরে একটা ছাদ আছে। খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা আছে। একজন সন্তানহীন বিধবার আর কী চাই!'

ম্যান্টেলপিসের উপর নজর গেল এনডিনের। ঘড়ির পাশে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি দেখতে পেল। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের ইউনিফর্ম পরা এক যুবকের ছবি। চোখ সরিয়ে মিসেস বার্টনকে দেখল এনডিন। হুবহু এক চেহারা। 'আপনার ছেলে?'

মাথা দোলাল মহিলা। দেখল ছবিটা। 'হ্যাঁ। ফকল্যাণ্ড যুদ্ধে মারা গেছে। গুলি খেয়ে সাগরে ক্র্যাশ করেছিল প্লেন।'

'আমি দুঃখিত।' একটু বিরতি। 'লেডি ম্যাকালিস্টারের যে অবস্থা, সে মরে গেলে আপনার কী হবে?'

আরও এক ঘণ্টা পর খুশি মনে সেখান থেকে বিদায় নিল সাইমন এনডিন। বেরিয়ে এসে হেড অফিসে পিটার মার্টিনকে ফোন করল। সহকর্মীর অনুরোধে মার্টিন ফোন করল ওয়েস্ট এণ্ডের এক ইনশিওরেন্স ব্রোকারকে।

হিজ এক্সেলেন্সি প্রেসিডেন্ট কিমবার সামনে এলে সব সময়ই অস্বস্তিতে ভোগেন ক্লারেন্সের বর্ষিয়ান আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর কেন উইলিয়ামসন। কারণ অন্য অনেকের মত তাঁরও কিমবার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কিন্তু যেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন, সেখানে কারও ব্যক্তিগত মতামত বা সন্দেহের উপর ভিত্তি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। চাকরি করতে হলে উপর মহলের নির্দেশ যা আসবে, তা পালন করতেই হবে। কিছু করার নেই।

সে জন্যই আজ দুর্বোধ্য চরিত্রের এই আফ্রিকান নেতার কাছে উইলিয়ামসনের আসা। বিশেষ এক আরজি নিয়ে। এ মুহূর্তে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের দোতলায়, প্রেসিডেন্ট'স স্টাডি নামের বিশাল এক হলরুমে আছেন

তিনি ও তাঁর সহকর্মী। শোনা যায়, এ রুমে তথাকথিত জাংগারান মন্ত্রীসভার বোর্ড মিটিং হয়।

মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড এক কনফারেন্স টেবিলের ওপাশে প্রেসিডেন্ট কিমবা বসা। নির্বিকার চেহারা। তার পিছনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সশস্ত্র কায়া। এক পাশে একই ভঙ্গিতে দাঁড়ানো তার এক সেক্রেটারি।

টেবিলটার এ পাশে আছেন রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সঙ্গী, আমেরিকান দূতাবাসের কথিত সেকেণ্ড সেক্রেটারি, মতান্তরে সিআইএ-র রেসিডেন্ট ডিরেক্টর, হেনরি অ্যালেইন। সবে রুমে ঢুকেছেন দু'জনে, এখনও বসার অনুমতি মেলেনি বলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিমবা চকচকে, স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাঁদেরকে।

ওই চাহনি উন্মাদের, স্পষ্ট টের পেলেন বৃদ্ধ রাষ্ট্রদূত। মুখটা লম্বাটে, কুঠারের মত বাঁকা। নাকের দু' পাশের চামড়ায় দুটো গভীর, নিম্নমুখী দাগ। সর্বক্ষণ নাক কুঁচকে রাখার ফল। ঠোঁটের দুই কোনাও নিম্নমুখী। ঘৃণার উদ্রেক হলে অথবা কিছু মেনে নিতে না পারলে অভিব্যক্তি এরকমই হয়।

জাংগারোর অফিশিয়াল পোর্ট্রেটে কিমবাকে যত সুদর্শন আর হ্যাণ্ডসাম দেখানো হয়েছে, ততটা সে আদৌ নয়। বরং উল্টোটাই ঠিক। উইলিয়ামসনের চোখে আস্ত একটা শয়তানের মত লাগে মানুষটাকে। তার উপর এখন বিশাল টেবিলটার পিছনে বসা বলে রীতিমত বামুনের মত লাগছে। সেটা আরও বেশি লাগছে মানুষটা মূর্তির মত অনড় আর সামনে ঝুঁকে বসে আছে বলে। তার এই ভাবটা কখন কাটে, সেই রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় আছেন রাষ্ট্রদূত।

এ দেশে কূটনৈতিক দৌড়ে আমেরিকার তুলনায় রাশা কয়েক মাইল এগিয়ে আছে। ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করার বিনিময়ে কিমবার কাছ থেকে এরইমধ্যে মস্কো অনেক বেশি সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। এখনও নিয়মিত নিচ্ছে।

তবে ইদানীং মনে হচ্ছে কোথাও ছন্দপতন ঘটে গেছে। মস্কোর প্রতি ক্লারেন্সের উদারতায় কিছুটা ভাটা পড়েছে যেন। এই সুযোগে কিমবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার উপায় নিয়ে ভাবছিলেন উইলিয়ামসন, তখনই একেবারে অযাচিতভাবে হাজির অভাবনীয় সুবর্ণ সুযোগটা।

ওয়াশিংটন থেকে কিমবার সঙ্গে দেখা করার জরুরি নির্দেশ পেয়ে আর দেরি করেননি রাষ্ট্রদূত। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন। যদি এই মিশিন সফল হয়, তাহলে তাঁর ধারণা, রাশানদের ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার সুযোগ সীমিত করে আনা যাবে।

অনেকক্ষণ পর ধ্যান ভাঙল অবিচল কিমবার। নড়ে উঠল। উইলিয়ামসনের দিকে ফিরে সামান্য মাথা দুলিয়ে বিস্ময়কর রকম মার্জিত কণ্ঠে বলল, 'বি সিটেড, প্লিজ। প্রসিড।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস এতক্ষণে উইলিয়ামসন ছাড়ার সুযোগ পেলেন। বসলেন। অবাক কাণ্ড! ভাবলেন তিনি। লোকটা তা হলে কিছু কূটনৈতিক ভাষা শিখেছে? অবশ্য সে-জন্য এখনই আনন্দে গদগদ হওয়ার কিছু নেই। তিনি যা বলতে এসেছেন, তা শোনার পর লোকটার মেজাজের কী হাল হয়, বলা কঠিন।

'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ পেয়ে আমি আপনার কাছে বিশেষ একটা আর্জি জানাতে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল কিমবা। কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না।

'জাংগারোর হিন্টারল্যাণ্ডে বা তার আশপাশে কোনও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কি না, আমার সরকার তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আপনার সদয় অনুমতি কামনা করছে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

চুপ করে থাকল ফ্রান্সিস কিমবা। চোখের পাতা সামান্য একটু কাঁপল না পর্যন্ত। উইলিয়ামসনের কথা কানে যাচ্ছে কি না বা আলোচনা যা নিয়ে, সে ব্যাপারে তার কোনও আগ্রহ জন্মেছে কি না, কিছুই বোঝার উপায় নেই।

একটু পর নড়ে উঠল সে। 'কী ধরনের খনিজ?'

'সেটা পরীক্ষা না করে বলা সম্ভব নয়, ইওর এক্সেলেন্সি। আমাদের বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আপনার দেশের হিন্টারল্যাণ্ডের মত পাহাড়ি এলাকায় কিছু না কিছু খনিজ সম্পদ না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক। লোহা, তামা, গ্যাস, তেল, কিছু না কিছু নিশ্চয়ই আছে। তাই আমাদের ভ্রাতৃ প্রতিম দুই দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থের কথা ভেবে ওয়াশিংটন আপনার মতামত...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল কিমবা। 'আপনারা অফিশিয়াল আবেদন জানান। আমি খনিজ সম্পদ মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে দেখি।'

তৎক্ষণাৎ বাউ করলেন রাষ্ট্রদূত উইলিয়ামসন।

'আর কিছু?'

'না, ইওর এক্সেলেন্সি। আবেদন অনুমোদনের জন্য আমার সরকারের তরফ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার বিদায় নেয়ার অনুমতি দিন দয়া করে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

হাত নেড়ে 'দূর হও!' জাতীয় ভঙ্গি করল কিমবা। দু'-তিন পা পিছিয়ে এসে আরেকবার বাউ করলেন রাষ্ট্রদূত। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্ট'স স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন সহকর্মীকে নিয়ে। স্টাডির দরজার বাইরে অপেক্ষমাণ এক গার্ড নীচের আঙিনা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল তাঁদেরকে।

সূর্যের আলোয় বেরিয়ে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দুই কূটনীতিক। একটু একটু ঘামছে। ভেতরের এয়ার কণ্ডিশনারের ঠিকমত কাজ না করা এবং কিমবার ব্যাপারে তাদের মনে গেড়ে বসা অজানা ভয়, দুটোই এর কারণ।

'ওফ, বাঁচলাম!' বলল হেনরি অ্যালেইন। 'ভেতরে আমার দম আটকে আসছিল।'

'একবারেই এই অবস্থা?'

'কেবল "বার" হিসেবে ধরলে একবারই হয়। কিন্তু মানুষটার সাথে দেখা করার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পেতেই যে দশদিন লাগল, সে কথা ভুলে যাবেন না।'

'তা বটে।'

দশ দিন বিশ দিন কোনও বিষয় নয়, কাজটা ভালয় ভালয় সমাধা করা গেছে, তাতেই বেজায় খুশি উইলিয়ামসন। যদিও ওয়াশিংটনের এমন অনুরোধ জানানোর কারণ জানেন না তিনি। উইলিয়ামসন ব্রিটিশ মাইনিং টাইকুন, স্যার

রিচার্ড ম্যানসনের নাম কখনও শোনেননি।

কোনও ধারণাই ছিল না যে তাঁর বড় ছেলে, টমাস ম্যানসনের হাত থাকতে পারে তাঁর এই সফরের পিছনে।

স্যার রিচার্ডের হঠাৎ মারা যাওয়া, লুটন ল্যাব পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া, অসুস্থ বোনসহ তাদের এক পুরনো কর্মচারীর বোমা বিস্ফোরণে নিহত হওয়া এবং তাদের চিফ অ্যানালিস্ট, ডক্টর হুপারের সর্বশেষ রিসার্চের সঙ্গে জড়িত এক রিসার্চ স্কলারের অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই লাপাত্তা হয়ে যাওয়া, এতসব একসঙ্গে ঘটে যাওয়ায় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাড়াহুড়ো করে দেশে ফিরে আসা ম্যানসন পরিবারের সদস্যদের। সবকিছু পরিকল্পিত ভাবা হয়েছিল প্রথম দিকে।

কিন্তু পরে পরীক্ষা করে জানা যায়, স্যার রিচার্ড ঘুমের মধ্যে 'হার্ট অ্যাটাকে' মারা গেছেন। যে বিশেষ ওষুধটা তাঁকে খাওয়ানো হয়েছিল, সেটার কাজই ওই রকম। হার্টের কার্যক্রম স্তব্ধ করে দেয়, অথচ তা বোঝার উপায় তেমন একটা থাকে না। তাছাড়া যে সত্যি সত্যি হার্টের রোগী, তার বেলায় 'অ্যাটাক' হয়েছে কি হয়নি, তা বেশি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখাও হয় না।

আরও জানা গেল, ডক্টর হুপার মারা গেছেন নিতান্তই দুর্ভাগ্যক্রমে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল ল্যাবে। তবে প্রসপেক্টর জেমস ব্রায়ান ও তার প্রায় পঙ্গু বোনের মৃত্যুর ঘটনা ছিল একশ' ভাগ 'দুঃখজনক দুর্ঘটনা'। যদিও পুলিশ তার কোনও কিনারা করতে পারেনি। কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি।

বাতের কামড়ে বছরের পর বছর বিছানায় পড়ে থাকা এক বৃদ্ধা, বা ষাট বছর ধরে আফ্রিকার জঙ্গলে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধকে কেউ বোমা ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা কেন করতে যাবে, কিছুতেই মাথায় আসেনি পুলিশের।

মোটিভ নেই। কাজেই ব্যাপারটাকে 'দুঃখজনক দুর্ঘটনা'-র লেবেল লাগিয়ে ফাইল ক্লোজ করে দিয়েছে।

তার মাসখানেক পর ডক্টর হুপারের পোড়া সেফ থেকে উদ্ধার করা হয় একটা প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়া ডকুমেণ্ট। সেটাই কেন উইলিয়ামসনের আজকের প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস সফরের মূল ভিত্তি। পুলিশ গুরুত্ব দিয়ে সেই দুর্ঘটনার তদন্ত করলে হয়তো তাদের হাতেই পড়ত ডকুমেণ্টগুলো। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারণ কেউ বুঝতেই পারেনি ওটা নাশকতামূলক ছিল।

সে যাই হোক, সেফের ডকুমেণ্টগুলোর মধ্যে আগুনের তাপে কুঁকড়ে যাওয়া একটা ফাইল ছিল। ডক্টর হুপারের ল্যাব অফিস ফাইল। তাতে টাইপ করা রিপোর্ট ছিল একটা। কিন্তু একে কাগজ আগুনের তাপে কুঁকড়ে গিয়েছিল, তার উপর লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাই রিপোর্টের বক্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার উপায় ছিল না। কিন্তু তাই বলে হাল না ছেড়ে লেগে ছিলেন টমাস।

সময় নিয়ে, গোপনে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তার মনে হয়েছে, কোনও এক ক্রিস্টাল মাউন্টেনে পাওয়া খনিজ সম্পর্কিত রিপোর্ট ছিল সেটা। বোমার ঘায়ে মারা যাওয়া প্রসপেক্টর, জেমস ব্রায়ানও সেখানেই দীর্ঘদিন কাজ করছিল।

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কোনও শত্রু পিছনে লেগেছে টের পেয়ে সাবধান হয়ে গেল ম্যানসন পরিবার—নিজেরা কিছু করতে গেলে আরও মৃত্যু ঘটবে বুঝতে পারল তারা। কিন্তু শত্রুপক্ষ একেবারে ফাঁকা মাঠে যাতে গোল দিতে না পারে তারও একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। চিন্তা-ভাবনা করে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ফরেন অফিসের এক হোমরাচোমরা কর্মকর্তা টনি সিবারের সাহায্য চাইলেন টমাস ম্যানসন। কিন্তু জাংগারোতে ব্রিটিশ দূতাবাস নেই বলে বন্ধুটি আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী রিপাবলিকান সিনেটর, রবিন ডেম্পসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন টমাসকে। টনি সিবারের বড় বোনের স্বামী রবিন ডেম্পসি।

পরের ঘটনা সোজা। কেন উইলিয়ামসনের প্রেসিডেনশিয়াল ভবন সফরের খবরটা দু'দিন পর কিমবার সেক্রেটারি মারফত রাশান দূতাবাসের কানে যায়। বোলতার চাকে ঢিল পড়ে। মস্কোর জন্য শাঁখের করাত হয়ে ওঠে খবরটা।

মস্কো। অ্যাসিসট্যান্ট আণ্ডার-সেক্রেটারি সের্গেই গোলনের মন-মেজাজ ভাল নেই। ভীষণ আশাহত মন নিয়ে আজ অফিসে এসেছে সে। কারণ, সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় একটা চিঠি এসেছে তার নামে। চিঠির বক্তব্যের সারমর্ম এরকম : তার একমাত্র ছেলে সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ফেল করেছে পরীক্ষায়।

ছেলের ভবিষ্যৎ চিন্তায় পরিবারের শান্তি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অ্যাসিডিটির পুরনো সমস্যা একটু একটু করে চেগিয়ে উঠতে শুরু করেছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে, আজকের দিনটা কঠিন যাবে। এর মধ্যে আবার তার সেক্রেটারি মেয়েটার আজই ছুটি নেয়ার দরকার হয়ে পড়ল।

ফরেন মিনিস্ট্রির ওয়েস্ট আফ্রিকা সেকশনে নিজের ছোটো অফিসে চুপ করে বসে আছে সের্গেই গোলন। জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। মস্কোর কয়েক ইঞ্চি পুরু তুষার মোড়া বুলেভারগুলোর মন্থরগতি ট্রাফিক দেখছে। প্রবল ঝোড়ো বাতাসের তুষার ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া দেখছে। পাউডারের মত গুঁড়ো তুষার ধোঁয়া ধোঁয়া করে তুলেছে পরিবেশ।

গাঢ়, ধূসর মেঘের কারণে দিনের আলো ঠিকমত ফুটতে পারছে না। বিচ্ছিরি আবহাওয়া।

এক সময় চোখ নামিয়ে নিজের ডেস্কের দিকে নজর দিল সের্গেই গোলন। ফাইলের ছোটোখাটো পাহাড়টার দিকে তাকাল। সেক্রেটারি মেয়েটা আজ আসেনি, কাজেই তার দিনের প্রথম কাজটাও গোলনকেই করতে হয়েছে। নিজের অফিসে ঢোকার আগে গোটা ভবন চক্কর দিতে হয়েছে। বিভিন্ন সেকশনে তার 'দৃষ্টি আকর্ষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য' যে সমস্ত ফাইল রাখা ছিল, সেগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে হয়েছে।

সবগুলো ফাইলের ওপর একবার করে চোখ বুলিয়ে নিল সে। মুখের মধ্যে ধীরগতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে একটা অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট। তিন নম্বর ফাইলটা নজর কাড়ল তার।

জাংগারোর রাষ্ট্রদূতের একটা চিঠি মিনিস্ট্রি থেকে 'অ্যাসেস অ্যাণ্ড

ইনস্টিগেট নেসেসারি অ্যাকশন' লিখে তার কাছে পাঠানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূত তার চিঠিতে যা লিখেছে, তার মর্মার্থ এই : জাংগারোতে আমেরিকার প্রভাব হঠাৎ করে বাড়তে শুরু করেছে। ওয়াশিংটন হিজ এক্সেলেন্সি প্রেসিডেন্ট কিমবার কাছে তার দেশের হিন্টারল্যাণ্ডে মাইনিঙের অনুমতির জন্য আবেদন জানাতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কিমবা তাদেরকে কথা দিয়েছেন, অফিশিয়ালি আবেদন জানানো হলে তাঁর সরকার বিষয়টা বিবেচনা করে দেখবে।

এরপর আছে আণ্ডার-সেক্রেটারি সের্গেই গোলনকে উদ্দেশ করে মিনিস্ট্রির সংক্ষিপ্ত নোট : অনতিবিলম্বে ক্রিস্টাল মাউণ্টেন বেল্টের সোল মাইনিং রাইটসের জন্য আবেদন জানাতে হবে। আমেরিকানরা অ্যাপ্রোচ করার আগেই। আমাদের হঠাৎ অনুমতি চাওয়া সন্দেহের কারণ হতে পারে প্রেসিডেন্টের। প্রশ্ন উঠতে পারে, ক্রিস্টাল মাউণ্টেনে প্ল্যাটিনামের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও আরও আগেই কেন আবেদন করা হয়নি। এর গ্রহণযোগ্য একটা ব্যাখ্যাও দিতে হবে।

এ বিষয়ে আমাদের অতীত সংশ্লিষ্টতার পূর্বসূত্র এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

কামড় দিয়ে ট্যাবলেট গুঁড়ো করে ফেলল সের্গেই গোলন। জিভ দিয়ে নেড়েচেড়ে ভিতরে চালান করে দিল। জাংগারোর রাশান রাষ্ট্রদূতের পাঠানো চিঠির সঙ্গে রেফারেন্স বা পূর্বসূত্র স্ট্যাপল করে দিয়েছে মিনিস্ট্রি। সেটায় চোখ বোলাল। ওটাও সার-সংক্ষেপের মতই অনেকটা।

গোলন জানে ওতে কী লেখা থাকতে পারে। আবেদন জানাতে মস্কো দেরি করেছে কেন, তা-ও ভাল করেই জানে।

বিষয়টা এরকম : ক্রিস্টাল মাউণ্টেন বেল্টের কোনও এক পাহাড়ে দেড়-দুই বছর আগে প্ল্যাটিনামের খোঁজ পেয়েছিল তাদের এক খননকারী দল। কিন্তু দামি খনিজের খোঁজ পেলে অন্য দেশ সাধারণত খনন করার অনুমতির জন্য যেমন উঠেপড়ে লাগত, মস্কো সেরকম কিছু করেনি। কারণ ওই জিনিস তাদের দেশেও প্রচুর ছিল। এখনও আছে। বিশ্বে প্রতি বছর ১৫ লাখ ট্রয় আউন্স প্ল্যাটিনাম উৎপাদন হয়। তার মধ্যে সাড়ে ৩ লাখ ট্রয় আউন্স, অর্থাৎ মোট উৎপাদনের প্রায় এক চতুর্থাংশ রাশাই উৎপাদন করে থাকে।

এটা ছিল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ, জাংগারোর রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল ভীষণরকম গোলমেলে। ঘন ঘন সরকার আসে আর যায়। দু'মাস-চার মাসের বেশি টেকে না কেউ। হয়তো দেখা যেত, কাঠখড় পুড়িয়ে এক সরকারের অনুমতি নিয়ে কাজ শুরু করেছে রাশা, ক'দিন পর আরেক সরকার এসে সেই অনুমতি বাতিল করে আর কাউকে দিয়ে দিল। মাঝখান থেকে রাশার প্রাথমিক খরচ পানিতে যেত আর দুনিয়ার সবাই জেনে ফেলত হাঁড়ির খবর।

কাজেই এ নিয়ে তখনই কিছু করার গরজ অনুভব করেনি মস্কোর কর্তারা। তাদের ভাবনা ছিল, চলছে যখন, চলুক না। আর কোনও পক্ষ যতদিন না জানছে এ খবর, ততদিন শুধু শুধু ব্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু... জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সের্গেই গোলন। মনে হচ্ছে আমেরিকা যেভাবেই হোক জেনে গেছে ব্যাপারটা। নইলে ওই অঞ্চলেই খননের

অনুমতি চাইতে গেল কেন?

এখন রাশা যদি ওই জায়গাতেই খনন করার অনুমতি চাইতে যায়, তাহলে নানান জটিলতা দেখা দেবে। কী করবে ভাবতে বসল আণ্ডার-সেক্রেটারি। আপনমনে মাথা নাড়ছে। কোনও সমাধান মাথায় আসছে না। এটা বড় কর্তাদের ভুল বা অবহেলা, যা-ই হোক না কেন, সে এর সঙ্গে কোনওমতেই জড়িত ছিল না। অথচ ভুগতে হবে তাকেই।

কৈফিয়ত তাকেই দিতে হবে এখন। বসকে দিয়ে সই করিয়ে অনতিবিলম্বে পাঠিয়ে দিতে হবে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে। বদমাশ সেক্রেটারিটা ছুটি নেয়ার আর সময় পায়নি!

উঠল সের্গেই গোলন। টাইপিং পুল থেকে খুঁজেপেতে এক সেক্রেটারিকে ধার করে এনে ডিকটেশন দিতে শুরু করল। মেয়েটা বেশ সুন্দরী, অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা।

ডিকটেশন দেয়ার ফাঁকে তার অনাবৃত, সুন্দর হাঁটুজোড়া নজর কাড়ল গোলনের। বাহ, দারুণ তো!

ছেলের ব্যর্থতা, অফিসের ঝামেলা আর অ্যাসিডিটির জ্বলুনি, সব দ্রুত ভুলে গেল সে।

শনিবারের সকালের দ্বিতীয় কাপ কফি উপভোগ করছিল গুন্থার নিজ বাড়ির সান লাউঞ্জে বসে। এমন সময় একটা টেলিফোন এল। তার বন্ধু, ফরেন অফিসের এক কর্মকর্তা, অ্যাড্রিয়ান গুল করেছে তার গ্রামের বাড়ি কেন্ট থেকে। সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে গেছে সে ওখানে। বেশ ঘনিষ্ঠ তারা।

'তোমার উইকএণ্ডের আনন্দ মাটি করলাম না তো?' জানতে চাইল অ্যাড্রিয়ান গুল।

'একদম না, ডিয়ার ফেলো,' মনের কথাই বলল গুন্থার। 'বলো, কী খবর।'

'কাল রাতেই ফোন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মিটিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আর মনে ছিল না। যাকগে, তুমি বেশ কয়েক সপ্তা আগে আফ্রিকার একটা দেশের মাইনিং নিয়ে কী যেন বলছিলে, মনে আছে? জাংগারোর?'

'মনে আছে। কেন?'

'এখন সেই প্রজেক্ট কোন পর্যায়ে আছে? ওদিকে কাজ শুরু করতে যাচ্ছ তুমি?'

কেন জানতে চাইছে? ভাবল গুন্থার। 'না, মানে, এখনও শুরু করিনি,' সতর্ক জবাব দিল পাইরেট। লোকটার উদ্দেশ্য নিশ্চিত না হয়ে বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। 'ইন ফ্যাক্ট, শুরু করব কি না নিশ্চিত হতে পারিনি এখনও।'

'না করলেই ভাল করবে, ভায়া,' বলল অ্যাড্রিয়ান গুল। 'ওদিকে পা না বাড়ানোই উচিত হবে না তোমার। ওই অঞ্চলের অবস্থা বেশি সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

পিঠের প্রতিটা পেশি আড়ষ্ট, লোহা হয়ে উঠল গুন্থারের। 'কেন বললে কথাটা?'

'ইদানীং আমাদের অফিসে জাংগারো প্রসঙ্গ নিয়ে কিছু রহস্যময় কথাবার্তা চালাচালি হচ্ছে।'

'রহস্যময় আলোচনা?' রিসিভার কানের সঙ্গে ঠেসে ধরল গুন্থার। 'সে আবার কী?'

'পুরোটা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি,' বলল ফরেন অফিস কর্মকর্তা। 'তবে বিষয়টা জাংগারো এবং একটা মূল্যবান খনিজ নিয়ে, এটুকু বলতে পারি তোমাকে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল গুন্থার। মনে মনে নানা কাল্পনিক ছবি এঁকে ফেলল। 'কিছুই পরিষ্কার হলো না, গুল।'

'জানি। আসলে হয়েছে কী জানো? জাংগারোতে আমাদের দূতাবাস নেই, আছে পাশের দেশে। লাইবেরিয়াতে। ওই একটা দূতাবাসই জাংগারোসহ মোট চার-পাঁচটা দেশে আমাদের স্বার্থ দেখে। তো সেখানকার রাষ্ট্রদূতের পাঠানো একটা রিপোর্ট গতকাল হাতে পেয়েছি আমি। খবরটা তোমাকে রাতেই জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...'

রিসিভারটা কানের সঙ্গে জোরে চেপে ধরে আছে গুন্থার। 'কী আছে সেই রিপোর্টে?' অভদ্রের মত বাধা দিল সে। অজান্তেই গলা চড়ে গেল।

'ওটায় আছে, আমেরিকা নাকি জাংগারোর হিণ্টারল্যাণ্ডে খনিজ সম্পদের খোঁজে খনন কাজ চালানোর অনুমতি চেয়েছে প্রেসিডেণ্ট কিমবার কাছে।'

নিঃশ্বাস আটকে এল পাইরেটের। 'কবে?'

'এই তো, গত সপ্তাহে।'

গুন্থারের সাড়া নেই। মাথার মধ্যে ঝড় বইছে।

'আরও একটা খারাপ খবর আছে, বিশেষ করে তোমার জন্য। রাশাও নাকি অতীতে ওই অঞ্চলে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর এটা। এখন, আমেরিকার খননের অনুমতি চাওয়ার খবর পেয়ে রাশানরা নাকি তড়িঘড়ি কিছু একটা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। অবশ্য...'

'কিছু একটা কী?' ঘাম ছুটে গেছে পাইরেটের।

'জানি না। তবে ওদের তাড়াতাড়ি মানে তো ছয় মাস, নয় মাসের ধাক্কা,' হাসল ফরেন অফিস কর্মকর্তা। 'আমি তোমাকে ফোন করেছি এ কথা বলতে যে, ওইসব ঝুট-ঝামেলায় না জড়িয়ে তুমি ভালই করেছ।'

মুঠোয় ধরা রিসিভারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। কপালের বাঁ পাশে একটা শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে।

সর্বনাশ! ভাবল সে। এতদিন কেবল ব্যবসার চিন্তা করেছে। এ ধরনের সম্ভাবনার কথা তো ভুলেও তার মাথায় আসেনি!

'হ্যালো!... হ্যালো!'

'সরি, গুল। একটা কথা বলো দেখি, রাশানরা ওই অঞ্চলে কবে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল?'

'তা জানি না,' বলল ফরেন অফিস কর্মকর্তা। 'এ কথা আগে কখনও শুনিনি আমি। এই প্রথম শুনলাম।'

'ও। মনে হয় কিছু পায়নি। পেলে নিশ্চয়ই...'

'একজ্যাক্টলি! তা হলে সবাই জানত।'

'কিন্তু... কিছু যদি না-ই পাওয়া যাবে, আমেরিকানরাই বা তাহলে খননের অনুমতি চাইবে কেন?'

'কী জানি! এসবের বেশিরভাগই হচ্ছে কানকথা। বাতাসে ওড়ে। হাতা নেই, মাথা নেই। আবার ভিত্তিহীন বলে একেবারে উড়িয়ে দেয়ারও জো নেই। বুঝলে না? তবে একটা বিষয় শিওর, কোনও খনিজ পাওয়া গেলে রাশা যে এতদিন বসে থাকত না, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই।'

আশ্বস্ত হতে পারল না গুন্থার। সাদা চোখে যুক্তি আছে কথাটার। কিন্তু তাহলে আমেরিকা খননের অনুমতি চাওয়ায় ওদের গা চিড়বিড় করে কেন?

'আমি আসলে তোমাকে ফোন করেছি সতর্ক করতে। যাতে তুমি এইসব বিগ পাওয়ারের কাছ থেকে দূরে সরে থাকো। এরা সবাই অস্বাস্থ্যকর, বুঝলে না?'

'হ্যাঁ, ঠিক! খবরটা জানানোর জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, গুল। খুব খুশি হলাম। থ্যাংকস।'

আরও মিনিটখানেক কথা বলে ফোন রাখল গুন্থার। ধীর পায়ে সান টেরেসের কিনারায় গিয়ে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল। দৈব-সংযোগ? ভাবল সে। হতে পারে। তাই হবে। নইলে হঠাৎ করে এত তোড়জোড়!

এখন কী করবে সে? পিছিয়ে আসবে সব ছেড়েছুড়ে? মিশন পরিত্যাগ করবে? কিন্তু... সাঁকোটার ওপারেই যে কলস ভর্তি খাঁটি সোনার মোহর, কারও তুলে আনার অপেক্ষায় আছে, সেগুলোর কী হবে তা হলে? এত স্বপ্ন তার, এত কিছু, সব এক লহমায় বিসর্জন দিয়ে দেবে?

না। রুডলফ গুন্থার পিছিয়ে যাওয়া কাকে বলে জানে না। তা ছাড়া কোথায় কে কী করল না করল, শুনেই হাত-পা গুটিয়ে নেয়ার মত মানুষও সে নয়। ছেড়ে যাওয়া আরামদায়ক ডেক চেয়ারটায় ফিরে এসে বসল টাইকুন। ঠাণ্ডা হয়ে আসা কফিপট থেকে কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিল।

মনে মনে একটা হিসেব কষল সে। অ্যাড্রিয়ান গুলের কথায় জানা গেল রাশানরা অতীতে কোনও এক সময় ওই অঞ্চলে খনন করেও চুপচাপ বসে ছিল। সফল হলে ওরা নিশ্চয়ই বসে থাকত না। তারপর এখন আমেরিকা খননের অনুমতি চাইতে যাচ্ছে।

অনুমতি পেলে সমস্ত যোগাড়যন্ত্র সেরে ওদের সার্ভে টিমের আফ্রিকা পৌঁছতে কম করেও মাস তিনেক তো লাগবেই। একই কথা খাটে রাশার বেলাতেও। কেননা তাদেরকেও সবকিছুই নতুন করে শুরু করতে হবে।

এদিকে মাসুদ রানা যে সময়সীমা দিয়েছে, তাতে আর বড়জোর দু' মাস আছে। তারপরই কিমবার গদি উল্টে যাওয়ার বিষয়টা প্রায় অবধারিত। তারপর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববি ক্ষমতায় বসলে তো আর কোনও কথাই থাকে না। সে তখন থাকবে তার কর্মচারী। তা হলে আর চিন্তা কী?

জার্মান টাইকুন গুন্থারের মুখের কথাই তখন হবে জাংগারোর আইন।

অলিখিত। তার কথামতই চলবে ওই দেশের সবকিছু। টেলিফোনের দিকে আপনাআপনি চোখ চলে গেল তার। একবার কথা বলে দেখবে নাকি পিটার মার্টিনের সঙ্গে? তাকে জানাবে গুলের টেলিফোন করার কথা?

নাহ্, থাক। শুধু শুধু বেচারার উইক এণ্ডটা মাটি করার দরকার নেই। দু'দিন পরেই আবার আফ্রিকায় ছুটতে হবে ওকে। তারচেয়ে বরং ও ফিরে আসুক। তারপর দেখা যাবে।

রবিবার মাঝরাতের এয়ার আফ্রিক-এর ফ্লাইটে আফ্রিকায় চলল রানা। গন্তব্যে পৌঁছল খুব ভোরে। তারপর শুরু হলো ট্যাক্সিতে করে দীর্ঘ যাত্রা।

রোদ ঠিকমত উঠতে না উঠতেই গাড়ির ভেতরটা তাওয়ার মত তেতে উঠল। তার উপর ওটার ধাতব শরীরের বিরতিহীন ক্যাঁচ কোঁচ সঙ্গীত। ছয় ঘণ্টার নির্ঘুম ফ্লাইটের পর এই অবস্থায় বিরক্তি লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রানা বিরক্ত হলো না।

দু'পাশের সারি সারি অয়েল-পাম গাছের মধ্য দিয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে ছুটে চলেছে ওর ট্যাক্সি। গাছগুলোর মাথার ওপর গ্রীষ্মের আকাশটাকে অস্বাভাবিক নীল মনে হলো রানার। কোথাও এক খণ্ড মেঘের চিহ্ন নেই।

মনে হলো এখানকার সবকিছু যেন ওর কতকালের চেনা। গরু-ছাগলের গলার ঘণ্টির শব্দ, বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ, গ্রাম্য নারী-পুরুষদের পথের কিনারা দিয়ে বাজারের দিকে হেঁটে চলা, রংচঙে গাউন পরা ইনডিয়ান নারীদের মিছিল, তাদের মাথার জিনিসপত্রের বোঝা, সবকিছু।

প্রতিটা গ্রামের বাজারের ব্যস্ততা বাড়ছে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। নড়বড়ে কাঠামোর উপর পাম পাতার ছাউনি দেয়া দোকানের সামনে মানুষের ভিড় বাড়ছে। দরদাম, বেচাকেনা, গাল-গল্প চলছে। মেয়েরা দোকান চালাচ্ছে আর পুরুষরা গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দুনিয়া উদ্ধার করছে। ছোটো ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলা করছে।

দু'পাশের জানালা খোলা রেখেছে রানা। পাম গাছের গন্ধ আসছে নাকে। ধোঁয়ার গন্ধ আসছে।

দুপুরের দিকে জায়গামত পৌঁছল ট্যাক্সি। মেইন রাস্তা থেকে একটু ভিতরদিকে, একটা প্রাইভেট রোডের মাথার একটা ছোটোখাটো পার্কের গেটে থামল ট্যাক্সি। ভিতরে তিন-চারটে বাড়ি আছে। রাস্তা থেকে ছবির মত সুন্দর লাগছে দেখতে। ট্যাক্সি থেকে নামল মাসুদ রানা।

দুই সশস্ত্র গার্ড ওর গোড়ালি থেকে বগল পর্যন্ত চাপড় মেরে মেরে সার্চ করল। তারপর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটা থেকে এক লম্বা আফ্রিকান বেরিয়ে এসে রিসিভ করল। যার সঙ্গে দেখা করতে এত পথ ছুটে এসেছে রানা, এ লোক তার পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্ট। ওকে ড্রইং রুমে এনে বসাল সে।

এয়ার কণ্ডিশনারের ঠাণ্ডা বাতাসে কাপড়ের ঘাম দ্রুত শুকিয়ে এল রানার। ঘুম ঘুম একটা ভাব চেপে বসতে শুরু করেছিল, এমন সময় দরজা মৃদু ক্যাঁচ

শব্দ করে উঠল। স্যাণ্ডেলের মৃদু শব্দ কানে আসতে ঘুরে তাকাল ও।

মানুষটা কালো, গাট্টাগোট্টা। গাল ভর্তি কুচকুচে কালো, ঘন দাড়ি। যে-কেউ একবার দেখলেই বুঝবে এই লোক নেতা হওয়ার জন্যই জন্মেছে। রানাকে দেখে হাসল লোকটা।

'হ্যালো, মেজর!' ডান হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্য। 'প্লিজড় টু সি ইউ এগেইন। ভেরি প্লিজড় ইনডিড।'

***

অচেনা বন্দর-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

এক

ওয়াগাডুগো, মৌরিতানিয়া আর মার্সেই হয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে লণ্ডনে ফিরল রানা। অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকে প্রথমেই টেলিফোনের আনসারিং মেশিন চেক করল। দুটো মেসেজ জমে আছে। আতাসি আর মার্সিয়ার হোটেলের নাম ও কণ্ট্যাক্ট নম্বর। ক্যাপ্টেন মিশ্রি খান পাঠাতে পারেনি কারণ সে স্টেশনারি নয়, মোবাইল। মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছে ভেসেলের খোঁজে।

ফায়জাকে ফোন করল রানা। মে ফেয়ারের সেই সেফ হাউসে আছে ও। 'কেমন চলছে?'

'মন্দ না,' বলল ফায়জা। 'তুমি কখন ফিরেছ?'

'একটু আগে। কোনও খবর?'

'দেখা হওয়া দরকার।'

'আমি আসছি। আধঘণ্টা পর।'

লাইন কেটে দিয়ে আতাসীর মার্সেইয়ের নম্বরে যোগাযোগ করল রানা। শহরের একটু বাইরের এক হোটেল ওটা। বেদুঈন ওখানে একটা নামকরা টয়লেট্রিজ সামগ্রীর সেলস প্রোমোশন অফিসার পরিচয়ে উঠেছে।

পাওয়া গেল না তাকে। হোটেল ম্যানেজার বলল, 'মঁশিয়ে ফ্রান্সিস মার্কেটপ্লেসে গেছেন। আপনার কোনও মেসেজ থাকলে আমাকে বলুন। মঁশিয়ে ফিরলে আমি জানিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ। মঁশিয়ে ফ্রান্সিসকে বলবেন লণ্ডন থেকে মিস্টার জেমস ব্রাউন কল করেছিল। ওকে?'

'ওকে।'

মে ফেয়ারের দিকে চলল রানা। কয়েকদিনের অনবরত ছোটাছুটির ফলে ক্লান্তি ধরে গেছে। ঘুমের অভাবে চোখ জ্বলছে। একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু এ মুহূর্তে ওসব বিলাসিতা দূরে সরিয়ে রাখা দরকার।

আধ ঘণ্টা নয়, পনেরো মিনিটের মধ্যে জায়গামত পৌঁছল রানা। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ফায়জার সঙ্গে। গত চারদিনে কেনাকাটায় তেমন অগ্রগতি হয়নি জানা গেল। একশ' জোড়া সকস, সিংলেট আর আণ্ডারপ্যাণ্ট ম্যানেজ হয়েছে। তবে দু'দিন পর হাতে পাওয়া যাবে সেসব।

কমব্যাট টিউনিক সাপ্লাইয়ারের কাছে অর্ডার প্লেস করেছে ফায়জা। কিন্তু রানা আলাদাভাবে ট্রাউজার্স কিনতে বলায় অসুবিধা হচ্ছে। ওগুলো পেতে আরও দু'-চারদিন সময় লাগবে।

'কেউ সন্দেহ করেছে কিছু?'

মাথা নাড়ল ফায়জা। 'না।'

অনেকগুলো ফুটওয়্যার স্টোরের সঙ্গে কথা বলেছে ফায়জা, কিন্তু যে ধরনের লেসওয়ালা ক্যানভাস বুটের কথা রানা বলেছে, তেমন পাওয়া যায়নি। এ সপ্তাহের পুরোটাই লেগে যেতে পারে ট্রাউজার্স আর বুট সংগ্রহ করার পিছনে। পরের সপ্তাহ যাবে বেরেট, হ্যাভারস্যাক, ন্যাপস্যাক, ওয়েবিং আর স্লিপিং ব্যাগ জোগাড় করতে।

কিছু ভাবল রানা। 'ওদেরকে বলো, যেগুলো জোগাড় হয়েছে সেগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক করে ফেলতে। আমি আতাসীর কাছ থেকে ওখানকার কনসাইনি এজেন্টের নাম নিয়ে জানাচ্ছি তোমাকে। ওই ঠিকানায় সব পাঠিয়ে দিতে হবে।'

মেসেজ দিয়ে রাখার তিন ঘণ্টা পর, বিকেল চারটায় ফোন করল লেফটেন্যান্ট আতাসী। 'প্রতিটা ক্যাটাগরির তিনটে করে ম্যানুফ্যাকচারারের খোঁজ বের করতে পেরেছি এ-পর্যন্ত,' জানাল সে। 'ওগুলোর ব্রোশার পেয়েছি। তোমার ঠিকানায় পাঠিয়েও দিয়েছি। কাল-পরশুর মধ্যে পেয়ে যাবে। ওগুলো দেখে জানাও কোনটা কোনটা চাই।'

'গুড। দ্বিতীয় আইটেমের কী খবর?' রানা বলল।

'সেটা নির্ভর করে তুমি ব্রোশার দেখে কী কী জিনিস পছন্দ করছ তার ওপর,' বলল বেদুঈন। 'একটা আরেকটার ওপর নির্ভর করে, তাই না? চিন্তার কিছু নেই। এখন গরম কাল। গোটা উপকূল জুড়ে হাজার হাজার দোকানে লেটেস্ট মডেলের জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। অন্তত আগামী দু' মাস এরকমই চলবে। সো, নো চিন্তা, মেজর—ডু ফুর্তি।'

মুখ টিপে হাসল রানা। 'ওকে। ফাইন। জিনিসপত্র শিপিঙের জন্য একটা ভালো, বিখ্যাত এক্সপোর্ট এজেন্টের নাম চাই। খোঁজ নিয়ে জানাও আমাকে। এখান থেকে কিছু ক্রেট যাবে ওই ঠিকানায়। হ্যামবার্গ থেকেও দু'-একটা যাবে।'

'এখানকারগুলো ব্যবহার করা ঠিক হবে না,' আতাসী বলল। 'এখানে সিকিউরিটি হঠাৎ খুব কড়া হয়ে গেছে। আমার মতে সেটা তুলোঁর কোনও ফার্ম হলে ভালো হবে।'

'ঠিক আছে। তাই করো। তাড়াতাড়ি নাম-ঠিকানা পাঠাও।'

এরপর অসটেণ্ড-এ ফোন করল ও, সেনিয়রিটা সিলভিও গোনজালিস ওরফে মার্সিয়াকে। 'এভরিথিং ওকে?'

'ওকে।'

'সেই লোককে ট্রেস করা গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাজ হবে?'

'হবে। সামনাসামনি আলোচনার প্রয়োজন আছে।'

একটু ভাবল রানা। 'ঠিক আছে। আগামী বৃহস্পতি বা শুক্রবার প্যারিসে আসছি আমি। ওখানে দেখা হবে। মিটিংপ্লেস আর টাইম ঠিক করে জানাচ্ছি তোমাকে।'

'ঠিক আছে।'
'লোকটাকে বলবে মালের একটা স্যাম্পল নিয়ে আসতে। চেক করতে হবে।'
'ওকে।'
সন্ধ্যেটা রানা এজেন্সিতে কাটাল ও। চারটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ তদন্তের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল এজেন্সি-চিফকে। 'যত লোক প্রয়োজন লাগিয়ে দাও। হাতে সময় কম, আমি খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট চাই।'
মাথা ঝাঁকাল চিফ। 'তা-ই হবে, মাসুদ ভাই।'

লাঞ্চের পর পিটার মার্টিনকে ডেকে পাঠাল গুন্থার। বেশ খুশি খুশি লাগছে আজ তাকে। আগের রাতে টেলিফোনে এনডিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে তার। তারপর এক ইনশিওরেন্স ব্রোকারের সঙ্গে প্রায় অর্ধেক রাত জেগে বিশেষ একটা কাজ করেছে এনডিন। এইসবই পাইরেটের আনন্দের কারণ।
'মাসুদ রানা আগামী এক সপ্তা বাইরে বাইরে থাকবে বলছিলে না তুমি?'
'হ্যাঁ, সার।'
'তা হলে তুমিও ঘুরে এসো।'
'কোত্থেকে, সার?'
'কিগালি থেকে,' গুন্থার বলল। 'লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিকে দিয়ে চুক্তি সই করিয়ে নিয়ে এসো। বোরম্যাকের ঝামেলা আশা করি আজই মিটে যাবে।'
'ঠিক আছে।'
'আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড এমপ্লয়মেন্ট কণ্ট্র্যাক্ট নিয়ে যাবে। সাইন করানোর আগে আমাদের নামের উপর বোরম্যাকের নাম পেস্ট করে সেটার ফটো কপি করিয়ে নিয়ো। অরিজিনাল কণ্ট্র্যাক্ট তার হাতে পড়ে না যেন। আমাদের ওয়েস্ট আফ্রিকা কনসালট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ দাও লেফটেন্যান্ট কর্নেলকে। দু' হাজার পাউণ্ড বেতন। বাড়ি-গাড়ি ফ্রি।'
'লোকটা যদি কণ্ট্র্যাক্ট ফরম চেক করে?'
হাসল গুন্থার। 'করবে না,' আত্মবিশ্বাস ফুটল তার কণ্ঠে। 'দু' হাজার পাউণ্ড বেতন শুনলে সই করার জন্য পাগল হয়ে উঠবে, দেখো না! আর বাড়ি-গাড়ির কথা শুনলে তো... ' থেমে শ্রাগ করল। 'বুঝতেই পারছ।'
'ওকে, সার।'
'তাকে বলবে, কনসালটেন্সির নেচার তাকে পরে জানানো হবে। আপাতত কিগালির ওই বাড়িতেই থাকতে হবে তাকে। কোথাও যাওয়া চলবে না। আর... কণ্ট্র্যাক্ট ফরমে তারিখের জায়গায় বছর আবছা করে লিখবে। বোঝা যায় না যেন।'

পাঁচটার একটু পর কেনসিংটন হাই স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টের অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎ থেকে বেরিয়ে এল উল্লসিত এনডিন। হাতে চারটে শেয়ার ট্রান্সফার ডিড। আইনমাফিক লেডি ম্যাকালিস্টারের স্বাক্ষর এবং মিসেস বার্টনের প্রতিস্বাক্ষর

করা আছে ওগুলোয়।

সঙ্গে লেডি ম্যাকালিস্টারের লেটার অভ অথরিটিও আছে। যেটায় তার ডানডির অ্যাটর্নি মিস্টার ডালগ্লেইশকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বাহক মিস্টার সাইমন এনডিনের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এবং উপযুক্ত অংকের চেক পাওয়ার পর বোরম্যাকের শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো যেন তার হাতে তুলে দেয়া হয়।

ট্রান্সফার ডিডে শেয়ার গ্রহণকারীর নামের জায়গাগুলো যে খালি রাখা হয়েছে, তা লেডি ম্যাকালিস্টারের চোখেই পড়েনি। কারণ মিসেস বার্টন কাজ ছেড়ে চলে যাবে বলে ব্যাগ-ট্যাগ গোছাচ্ছে দেখে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। কোথায় সই করছে না করছে দেখার সুযোগ মেলেনি।

পরে অবশ্য অনেক তেল মালিশ করে মিসেস বার্টনকে ঠেকানো হয়েছে।

শেয়ার গ্রহণকারীর নাম বসিয়ে নেয়া তো সহজ কাজ। রাত নামার আগেই জুইংলি ব্যাংকের নমিনি কোম্পানি; মেসার্স অ্যাডামস, বল, কার্টার এবং ডেভিস ইত্যাদি নামগুলো বসে যাবে খালি জায়গাগুলোতে। আগামী সপ্তাহে আবার জুরিখে যাবে এনডিন। তখন ব্যাংকের স্ট্যাম্প আর ডক্টর স্টেইনহফারের সই জায়গামত বসিয়ে নেবে।

ব্যস, মামলা খতম।

শেয়ারগুলো কিনতে মোট ত্রিশ হাজার পাউণ্ড খরচ হচ্ছে গুন্থারের। কাল সকালে খসবে আরও ত্রিশ হাজার। এ-টাকা এক বিধবা, অসহায় হাউজকিপারের শেষ জীবনের অনিশ্চয়তা দূর করার কাজে লাগবে। কারণ সে এনডিনের পরামর্শে হুমকিটা না দিলে বুড়ি এত সহজে সবকিছু তুলে দিত না তার হাতে।

সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: কোথাও কোনও বেআইনী কাজ হয়নি। যা হয়েছে সব আইনসম্মতভাবেই হয়েছে। সম্পূর্ণ লিগ্যাল।

মেঘ ভর্তি কালো আকাশ ভেদ করে দক্ষিণের পানে ছুটে চলেছে পিটার মার্টিনের কটনউ ভায়া নিমেই ভায়া কিগালি ওভারনাইট ফ্লাইট, ইউটিএ ডিসি-এইট। আফ্রিকায় চলেছে সে টুরিস্ট ভিসায়। নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের আশায় পিল খেয়ে আয়েশ করে শোয়ার আয়োজনে ব্যস্ত আছে এ মুহূর্তে।

সোমবার সকালের প্রথম ফ্লাইটে প্যারিসে পৌঁছেছে মার্টিন। অরলি থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সরাসরি গেছে অ্যাভিনিউ ভিক্টর হিউগোর রওয়াণ্ডান দূতাবাসে। সেখানে তার আগমনের কারণ শুনে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট গোলাপি রঙের একটা লম্বা ফরম ধরিয়ে দেয় হাতে। ওটা পূরণ করে জমা দিয়ে চলে আসে মার্টিন। পরদিন অফিস আওয়ার শেষ হওয়ার একটু আগে গিয়ে সংগ্রহ করে ফরমটা। ভিসা অনুমোদন করা হয়েছে।

মাসুদ রানা তার এই সফরের কথা জানে না। জানলেও খুব একটা অবাক হত না। কারণ রুডলফ গুন্থারের পরিকল্পনায় জাংগারান আর্মির সাবেক প্রধান, নির্বাসিত লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্টনিও ববির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

থাকবে, এবং লোকটা বর্তমানে ম্যানগ্রোভ উপকূলের কোথাও যে গা ঢাকা দিয়ে আছে, এটুকু জানে ও। তার সঙ্গে মার্টিন দেখা করতে যেতেই পারে। এর মধ্যে ওর অবাক হওয়ার কোনও খোরাক নেই।

কিন্তু মার্টিন যদি জানত মাসুদ রানাও মাত্র তিনদিন আগে এই এলাকা সফর করে গেছে, ঘুম হারাম হয়ে যেত তার। ঘুমের বড়ি তো দূরের কথা, যে-লোক ওই জিনিস আবিষ্কার করেছিল, তাকে গুলে খাওয়ালেও কাজ হত না।

পরদিন সকাল আটটার দিকে কিগালি পৌঁছল মার্টিন। হোটেল ডু পোর্টে উঠে সেটার ইজরাইলি ম্যানেজারের সাহায্য নিয়ে খুঁজে বের করল লে. কর্নেল ববির বাসা। শহরের সবচেয়ে অভিজাত রেসিডেনশিয়াল ডিস্ট্রিক্টের একটা আধুনিক ভিলা সেটা। ছোট, তবে সুন্দর।

ববিকে শুধু দানব বললে ভুল হবে। ভয়ঙ্কর দানব সে। মুখটা প্রকাণ্ড সসপ্যানের মত, ছোটো ছোটো কান খুলির সঙ্গে সেঁটে থাকায় পূর্ণিমার চাঁদের মত পুরো গোল লাগে। কুতকুতে চোখের সাদা জমিনে রক্ত জমাট বাঁধা হাজারো সরু সরু রগ। ঠোঁট এত পুরু আর কর্কশ, সাইকেল-টায়ারের কথা মনে পড়ে যায়। ঠোঁটের দু' পাশ পুরনো ঘায়ের কারণে সাদা হয়ে আছে।

লোকটার হাতের পাঞ্জা দেখার মত জিনিস। লণ্ডন জু-তে যে কেনিয়ান গরিলা দেখেছে সে, ঠিক সেগুলোর মতই প্রকাণ্ড। দেখলেই বোঝা যায় মানুষটা পশুতুল্য, দয়া-মায়ার বালাই নেই। সন্তুষ্ট হলো মার্টিন। এরকমটাই আশা করছিল সে। কিমবা এখন দেশবাসীর উপর যে স্টিম-রোলার চালাচ্ছে, ববির রোলার যে তারচেয়ে বহুগুণ ভারী হবে, তাতে কোনও সন্দেহ রইল না তার।

ঘুম থেকে উঠে আসার কারণে এ মুহূর্তে ডিমে তা দেয়া মুরগির মত ঝিম মেরে আছে দানবটা।

মার্টিনের প্রস্তাব পুরোটা শোনার আগেই রাজি হয়ে গেল লে. কর্নেল। হবে না-ই বা কেন? একে ওরা তাকে দেশের ক্ষমতায় বসাতে যাচ্ছে, তার উপর সেটা যতদিন না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত প্রতিমাসে দুই হাজার পাউণ্ড বেতন দিয়ে যাবে। সঙ্গে বাড়ি-গাড়ির সুবিধা। এসব কে দেবে তাকে?

সঙ্গে নিয়ে আসা কণ্ট্রাক্টটা ববির হাতে তুলে দিল মার্টিন। তারপর দম বন্ধ করে অপেক্ষায় থাকল। প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে গেল দানব, তারপর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এল। বিশেষ কিছু লেখা আছে ওটায়। ওগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু কোনও ভাবান্তর হলো না। অর্থাৎ ব্যাটা অশিক্ষিত, বুঝল মার্টিন। পুরো বকলম বলতে যা বোঝায়, তা হয়তো নয়। কিন্তু ভাষার মারপ্যাঁচ বোঝার সাধ্য নেই। তাদের জন্য এরচেয়ে বড় সুখবর আর হতে পারে না। উল্লসিত হলো মার্টিন।

ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ মিলিয়ে তৈরি খিচুড়ি কোস্ট পিডগিন ভাষার শব্দভাণ্ডার হাতড়ে হাতড়ে কথা বলতে লাগল সে। যতটা না মুখে বলে, তারচেয়ে বেশি অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নিজেদের দাবির বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করল তাকে। কর্নেল একটু পর পর মাথা দোলাচ্ছে। মার্টিন তাকে বোঝাল, আগামী তিন মাস

তাকে এখানেই থাকতে হবে। তারপর সে আবার আসবে পরবর্তী করণীয় জানাতে।

অবশেষে ডকুমেন্টের নীচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কবজি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছু আঁকিবুঁকি কাটল ববি। ওটাকেই তার স্বাক্ষর ধরে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মার্টিনকে।

স্বাক্ষরটা তাকে অদূর ভবিষ্যতে রিপাবলিক অভ জাংগারোর সর্বোচ্চ পদে বসাবে এবং বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডকে ক্রিস্টাল মাউন্টেনের সোল মাইনিং রাইটস পাইয়ে দেবে।

পরদিন সকালের ফ্লাইটে প্যারিস হয়ে লণ্ডনে ফিরে চলল সন্তুষ্ট পিটার মার্টিন। সেদিন বৃহস্পতিবার।

বিসিআই, ঢাকা। মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে আছেন রাহাত খান। দু'হাত বুকে বাঁধা। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সামনের ছোটোখাটো মানুষটার দিকে। দেখলেই বোঝা যায় মনটা অস্থির রাহাত খানের।

ভদ্রলোকের বয়স সত্তর-পঁচাত্তরের মত হবে। কাঠির মত শুকনো হাত-পা। পেট আছে কি না সন্দেহ। অন্তত শার্টের ওপর থেকে দেখলে যে কারও সে সন্দেহ হবেই। চেহারা দেখে মনে হয় ভদ্রলোক ভীষণ বদমেজাজি।

তাঁর পাশের চেয়ারে বসে আছে সোহেল। পাশ থেকে নিবিষ্ট মনে মানুষটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

এ মুহূর্তে ছোটোখাটো বৃদ্ধের সামনে রাখা আছে মাসুদ রানার পাঠানো এক্স-রে ফিলমগুলো। হাতে আছে রেডিও সিগন্যাল আর ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত অত্যন্ত জটিল একগাদা প্রিন্ট আউট। রাহাত খানের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ হতে কিছুটা ব্যগ্রতা ফুটতে দেখা গেল তাঁর চেহারায়। 'কী বলছ?'

'আপনার সাহায্য প্রয়োজন, আনিস ভাই। তাড়াতাড়ি যা করার করুন।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! অস্থির হয়ো না। দেখতে দাও আমাকে।'

প্রথমে প্রিন্ট আউটগুলো কাছে টেনে নিলেন তিনি। আধ ঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কিছু নোট নিলেন। রাহাত খান আর সোহেলের নজর সেঁটে আছে তাঁর ওপর।

প্রিন্ট আউট রেখে অ্যানালাইসিসের দিকে হাত বাড়ালেন বৃদ্ধ। 'এই অ্যানালাইসিস... ' অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন তিনি। প্রিন্ট-আউটগুলো নাড়লেন। 'তোমাদের করা নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

আবার চুপ হয়ে গেলেন বিশেষজ্ঞ। রাহাত খান রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছেন। তাঁর চেহারার ভাষা পড়ার চেষ্টা করছেন।

মানুষটার নাম আনিসুর রহমান। চাকরি জীবনে আর্মিতে ছিলেন, সিগনাল কোরে। রাহাত খানের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়র। ব্যক্তিগত জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁরা, যদিও আজকাল দেখা-সাক্ষাৎ হয় কম। আনিসুর রহমান আমেরিকা-প্রবাসী। তবে একাত্তরে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর আবার ফিরে

গেছেন মার্কিন মুলুকে। ওখানে এক বিশাল ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির চিফ। অনেক বছর পর দেশে এসেছেন একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে।

'৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় খেমকারান সেক্টরে ছিলেন আনিসুর রহমান। আগে থেকেই রেডিও সিগন্যাল নিয়ে বিশেষ এক গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। ওই যুদ্ধের সময় তাতে বেশ সাফল্য অর্জন করেন তিনি। শত্রুর সিগনাল জ্যাম করা আর মেসেজের আঁটি ভেঙে শাঁস বের করার ক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট হয়ে ওঠেন রীতিমত। তাঁর জন্য ভারতীয় আর্মিকে অনেকবারই বড় রকমের বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই একই কিংবা তার চেয়ে বেশি বিপর্যয় পাক বাহিনীকেও হজম করতে হয় যশোর-নাভারন সেক্টরে।

১৯৬৮-তে পাঞ্জাবি অফিসারদের অসদাচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান আনিসুর রহমান। স্নায়ুযুদ্ধ তখন তুঙ্গে ছিল। ওই সময় ন্যাটোর বিরুদ্ধে যায়, ওয়ারশ জোটের এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিগনাল নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ইণ্টারসেপ্ট করে যথেষ্ট সাড়া ফেলে দেন তিনি।

এমনিতে রেডিও সিগনাল সাধারণভাবে ইণ্টারসেপ্ট করা কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কাজটা প্রায় অনায়াসেই করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ হলো ইণ্টারনাল, প্রি-অ্যারেঞ্জড্ ফ্রিকোয়েন্সির সিগনাল ঠেকিয়ে দেয়া বা সেগুলোকে বিভ্রান্ত করা। আনিসুর রহমান পরেরটার ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ।

এক সময় নড়ে উঠলেন রাহাত খান। বিশেষজ্ঞের মতামতের অপেক্ষা করতে গিয়ে ধৈর্য হারানোর দশা হয়েছে। 'কী হলো, আনিস ভাই?' বিরক্তি ফুটল। 'সারাদিন লাগিয়ে দেবেন নাকি?'

'কেন? সমস্যা কী?' প্রিণ্ট-আউট থেকে চোখ না তুলে সমান বিরক্ত কণ্ঠে বললেন আনিসুর রহমান। নীচের ঠোঁট কামড়ে কিছু ভাবছিলেন। 'ঘোড়ার পিঠে জিন চড়িয়ে রেখে এসেছ নাকি?'

আরেকটু হলে হেসে উঠত সোহেল, খুক করে কেশে অনেক কষ্টে সামলে নিল। রাহাত খান বিষয়টা টের পেয়ে কটমট করে তাকালেন ওর দিকে। আরও বেশ কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখ তুললেন বিশেষজ্ঞ। 'জটিল কাজ। তবে মনে হয় সম্ভব।'

'সম্ভব?' রাহাত খানের মুখের ভেতরে কোথাও একটা অদৃশ্য সার্চলাইট জ্বলে উঠল যেন।

'মনে হয়। তবে আরও কিছু পরীক্ষার দরকার আছে। সময় লাগবে। বেশ জটিল কাজ।'

'কতদিন লাগবে?' চাপা ব্যস্ততা ফুটল রাহাত খানের কণ্ঠে।

'এখনই বলা সম্ভব নয়, খান।' বন্ধুর চেহারায় কী দেখলেন কে জানে, গলার স্বর একটু নরম হলো তাঁর। 'সময় লাগবে। ভাবতে দাও আমাকে। আর হ্যাঁ, নতুন করে আরও কিছু এক্স-রে, টেস্ট ইত্যাদি দরকার হবে। আবার যেমন-তেমন জায়গায় করালে হবে না। দেখি, কাগজ দাও। আমি লিখে দিচ্ছি কী কী টেস্ট করাতে হবে।'

টেস্টগুলোর নাম লিখে রাহাত খানের দিকে এগিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। 'এই নাও। বেস্ট রেজাল্ট পেতে চাইলে এই টেস্টগুলো ব্রাসেলসের এইখানে করাতে হবে। লিখে দিয়েছি। আমি সময়মত ওদেরকে টেলিফোনে জানিয়ে দেব। ওরা সাহায্য করবে।'

চেপে রাখা দম ছাড়লেন রাহাত খান। 'থ্যাংক ইউ, আনিস ভাই। আমি সব ব্যবস্থা করছি।'

কিংস ক্রস স্টেশন। ভিড় ঠেলে গ্লাসগো, স্টার্লিং ও পার্থগামী ওভারনাইট স্লিপার ট্রেনে চড়ল সাইমন এনডিন। সেখান থেকে সংযোগ ট্রেনে ড্যানডি যাবে ডালগ্লেইশ অ্যাণ্ড ডালগ্লেইশ, অ্যাটর্নিজ অ্যাট ল-র অফিসে।

এতদিনে জীবন একটা শেপ নিতে চলেছে, ভাবছে সে তৃপ্তির সঙ্গে। এক মি-লি-য়-ন পাউণ্ড! মাই গুডনেস।

ফার্স্টক্লাস স্লিপার কম্পার্টমেন্টের ব্লাইণ্ড নামিয়ে দিল সে। ব্যস্ত-সমস্ত কিংস ক্রস স্টেশন মুছে গেল দৃষ্টিপথ থেকে। চব্বিশ ঘণ্টা, ভাবল সে। চব্বিশ ঘণ্টা পর সব ঝামেলা শেষ হয়ে যাবে। ঝাড়া হাত-পা হয়ে লণ্ডনে ফিরে আসতে পারবে সে।

ব্রিফকেসটা বালিশের নীচে রেখে শুয়ে পড়ল আইরিশ দৈত্য। সিলিঙের দিকে চোখ রেখে এক মিলিয়ন লিখতে কয়টা শূন্য লাগে, সেই হিসাব মেলাতে লাগল।

পরদিন এনডিনের মুখে অবিশ্বাস্য খবরটা শুনে এবং শেয়ার ট্রান্সফার ডিডগুলো দেখে আকাশ থেকে পড়ল লেডি ম্যাকালিস্টারের দীর্ঘদিনের আইনজীবী, বৃদ্ধ ডানকান ডালগ্লেইশ।

'খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার,' চকচকে টাকমাথাটা নাড়তে নাড়তে বলল সে। 'সত্যিই খুব অদ্ভুত।'

লেডি ম্যাকালিস্টারের স্বাক্ষর ও মিসেস বার্টনের প্রতিস্বাক্ষর করা ডিডগুলো অনেক সময় নিয়ে, অনেক সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখল সে। দেখতে দেখতে বিষণ্ন হয়ে উঠল চেহারা। এনডিন টের পেল তার দিকে লোকটা বারবার যে চোখে তাকাচ্ছে, তাতে বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই নেই।

'ইউ নো, লেডি ম্যাকালিস্টারের কাছে এর আগে অনেকেই এসেছে এইসব শেয়ার কিনে নেয়ার জন্য,' আপনমনে বলল ডালগ্লেইশ। 'প্রতিবারই তিনি আমার ফার্মের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এ নিয়ে এবং আমি প্রতিবারই তাকে স্টক বিক্রি করতে নিষেধ করেছি। কেবল এবারই... '

'মিস্টার ডালগ্লেইশ,' বাধা দিল সাইমন এনডিন। 'আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমি যাদের প্রতিনিধিত্ব করছি, তারা লেডি ম্যাকালিস্টারের স্টকের ফেস ভ্যালিউ যা, তার দুইগুণ দাম দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' নিস্তেজ গলায় বলল আইনজীবী।

'তিনি স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই ডিডে স্বাক্ষর করেছেন, এবং আমাকে পাঠিয়েছেন ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের চেক আপনার হাতে তুলে দিয়ে

শেয়ারগুলো সংগ্রহ করতে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। বিড়বিড় করে বলল, 'কাজটা করার আগে মহিলা আমার সাথে একটিবার কথা বললেন না, আমি এটা সহজভাবে মেনে নিতে পারছি না। এতগুলো বছর সব সময় তাঁর সমস্ত ফাইনানশিয়াল ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে এলাম। আজও এই স্টকের জেনারেল পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি আমার নামে আছে, জানেন?'

'কিন্তু তাই বলে লেডি ম্যাকালিস্টারের স্বাক্ষরকে অকার্যকর মনে করারও তো কোনও কারণ নেই, তাই না?' জোর দিয়ে বলল এনডিন। রেগে উঠছে।

'তা তো বটেই! তা তো বটেই!' ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল বৃদ্ধ। 'আমার পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি স্বয়ং লেডি ম্যাকালিস্টারের স্বাক্ষরকে অকার্যকর করে কীভাবে?'

চেপে রাখা দম ছাড়ল আইরিশ। 'তা হলে দয়া করে শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো দিয়ে দিন। আমাকে এখনই লণ্ডনে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে।'

ধীরেসুস্থে উঠল বৃদ্ধ বার অ্যাট-ল। 'উড ইউ এক্সকিউজ মি, মিস্টার এনডিন।'

পাশের ছোটো একটা রুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল সে। লণ্ডনে ফোন করতে গেছে বৃদ্ধ, জানে এনডিন। লেডি ম্যাকালিস্টারের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হতে গেছে। মিসেস বার্টন যেন জায়গামত উপস্থিত থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করল যুবক—যেন বুড়ির হিয়ারিং এইডটা গোলমাল করে এবং মিসেস বার্টনকে তার হয়ে কথা বলতে হয় ডালগ্লেইশের সঙ্গে।

আধ ঘণ্টা পর বন্ধ রুম থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ। পরাজিত সৈনিকের মত হতাশ চেহারা হয়েছে। অনেকগুলো শেয়ার সার্টিফিকেটের বড় একটা বাণ্ডিল এনডিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল। প্রায় নেতিয়ে গেছে কাগজগুলো। রং চটে গেছে। তবে দেখলে বোঝা যায় কোনওকালে গোলাপি ছিল ওগুলো।

'এই নিন। এত বছর সামলে রেখেছি তো, তাই কারও হাতে তুলে দেয়ার আগে লেডি ম্যাকালিস্টারের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নেয়াটা জরুরি মনে হয়েছিল। আপনি বুঝবেন আশা করি।' সার্টিফিকেটগুলো এমনভাবে তার হাতে তুলে দিল বৃদ্ধ, যেন ওগুলো তার অস্তিত্বেরই একটা অংশ।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' লোকটার সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে ফুরফুরে মেজাজে বেরিয়ে এল সে।

এক ঘণ্টা পর, অ্যাংগাস কাউণ্টির বুক ভেদ করে লণ্ডনের দিকে ছুটে চলল তার ফিরতি ট্রেন। জানালায় বসে প্রকৃতির শোভা দেখছে সাইমন এনডিন।

আজ চারদিকের সবকিছুই তার চোখে রঙিন লাগছে।

দুই

প্যারিসে এসে প্লাজা সুরেনে হোটেলে উঠল রানা। শাওয়ার শেভ সেরে ডিনারের জন্য তৈরি হওয়ার ফাঁকে দুটো পারসন-টু-পারসন কল বুক করল। প্রথম পারসন মার্সেইয়ের মঁশিয়ে ফ্রান্সিস ওরফে আতাসি। দ্বিতীয় পারসন লণ্ডনের মিস মায়েদা ওরফে ফায়জা। আতাসিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল।

'শিপিং এজেন্ট পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, বস। তুলোঁয় ভাল একটা এজেন্ট পেয়েছি,' আতাসি বলল। 'খুব ভালো এজেন্ট। ওখানকার পোর্টে নিজেদের বণ্ডেড ওয়্যারহাউসও আছে।'

হোটেলের নোট প্যাড আর কলম নিয়ে তৈরি হলো রানা। 'নাম বলো।'

'এজেন্সি মেরিটাইম ডুফট,' বানান করে বলল লেফটেন্যাণ্ট। তারপর ঠিকানাটা বলল। 'কনসাইনমেণ্ট এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। গায়ে লিখে দিয়োঃ মঁশিয়ে ফ্রান্সিসের সম্পত্তি।'

'ঠিক আছে।' রানা রিসিভার রাখতে না রাখতে হোটেল অপারেটর জানাল লণ্ডনে মিস মায়েদা লাইনে আছেন।

ফোন তুলল ও। 'একটা নাম-ঠিকানা বলছি। লিখে নাও।' আতাসির দেয়া নাম-ঠিকানা বানান করে বলে গেল ও। ফায়জা ওরফে মিস মায়েদা লিখে নিল।

'প্রথম চারটে ক্রেট আমি রেডি করে ফেলেছি,' ফায়জা বলল। 'লণ্ডন এজেণ্টকে বলছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে।'

'বলে দাও। আর কিছু?'

'বুট খুঁজে পেয়েছি।'

'গুড। ওয়েল ডান।'

আরেকটা কল বুক করল মাসুদ রানা। এটা বেলজিয়ামের অসটেণ্ডে। পনেরো মিনিট পর সাড়া পাওয়া গেল মার্সিয়া ওরফে সেনিয়রিটা সিলভিও গোনজালিসের।

'আমি প্যারিসে আছি,' রানা বলল। 'সেই লোক দেখা করতে রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' মার্সিয়া বলল।

'স্যাম্পল নিয়ে আসতে বলেছ?'

'অবশ্যই!'

'গুড,' আশ্বস্ত হলো ও। 'আমি আসছি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অথবা শুক্রবার সকালে ব্রাসেলসে পৌঁছব আশা করছি। তাকে বোলো, শুক্রবার হলিডে ইন হোটেলে আমরা তিনজন একসঙ্গে নাস্তা করব। ওকে? হলিডে ইন এয়ারপোর্টের কাছে।'

'আমি চিনি,' মার্সিয়া বলল। 'ঠিক আছে। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে

তোমাকে কনফার্ম করছি।'

'ভেরি গুড।'

আবারও রিসিভার রাখতে না রাখতে রিং বেজে উঠল। 'ইয়েস?'

'মঁশিয়ে,' রিসেপশনিস্ট বলল। 'বেনি ল্যাম্বার্ট নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'আমার রুমে পাঠিয়ে দিন, প্লিজ। মার্সি।'

'রাইট, মঁশিয়ে।'

দু'মিনিট পর মৃদু নক হলো দরজায়। রানা খুলল দরজা। মানুষটা ছোটোখাটো। ওকে দেখে কৃতার্থ চেহারা করে হাসল। 'কাগজটা দিতে এসেছি।'

'কাগজ?' না বোঝার ভান করল ও।

'হের জোহান শ্লিংকার পাঠিয়েছেন।'

'কাম ইন, প্লিজ।'

ভেতরে চলে এল লোকটা। কোটের পকেট থেকে একটা লম্বা খাম বের করল। দুটো সুন্দর, মসৃণ প্যাডের কাগজ বের হলো খাম থেকে। দু'টোতে একই ক্রেস্টের ছাপ। প্যারিসের রিপাবলিক অভ টোগোর রাষ্ট্রদূতের লেটারহেড।

একটা লেটারহেড ব্ল্যাংক। নীচে এমব্যাসির সিল ও স্বাক্ষর ছাড়া কিছু নেই। দ্বিতীয়টা চিঠি। সেটার নীচেও সিল এবং স্বাক্ষর আছে। চিঠির লেখক লিখেছে : বাহককে তার সরকার ... জন্য নিয়োগ করেছে ... সরকারের কাছ থেকে ... সংযুক্ত শিটে উল্লেখ করা সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করার জন্য আবেদন জানাতে।

চিঠির শেষে এই মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে : এসব অস্ত্র সম্পূর্ণরূপে রিপাবলিক অভ টোগোর সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনে ব্যবহার হবে। তৃতীয় কোনও পক্ষকে দেয়া হবে না বা কারও কাছে বিক্রি করা হবে না।

মাথা ঝাঁকাল রানা। অ্যালান বেকারের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেল বাকি কাজটা। এটায় নিজের নাম বসিয়ে দিয়ে টোগোর অথরাইজড এজেন্ট হয়ে কাজটা অনায়াসে সেরে ফেলতে পারবে সে। কাগজগুলো খামে ভরে রাখল রানা। ব্রিফকেস থেকে একটা মুখবন্ধ খাম বের করে এগিয়ে দিল বেনি ল্যাম্বার্টের দিকে।

'হের শ্লিংকারকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বিগলিত হয়ে গেল লোকটা।

তাকে নীচের লবিতে বিদায় জানল রানা। ডিনার সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে আরও একটা কল বুক করল—লাক্সেমবার্গের ল্যাং অ্যাণ্ড স্টাইন-এর মিস্টার এমিল স্টাইনকে।

'আহ্! হ্যালো, মিস্টার ব্রাউন।'

'আমার টাইটানিক হোল্ডিংস লিমিটেডের মিটিং কখন করতে চান, সেটা জানতে ফোন করেছি।'

'আমার তরফ থেকে কোনও অসুবিধে নেই, সার। আমি রেডি। আপনি যখন বলবেন, তখনই আয়োজন করব।'

'আগামীকাল দুপুরের পর হলে কেমন হয়?'

'পারফেক্ট।'

মিটিঙের সময় পরদিন, বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটায় নির্ধারিত হলো। আলাপ সেরে রানা হোটেলকে নির্দেশ দিল, পরদিন সকাল দশটার প্যারিস-লাক্সেমবার্গ এক্সপ্রেস ট্রেনে ওর জন্য একটা ফার্স্ট ক্লাস সিট বুক করে রাখতে।

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল রানা। পরমুহূর্তে থমকে গেল। চোখ পিটপিট করে উঠল। অস্বস্তি লাগছে। ডান হাতটা কাঁপতে শুরু করে দিল। ব্যথা নেই, জ্বালা-যন্ত্রণা নেই, কিচ্ছু না। থর থর করে কাঁপছে শুধু। সেই পরিচিত লক্ষণ! ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল ব্যাপারটা।

গুন্থার! রাগে দাঁতে দাঁত চাপল ও। হারামজাদা...

কাঁপুনি থামানোর আপ্রাণ চেষ্টা করল রানা, কিন্তু লাভ হলো না। কী করবে দিশা করে উঠতে পারছে না, এমন সময় থেমে গেল কাঁপুনি। যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে। এক মিনিটও পার হয়নি, এল দ্বিতীয় ধাক্কা।

কনুইয়ের কাছটা গরম হয়ে উঠতে শুরু করল, তারপর ওপরে ও নীচের দিকে সমান গতিতে উত্তাপ ছড়াতে লাগল। হাতের আঙুল থেকে কাঁধ পর্যন্ত গরম হয়ে উঠল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত। বাড়তে বাড়তে অসহ্য হয়ে উঠল গরম।

কপালে ঘাম ফুটল ওর। অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে আসতে চাইছে বুকের ভেতর থেকে। দেখতে দেখতে নাক-মুখ ঘামে ভিজে উঠল। চুলের গোড়া বেয়ে অজস্র মোটা ধারায় গড়িয়ে নামতে লাগল স্রোতের মতো। বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসছে গোঙানি। প্রাণপণে ঠেকাতে চেষ্টা করল ও, পারল না।

ঘামে গোসল হয়ে উঠল রানা। গোঙানি বাড়ছে, চিৎকারে পরিণত হতে যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ করে স্বাভাবিক হয়ে এলো হাতটা। এতই দ্রুত যে বিশ্বাসই হতে চাইল না। কপালের ঘাম মুছে চুপ করে বসে থাকল রানা। একভাবে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে। স্থির, অনড়। মনে মনে পুনরাবৃত্তি করল ও প্রতিজ্ঞাটা।

রানার জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছিল লাক্সেমবার্গে। নতুন একটা কোম্পানি ফ্লোট করতে যত সময় লাগবে ভেবেছিল, আসল সময়ে তার সিকি ভাগও লাগল না দেখে মনে মনে বেশ তাজ্জব হলো রানা। আসলে আনুষ্ঠানিকতা বলতে যেটুকু ছিল, শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল।

সাদাচুলো এমিল স্টাইন এবং একজন জুনিয়র পার্টনার ভেতরের অফিসে ওর অপেক্ষায় ছিল। একদিকের দেয়ালঘেঁষে তিনজন সেক্রেটারি বসা। রানা ঠিকমত বসতে না বসতেই হয়ে গেল। প্রয়োজনীয় টাকা নগদে পরিশোধ করল স্টাইন। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক হাজার শেয়ার ইসু করা হলো। উপস্থিত সবাই একটা করে শেয়ার নিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে আবার স্টাইনের

কাছে ফিরিয়ে দিল। সে ওগুলো তুলে রাখল সেফে।

রানা নিল নিজের ভাগের বাকি ৯৯৪টা শেয়ার—সিঙ্গেল ইউনিট শিটে। ওটা রিসিভ করে ব্রিফকেসে ভরল। আর্টিকেলস অ্যাণ্ড মেমোরেণ্ডাম অভ অ্যাসোসিয়েশনে স্বাক্ষর করল চেয়ারম্যান ও কোম্পানি সেক্রেটারিরা। ওগুলোর কপি পরে ফাইল করার জন্য পাঠানো হবে আর্চডাচি অফ লাক্সেমবার্গের রেজিস্ট্রার অভ কোম্পানিজ-এ।

কাজ সেরে তিন সেক্রেটারি যে যার কাজে চলে গেল। বোর্ডের তিন ডিরেক্টর মিটিঙে বসে কোম্পানির ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের প্রশ্নে একমত হলো। একটা শিটে মাইনিউট লেখা হলো, এক সেক্রেটারি পড়ে শোনাল সেটা। চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করল। চোখ মেলে তাকাল টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ।

বাকি দুই ডিরেক্টর মিস্টার ব্রাউনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিদায় নিল। এমিল স্টাইন দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল রানাকে।

এয়ারপোর্টের দিকে চলল রানা। দু' ঘণ্টা পর ব্রাসেলসের ফ্লাইট ধরল। হোটেল হলিডে ইনে যখন চেক ইন করল, তখন আটটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি।

কথামত পরদিন শুক্রবার সকাল আটটায় লোকটাকে নিয়ে এল মার্সিয়া। নাম মঁশিয়ে বাউচার। মার্সিয়ার চেয়ে কম করেও ছয় ইঞ্চি খাটো। তবে চওড়ায় ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখানোর উপযুক্ত, মাশাল্লাহ্। কোমর বরাবর এতই মোটা যে দেহটা প্রায় তরমুজের মত আকৃতি পেয়েছে। মাথা ছোটো, খোসা ছাড়ানো নারকেল সাইজের। কাঁধের চর্বি আর মাংসের মধ্যে ওটাকে জোর করে গুঁজে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন।

মানুষের চোয়ালে এত চর্বি জমতে পারে, এই লোকটাকে না দেখলে বিশ্বাস করত না রানা। দুই চোয়ালের চর্বি ঝুলে আছে বাউচারের, কাঁধের ওপর দলা হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। টকটকে লাল চেহারা তার। বয়স ষাটের কম হবে না। সারাক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে। হাতে কালো ব্রিফকেস।

খোলা দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে যে কারও মনে হবে এই বুঝি পড়ল। একটু নড়লেই দেহের সর্বত্র চর্বি থলথল করে। চকচকে পলিশড় বুট পরা খাটো পাদুটো খাড়া রেখেছে মাংস-চর্বির পাহাড়টাকে। তবে বুট একজোড়া হলেও পা প্রথমে সিঙ্গেল ইউনিটই মনে হয়েছিল রানার।

দুটো এমনভাবে মিশে আছে যেন মাঝখানে কোনও ফাঁক-টাক নেই। না, আছে। সামান্য নড়ে উঠে রানার ভুলটা ধরিয়ে দিল সে। এই দেহ নিয়ে ব্যাটা হাঁটে কী করে ভেবে পেল না ও।

দু' পা পিছাল বিস্মিত রানা। 'কাম ইন, প্লিজ।'

পা বাড়াল লোকটা। দরজা দিয়ে ঢোকার সময় সামান্য কাত হয়ে ঢুকতে হলো। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ঠোঁট টিপে হাসল মার্সিয়া। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল। হ্যাণ্ডশেকের জন্য লোকটার হাত ধরে রানার মনে হলো বাতাস ভরা শক্ত আবরণের বেলুন ধরেছে বুঝি। লোকটাকে একটা আর্মচেয়ার দেখাল রানা।

কিন্তু তরমুজ সেদিকে না গিয়ে খাটের কিনারায় বসার সিদ্ধান্ত নিল। বুদ্ধি আছে। আর্মচেয়ারের সাইজ দেখে মনে বোধহয় সন্দেহ জেগেছে, ওটায় বসতে গেলে আটকা পড়বে।

সুইটে বসেই নাস্তা খেয়ে নিল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে মার্সিয়ার সঙ্গে দ্রুত কিছু আলোচনা সেরে নিল রানা। তারপর কফি খেতে খেতে ক্রেতা-বিক্রেতার আলাপ শুরু হলো।

'মঁশিয়ে বাউচার, আমি একদল ইওরোপিয়ান ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হিসেবে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি,' ইঙ্গিতে মার্সিয়াকে দেখাল। 'আমার সহকর্মী বলেছে নিশ্চয়ই।'

নারকেল দোলাল বাউচার—বলেছে।

'আপনার কাছে ব্র্যাণ্ড নিউ স্মাইজার নাইন এমএম মেশিন পিস্তলের স্টক আছে শুনেছি। বৈধ কাগজপত্র নেই।'

নীরবে নারকেল দোলাল সে আবার।

'আমার বন্ধুরা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার স্টক থেকে কিছু সাবমেশিন কারবাইন অথবা মেশিন পিস্তল কিনতে আগ্রহী। আমরা সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে কিনব। আপনি শুধু আমাদের হাতে জিনিসগুলো তুলে দেবেন। তারপরের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের।' একটু বিরতি দিল ও। 'সম্ভব?'

'কতগুলো?'

'একশ' আপাতত। পরে আরও দরকার হতে পারে।' প্রথমে দুশো কেনার ইচ্ছা ছিল রানার। কিন্তু বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা থেকে বাঁচতে আপাতত একশই কিনবে বলে ঠিক করেছে।

মাথা দোলাল সে। 'সম্ভব, মনে হয়,' সতর্কতার সঙ্গে বলল। 'আমার কাগজপত্র না থাকলেও জিনিস কিন্তু ফাসক্লাস, ঝকঝকে। এখনও গ্রিজপেপার খোলা হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার।'

'আপনার হাতে এলো কীভাবে, বলবেন না নিশ্চয়ই?'

নাক টানল লোকটা। 'আমার বাবার হাত হয়ে।'

'আই সি,' বলল রানা। কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ সরিয়ে রাখল সামনে থেকে। মুখের কোণ মুছল। 'ওগুলো কীভাবে পেতে পারি তা হলে?'

'প্রথম শর্ত আমার এবং আমার লোকজনের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।'

গুল মেরো না, বাপ!—মনে মনে বলল রানা। তোমার 'লোকজন' বলে কেউ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। মার্সিয়ার সঙ্গে দ্রুত চোখাচোখি হলো ওর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাউচারের বাবা ছিল দখলদার জার্মান বাহিনীর বাবুর্চি। বেলজিয়ামের দুর্গ শহর নামে খ্যাত নামুর-এর এসএস ব্যারাকের কুক। খাবার-দাবারের প্রতি অতিমাত্রায় আকর্ষণ ছিল বলে আগেও এই কাজই করত সে। জার্মান বাহিনী বেলজিয়াম দখল করে জায়গায় জায়গায় ঘাঁটি বসালে তারই এক ব্যারাকে জয়েন করে সে। সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকায় চাকরি পেতে কোনও

অসুবিধা হয়নি।

ওরকম পেটুক খুব কমই দেখা যায়। সারাদিন মুখ চলত মানুষটার। এসএস সদস্যদের হাসি-ঠাট্টার পাত্র ছিল। তার প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই বলত : কার কথা বলছ, ওই যে, যার চার আঙুল কপাল বাদে সবটাই পেট?

হ্যাচের মধ্য দিয়ে যত খাবার সে সৈন্যদের সরবরাহ করত, একেকসময় রান্না কেমন হলো চেখে দেখতে গিয়ে তার চাইতে বেশি নিজেই খেয়ে সাবাড় করত। এ জন্য যুদ্ধের সময় বেশ কয়েকবার সাজা ভোগ করতে হয়েছে বাউচারের বাবাকে। চাকরি চলে যাওয়ার মত অবস্থাও হয়েছে একাধিকবার।

ছেলে বাউচারও হয়েছে বাবারই ডুপ্লিকেট। ঘুম থেকে উঠে আবার বিছানায় না যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ মুখ চলতেই থাকে। ফলে ফিগারও কারও কথা না শুনে ইচ্ছেমত আকৃতি নিয়েছে।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি নাগাদ যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠতে জার্মান বাহিনী নামুর ঘাঁটি গুটিয়ে ফ্রন্টিয়ারের দিকে যাত্রা করে। সে সময় তাদের গাড়ি বহরে পেট ভর্তি স্মাইজারসহ একটা লরিও ছিল। কয়েকদিন একনাগাড়ে চলার পর এক সময় অজায়গায় নষ্ট হয়ে যায় লরিটা।

ওই হুড়োহুড়ির মুহূর্তে ওটাকে সারানোর মত সময় ছিল না। তাই স্মাইজারগুলো কাছের একটা পুরনো বাংকারে রেখে বাংকারের মুখ ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দিয়েছিল এসএস। পুরোপুরি বুজে যায় সেটা।

বাউচারের বাবার চোখে পড়ে ব্যাপারটা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার বেশ কয়েক বছর পর ওই এলাকা ঘুরে দেখতে আসে সে। বাংকার যেখানে ছিল, সেখানটা আগের মতই আছে দেখে আশা জাগে তার মনে। একদিন গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে দেখে জায়গামতই আছে সবকিছু। জিনিসগুলো বিক্রি করার অনেক চেষ্টা করেছে লোকটা, কিন্তু পার্টির অভাবে সম্ভব হয়নি।

মৃত্যুর আগে ছেলে বাউচারকে অস্ত্রগুলোর কথা জানিয়ে গিয়েছিল লোকটা। সে পরে আরেক নিরাপদ জায়গায়, তাদের কান্ট্রি কটেজে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওগুলো। কটেজের গ্যারাজের মেঝে নিজের হাতে খুঁড়ে একটা গোপন ফ্লোর বানিয়ে সেখানে রেখেছে। নতুন আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে যাওয়ার জন্য একটা ট্র্যাপ-ডোরও বানিয়ে নিয়েছে।

কয়েক দফায় এ পর্যন্ত শ' পাঁচেকের মত স্মাইজার বিক্রি করতে পেরেছে সে। আরও পাঁচশ' আছে স্টকে।

'আর পেমেন্ট হতে হবে একশ' ভাগ নগদ,' বলল লোকটা।

'তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না, মঁশিয়ে বাউচার।' মোটুকে আশ্বস্ত করল রানা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন। জিনিসগুলোর কণ্ডিশন যদি আপনার কথামত ভাল হয়ে থাকে, তা হলে আমি নগদ পেমেন্ট দিয়েই কিনব এবং নিজেদের গরজেই আমরা বিষয়টা গোপন রাখব।'

'কণ্ডিশনের ব্যাপারে আমার একটা কথাই বলার আছে। ওগুলো ব্র্যাণ্ড নিউ... মানে, ব্যবহার করা হয়নি। মেকারের গ্রিজ তার সাক্ষ্য দেবে। গ্রিজপ্রুফ র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়া আছে। সিল আনব্রোকেন। ওই সময় কারখানা

থেকে যেমন বেরিয়েছিল, তেমনি আছে। এবং পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত পদের তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে সম্ভবত ফাইনেস্ট মেশিন পিস্তল ওগুলো।'

স্মাইজার নাইন এমএম সম্পর্কে খুব ভালো জানা আছে রানার, কারও লেকচারের দরকার নেই। ইজরাইলের উজি মেশিন পিস্তলও মন্দ নয়, তবে এর তুলনায় বেশ ভারী ওটা। স্টেনের চেয়েও ভাল জার্মান স্মাইজার। প্রায় ব্রিটিশদের আধুনিক স্টার্লিঙের সমমানের। আমেরিকান গ্রিজ-গান এবং রাশান বা চাইনিজ বারপ্-গানের চেয়ে একশ' মাইল এগিয়ে।

'পরখ করে দেখতে পারি?'

পাশে রাখা কালো ব্রিফকেসটা টেনে নিয়ে কোলের ওপর রাখল বাউচার। হাঁপাচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে। কম্বিনেশন তালা আনলক করে ক্যাচ খুলল, তারপর ডালা তুলে কেসটা ঘুরিয়ে ধরল রানার দিকে। বসা থেকে ওঠার কোনও লক্ষণ নেই তার মধ্যে। কাজেই রানাকে উঠতে হলো।

কেস থেকে অস্ত্রটা বের করে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল ও। ওটার মসৃণ, ব্লু-ব্ল্যাক দেহে আলতো করে হাত বোলাতে একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি হলো। ওটার ওজন অনুভব করল পিস্তল-গ্রিপ ধরে কয়েকবার দুলিয়ে। ফোল্ডিং স্টক পুল করল রানা, লক করল। ব্রিচ মেকানিজম পরীক্ষা করে দেখল কয়েকবার। সবশেষে এক চোখ বুজে ফোরসাইটের দিক থেকে ব্যারেলের ভেতরটায় তীক্ষ্ণ নজর বোলাল। কোথাও একটা আঁচড়ও নেই।

একটা গুলিও ছোঁড়া হয়নি এটা দিয়ে।

'এটা স্যাম্পল মডেল,' বাউচার বলল। 'এজন্য মেকার'স গ্রিজ নেই। শুধু খানিকটা তেল আছে।'

জিনিসটা ফিরিয়ে দিল রানা।

'স্ট্যাণ্ডার্ড নাইন এমএম অ্যামো দিয়েও স্মাইজার চালাতে পারবেন,' বাউচার বলল। 'সবখানে পাবেন ওই অ্যামো।'

'জানি, ধন্যবাদ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু ম্যাগাজিনের কী হবে? ওগুলো তো যেখানে-সেখানে পাওয়া যাবে না।'

'আমি প্রতিটার সাথে পাঁচটা করে দেব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

প্রতিটা মেশিন পিস্তলের জন্য ২২৫ ডলার চাইল বাউচার। মার্সিয়া প্রতিবাদ করল। মনে করিয়ে দিল তার কাছে প্রতিটা একশ ডলার করে বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিল সে। লোকটা জবাব দিল, সে কয়েক বছর আগের কথা। এখন সেই দামে দেয়া সম্ভব নয়।

তর্ক না বাড়িয়ে রাজি হয়ে গেল রানা। ঠিক হলো, পরের বুধবার সন্ধ্যার পর ওগুলো রানার হাতে তুলে দেবে বাউচার। বিশেষ একটা জায়গা থেকে।

নীচের লবিতে এসে লোকটাকে বিদায় জানাল ওরা। তারপর কফির অর্ডার দিয়ে লাউঞ্জে বসল আলোচনা করতে। 'বুধবারের মধ্যে একটা মাঝারি সাইজের কাভার্ড ভ্যান কিনতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'ফলস নাম্বার প্লেট আর একটা ফলস টেইল বোর্ড তৈরি করতে হবে ওটার জন্য। আর... পাঁচ-ছয় বস্তা

আলু কিনে রাখতে হবে।'

মার্সিয়া বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছে দেখে রানা গাড়ি আর আলুর ব্যাপারটা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করল।

'একটা লক-আপ গ্যারাজও ভাড়া নিতে হবে। খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এখানে এ ধরনের গ্যারাজ প্রচুর আছে। কমার্শিয়াল এরিয়ায়, রেসিডেনশিয়াল এরিয়ায়, সবখানে।'

ভুরু কোঁচকাল মার্সিয়া। 'কারণ?'

'প্রতিদিন অনেক চাকরিজীবী দূর দূর থেকে ব্রাসেলসে আসে অফিস করতে,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রানা। 'কমিউটার প্যাসেঞ্জার। সকালে আসে, আবার সন্ধ্যায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ ট্রেনে এলেও অনেকে গাড়িতেও আসে। কিন্তু কমার্শিয়াল এলাকায় বেশি গাড়ি রাখার জায়গা নেই, তাই গ্যারাজ ব্যবসা এখানে রমরমা। ভাড়া গ্যারাজে গাড়ি রেখে অফিস করে লোকে। রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতেও প্রচুর গ্যারাজ আছে। একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। তবে, জায়গাটা নিরিবিলি হতে হবে। কাজের সময় উঁকি দেয়ার কেউ যাতে না থাকে।' একটু ভাবল রানা।

'পরেরগুলোর ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারব। তবে গাড়ির ব্যবস্থা হয়তো তোমাকে একাই করতে হবে।'

এরপর বাউচারের মালের চালান কীভাবে গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে এক ঘণ্টা ধরে বিস্তারিত আলোচনা করল রানা। বুঝিয়ে দিল কীভাবে কী করবে বলে ঠিক করেছে।

মার্সিয়াকে বিদায় দিয়ে ডেস্ক ক্লার্ককে বিল রেডি করতে বলল রানা। সুইটে ফিরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল। টেলিফোনে সন্ধ্যার লণ্ডন ফ্লাইটে নিজের সিট বুক করে ব্রাগের ক্রেডিয়েটব্যাংকের উদ্দেশে ছুটল। কিন্তু গুজেনসকে মিস করল অল্পের জন্য। লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গেছে লোকটা। রানাও মেইন স্কয়ারের ছোটো একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিল।

আড়াইটায় ব্যাংকে ফিরে এল ও আবার। গুজেনসের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে জোহান শ্লিংকারের নামে ২ লাখ ৬৩ হাজার ডলারের একটা ব্যাংকার'স চেক তুলল। গত সপ্তাহে অর্ডার দিয়ে যাওয়া মালের দাম ২ লাখ ৬০ হাজার ডলার। বাকি ৩ হাজারের ২ হাজার টোগোলিজ এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট জোগাড় করে দেয়ার জন্য এবং ১ হাজার বেনি ল্যাম্বার্টের প্লেন ভাড়া।

এ জন্য লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিল রানা। ব্যাংকার'স চেক আর সেই চিঠিটা খামে ভরল। চিঠিতে আতাসির দেয়া তুঁলোর শিপিং এজেন্টের নাম আর ঠিকানাও আছে। সব ভরে খামটা সিল করল।

এরপর ২ লাখ ৪০ হাজার ৪শ ডলারের আরেকটা ব্যাংকার'স চেক তুলল অ্যালান বেকারের নামে। একজোড়া মর্টার, একজোড়া বাজুকা, ওগুলোর বেস-প্লেট, সাইটিং মেকানিজম এবং চল্লিশটা বাজুকা রকেট ও তিনশ মর্টার বোমার দাম।

তাকেও একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখেছিল রানা। চেকটার সঙ্গে বেনি ল্যাম্বার্টের

দিয়ে যাওয়া রিপাবলিক অভ টোগোর এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট এবং ব্ল্যাংক লেটার হেডটা অপর এক খামে ভরে সেটাও সিল করল।

তারপর ক্রেডিয়েটব্যাংকের ফরেন অ্যাকাউন্টস সেকশন চিফ গুজেনসের মনে আরও অজস্র প্রশ্নের জন্ম দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। চিঠি দুটো ব্রাগ পোস্ট অফিস থেকে এক্সপ্রেস রেটে রেজিস্ট্রি করে ব্রাসেলস ফিরে চলল।

পরেরদিনটা লক-আপ গ্যারাজ ভাড়া করা এবং জরুরি কিছু কেনাকাটার পিছনে ব্যয় করল রানা। গ্যারাজ খুঁজে পেতে সময় লাগল না তেমন। দুপুরের আগেই শহর কেন্দ্রের কিছুটা বাইরে একটা পেয়ে গেল। ঠিক যেরকম পরিবেশে খুঁজছিল, সেই রকম।

লাঞ্চের পর মার্সিয়াকে নিয়ে বন্দর এলাকায় এল। জাহাজের ব্যবহৃত মালামাল বিক্রি করে, এমন এক দোকান থেকে পাঁচটা খালি তেলের ব্যারেল কিনে সেখানকারই এক মেশিন-শপে সতর্কতার সঙ্গে কিছু কাজ করাল ওগুলোর। তারপর সেসব মার্সিয়ার লক-আপ গ্যারাজে পৌঁছে দিয়ে রাতের শেষ ফ্লাইটে ব্রাসেলস ছাড়ল ও।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে হ্যারিসের আনট্রেসেবল নাম্বারে নিজের ফিরে আসার মেসেজ দিয়ে রাখল রানা। বাকি বিল্লাহ্‌র চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়। আবার কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে। এরকম একটা বিপদ যতক্ষণ সঙ্গে আছে, ততক্ষণ ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করা সত্যিই কঠিন।

এরমধ্যে দু'বার কথা হয়েছে ওদের। বিল্লাহ্‌ই করেছিল ফোন। ওটা কোনও প্রবলেম করছে কী না জানতে চেয়েছে। বলেছে, জিনিসটার নেচার আবিষ্কার করার জন্য দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছে সে। খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে, যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। আরও কয়েকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ আছে সঙ্গে। প্রত্যেকে ব্যাপারটাকে তাদের ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। অতএব রানার চিন্তার কোনও কারণ নেই। অল্পদিনের মধ্যেই রানার নির্দেশমত একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

তার কথাবার্তায় মনে হয়েছে জিনিসটা নিয়ে রানা যতটা না চিন্তিত, বিল্লাহ্‌ তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন। তাই অনেকটাই নিশ্চিন্তে আছে রানা। তবু, এভাবে কতদিন চলা যায়!

যেখানে চিপটা বসানো হয়েছে, সেখানকার চামড়ায় আলতো করে হাত বোলাল ও। শক্ত হয়ে আছে জায়গাটা। আর কোনও অনুভূতি নেই। সেদিনকার শকের কথা ভাবল। মনের পর্দায় গুন্থারের চেহারা ভেসে উঠতে দাঁতে দাঁত চাপল ও। বিড়বিড় করে কিছু বলল নিচু গলায়।

•

শনিবার সকালে স্পেনের দক্ষিণের পোর্ট সিটি মালাগা থেকে একটা এক্সপ্রেস মেইল এল রানার নামে। পাঠিয়েছে মিশ্রি খান। লিখেছে: একটা বোট খুঁজে পেয়েছে। কনভার্টেড মোটর ফিশিং ভেসেল, লিভারপুলের এক নামকরা শিপ বিল্ডিং ফ্যাক্টরিতে তৈরি। মালিক ব্রিটিশ। লণ্ডনে রেজিস্টার্ড। চলে ব্রিটিশ ফ্ল্যাগে।

দৈর্ঘ্য নব্বই ফুট, ধারণ ক্ষমতা আশি টন। অ্যামিডশিপে বড়ো সেণ্ট্রাল হোল্ড আছে, আফট ডেকে আছে ছোটো আরেকটা হোল্ড। প্রাইভেট ইয়ট ক্লাসের ভেসেল, তবে প্রয়োজনে ওটাকে কোস্টার হিসেবেও রি-রেজিস্ট্রেশন করানো সম্ভব।

আরও জানিয়েছে সে, মালিক এক দাম ৬০ হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করবে ভেসেলটা। কর্মচারী মোট চারজন।

ভেসেলটার নাম এম. ওয়াই. আলব্যাট্রস।

মালাগা প্যালাসিও হোটেলে আছে মিশ্রি খান। আসার আগে রানা যেন তাকে অ্যারাইভেল টাইম আর ফ্লাইট নাম্বার জানায়।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ফোন করল রানা। সোমবার সকালের মালাগা ফ্লাইটের একটা সিট বুক করে অ্যারাইভেল টাইম আর ফ্লাইট নাম্বার জানিয়ে দিল মিশ্রি খানকে।

বিকেলে ওয়াল্টার হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিন এল দেখা করতে। কথায় কথায় জেনে নিল রানার প্রস্তুতি কোন পর্যায়ে রয়েছে এখন। কোনও সাহায্য দরকার কি না। প্রয়োজনীয় লোকবল, জিনিসপত্র জোগাড়ের কাজ কতদূর ইত্যাদি। এর বেশি জানার আগ্রহ দেখা গেল না লোকটার মধ্যে।

ব্যাপার টের পেয়ে মনে মনে হাসল রানা। খুঁটির জোরের কারণে প্রথম সাক্ষাতের দিনই ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে বৈরী ভাব দেখিয়েছিল ব্যাটা। পরে যখন রানা জানতে পারল মানুষটা রুডলফ গুন্থারের ডানহাত, এবং উদ্দেশ্য যা-ই হোক, গুন্থারই রয়েছে এসবের পিছনে, তখন থেকেই এই যন্ত্রণাটাকে কীভাবে দূরে সরিয়ে রাখা যায় তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল।

উপায় আবিষ্কার করতে বেশি সময় লাগেনি। জাংগারো থেকে ঘুরে এসে 'কনসোর্টিয়ামের জ্ঞাতার্থে' জমা দেয়া রিপোর্টে বুদ্ধি করে কমাণ্ডারের একা কাজ করার স্বাধীনতার ওপরে লেখা বিবৃতিতে কিছু কিছু ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে ও, যাতে ওর অতি আগ্রহের পথে স্বয়ং গুন্থারই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মার্টিন যেন বেশি উৎসাহ দেখাতে না পারে, কিছুতেই ঘাড়ে চেপে বসতে না পারে।

ওর সে চেষ্টা যে সফল হয়েছে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। রানার রিপোর্ট পড়ে লোকটার অবাধ বিচরণক্ষেত্রে বেড়া তুলে সীমিত করে দিয়েছে গুন্থার। অবশ্য একটা বিষয়ে উদ্বিগ্ন মনে হলো মার্টিনকে—রানার বেঁধে দেয়া সময়েই মিশন সফল হবে কি না। উদ্বেগের কারণ বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

তিন

ক্লারেন্স। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে। লাঞ্চ সেরে অলস পায়ে সামনের খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়াল গোমেজ। চোখমুখ কুঁচকে সামনে তাকাল। গত

কয়েকদিন থেকে অসহনীয় গরম পড়েছে। স্রেফ ভাজা ভাজা হচ্ছে সবকিছু। উত্তাপের অদৃশ্য, কাঁপা কাঁপা ধোঁয়া উঠছে চারদিক থেকে। রাস্তা-ঘাট একেবারে ফাঁকা।

মানুষজন বা কর্মতৎপরতা, কোথাও কিছু চোখে পড়ে না। জাংগারানরা এমনিতেই মহাঅলস জাতি। তার উপর এই গরমে সে প্রবণতা আরও বেড়ে গেছে। গত ক'দিন থেকে পারতপক্ষে বাইরে আসছে না কেউ। এমনকি তার ফাই-ফরমাশ খাটত যে মতুবা, সেই ছেলেটাও গত দু'তিনদিন আসছে না। ও এলে গল্প করেও কিছু সময় কাটত তার।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গোমেজ। সিগারেট ধরিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিল কাছে। কাজকর্মের তাড়া নেই, তাই সামনের রেইলিঙে পা তুলে আয়েশ করে বসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। সাগর ছুঁয়ে ফুরফুর করে বাতাস আসছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না তাতে। গরম বাতাস। তৃপ্তি মেটে না। অবশ্য ঘরের চেয়ে বাইরে, ছায়ার নীচে থাকলে কিছুটা ভাল লাগে।

এক মাস হতে চলল এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি ক্লারেন্সে। রোজ একটু একটু করে বেড়েই চলেছে গরম। আকাশটা আজও অদ্ভুত রকম নীল। আকাশের কোথাও মেঘের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ে না। এই গুমোট আবহাওয়া কবে কাটবে তার ঠিক নেই।

এর মধ্যে গত দু' সপ্তাহের টানা লোড শেডিং আর প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা সবকিছু আরও অসহনীয় করে তুলেছে। ইলেকট্রিসিটি এই আসে এই যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এখন বলতে গেলে বিশ ঘণ্টাই থাকে না। গরমে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

শহরে জোর গুজব চলছে, বিদেশি টেকনিশিয়ানরা এবার সত্যি সত্যি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

বেশ অনেকদিন আগেই তাদের উপর কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সদস্যদের নির্যাতন বন্ধ করার চূড়ান্ত দাবি জানিয়েছিল টেকনিশিয়ানরা, কিন্তু তার কোনও প্রতিকার করা হয়নি সরকারের তরফ থেকে। কোনও আশ্বাসও দেয়া হয়নি। তাই নিরুপায় হয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এ দেশে আর কাজ করবে না তারা। তাই ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের এই দশা।

এদিকে দেশের এই অবস্থা, অন্যদিকে গোমেজের ব্যবসারও লাল বাতি জ্বলার দশা। গত সাতদিনে কোনও নতুন বোর্ডারের পা পড়েনি ইণ্ডিপেনডেন্সে। এ মুহূর্তে মাত্র দু'জন নিয়ে চলছে তার হোটেল। প্রতিবেশী সিয়েরা লিওনের টিম্বার মার্চেন্ট তারা, টুরিস্ট নয়। টুরিস্ট হলে ভাড়ার সঙ্গে বিভিন্ন চার্জ ইত্যাদি মিলিয়ে কোনওমতে পুষিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু এদের কাছ থেকে শুধু ভাড়াটাই পাওয়া যায়।

সব মিলিয়ে হা-ভাতে অবস্থা চলছে গোমেজের। ফ্লাইটের দিন এয়ারপোর্টে গিয়ে চাতক পাখির মত হাঁ করে বসে থাকে, যদি কোনও টুরিস্ট আসে! আসে না। সব মিলিয়ে মেজাজ ভীষণ খিঁচড়ে আছে তার। হোটেলটা বিক্রি করে দেয়ার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে এখন। আর ভাল লাগে না। যা

পাওয়া যায় তাই সই। তবু এই নিত্য যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চায় সে।

ঝুঁকে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল গোমেজ। সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকাল। তার সরাসরি সামনে, ঘরবাড়ির আড়াল থেকে ধুলোর হালকা মেঘ ভেসে উঠতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল। কীসের মেঘ? ভাবল সে। হয়তো কোনও গাড়ি হবে।

এদিকে আসছে? টুরিস্ট? কিন্তু... আজ তো ফ্লাইটের দিন না, টুরিস্ট আসবে কোত্থেকে? তা হলে আর কে? রেইলিং থেকে পা নামিয়ে বসল গোমেজ। একটু পর শব্দ শুনে বোঝা গেল ওটা গাড়িই, এবং এদিকেই আসছে। কার গাড়ি? কে হতে পারে?

ভাবতে ভাবতেই বাড়িঘরের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওটা। একটা জিপ গাড়ি। উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে নেচে নেচে, হেলে দুলে এদিকেই আসছে।

ওটাকে খোলা জায়গায় দেখামাত্র বুকটা ছাঁৎ করে উঠল গোমেজের। মুহূর্তের মধ্যে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল। হুড খোলা জিপ! রংটা খুব পরিচিত। ধূসর। সামনের সিটে ড্রাইভার বাদে দু'জন বসা, পিছনে আরও তিন-চারজন। রোদে চকচক করছে কালো মুখগুলো। অটোম্যাটিক কারবাইন সবার হাতে। কয়েকটার নল বেরিয়ে আছে দু'পাশ দিয়ে।

ওগুলোর মধ্যে একটা আকাশমুখো হলো, দু'টো কালো হাত উঁচু করে ধরল সেটাকে। ঝাঁকির সঙ্গে তিনবার ধোঁয়া উদগীরণ করল ওটা আকাশ লক্ষ্য করে। আওয়াজ পৌঁছতে সময় লাগল কয়েক সেকেণ্ড।

টাশশ! টাশশ! টাশশ! শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিন ঝিন করে উঠল গোমেজের। অবশ হয়ে এল হাত-পা। অজানা আশঙ্কায় বুক কাঁপতে শুরু করল ভীষণভাবে। হৃৎপিণ্ডটা বুকের খাঁচায় ঢপ্ ঢপ্ করে এত জোরে বাড়ি মারতে লাগল যে শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে গোমেজ। কিমবার ইয়ুথ... ? এদিকে কী... !

তার অবিশ্বাস মাখা বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে হোটেলের ঠিক সামনে এসে থামল গাড়িটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল গোমেজ। সিগারেট পড়ে গেছে আঙুলের ফাঁক থেকে। বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকল সে। পাঁচজন আরোহী ঝপাঝপ্ লাফিয়ে নামল। সামনের ঢ্যাঙামত লোকটা ওদের নেতা—পিয়েরে ওকুম্বা তার নাম।

গোমেজ চেনে লোকটাকে। এ দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই চেনে তাকে, জাংগারোর কসাই নামে।

মুখ তুলে তাকে দেখল লোকগুলো। হাতের অটোম্যাটিক ঝোলাতে ঝোলাতে গদাই লস্করি চালে এগিয়ে আসতে লাগল। কারও বয়স পঁচিশের বেশি হবে বলে মনে হলো না। গোমেজ স্রেফ হাবা হয়ে গেছে। কিচ্ছু ভাবতে পারছে না সে। মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে।

না জানি কোন্ সর্বনাশ ঘটতে চলেছে ভেবে তীব্র আতঙ্কে হাত-পা কুঁকড়ে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে তার।

তিন ধাপের সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে এল পাঁচজনের দলটা। ওদের গায়ের দুর্গন্ধে পেটের ভিতরে পাক্ খেয়ে উঠলেও চেহারা যথাসম্ভব নির্বিকার রাখার চেষ্টা করল সে। জংলী শুয়োরের গন্ধ বেরোচ্ছে একেকটার গা থেকে। ব্যাটারা বছর খানেকের মধ্যে গোসল করেছে কী না সন্দেহ। পোশাকের অবস্থা দেখে মনে হয় ধরলেই ময়লার স্তর উঠে আসবে।

ওকুম্বার মুখের উপর চুম্বকের মত আটকে থাকল তার শঙ্কিত দৃষ্টি। লম্বায় সাড়ে ছয় ফুটের কম হবে না লোকটা। ঢ্যাঙা, কুঁজোমত। হাত-পা সরু সরু। থুতনির নীচে ছাগলা দাড়ি আছে খানিকটা। ঘামে ভেজা হাসি-হাসি মুখ। যদিও হাসি নয় ওটা, মুখের গঠনই ওইরকম তার।

যেন রিহার্সাল দেয়াই ছিল, এমন নিশ্চিত ভঙ্গিতে বারান্দায় উঠেই দলের দু'জন সোজা এগিয়ে এল গোমেজের দিকে। নীরবে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। চিকন ঘাম ছুটে গেল তার। ঘুরে দেখারও সাহস হলো না লোকগুলো কী করছে। মৃত্যুভয়ে আধমরা হয়ে গেল বেচারা।

'হেনরি গোমেজ?' কানের কাছে বোমা ফাটাল যেন ওকুম্বা।

ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝাল সে। তীব্র আতঙ্কে কথা বেরোল না মুখ দিয়ে।

সবজান্তার মত মাথা দোলাল ছাগলা দাড়ি। সার্বক্ষণিক হাসি হাসি ভাবটা টিটকারির ভঙ্গিতে বেঁকে গেল। 'গত সাতাশে মার্চ থেকে এ মাসের এক তারিখ পর্যন্ত এক টুরিস্ট থেকে গেছে আপনার হোটেলে। ব্রিটিশ পাসপোর্টে জাংগারো সফরে এসেছিল সে। তার নাম জেমস ব্রাউন, ঠিক?'

'হ্যাঁ!' অনেক কষ্টে বলল সে। 'কে-কেন?'

ওকুম্বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করল তাকে। 'তার আসল পরিচয়টা আমাদেরকে জানাবেন আপনি।'

আকাশ থেকে পড়ল গোমেজ। তার আতঙ্কের মুখোশের সঙ্গে নিখাদ বিস্ময় যোগ হলো। হাবার মত এর-ওর দিকে তাকাতে লাগল। হয়তো বোঝার চেষ্টা করছে শুনতে ভুল হয়েছে কিনা। নড়াচড়ার শক্তি নেই। পরিষ্কার টের পাচ্ছে সে, মুখের সমস্ত রক্ত হড়হড় করে নীচের দিকে ছুটছে। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে চেহারা। ঘামের পরিমাণ বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। মাটি সরে যাচ্ছে পায়ের তলা থেকে।

'আ-আসল পরিচয়?' খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'বুঝলাম না, সাহ্।'

'খুব কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছি বুঝি?' এবার সত্যি সত্যি হাসল পিয়েরে ওকুম্বা। দু' সারি সাদা দাঁত ঝিলিক মেরে উঠল কালোর মধ্যে। 'আমি আপনার কাছে জেমস ব্রাউনের আসল পরিচয় জানতে চেয়েছি। ক্লিয়ার?'

লোকটার হাসির আড়ালে প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে, ভাবল গোমেজ। কারণ আর যার মুখেই হোক, কসাই ওকুম্বার মুখে হাসি কিছুতেই মানায় না। কোনওমতে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলাল সে।

'লোকটা কে? এ দেশে কী মিশন নিয়ে এসেছিল?'

অথৈ সাগরে পড়ল গোমেজ। 'কী মিশন...

ওকুম্বার বুক পকেটে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ দেখা যাচ্ছে। ওটা বের করে চোখ বোলাল সে। গম্ভীর। 'লোকটা ক্লারেন্সে আসে মার্চ মাসের সাতাশ তারিখে। ওইদিন বাদে আটাশ, ঊনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ এবং এপ্রিলের এক তারিখ, এই ক'দিন সে কী করে বেড়িয়েছে, বলতে পারেন আপনি?'

হাঁ হয়ে গেছে গোমেজ। হাত-পা অসাড় হয়ে আসতে লাগল। ভয় হলো যে-কোনও মুহূর্তে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে বসে পড়বে ধপ্ করে। কোনওমতে বলল, 'না।' যদিও সন্দেহ আছে গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়েছে কি না।

'জানেন না? আমি বলছি। প্রত্যেকদিন ঘুরে ঘুরে এই শহরের সবকিছুর ছবি তুলেছে ও। সব জায়গার ছবি তুলেছে।' দীর্ঘ বিরতি। 'কিন্তু কেন, কারণটা কী, জানতে পারলে খুশি হতাম।'

গোমেজের চোখের সামনে রানার ছবি ভেসে উঠল। তিন সপ্তাহ হতে চলল লোকটা চলে গেছে, এতদিন পর এ কোন্ সর্বনাশা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলো এরা? কেন উঠল এ প্রশ্ন?

'কে... কে বলল... !' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে বলল গোমেজ।

'মতুবা।' তাকে বিস্ময়টা হজম করার সময় দিয়ে আবার হাসল ওকুম্বা। তবে এবার অন্যরকম হলো হাসিটা। নিষ্প্রাণ। চোখ স্পর্শ করল না। একে একে বাকি চারজনের দিকে তাকাল গোমেজ। সবার চোখমুখের ভাব কঠোর।

'মতুবাকে চিনতে পেরেছেন তো? ওই যে, যাকে আপনি বিদেশি টুরিস্টদের পেছনে লাগিয়ে রাখতেন। তাদের কোনও বিপদ হলে দৌড়ে এসে আপনাকে খবর দিতে, যাতে আপনি... '

'আমি... আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না, সাহ্।' বলল বটে সে, কিন্তু নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল কথাটা।

'না পারার কোনও কারণ নেই। অন্যদের মত সেই লোকের সঙ্গেও মতুবাকে পাঠিয়েছিলেন আপনি। মনে পড়ল? দু'দিন আগে গোপনে একটা পাঁচশ' ফ্রেঞ্চ-আফ্রিকান ফ্রাঙ্ক নোট ভাঙাতে গিয়ে চোখে পড়ে যায় মতুবা। ওর মত এক ফকিরের বাচ্চার কাছে এত টাকা, অবাক করার মত বিষয় না? পরে আমরা খবর পেয়ে ধরি ওকে। একটু মশলা দিতেই স্বীকার করেছে যে টাকাটা সেই লোক দিয়েছিল। কেউ দেখে ফেলতে পারে, এই ভয়ে নোটটা এতদিন বের করার সাহস পায়নি হারামজাদা।'

তাকিয়ে থাকল গোমেজ। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে।

'গত দু'দিন ছেলেটাকে প্রশ্ন করে এসব তথ্য জানতে পেরেছি আমরা।' একটু বিরতি। 'আপনার কিছু বলার আছে?'

তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম মুছল গোমেজ। 'আমি জানি না। বিশ্বাস করুন। লোকটা... লোকটা আমার... ,' ঢোক গিলল, 'আমার কাছে একজন গাইড চাইল... তাই... ওকে পাঠিয়েছি আমি। হোটেল ব্যবসায় টু-টুরিস্টদের গাইড সার্ভিস না দিলে... '

'আচ্ছা!' বাধা দিল পিয়েরে ওকুম্বা। 'গাইডরা আজকাল টুরিস্টদের সদর

রাস্তায় রেখে আড়াল থেকে পথ দেখায় বুঝি?' কৌতুকের দৃষ্টিতে সঙ্গীদের ওপর চোখ বোলাল।

'আপনাদের নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে, সাহ,' গোমেজ মরিয়া হয়ে উঠল। 'আমাকে নিয়ে চলুন মতুবার কাছে। এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি... ' লোকগুলোকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসতে দেখে থেমে গেল। বোকার মত এর-ওর দিকে তাকাতে লাগল।

'মতুবার কাছে নিয়ে যাব? তা হলে যে,' তর্জনী খাড়া করে আকাশ দেখাল লোকটা, 'ওখানে যেতে হবে। আমরা বলতে গেলে কিছুই করিনি। তবু চলে গেল... ' শ্রাগ করল। 'মনে হয়, খুব দুর্বল ছিল। যাকগে, চলুন।'

আপাদমস্তক কেঁপে উঠল গোমেজের। 'কোথায়?'

'গেলেই দেখবেন।'

'আমার হোটেল... ?'

'এ নিয়ে আপনাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এটা এখন আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ।'

'আমার...' ভেতর থেকে ঠেলে উঠে আসা কান্নায় গলা বুজে গেল গোমেজের। বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল দৃষ্টি।

'প্রেসিডেনশিয়াল ডিক্রি বলে জাতীয়করণ করা হয়েছে। এটার ওপর আপনার আর কোনও অধিকার নেই।'

'হাঁটো!' পিছন থেকে জোরাল ঘাড় ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে কয়েক পা এগিয়ে গেল গোমেজ। আরেক ধাক্কায় দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গেল। সামলে নিয়ে ঘুরে তাকাল সাহস করে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে কসাই ওকুম্বা। অটোম্যাটিকটা লাঠির মত কাঁধে তুলে নিয়েছে।

অন্য চারজন তার পিছন পিছন এল। তৃতীয় ধাক্কায় জিপের উত্তপ্ত বনেটের উপর গিয়ে পড়ল গোমেজ। তারপর কী ঘটল জানে না। ঠিকমত সামলে উঠতে পারার আগেই সামনের সবকিছু আউট অফ ফোকাস হয়ে গেল।

জিপের মাডগার্ডের একটা অংশ সাঁৎ করে উঠে এল, দড়াম করে আছড়ে পড়ল গোমেজের মুখের পাশে। উত্তপ্ত স্টিলের ছোঁয়া লাগামাত্র ফোসকা পড়ে গেল ওখানটায়।

কিন্তু গোমেজ কিছু টের পেল না।

টুরিস্টদের ব্যাপারে সাধারণভাবে যতটা মনে করা হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি সহনশীল স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ। প্রতি বছর গ্রীষ্মে ও বসন্তে হাজার হাজার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, জার্মান, ফ্রেঞ্চ ও ব্রিটিশ হড়হড় করে ঢোকে সে দেশে। তাদের মধ্যে অনেকে আছে ও-দেশের আইন-কানুনের পরোয়া করে না। তবু কর্তৃপক্ষ চুপচাপ তাদের সহ্য করে।

স্প্যানিশ আইনে আছে একজন টুরিস্ট এক কার্টন সিগারেট অথবা দুই কার্টন বিয়ার-এর বেশি সঙ্গে করে আনতে পারবে না। কিন্তু বেশিরভাগ টুরিস্টই তারচেয়ে অনেক বেশি আনে। এরকম কিছু হিথরো এয়ারপোর্টে ঘটলে অনেক

কিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ড অফিশিয়ালরা সেরকম দেখলে মুচকি হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে পড়ে।

তারা সব সময় চেষ্টা করে বিদেশি টুরিস্টরা তাদের দেশে মজা করতে এসে যেন কোনও ঝামেলায় পড়ে না যায়। কিন্তু যদি কেউ তাদের এ ধরনের ঢিলেমিকে ভুল বুঝে তার সুযোগ নিতে যায়, তা হলে অবশ্য তার খবর করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

চারটে জিনিস তারা টুরিস্টদের লাগেজে দেখতে চায় না। অস্ত্র বা বিস্ফোরক, ড্রাগস, পর্নোগ্রাফি আর কমিউনিস্ট বা জঙ্গি প্রোপাগাণ্ডা। অন্য সব দেশ হয়ত দু' বোতল ডিউটি-ফ্রি ব্র্যাণ্ডি দেখলে আপত্তি জানাবে, অথচ পেন্টহাউস ম্যাগাজিন নিয়ে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু স্পেন প্রথমটার ব্যাপারে মাথা না ঘামালেও পরেরটার ক্ষেত্রে ঘামাবে। কাজেই অন্য সব দেশের তুলনায় অনেক ব্যাপারেই আলাদা এ দেশ।

ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী জেমস ব্রাউনের বেলাতেও সেরকমই ঘটল সেদিন। মালাগা এয়ারপোর্টের তরুণ কাস্টমস অফিসার ঠোঁট গোল করে শব্দহীন শিস বাজাতে বাজাতে ওর ট্রাভেল ব্যাগ চেক করছিল, হঠাৎ একশ পাউণ্ডের কড়কড়ে একগাদা নোট চোখে পড়তে শিস থেমে গেল তার। একটু থমকাল দৃষ্টি। কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটল।

নোটগুলো এভাবে আনতে জেমস ব্রাউনকে নিশ্চয়ই হিথরো এয়ারপোর্ট কাস্টমসের কঠিন বেড়া টপকাতে হয়েছে। বেশি নগদ টাকা বহন করা হিথরোয় নিষিদ্ধ, স্পেনে নয়। ওরা যখন কিছু বলেনি, তখন তার কী দায় ঠেকেছে বলার? এই টাকা দিয়ে লোকটা ফুর্তি করবে তার দেশে? করুক না! তার কী ক্ষতি? হাত নেড়ে ব্রাউনকে কেটে পড়তে বলল সে।

মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলে ভেসেলের খোঁজে পুরো তিন সপ্তাহ টহল দিয়ে বেড়ানোর ফলে তোবড়ানো গাল আরও বসে গেছে পাঞ্জাবি মিশ্রি খানের। চেহারাটা ম্লান লাগল দূর থেকে। বিষণ্ন।

রানাকে দেখে হাত নাড়ল সে। শেষ হয়ে আসা সিগারেট ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে ছুটে এল।

'কেমন আছ?' লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা।

'আলহামদুলিল্লাহ, ওস্তাদ। আপনি কেমন আছেন?'

'ভালো।' কড়া চোখে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল রানা। মনে হলো কিছু খুঁজছে হয়তো তার চেহারায়।

'কী দেখছেন, ওস্তাদ?' দ্বিধায় পড়া চেহারা হলো পাঞ্জাবির।

'তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? দেশ থেকে নতুন কোনও খবর এসেছে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল মিশ্রি খানের। 'কীসের কথা বলছেন... ?'

'তোমার বউয়ের কথা বলছি। এখন কী অবস্থা?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল পাঞ্জাবি। ক্রমে কালো হয়ে উঠল চেহারা। মাথা নাড়ল হতাশ ভঙ্গিতে। 'ভালো না, ওস্তাদ। ও...ও মনে হয় আর

বাঁচবে না।'

'এখন তো প্রথম স্টেজে আছে, তাই না? উপযুক্ত চিকিৎসা হলে ফার্স্ট স্টেজের ক্যান্সার আজকাল কোনো ব্যাপারই না।'

'হ্যাঁ, তা... ' হঠাৎ থেমে গেল মিশ্রি খান। চোয়াল ঝুলে পড়ল। 'কিন্তু... ওস্তাদ! আপনি এ খবর জানলেন কী ভাবে?' ভুরু কুঁচকে উঠল। 'কে বলল?'

'কেউ বলেনি। আমি জানি।' মৃদু হাসল রানা।

'কিন্তু কীভাবে?'

শ্রাগ করল রানা। 'চেনাজানা-প্রিয় সবার খবর রাখার চেষ্টা করি।'

অবিশ্বাস ফুটল অভিজ্ঞ কমাণ্ডোর ক্লান্ত চেহারায়। 'মেজর, ত্রিশ বছরের বেশি হলো পাকিস্তান ভেঙেছে। আপনি...আপনি এখনও আমাদের খবর রাখেন?'

মৃদু হাসল রানা। 'পাকিস্তান ভেঙেছে তাতে কী? তাই বলে এক সময়কার আপন লোকদের খোঁজ-খবর রাখাও নিষেধ হয়ে গেছে নাকি? পুরনো সম্পর্ক খতম?'

'না... ' আমতা আমতা করতে লাগল পাঞ্জাবি। 'তা অবশ্যই না।' বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। 'ওস্তাদ, আমার... আমার শাহিনার ট্রিটমেণ্টে অনেক টাকা লাগবে। আপনি জানেন না। আমি সিঙ্গাপুরে খোঁজ নিয়েছি। ওরা বলেছে, কম করেও বিশ-তিরিশ লাখ রুপিয়া লাগবে! কাঁহাসে... এত নগদ টাকা আমি কোথায় পাবো?'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলেছিল রানা, একটা খালি ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতে আর বলা হলো না।

দশ মিনিট পর, চলন্ত ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মালাগা পোর্টের দিকে চলল ওরা।

'পছন্দের জিনিস পেয়েছ তা হলে?' বলল রানা।

'হ্যাঁ,' চওড়া গোঁফের নীচে তামাকের দাগ বসে যাওয়া খয়েরি দাঁত দেখা দিল লোকটার। 'দারুণ একটা বোট পেয়েছি, ওস্তাদ। আপনারও পছন্দ হবে।'

যেতে যেতে রানাকে নিজের এতদিনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল সে। জানাল, উপযুক্ত বোটের খোঁজে মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলের সবখানে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। নেপলসে গেছে, জেনোয়ায় গেছে, মলটার রাজধানী ভ্যালেটায় গেছে, মার্সেই, বার্সেলোনায় গেছে। জিব্রাল্টারেও গেছে।

এক সময় ইজরাইলের বেপরোয়া সামরিক আগ্রাসনের মুখে গোটা মধ্য প্রাচ্য জিম্মি হয়ে ছিল। ফিলিস্তিনীরা ছিল পুরো অসহায়। ওই সময় তাদেরকে সহায়তা করতে অন্য অনেকের সঙ্গে পাকিস্তান কাউণ্টার ইণ্টেলিজেন্স প্রধান রাহাত খানও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে পিসিআই বেশ কিছু কমাণ্ডো মিশন পরিচালনা করে ইজরাইলের বিরুদ্ধে।

তার বেশিরভাগের নেতৃত্ব দিত মাসুদ রানা, আর মিশ্রি খান ছিল ওর অবিচ্ছেদ্য সহযোগী। পাকিস্তান আর্মির ক্যাপ্টেন মিশ্রি খান বেশি পরিচিত ছিল এক্সপ্লোসিভ উইজার্ড নামে। দেড়-দুশ' গ্রাম বারুদ হাতে ধরিয়ে দিলেই ভয়ঙ্কর

বোমা বানিয়ে ফেলতে পারে। অকুতোভয় কম্যাণ্ডো। তার ওপর স্বভাব-রসিক কিসিমের মানুষ। অন্যকে আকৃষ্ট করার অসাধারণ ক্ষমতা। দু'মিনিটের পরিচয়ে যে-কাউকে ভাতিজা বানিয়ে ফেলতে পারে।

অতীতে ইজরাইলের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে কয়েকবারই মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল থেকে বিস্ফোরক সামগ্রী কিনতে হয়েছিল ওদেরকে। তখন সেখানেও একটা 'ভাতিজা' বাহিনী গড়ে তুলেছিল খান। যাদের বেশিরভাগই ছিল আণ্ডারগ্রাউণ্ডের। এবার জাহাজ কিনতে এসে সেই বাহিনীর সাহায্য নিয়েছে।

তাদের সহায়তায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে ছোটো জাহাজ খুঁজেছে সে। অনেক জাহাজ দেখেছে, কিন্তু বেশিরভাগই পছন্দ হয়নি। যেগুলো পছন্দ হয়েছে, সেগুলোর স্কিপারদের ব্যাকগ্রাউণ্ড সন্দেহজনক বলে রায় দিয়েছে তার ভাতিজারা। এভাবে গোটা মেডিটারেনিয়ান অঞ্চল সফর শেষে সাতটা জাহাজের একটা তালিকা তৈরি করেছে মিশ্রি খান।

তার মধ্যে এম. ওয়াই. আলব্যাট্রস তিন নম্বর। আসিরা ডি লা মেরিনা স্কয়ারের শেষ মাথায় ডকে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে সাদা রং করা ছোটখাট ভেসেলটা। হারবারের মৃদু ঢেউয়ের দোলায় রাজকীয় ভঙ্গিতে দুলছে। কড়া রোদে ঝিলিক মারছে।

রানাকে নিয়ে ডেকে উঠে এল মিশ্রি খান। আলব্যাট্রসের মালিক-কাম-স্কিপার জর্জ অ্যালেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। বোটটা এক চক্কর দিয়েই রানা বুঝে ফেলল বোটটা আর সবদিক থেকে ফিট হলেও প্রয়োজনের তুলনায় একটু ছোটো হয়ে গেছে। আর কয়েক ফুট বড়ো হলে চমৎকার হত। তবে যা আছে, তাতেও অ্যাকমোডেশনের খুব বেশি অসুবিধা হবে না।

হিসেব করে দেখল ও, মাস্টার'স কেবিনে দু'জন ঘুমাতে পারবে। ওটা মেয়েদের জন্য ছেড়ে দিলে আর থাকে ডবল বাঙ্কওয়ালা তিনটে রুম। ওগুলোয় ছয়জন ঘুমাতে পারবে। সেলুনটা মোটামুটি বড়ো। ম্যাট্রেস আর স্লিপিং ব্যাগে কম করেও ছয়জন ঘুমাতে পারবে। তা ছাড়া আফটার হোল্ডকে স্লিপিং এরিয়া বানিয়ে নিলে আরও চার-পাঁচজনের জায়গা হয়ে যাবে।

রানারা পাঁচজন আর আলব্যাট্রসের স্টাফ আছে চারজন। পথের মাঝে উঠবে আরও এগারজন। অর্থাৎ নয় আর এগারো, বিশজন। একটা সিট কম হয়ে যায়। কিন্তু সেটা তেমন কিছু নয়। কারণ, সবাই একযোগে ঘুমাবে না। জাহাজ চলার সময় কাউকে না কাউকে পালা করে ব্রিজে থাকতেই হচ্ছে। তবু...

জাহাজের কাগজপত্র চেক করে দেখল রানা। ঠিকঠাক মতই আছে। আলব্যাট্রসের বোর্ড অভ ট্রেডের কাগজপত্র দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল ব্রিটেনেই রেজিস্টার্ড ওটা। মালিক-কাম-স্কিপার জর্জ অ্যালেনের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলল ও। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আলব্যাট্রস কী পরিমাণ কাজ করেছে, রিসিট আর ইনভয়েস ঘেঁটে তা বোঝার চেষ্টা করল। লগবুক চেক করল।

তারপর মিশ্রি খানকে নিয়ে হোটেলের দিকে চলল রানা। কিছু ভাবছে

গভীরভাবে।

'কী ভাবছেন, মেজর? এটার রেকর্ড কিন্তু একদম ক্লিন।'

'তা নিয়ে ভাবছি না,' রানা বলল। 'জাহাজটা মনে হচ্ছে বেশি ছোটো হয়ে যাবে লং ভয়েজের জন্য। তাছাড়া কোনো শিপিং কোম্পানির নয় ওটা। প্রাইভেট ইয়ট হিসেবে রেজিস্টার্ড। আমার সন্দেহ এক্সপোর্টিং অথরিটি ওটাকে লোড নেয়ার উপযুক্ত ভেসেল মনে না-ও করতে পারে।'

প্যালাসিও হোটেলে রানার জন্য রুম বুক করে রেখেছিল মিশ্রি খান। সেখানে উঠেই লণ্ডন লয়েড'স-এ ফোন করল ও। ইয়টের নামের তালিকা চেক করে দেখার অনুরোধ করে জানল আলব্যাট্রস আছে ওর মধ্যে। ৭৪ টনী ফ্রেইটার। হোম পোর্ট মিলফোর্ড এবং পোর্ট অভ রেসিডেন্স হুয়ে।

'দেখি কী জবাব আসে,' বলল রানা। দ্বিতীয় কলটা বুক করল হ্যামবার্গে। প্রায় তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল জোহান শ্লিংকার।

'নেইন, নেইন!' মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'প্রাইভেট ইয়টে চলবে না, হের ব্রাউন। কমার্শিয়াল বেসিসে মালামাল বহনের কাজে ওটার চান্স নেই বললেই চলে।'

'তার মানে অন্য ভেসেল খুঁজতে হবে,' আপনমনে বলল ও। 'ঠিক আছে। জাহাজের নাম আপনার কখন দরকার?'

একটু ভাবল জোহান শ্লিংকার। 'পনেরো দিনের মধ্যে হলে ভালো হয়। বাই দ্য ওয়ে, আপনার ব্যাংকার'স চেক পেয়েছি। এখন জিনিসপত্র প্যাক করে তুলোঁর সেই বণ্ডেড ওয়্যারহাউসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়ার কাজ করছি আমি। আসল ডকুমেণ্টও জোগাড় করে ফেলেছি।'

'ওকে, থ্যাংক ইউ। আর ভেসেলের নাম পনেরো দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন আপনি।'

ফোন রেখে মিশ্রি খানের দিকে ফিরল রানা। ঘটনা খুলে বলল আকে। 'সরি, খান। মেরিটাইম ফ্রেইটিং বিজনেসের রেজিস্টার্ড কোম্পানির ভেসেল হতে হবে ওটাকে। লাইসেন্সধারী ফ্রেইটার। প্রাইভেট ইয়টে চলবে না। কী আর করা! নতুন করে খোঁজ শুরু করো। দশ-বারোদিনের মধ্যে নামটা চাই।'

পরদিন সকালে দু'জনেই মালাগা ছেড়ে উড়াল দিল। মাসুদ রানা লণ্ডনের পথে, মিশ্রি খান মাদ্রিদের পথে। সেখান থেকে রোম হয়ে জেনোয়া যাবে সে।

পরদিন সকালের ব্রাসেলস ফ্লাইটে একটা সিট বুক করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে। মার্সিয়াকে ফোন করে খবরটা দিল ও। বাউচারকে ওদের আগমনের খবর জানিয়ে রাখতে বলল।

রিসিভার ক্রেডলে রাখার সময়ও ঠিকমত পায়নি, এমন সময় আবার শুরু হলো গুন্থারের শক ট্রিটমেণ্ট। প্রথম পর্ব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না এবার। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের ধাক্কা চলল একটানা পাঁচ মিনিট ধরে। জ্বলুনি অসহ্য হয়ে উঠতে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো রানা। তারপর এল তৃতীয় পর্ব—কোল্ড ট্রিটমেণ্ট। ঠাণ্ডায় জমে গেল ও। অসহ্য ঠাণ্ডা!

গড়াগড়ি খেতে লাগল বিছানার এপাশ থেকে ওপাশ। বুকের ভেতর থেকে

অনবরত গোঙানি বেরিয়ে আসছে। কখন যে সেটা চাপা চিৎকারে পরিণত হয়েছে, রানা নিজেও জানে না। গলা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে, এমন সময় থেমে গেল ট্রিটমেণ্ট।

স্থবিরের মত পড়ে থাকল মাসুদ রানা। হাঁপাচ্ছে প্রবলভাবে। রুম টেম্পারেচারেই দর দর করে ঘামছে। এক ফোঁটা শক্তি নেই শরীরে। সবটুকু শুষে নিয়েছে গুন্থারের বিচিত্র ট্রিটমেণ্ট। এক সময় আপনাআপনি চোখ বুজে এল ওর।

'আমি তোমাকে একটাই ট্রিটমেণ্ট দেব, গুন্থার! শুধু একটা!' ঘুমিয়ে পড়ার আগে উচ্চারণ করল রানা হুমকিটা।

চার

হ্যারল্ড রবার্টস কাজের মানুষ। বাষট্টি বছর আগে পৃথিবীর আলো দেখেছে সে। তার বাবা ব্রিটিশ, মা সুইস। দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারী। বাবার অসময়োচিত মৃত্যুর পর সুইটজারল্যাণ্ডেই বড় হয়েছে সে মায়ের তত্ত্বাবধানে।

তার পেশাগত জীবন শুরু হয়েছে ব্যাংকে চাকরির মাধ্যমে। সুইটজারল্যাণ্ডের অন্যতম বৃহত্তম ব্যাংকের জুরিখ হেড অফিসে বিশ বছর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। তারপর কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে নিজেদের লণ্ডন শাখার অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার করে পাঠিয়েছে তাকে।

ক্যারিয়ারের পরের বিশ বছর অ্যাসিসটেণ্ট ম্যানেজার থেকে ইনভেস্টমেণ্ট অ্যাকাউণ্টস সেকশনের ম্যানেজার হওয়ার পিছনে ব্যয় হয়েছে হ্যারল্ড রবার্টসের। তারপর লণ্ডন শাখার ওভারল ম্যানেজার হতে পেরেছে। ষাট বছর বয়সে রিটায়ার করে লণ্ডনেই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে সে।

বর্তমানে নিজের সাবেক প্রতিষ্ঠানসহ উল্লেখযোগ্য আরও দুয়েকটা সুইস ব্যাংকের হয়ে এখানেই নানান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কাজে নিয়োজিত। বুধবার দুপুরে এরকমই এক কাজে ব্যস্ত ছিল রবার্টস। জুইংলি ব্যাংকের লণ্ডন শাখার প্রতিনিধি হিসেবে তার নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তির কথা বোরম্যাকের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিকে জানাল সে।

পরের সোমবার দু'টো মিটিং হলো। প্রথমটা হলো রবার্টস ও বোরম্যাকের সেক্রেটারি, সিটি সলিসিটরের মধ্যে। পরেরটায় তাদের সঙ্গে বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান, মেজর লুটনও থাকল। সার আয়ান ম্যাকালিস্টারের প্রয়াত আণ্ডার ম্যানেজারের ছোটো ভাই সে। বড়ো ভাইয়ের সমস্ত শেয়ারের মালিক। সাসেক্সে থাকে। বয়স হয়ে গেছে বলে আজকাল বাড়ির বাইরে তেমন বের হয় না। তারপরও এসেছে সিটি সলিসিটরের একান্ত অনুরোধে। সে ছাড়া আরেকজন ডিরেক্টরও উপস্থিত থাকল ওই মিটিঙে।

বোরম্যাকের বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। তার মধ্যে দু'জন

একমত হলেই যে কোনও রেজোলিউশন পাশ করা যায়। তিনজনে হয় আউটরাইট মেজরিটি।

সিটি সলিসিটর, মেজর লুটন ও অপর ডিরেক্টরের সামনে বোরম্যাক সেক্রেটারি হ্যারল্ড রবার্টস একটা রেজোলিউশন পেশ করল সেদিন।

মেসার্স অ্যাডামস, মেসার্স বল, মেসার্স কার্টার ও মেসার্স ডেভিস নামের অদেখা যে চার শেয়ারহোল্ডারের কথা বলা হলো তার রেজোলিউশনে, তাদের স্বার্থ জুইংলি ব্যাংক দেখাশোনা করে। তারা যেভাবেই হোক, সম্প্রতি তাদের বোরম্যাকের ত্রিশ পার সেন্ট স্টকের মালিক হয়ে গেছে। এখন তারা জুইংলি ব্যাংককে নিজেদের স্বার্থ দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে এবং জুইংলি ব্যাংক রবার্টসকে তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে। সেই সূত্রে সে মিটিং ডেকেছে। তার প্রস্তাবটা নিয়ে সবাই মাথা ঘামাল কিছু সময়।

সেটা হচ্ছে এরকম: মেসার্স অ্যাডামস, বল, কার্টার ও ডেভিস নামের চার প্রতিষ্ঠানের একটি বিজনেস কনসোর্টিয়াম বোরম্যাকের মত প্রায় মৃত একটা কোম্পানির ত্রিশ পার সেন্ট স্টক কিনে নিয়েছে। সুইস জুইংলির মত ব্যাংক সেই কনসোর্টিয়ামকে অনুমোদন করছে এবং বোরম্যাকের অন্যসব শেয়ার হোল্ডারদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাইছে যে, তারা বোরম্যাকে নতুন করে ফাণ্ড ইনজেক্ট করতে আগ্রহী।

এই পদক্ষেপ শেয়ারের দাম বাড়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই রাখবে। মিটিঙে উপস্থিত তিনজন যেহেতু বোরম্যাকের শেয়ারের মালিক, সেহেতু এ লাভের ফসল তাদের ঘরেও উঠবে। অতএব সভায় হ্যারল্ড রবার্টসের পেশ করা রেজোলিউশন এক কথায় গৃহীত হলো এবং তৎক্ষণাৎ অনুমোদিতও হলো।

সেই সঙ্গে রবার্টসকে বোরম্যাকের বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স-এর নমিনি ডিরেক্টর ও জুইংলি ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করা হলো। এজন্য যে আগে কোম্পানির আইন পরিবর্তন করা জরুরি ছিল, সে কথা কারও মাথায়ই এল না।

দু'জন ডিরেক্টর হলেই যে কোরাম পূর্ণ হয় এবং যে-কোনও রেজোলিউশন পাশ করা যায়, তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামাল না।

ডিরেক্টর পাঁচজনের জায়গায় ছয়জন হওয়ায় যে বোরম্যাকের বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের বিধান অমান্য করা হলো, তা নিয়েও না।

ক্লারেন্স। নিজের অফিসে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন রাশান রাষ্ট্রদূত লিওনিদ দবরোভলস্কি। ষাট থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে হবে তাঁর বয়স। মাঝারি উচ্চতার গাট্টাগোট্টা মানুষ। এমনিতে যথেষ্ট প্রাণচঞ্চল, কর্মঠ। কিন্তু এ মুহূর্তে বিশেষ একটা কারণে চিন্তিত। তাঁর সামনে দুটো খোলা চিঠি।

একটা মস্কো থেকে অ্যাসিসটেণ্ট আণ্ডার সেক্রেটারি সের্গেই গোলনের পাঠানো। অন্যটা ফরেন মিনিস্ট্রির। ও দুটোর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে আছেন দবরোভলস্কি, দেখলে যে কেউ ভাববে তাঁর পেট কামড়াচ্ছে বুঝি। প্রথম চিঠিটা কয়েকদিন আগেই এসেছে। ওটার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন

তিনি। এই সময় দ্বিতীয়টা এসে হাজির।

ভাগ্য ভাল যে আগের চিঠি অনুযায়ী তিনি কাজে হাত দিয়ে বসেননি। তা হলে গোলমাল হয়ে যেত।

কারণ দ্বিতীয় চিঠি আসার পর প্রথম চিঠিটা গুরুত্ব হারিয়েছে। এখন দ্বিতীয়টার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে তাঁকে। প্রথম চিঠিতে আণ্ডার সেক্রেটারি গোলন রাষ্ট্রদূতকে পরামর্শ দিয়েছিল, 'আমেরিকানদের নিরুৎসাহিত করে পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রিস্টাল মাউণ্টেন এলাকার সোল মাইনিং রাইটসের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানাতে হবে। আবেদন জানাতে এত দেরি হলো কেন, তার একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও দিতে হবে।'

কিন্তু দ্বিতীয় চিঠির বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে একেবারে উল্টো: *ধরো তক্তা, মারো পেরেক* জাতীয়।

ভালই হলো বরং, ভাবল লিওনিদ দবরোভলস্কি। পাগলকে সাঁকো নড়াতে নিষেধ করলে সে বেশি বেশি সাঁকো নাড়ে, জানা কথা। এই পর্যায়ে গোলনের নির্দেশ অনুযায়ী কিমবার কাছে মাইনিং রাইটসের জন্য আবেদন জানাতে গেলে দেরি করার জন্য ব্যাটা পাল্টা কৈফিয়ত তলব করে বসতে পারত। কে জানে, হয়ত ঘাড় ধরে বেরই করে দিত প্রাসাদ থেকে!

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত, ভোঁদড় কেন উইলিয়ামসন প্রেসিডেন্ট কিমবাকে কী সব আগডুম বাগডুম বুঝিয়ে হিণ্টারল্যাণ্ডে মাইনিঙের অনুমতি নিয়ে গেছে কে জানে! এই অবস্থায় প্রথম চিঠিটা পেয়ে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবেন বুঝতে না পেরে স্বর্গ-মর্ত্য করে বেড়াচ্ছিলেন দবরোভলস্কি। এমন চরম জটিল এক মুহূর্তে ফরেন মিনিস্ট্রির চিঠিটা তাঁর জন্য এক মহা স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।

বর্তমান বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার এমন একটা চমৎকার উপায় দেখিয়ে দিয়েছে ওটা যে, আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে তাঁর।

বহুবার পড়া দ্বিতীয় চিঠিটা তুলে নিয়ে আবারও চোখ বোলালেন লিওনিদ দবরোভলস্কি। প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের পিছনে কিছুদিন আগে এক কায়া গার্ড নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল। সেই সঙ্গে এক টিভ যুবতী ও তার কোলের শিশুও। মস্কো সেই গার্ডের নিহত হওয়ার ঘটনাটাকে পুঁজি করে জবর এক চাল চেলেছে। মানে, চালার পরামর্শ দিয়েছে তাঁকে।

খুনগুলো কে বা কারা করেছে কেউ জানে না। এ নিয়ে অনেক ধরনের কানাঘুষা চলে ক্লারেন্সে। মস্কোর ফরেন মিনিস্ট্রির কোনও এক চতুর মাথা থেকে এই বিষয়টাকেই সামনে নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ভয় দেখাতে হবে কিমবাকে। বেপরোয়া, অজ্ঞাত হত্যাকারীর হাত যখন ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে, তখন যে-কোনও মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত পৌঁছে যেতে কতক্ষণ?

সবাই জানে, কিমবা তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে অসম্ভব রকম সতর্ক। গোটা দুনিয়া একদিকে, আর তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আরেকদিকে। তাই ফরেন মিনিস্ট্রি ঠিক করেছে, সেই তিন খুনের ঘটনাকে সামনে এনে কেল্লা ফতে

করবে। তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাজুক, ভঙ্গুর, যে-কোনও সময় যা-তা ঘটে যেতে পরে, দবরোভলস্কি গিয়ে এইসব বোঝাবে হিজ এক্সেলেন্সি কিমবাকে। জ নাবে, বন্ধু প্রতিম দেশ বলে তার নিরাপত্তার প্রশ্নে মস্কো যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। তারা এর প্রতিবিধান করতে আগ্রহী।

হিজ এক্সেলেন্সি অনুমতি দিলে তাঁর দেশ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। ক্লারেন্সের রাশান দূতাবাসের নিজস্ব রিজার্ভ ফোর্স থেকে দশ সদস্যের একটা মেরিন কণ্টিনজেন্টকে প্যালেসের নিরাপত্তার কাজে নিয়োগ করবে। তাদের 'কমাণ্ডার' থাকবে একজন গোয়েন্দা অফিসার।

মনে মনে হাসলেন রাষ্ট্রদূত। ভালই ওষুধ বের করেছে মিনিস্ট্রি। প্রস্তাবটাকে যতই সাদামাটা মনে হোক না কেন, বাস্তবে কিন্তু একেবারে উল্টো। রাজি হলেই কিমবা মরেছে। যে-মুহূর্তে মেরিন বাহিনী প্যালেসে পা রাখবে, সেই মুহূর্ত থেকে 'নজরবন্দি' হয়ে পড়বে লোকটা। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলতে শুরু করবে।

তারপর থেকে মস্কোর 'পরামর্শে'র বাইরে গেলে কিমবার গদি এমনকী উল্টে পর্যন্ত যেতে পারে। মুহূর্তের নোটিশে।

কেন উইলিয়ামসনের কথা ভেবে করুণা হলো লিওনিদ দবরোভলস্কির। ব্যাটা বুড়ো ভাম। টের পায়নি কাদের সঙ্গে টেক্কা দিতে এসেছে।

ব্রিটিশ রেসিডেন্ট মিস্টার জেমস ব্রাউন ইদানীং ক্রেডিয়েটব্যাংকের নিয়মিত ভিজিটরে পরিণত হয়েছে। প্রায়ই আসা-যাওয়া করছে। গুজেনস জানে তার অ্যাকাউন্টে ছয় দফায় বিশাল বিশাল অংকের টাকা জমা হয়েছে এবং তার বেশিরভাগই তুলে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু তার কর্মকাণ্ডের ওপর নজর রাখার যে চিন্তা সে আগে করেছিল, সেটা কখন যেন বেরিয়ে গেছে মাথা থেকে।

তা ছাড়া অমন কাজ করতে চেয়েছিলই বা কেন সে? পার্টি আসবে, টাকা জমা রাখবে, প্রয়োজনে তুলে নেবে। এর মধ্যে বেআইনী কিছু না ঘটলে আর ব্যাংকের ব্যবসা হলেই হলো। আর কিছু নিয়ে তার মাথা ঘামানোর কী দরকার? কাজেই গোয়েন্দাগিরির চিন্তা ভুলে আজকাল ব্রাউনকে সাহায্য করার জন্য বলতে গেলে মুখিয়েই থাকে সে।

বুধবার আবার এল জেমস ব্রাউন। গুজেনসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে একটা বড়ো অঙ্কের টাকা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে চলে গেল ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

ব্রাগ রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত মাইল চারেক পথ ট্যাক্সিতে এল রানা। সেখানে একটা মাঝারি আকারের কাভার্ড ভ্যান নিয়ে অপেক্ষায় ছিল মার্সিয়া। ট্যাক্সি বিদায় হতেই ওটার ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল রানা।

আসল কাজ শুরু হতে দেরি আছে, তাই ঘুরে ঘুরে ব্রাগ দেখল ওরা। শহরের সবচেয়ে নামকরা রেস্টুরেণ্টে লেট লাঞ্চ খেল। তারপর আরও ঘণ্টা দুয়েকের মত কাটাল বিখ্যাত আর্ট গ্যালারিতে। অবশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে দেখে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলো।

শহরের চল্লিশ মাইল পুবে ব্রাগ আর ঘেন্টের মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী একটা পুরনো রাস্তা আছে। খোলামেলা, সমতল ফার্মল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে গেছে। ভীষণরকম আঁকাবাঁকা রাস্তা, তাছাড়া সমতল বলে সারাক্ষণ প্রবল বাতাস বয় ওই অঞ্চলের ওপর দিয়ে। এই কারণে আজকাল মোটরিস্টরা পারতপক্ষে ওই রাস্তা আর ব্যবহার করে না, নতুন তৈরি করা অসটেণ্ড-ব্রাসেলস মোটরওয়ে ই-ফাইভ হয়ে চলাচল করে তারা। ফলে পুরনোটা হয়ে পড়েছে নির্জন, জনবিরল।

এই রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় ঘন বার্চ বনের মধ্যে বাউচারের 'বিশেষ জায়গা', পরিত্যক্ত একটা ফার্মহাউস খুঁজে পেল ওরা। খুঁজে পেল মানে, ওটায় যাওয়ার রাস্তা নির্দেশকারী রং চটা, অস্পষ্ট হয়ে আসা তীর চিহ্নটা দেখতে পেল। বনের পিছনে কোথাও আছে ফার্মহাউসটা।

রাস্তা থেকে বা ফার্মহাউসে আসা-যাওয়ার পথে দেখা যায় না, এমন এক জায়গায় পার্ক করল রানা। মার্সিয়াকে সতর্ক থাকতে বলে একটা পেন্সিল টর্চ ও একজোড়া নাইটগ্লাস নিয়ে ওটার খোঁজে চলল। বেশি সময় লাগল না। দশ মিনিটের মধ্যেই ফার্মহাউসটার দেখা পাওয়া গেল। সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে এল ও। মানুষের আনাগোনার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না কোথাও। ওদের জন্য কোনও রিসেপশন কমিটিও অপেক্ষায় নেই।

'একদম ফাঁকা?' বলল মার্সিয়া। 'কেউ নেই মেইন হাউসে বা আউটবিল্ডিংগুলোয়?'

মাথা নাড়ল রানা। 'সামনের-পিছনের দরজা লক করা। বার্ন, স্টেবল, সব খালি।'

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল ও। অন্ধকার একটু একটু করে চেপে বসতে শুরু করেছে। বাউচার আসতে এখনও এক ঘণ্টা দেরি আছে।

'তুমি পিছনদিকে চলে যাও,' বলল রানা। 'আড়াল থেকে বাড়িটার ওপর নজর রাখো। আমি এখান থেকে সামনের এণ্ট্রান্সের উপর নজর রাখব।'

মার্সিয়া চলে যেতে সময় কাটানোর জন্য ভ্যানটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। পুরনো ঝক্কর মার্কা শেভ্রলে একটা। তবে চমৎকার কাজের জিনিস। সার্ভিসিং করিয়ে নেয়ায় একেবারে নতুনের মত হয়ে গেছে ইঞ্জিন। পিছনের ভ্যানে বড়ো ছয় বস্তা আলু আর একটা চওড়া কাঠের বোর্ড আছে। ওটা জায়গামত বসিয়ে দিলে একটা অভ্যন্তরীণ টেইলবোর্ড হয়ে যাবে। সন্তুষ্ট হয়ে পথের দিকে নজর ফিরাল রানা।

আটটা বাজার পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে দূরে একজোড়া হেডলাইট দেখা দিল। একটু একটু করে বড় হচ্ছে, কাছে চলে আসছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বড়ো রাস্তা ছেড়ে ফার্মহাউসের ট্র্যাকে এসে উঠল গাড়িটা। দোল খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। নাইটগ্লাস চোখে লাগাল রানা।

লাফ দিয়ে কাছে চলে এল গাড়িটা। ওটাও কাভার্ড ভ্যান। ড্যাশবোর্ডের আলোয় ড্রাইভিং সিটে বসা বেলুন আকারের লালচে কাঠামোটাকে চিনতে ভুল হলো না ওর। ওরকম আকৃতি খুব কমই চোখে পড়ে। পাশের সিটে আরও কেউ

একজন আছে। সাহায্যকারী! বাঁ হাতের নীচে শক্ত জিনিসটার অবস্থান অনুভব করে নিল মাসুদ রানা।

ওর সামনে দিয়ে ফার্মহাউসের দিকে চলে গেল গাড়িটা। অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের আড়ালে। বাউচারকে তিন মিনিট সময় দিয়ে রানাও উঠে এল ট্র্যাকে। ধীরগতিতে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ফার্মইয়ার্ডে পৌঁছে দেখল বাউচারের গাড়ি ইয়ার্ডের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো। সাইড লাইট জ্বলছে।

ওটার দশ ফুট পিছনে নিজের ভ্যান দাঁড় করাল রানা। ইঞ্জিন অফ করে নামল। ওরটার সাইড লাইটও জ্বলছে।

'মঁশিয়ে বাউচার!' অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হলো ডাকটা। একটু অন্ধকারমত জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা, যাতে সহজে কারও চোখে পড়ে না যায়।

'মঁশিয়ে ব্রাউন!' মোটা লোকটার হাঁপানির শব্দ শুনল রানা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সে। তার সঙ্গীও বেরিয়ে এল। বাউচারের মত না হলেও একেবারে কম মোটা নয় সে-ও। তবে বিশালদেহী। সাড়ে ছয় ফুটের ওপর লম্বা। এ লোক বাউচারের কেমন সাহায্যকারী ভেবে পেল না রানা।

অ্যাকশনের প্রয়োজন হলে এ-লোক দ্রুত নড়াচড়া করতে পারবে কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এর তুলনায় মার্সিয়া নিঃসন্দেহে হাজারগুণ ফাস্ট। কাজেই বিপদ সামাল দেয়ার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বাউচারের দিকে মন দিল রানা।

ড্রামের মত অদ্ভুত ভঙ্গিতে, প্রায় গড়িয়ে কাছে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'টাকা এনেছেন?'

বুড়ো আঙুলের সাহায্যে কাঁধের ওপর দিয়ে নিজের ভ্যানের ড্রাইভিং সিট দেখাল রানা। 'ওখানে আছে। জিনিস?'

বাউচার তার গোদা হাত নাড়ল। 'আমার ভ্যানের পিছনে।'

'আমরা যার-যার মাল দুই ভ্যানের মাঝখানে রেখে বিনিময় পর্বটা সারি, কী বলেন?' পরামর্শের ভঙ্গিতে বলল রানা। 'মনে হয় সেটাই সবদিক থেকে ভালো হবে।'

সঙ্গীর উদ্দেশে ফ্লেমিশ ভাষায় কিছু বলল বাউচার, বুঝতে পারল না রানা। বিশালদেহী লোকটা নীরবে নিজেদের ভ্যানের পিছনের পাল্লা খুলল। রানা দম বন্ধ করে প্রস্তুত হলো। ডান হাত দেহ থেকে সামান্য দূরে আড়ষ্ট হয়ে ঝুলছে। উপহার দেয়ার জন্য যদি কোনও চমক সঙ্গে এনে থাকে বাউচার, তা এখনই মুখ দেখাবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না।

বাউচারের ভ্যানের সাইডলাইটের আবছা আলোয় ভেতরে দশটা চৌকো ক্রেট দেখা গেল। তার একটার মুখ খোলা।

'আপনার বান্ধবী আসেননি?' এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল বাউচার।

জবাবে মৃদু শিস বাজাল রানা। তৎক্ষণাৎ কাছের একটা বার্ন থেকে বেরিয়ে এল মার্সিয়া। সাপ্রেসর পরানো বিশাল একটা মাউজার কোমরের বেল্টে গুঁজে

রেখে বাউচারের উদ্দেশে হাত নাড়ল। 'হ্যালো!'

রানা তাড়া দিল, 'কাজ সেরে ফেলা যাক।'

ড্রাইভিং সিটের ওপর রাখা ব্রিফকেসটা বের করে আনল ও। এক হাঁটুর ওপর রেখে খুলল ডালাটা, তারপর ঘুরিয়ে ধরল বাউচারের দিকে।

'নিন। ক্যাশ। গুনে দেখুন।'

বাউচারের সঙ্গীর কেরামতি এইবার বোঝা গেল। নিশ্চয়ই ব্যাংকের টেলার হবে লোকটা। ব্রিফকেস নিয়ে অবাক করার মত দ্রুতগতিতে টাকা গুনতে লাগল সে। একটা করে বাণ্ডিল গোনা শেষ করে জ্যাকেটের পকেটে ভরে। শেষ বাণ্ডিলের নোট গোনা হতে সবগুলো বের করে আবার পরখ করতে লাগল লোকটা।

পেন্সিল টর্চের আলোয় বাণ্ডিলের যেখান থেকে খুশি ইচ্ছেমত নোট বের করে যাচাই করতে লাগল জাল নোট আছে কি না ওর মধ্যে। সময় নিয়ে সবগুলো বাণ্ডিল চেক করে সন্তুষ্ট হলো—নেই।

'ঠিক আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলে সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল সে। ভ্যানের কাছ থেকে সরে গেল বাউচার।

রানা এগিয়ে গেল সেদিকে। মার্সিয়া সরে গিয়ে এমন এক অ্যাঙ্গেলে দাঁড়াল, যেখান থেকে অনায়াসে বাউচার ও তার সঙ্গীকে একযোগে মোকাবেলা করা যায়। রানা দ্বিতীয় ভ্যানটার পিছন থেকে একটা ভারী ক্রেট তুলে এনে মাটিতে রাখল। পকেট থেকে ছোট্ট টায়ার লিভার বের করে তুলে ফেলল ক্রেটের ঢাকনা।

ভেতরে গায়ে গা লাগিয়ে ঘুমিয়ে আছে নিরীহ চেহারার দশটা ধাতব মৃত্যু। ব্লু-ব্ল্যাক মেটালের স্মাইজার। মসৃণ দেহ।

একটা তুলে নিয়ে ফায়ারিং মেকানিজম পরীক্ষা করে দেখল রানা। পিন আর ব্রিচ মুভমেন্ট যাচাই করে দেখল। তারপর সন্তুষ্ট মনে জায়গামত রেখে ক্রেটের ডালা লাগিয়ে দিল। দশটা ক্রেট পরীক্ষা করে দেখতে বিশ মিনিটের মত লাগল ওর। পুরোটা সময় বাউচারের দানবাকৃতির সঙ্গী রানার পাশেই দাঁড়িয়ে থাকল। আর বাউচার থাকল ওর থেকে বারো ফুট দূরে।

এরপর বাকি থাকল ওগুলোর জন্য পাঁচশ' ম্যাগাজিন ভরা চারটে ক্রেট। সবগুলো ক্রেট থেকে তিন-চারটে করে ম্যাগাজিন বের করল রানা। নিশ্চিত হয়ে নিল ওগুলো একই মডেলের মেশিন পিস্তলের, নাকি সঙ্গে আরও কোনও মডেলের ম্যাগাজিন মিশিয়ে গোঁজামিল দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। না, ঠিকই আছে।

মার্সিয়ার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে। সব ঠিক আছে।' বাউচারের দিকে ফিরল। 'দয়া করে আপনার বন্ধুকে বলবেন, এগুলো ভ্যানে তুলতে আমাকে সাহায্য করতে।'

বলতে হলো না। রানার বলার ভঙ্গি আর বাউচারের ঘুরে তাকানো দেখেই টেলার বুঝে নিল কী করতে হবে। নীরবে হাত লাগাল সে। আলুর বস্তাগুলো বের করে রেখে দশ মিনিটের মধ্যে স্মাইজারের দশটা ফ্ল্যাট ক্রেট আর

ম্যাগাজিনের চারটে কার্টন তুলে ফেলল। আলুর বস্তা নিয়ে ফ্লেমিশ ভাষায় কোনও রসিকতা করল বোধহয় দানব, বাউচারকে প্রবলভাবে ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসতে দেখে সেরকমই মনে হলো রানার।

মাল তোলা হতে মার্সিয়ার তৈরি কাঠের বোর্ডটা বসিয়ে দেয়া হলো ভ্যানের দু'পাশের দুটো স্লটের মধ্যে। নকল টেইলবোর্ড হয়ে গেল সেটা। এবার বস্তার মুখ খুলে আলু ছড়িয়ে দেয়া হলো গাড়ির ভেতর। সবগুলো ক্রেট আর কার্টন একদম চাপা পড়ে গেল ওগুলোর নীচে।

এখন কেউ যদি ভ্যানের পিছনে নজর বোলাতে চায়, এক গাদা আলু ছাড়া কিছুই চোখে পড়বে না তার।

বাউচারের দিকে ফিরল রানা। 'আমরা আগে যেতে চাই, কারণ আমাদের বমাল ধরা পড়ার ভয় আছে। আপনারা দশ মিনিট পরে বের হবেন। অল রাইট?'

'অল রাইট।' নারকেল ঝাঁকাল লোকটা।

মার্সিয়া বসল ড্রাইভিং সিটে। দুই ফ্লেমিশের কাছ থেকে সরে এল রানা, তাদের ওপর চোখ রেখে এক পা দু'পা করে হাঁটতে লাগল ট্র্যাকের দি[illegible]। ভ্যানটা নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে উঠে পড়ল চট্ করে। মার্সিয়াকে কিছু বলল। মাথা ঝাঁকাল ও।

ট্র্যাকের মাঝ বরাবর জায়গায় বেশ বড়ো, চওড়া একটা গর্ত আছে। ওটাকে পাশ কাটানোর সময় খুব ধীরে, সাবধানে যেতে হয়। ওখানটায় পৌঁছে গতি কম করল মার্সিয়া, সঙ্গে সঙ্গে টুপ্ করে নেমে পড়ল রানা। মুহূর্তে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ভ্যান এগিয়ে চলল নাচতে নাচতে।

দশ মিনিট পর বাউচারের ভ্যানও ওই জায়গাটায় এসে গতি কমালো। দুই হাতির ভারে টালমাটাল অবস্থা। সময় বুঝে বড়ো একটা ঝোপের আড়াল থেকে ভূতের মত বেরিয়ে এল রানা। মুঠোয় ধরা আছে একটা তীক্ষ্ণধার ছোরা। সুযোগ বুঝে বাউচারের ভ্যানের পিছনের একটা চাকায় ওটা ঢুকিয়ে দিল খ্যাচ্ করে, বিকট হিশশশ! শব্দে বাতাস বেরিয়ে যেতে লাগল টায়ারের।

রানা ততক্ষণে ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। ঘুরপথে পাঁচ মিনিট পর পাকা রাস্তায় উঠল এসে। এরমধ্যে মার্সিয়া ভ্যানে ভুয়া নাম্বার প্লেট লাগিয়ে রেডি হয়ে নিয়েছে।

বাউচারকে সন্দেহ করে বলে কাজটা করেনি রানা। এসব ক্ষেত্রে সবার উপরে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টাকে স্থান দিতে হয় বলে করছে। ঝুট-ঝামেলা এড়াতে বাউচারের চেয়ে অন্তত এক ঘণ্টা এগিয়ে থাকার ইচ্ছে আছে ওর।

সাড়ে আটটা নাগাদ ব্রাসেলসে পৌঁছল ওরা। ভাড়া করা লক-আপ গ্যারাজে নিয়ে রাখা হলো ভ্যান। স্মাইজারগুলো বেলজিয়ান বর্ডার দিয়ে ফ্রান্সে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে রানার। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলের এক পোর্ট থেকে জাহাজে তোলা হবে ওগুলো। মালটা কীভাবে বেলজিয়ান বর্ডার পার করানো হবে, সে প্ল্যান আগেই পাকা করে রেখেছে।

মার্সিয়াকে পরবর্তী করণীয় ভালো করে বুঝিয়ে দিয়ে শেষ ফ্লাইটে লণ্ডন

ফিরে এল রানা। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে আনট্রেসেবল সেল ফোনটা বের করল প্রথমেই। কোনও মিসড্ কল উঠে নেই দেখে ভাবনায় পড়ে গেল। এই নিয়ে তিনবার ঘটল ব্যাপারটা।

প্রথম শেডিউল মিস হওয়ার ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি রানা। দ্বিতীয়বার একই কাণ্ড ঘটেছে। আশা ছিল এবার নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে লোকটা। কিন্তু...

সাড়া নেই কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। কোনও বিপদ ঘটে যায়নি তো? এতটা দায়িত্বহীন তো মনে হয়নি লোকটাকে!

গুন্থারের চিন্তা চেপে বসতে চাইছিল, কিন্তু সুযোগ দিল না রানা। তাড়াতাড়ি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুন্থারের পরিণতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শেষ করেই রেখেছে ও।

পরদিন শুক্রবার সকালে কুরিয়ারে একটা বড়ো প্যাকেট এল। মার্সেই থেকে আতাসী পাঠিয়েছে। ইওরোপিয়ান রাবারাইজড্ ইনফ্লেটেবল সেমি-রিজিড বোট মেনুফ্যাকচারারদের ব্রোশার। পাঠিয়ে দিয়েছে রানার দেখা ও বাছাই করার জন্য।

নানাভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে ওগুলোকে। সি-রেসকিউ লঞ্চ, পাওয়ার-বোট, ওয়াটার স্কি টো করার স্পিড ক্রাফট, প্লেজার বোট, সাব-অ্যাকুয়া ডাইভিঙের লঞ্চিং ভেসেল, ইয়টের রানঅ্যাবাউট অ্যাণ্ড ফাস্ট টেণ্ডার ইত্যাদি বলে।

কিন্তু জিনিসগুলো আসলে যে মেরিন কমাণ্ডোদের ফাস্ট অ্যাণ্ড ম্যানিউভারেবল অ্যাসল্ট ক্রাফটের ডিজাইন অনুসারে তৈরি করা হয়েছে, সে কথা কোথাও স্বীকার করা হয়নি।

আগ্রহ নিয়ে ওগুলোয় চোখ বোলাল মাসুদ রানা। তিনটে রাবারাইজড্ ইনফ্লেটেবল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের ব্রোশার আছে ওর মধ্যে। একটা ইটালিয়ান, একটা ব্রিটিশ, আর তৃতীয়টা ফ্রেঞ্চ। ইটালিয়ান নির্মাতার ছয়টা স্টকিস্ট আছে কোট ডি অ্যাজিউর উপকূলে। মনে হলো তারাই রানার প্রয়োজন সহজে এবং দ্রুত মেটাতে পারে।

ওগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়োটি সাড়ে পাঁচ মিটার দীর্ঘ লঞ্চ। স্টকে ওরকম দু'টো আছে তাদের এবং এই মুহূর্তেই ডেলিভারি দেয়া সম্ভব। একটা আছে মার্সেইয়ে, অন্যটা ক্যানেস-এ। ফরাসি নির্মাতার সবচেয়ে বড়োটা দেখল রানা। পাঁচ মিটার দীর্ঘ ক্রাফট। সাগরে লেজ দাবিয়ে, নাক উঁচিয়ে ছুটছে।

ব্রোশারের সঙ্গে পাঠানো এক নোটে আতাসী লিখেছে : একটা ফ্রেঞ্চ ক্রাফট এই মুহূর্তে বিক্রির জন্য নিসের এক মেরিন ইকুইপমেন্টস শপে আছে। ব্রিটিশ মডেলগুলো পেতে হলে আগে অর্ডার দিতে হবে। সবগুলো উজ্জ্বল কমলা রঙেও পাওয়া যায়, কিন্তু সে রানার পরামর্শে শুধু কালো রঙেরগুলোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। ওগুলো চালাতে পঞ্চাশ হর্স পাওয়ারের বেশি ক্ষমতাধর আউটবোর্ড ইঞ্জিন লাগবে। লিখেছে : এ মুহূর্তে বিক্রির জন্য প্রস্তুত ওরকম সাতটা ইঞ্জিন

আছে ওর খোঁজে।

আতাসীর হোটেলে ফোন করে মঁশিয়ে ফ্রান্সিসকে চাইল রানা। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে জানিয়ে দিল, তার সোশিয়েট জেনারেল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত টাকা ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করছে রানা। সেদিনই দুপুরের পর তুলে নিতে পারবে সে। তারপর ইটালিয়ান দুটো এবং ফ্রেঞ্চ একটা, মোট তিনটে বোট কেনার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে পার্চেজ অর্ডার প্লেস করতে হবে ওকে।

বোটগুলোর জন্য তিনটে সেরা ইঞ্জিনও কিনতে হবে, তবে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতার কাছ থেকে। সেই সঙ্গে একটা বিশ হাণ্ড্রেডওয়েইট ভ্যানও কিনতে হবে। ভালো কণ্ডিশনের হলে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিসেও চলবে। তবে অবশ্যই পাকা রেজিস্ট্রেশন ও ইনশিওরেন্সের কাগজপত্র থাকতে হবে সেটার।

ক্রেট করা তিনটে ইনফ্লেটেবল অ্যাসল্ট ক্রাফট ও সেগুলোর তিনটে আউটবোর্ড ইঞ্জিন সেই ভ্যানে করে তুঁলোয় নিয়ে যেতে হবে আতাসীকে। বণ্ডেড ওয়্যারহাউসের হাতে তুলে দিতে হবে শিপমেন্টের জন্য। যাবতীয় মাল ৩০ মে-র মধ্যে শিপমেন্টের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

পরের ফোনটা বেলজিয়ামে করল ও। ক্রেডিয়েটব্যাংকের ফরেন অ্যাকাউন্টস সেকশন চিফ গুজেনসকে। মার্সেইয়ের মঁশিয়ে ফ্রান্সিসের সোশিয়েট জেনারেল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে একটা নির্দিষ্ট টাকা তখনই ট্রান্সফার করে দেয়ার নির্দেশ দিতে।

রিসিভার রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মাসুদ রানা। একদৃষ্টিতে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল। নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছে। দেহঘড়িটা গত ত্রিশদিনের অন্তহীন ছোটাছুটি, টেনশন ইত্যাদির মাশুল আদায় করে নিচ্ছে।

তবে স্বস্তির কথা যে আসল কাজ পরিকল্পনা মতই এগোচ্ছে। রানা জানে, এতদিনে অ্যালান বেকার ইউগোস্লাভিয়া থেকে মর্টার, বাজুকা ইত্যাদি কেনার প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলেছে। এর অন্যথা হলে নিশ্চয়ই জানাত ওকে। কিছু যখন জানায়নি, তখন ধরে নিতে হবে তার মিশন সফল হয়েছে বা হওয়ার পথে।

জোহান শ্লিংকার বর্তমানে মাদ্রিদে, স্মাইজারগুলোর এক বছর চলার মত পর্যাপ্ত নাইন মিলিমিটার অ্যামো কিনতে গেছে। এদিকে ব্রাসেলস থেকে মেশিন পিস্তলগুলো ফ্রান্সের তুঁলোয় বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য মার্সিয়াও প্রস্তুত হয়ে যাবে দুই-এক দিনের মধ্যে। আতাসীর কেনা অ্যাসল্ট ক্রাফট আর ইঞ্জিনও এরমধ্যে এজেন্সি মেরিটাইম ডুফট বণ্ডেড ওয়্যারহাউসে জমা হবে এক্সপোর্টের জন্য ক্রেটেড অবস্থায়, শ্লিংকারের সরবরাহ করা প্রয়োজনীয় অ্যানসিলারি গিয়ারসহ।

লণ্ডনে ফায়জা যে কাজে ব্যস্ত ছিল, সে কাজও হয়ে গেছে। ইউনিফর্ম কেনা বাকি ছিল ওর, হয়ে গেছে সে-কাজ। ওগুলোও সময়মত তুলোঁর উদ্দেশে যাত্রা করবে। শুধু মেশিন পিস্তলগুলো চোরাইপথে ফ্রান্সে আনতে হবে ওকে। বাকি সব কাজ আইনি পথ অনুসরণ করেই হয়েছে।

কোথাও কোনও ঝামেলা নেই।

কিন্তু রানা খুব ভালোই জানে, তার মানে এই নয় যে এতকিছুর পরও কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে যাওয়ার ভয় নেই। মাদ্রিদ বা বেলগ্রেড, কেউ যদি মাল সরবরাহ করতে অহেতুক সময় নষ্ট করে বা কাগজপত্র সন্তোষজনক নয় বলে বেঁকে বসে, অথবা ব্যাখ্যার অতীত আর কোনও কারণে মাল বিক্রিতে আপত্তি জানিয়ে বসে, তা হলে মহা বিপদ হবে।

অবশ্য সবচেয়ে বড়ো সমস্যার সমাধান এখনও বাকি আছে। মিশ্রি খান জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারেনি এখন পর্যন্ত। এক মাস চক্কর মেরে যা-ও বা একটা জোগাড় করেছিল, কিছু জটিলতার কারণে সেটা কেনা সম্ভব হয়নি। এখন জেনোয়ায় আছে ও। দেখা যাক।

রবিবার সকালে ফোন বাজল। 'মিস্টার জেমস ব্রাউন?' অপারেটর বলল।

'ইয়েস?'

'একটু ধরুন, প্লিজ।'

একটু পর মিশ্রি খানের গলা শোনা গেল। ক্ষীণ, তবে স্পষ্ট। 'মিস্টার ব্রাউন!'

'বলো, কার্লো।'

'আমি জেনোয়া থেকে বলছি।'

'আমি জানি। খবর বলো।'

'পেয়েছি, ভাতিজা... সরি, ওস্তাদ! এবার ভুল করিনি। ঠিক যেমনটা আপনি চেয়েছিলেন। কিন্তু এটার আরও একজন ক্রেতা জুটে গেছে। সে জন্য হয়তো দাম কিছু বাড়িয়ে দিতে হতে পারে। তবে বোটটা দারুণ! আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে।'

'তুমি শিওর?'

'হাজারবার শিওর, ওস্তাদ। রেজিস্টার্ড ফ্রেইটার এটা। জেনোয়া বেজড্ এক শিপিং কোম্পানির সম্পত্তি। অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। দেখতে একটু পুরনো লাগে। কিন্তু জিনিস এক নম্বর।'

'আমি কালই আসছি,' এক সেকেণ্ড দেরি না করে বলল ও। 'তুমি কোন হোটেলে আছ?' নামটা শুনে বলল, 'আমার জন্যও একটা রুম বুক করো। কালকের প্রথম ফ্লাইট কখন জানি না। তবে যখনই হোক, ওটাতেই আসছি আমি।'

কয়েক মিনিট পর বিইএ রিজার্ভেশনের সঙ্গে কথা বলল মাসুদ রানা। জানা গেল, ইটালিমুখো দিনের প্রথম ফ্লাইট হবে আলিটালিয়ার ফ্লাইট। লণ্ডন-মিলান-জেনোয়া। হিথরো থেকে ফ্লাই করবে জিরোনাইনজিরোফাইভ আওয়ারে। দুপুর একটার দিকে জেনোয়ায় পৌঁছবে ওটা।

সিট বুক করে ফেলল রানা। এই জাহাজটা যদি উপযুক্ত জাহাজ হয়ে থাকে, তা হলে আশা করা যায় আগামী বারোদিনের মধ্যে মিশনের বাকি সব খুচরো ঝামেলা শেষ করে ফেলা যাবে। তারপর বাকি থাকবে ভালো ক্রু

নিয়োগের কাজ। ওটা হয়ে গেলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এবং তারপর...

জাংগারোর বর্তমান পরিস্থিতির কথা যদি জানা থাকত ওর, যদি জানত রাশা কিমবাকে রাজি করিয়ে প্রেসিডেন্ট প্যালেসের 'নিরাপত্তা' রক্ষার কাজে নিজেদের একটা মেরিন কন্টিনজেন্টকে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, তা হলে এতটা আত্মবিশ্বাসী হয়তো হতো না মাসুদ রানা।

পাঁচ

ক্লারেন্স। আমেরিকান দূতাবাস। নিজের বিলাসবহুল অফিস রুমে অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছেন কেন উইলিয়ামসন। অফিস আওয়ার শেষ, আর কোনও ভিজিটর আসার সম্ভাবনা নেই। তাই নিশ্চিন্তে টাইয়ের নট্ আলগা করে বসে আছেন তিনি।

সামনে দুধ সাদা প্যাডের কাগজে টাইপ করা একটা খোলা চিঠি পড়ে আছে। ঈগল এম্বস করা কাগজে লেখা চিঠি। এসেছে ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। জাংগারোর প্রেসিডেন্ট, হিজ এক্সেলেন্সি ফ্রান্সিস কিমবার কাছ থেকে এ দেশের হিন্টারল্যাণ্ডে খনিজের খোঁজে গবেষণা চালানোর অনুমতি আদায় করতে সফল হওয়ায় চিঠিতে প্রথমে অভিনন্দন জানানো হয়েছে উইলিয়ামসনকে।

এটা এ সম্পর্কিত দ্বিতীয় চিঠি অবশ্য। মিশন সফল হওয়ায় বেশ আগেই তাঁকে প্রথম দফা অভিনন্দন জানিয়েছে ওয়াশিংটন। এবারেরটা হচ্ছে প্রথম চিঠির অনুসৃতি। আমেরিকান সার্ভে টিম জাংগারোর উদ্দেশে রওনা হতে যাচ্ছে, সেই খবরটা তাঁকে অবহিত করতে লেখা। এই সূত্রে আরও একবার তাঁকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে ভুল করেনি পররাষ্ট্র দফতর।

কিন্তু কেন উইলিয়ামসন সে জন্য খুব একটা আশাবাদী হতে পারছেন না। ভীষণরকম দোটানায় আছেন। কারণ একটা কাজে সফল হতে না হতে রাশানরা আবারও তাঁকে ল্যাং মেরেছে। একটা রহস্যজনক ঘটনাকে ছুতো বানিয়ে প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ধুয়া তুলে তাঁকে টেক্কা দিয়েছে ওরা।

কিমবাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে একদল মেরিনকে লাগিয়ে দিয়েছে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস গার্ড দেয়ার কাজে। অর্থাৎ তাকে পুরোপুরি কবজা করে ফেলেছে বদমাশগুলো। বেশি নয় অবশ্য—দশজন মেরিন। কিন্তু বেশি বা কমের ব্যাপার নয়, ব্যাপার হলো রাশানদের দাবাড়ু বুদ্ধির কাছে আরও একবার কূটনৈতিক পরাজয় ঘটেছে উইলিয়ামসনের।

রাশানরা এসব কেন করছে, তা বোঝার মত আক্কেল আছে উইলিয়ামসনের। সময়ের কাজ সময়মত না করে ফেলে রেখে যে অপরাধ করেছে, তা ঢাকা দিতে এসব করছে ব্যাটারা। কিন্তু অপরাধটা যে কী, তা

এখনও অজানাই আছে।

আমেরিকান সার্ভে টিম পৌঁছার আনুমানিক তারিখটার উপর আরেকবার চোখ বোলালেন। ওয়াশিংটন যে সময়সীমার কথা বলছে, তাতে টিমের পৌঁছতে কম করেও দু' মাস লাগবে।

উইলিয়ামসনের কেবলই আশঙ্কা হচ্ছে, এর মধ্যে বড় ধরনের কোনও ওলট-পালট ঘটে যেতে পারে। তাঁর মন বলছে, সার্ভে টিম পৌঁছতে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

ওদিকে হোটেল ইণ্ডিপেনডেন্সের মালিক হেনরি গোমেজের কথা ভেবেও মনটা খারাপ হয়ে আছে তাঁর। ভালোমানুষ ছিল বেচারা। কয়েক বছর থেকে এখানে সুনামের সঙ্গে হোটেল ব্যবসা করে আসছিল। ক'দিন আগে কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের প্রধান, পিয়েরে ওকুম্বা ধরে নিয়ে গেছে মানুষটাকে। উফা প্রিজনে এখন প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হচ্ছে তার উপর।

উইলিয়ামসন শুনেছেন, তার বিরুদ্ধে নাকি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। এ ব্যাপারে কী এক স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা চলছে তার কাছ থেকে। ওদিকে তার হোটেল সো-কলড্ জাতীয়করণ করা হয়েছে। সেটা এখন কিমবার ইয়ুথ নেতার হেড অফিস।

শোনা কথা: গোমেজকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারে।

এখানকার প্রতিটা দূতাবাসে আলোচনা হয় লোকটাকে নিয়ে। দিলখোলা, সৎ মানুষ বলে সবাই পছন্দ করত তাকে। এখন দুঃখ করে। সন্ধে হলেই তার অভাব বেশি বেশি অনুভব করে। কারণ দূতাবাস কর্মচারীদের বাইরে সময় কাটানোর একটাই জায়গা ছিল এখানে, হোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেনসের বার।

সবসময় চাহিদামত ড্রিঙ্কস না পেলেও সন্ধের দিকে কিছুটা সময় গোমেজের বারে বসে গল্প-গুজব করে কাটাতে ভালবাসত অনেকেই। সে সুযোগও হয়ত গেল।

সব মিলিয়ে ভারী হতাশাজনক পরিস্থিতি!

ছোটো-বড়ো নানান আকারের এবং নানান চেহারার অজস্র নৌ-যানে গিজগিজ করছে জেনোয়া বন্দর। দুপুরের কড়া রোদে ঝলমল করছে সাগরের গাঢ় নীলচে-সবুজ পানি এবং তার উপর ভাসমান রং-বেরঙের ইয়ট, ফ্রেইটার, কোস্টার। নানান মানুষের কোলাহল আর বিচিত্র যান্ত্রিক শব্দে ডক এলাকা সরগরম।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে মিশ্রি খানকে অনুসরণ করল রানা। ক্রেন, ফর্ক লিফট, ট্রাক, ট্রলি প্রভৃতির ফাঁক-ফোকর দিয়ে সেরে-সামলে ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে এল পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন। হাত তুলে একটা মোটর ভেসেল দেখাল।

নাম টেমপেস্ট। পুরনো, রং চটা একটা কোস্টার। দু'পাশে পাহাড় প্রমাণ দু'টো তিন হাজার টনী ফ্রেইটারের মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে আছে টেমপেস্ট। তার পরেও রাজকীয় ভঙ্গিমায় সামনে-পিছনে দোল খাচ্ছে অল্প অল্প। দেখামাত্র ভেসেলটা পছন্দ হয়ে গেল রানার। জাংগারো অভিযানের জন্য মনে মনে

যেরকমটা খুঁজছিল, ঠিক সেই রকম ওটা।

সামনে ছোটো একটা ফোরপিক আছে। তারপর সিঁড়ি বেয়ে চার ধাপ নামলে মেইন ডেক। ডেকের ঠিক মাঝখানে রয়েছে বড় হ্যাচওয়ে। অ্যামিডশিপের একমাত্র কার্গো হোল্ড। আফটার ডেকে আছে পিচ্চি ব্রিজ এবং তার ঠিক নীচেই ক্রু'জ কোয়ার্টার্স ও ক্যাপ্টেন'স কেবিন। মাস্তুলটা খাটো। প্রায় খাড়া একটা লোডিং ডেরিক জোড়া রয়েছে তার সঙ্গে। স্টার্নের উপরের রাইট আফটে ওটার একমাত্র লাইফবোটটা ঝুলছে।

অযত্নের কারণে দেহের সর্বত্র জং ধরে গেছে টেমপেস্টের। কড়া রোদের কারণে অনেক জায়গার রং জ্বলে ফেটে খসে পড়েছে, কোথাও বা খসেছে লবণ পানির কারণে। ছোটো, পুরনো এবং বেচারা টাইপের ভেসেল। কারও বিশেষ নজর কাড়ার মত নয়। এরকম জিনিসই চাইছিল রানা।

কোস্টাল ইনশোরে এরকম হাজার হাজার খুদে ফ্রেইটার বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়। মালামাল পরিবহন করে। হাইফা থেকে জেবেল আল তারিক বা জিব্রাল্টার, তানজিয়ার থেকে ডাকার, মনরোভিয়া থেকে সিমনসটাউন। প্রতিটার চেহারা একই রকম হতচ্ছাড়া কিসিম। একবারের বেশি দু'বার তাকিয়ে দেখে না কেউ। সাধারণ পণ্য ছাড়া ওগুলো আর কিছু বহন করতে পারে, সে চিন্তাই কারও মাথায় আসে না।

'কেমন মনে হচ্ছে, ওস্তাদ?' বলল মিশ্রি খান।

'মন্দ না,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভালোই।'

ওর চেহারার লেখা পড়ে নিশ্চিত হলো পাঞ্জাবি। 'চলুন।'

রানাকে নিয়ে টেমপেস্টের ডেকে উঠে এল মিশ্রি খান। আফট ডেকে এসে কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নীচের ক্রু'জ কোয়ার্টার্সের আবছা অন্ধকার জগতের উদ্দেশে পা বাড়াল।

'হ্যালো!' ডাকল খান।

কম্প্যানিয়নওয়ের গোড়ায় এক পেশিবহুল, কঠোর চেহারার লোকের মুখোমুখি হলো ওরা। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বয়স। খানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল লোকটা। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিল খান।

'ইনি হবু বায়ার, মিস্টার জেমস ব্রাউন। আর এই ভাতিজা হচ্ছে কার্ল ওয়ালডেনবার্গ। টেমপেস্টের ফার্স্ট মেট।'

চেহারায় ব্যগ্রতা ফুটল ফার্স্ট মেটের। তাড়াতাড়ি রানার ডান হাতটা লুফে নিয়ে হ্যাণ্ড শেক করল। 'আপনি শিপ দেখতে এসেছেন, হের ব্রাউন?' জার্মান অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে জানতে চাইল লোকটা।

রানা মৃদু হেসে মাথা দোলাল। জার্মান নাবিকের আগ্রহের কারণ বুঝতে পারছে। মিশ্রি খান তাকে আগেই জানিয়ে রেখেছে রানার আগমনের উদ্দেশ্য। হের ব্রাউন শিপ কিনতে আগ্রহী। এ ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তিটির প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার অন্যরকম আকর্ষণ থাকেই, বিশেষ করে যেখানে তাদের ভবিষ্যতের প্রশ্নটিও জড়িত।

টেমপেস্টের ক্যাপ্টেন ইটালিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার সার্বিয়ান। দু'জনেই তীরে রয়েছে এ-মুহূর্তে। এক টিন-এজ ইটালিয়ান ডেকহ্যাণ্ড আছে। বাঙ্কে শুয়ে একটা মেয়েলি ম্যাগাজিন গিলছিল। অচেনা কণ্ঠ শুনে নেমে এল ছেলেটা। ফার্স্ট মেট তাকে নবাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর একাই ওদেরকে ঘুরিয়ে দেখাল ফ্রেইটার।

মাসুদ রানা তিনটি বিষয়ে বেশি আগ্রহী। কর্মচারী ছাড়া আরও অন্তত পনেরোজনকে বহন করার মত জায়গা থাকতে হবে ভেসেলে। তার মধ্যে কয়েকজনকে যদি খোলা ডেকেও ঘুমাতে হয়, ঘুমাবে। অসুবিধে নেই। কিন্তু স্পেস চাই। তাছাড়া পর্যাপ্ত স্পেসের মেইন হোল্ড আর কিছু কিছু ক্রেট ডেকের নীচের বিল্‌জ্-এ লুকিয়ে রাখার মত ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকতে হবে। আর থাকতে হবে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত ইঞ্জিন। যেটা ওদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার মত দূরত্বে অনায়াসে নিয়ে যেতে পারবে নিশ্চিন্তে।

ওর প্রশ্ন শুনে চাউনি সরু হয়ে উঠলেও জবাব দিতে দেরি করল না কার্ল ওয়ালডেনবার্গ। কেননা ওই প্রশ্নেই পার্টির উদ্দেশ্য তার মোটামুটি বোঝা হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের গরম রাতে টেমপেস্টের হোল্ড কাভারের ওপর কম্বল বিছিয়ে ঘুমানোর সুযোগ নিয়ে ধন্য হওয়া যাবে, কেবল এই আশায় কেউ যে তাদের ভেসেল কিনতে আসবে না, বা পেট বোঝাই ক্রেট নিয়ে আফ্রিকার আরেক মাথায় যেতে হবে বলে এত ছোটো ভেসেল কেউ খুঁজবে না, এটুকু বোঝার মত আক্কেল আছে তার।

টেমপেস্টের মত ছোটো ভেসেলের সুবিধা হচ্ছে খুব অল্প সময়ের নোটিসে ঝট্‌পট্ মাল বোঝাই করে দু'দিনের মধ্যে কয়েকশ' মাইল দূরের গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারে। বড়ো ভেসেলের পক্ষে তা সম্ভব হয় না, কারণ সেগুলো অনেক সময় নিয়ে কাজ করে। গন্তব্য পাঁচশ মাইলের বেশি হলে টেমপেস্টের মত ভেসেলের খোঁজ কেউ করে না।

বোট পরিদর্শন সেরে উপরে উঠে এল সবাই। ব্রিজের পিছনে ক্যানভাসের তৈরি একটা শেডের নীচে বসল রানা ও মিশ্রি খান। ওয়ালডেনবার্গের নিজ হাতে তৈরি চমৎকার কফিতে চুমুক দিল রানা ও খান। একটু পর প্রসঙ্গটা তুলল। প্রথমে মিশ্রি ও ফার্স্ট মেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল সেটা। ওয়ালডেনবার্গ নিচু কণ্ঠে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগল আর খান ততধিক নিচু কণ্ঠে জবাব দিয়ে চলল।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতে রানার দিকে তাকাল ফার্স্ট মেট। তারপর মিশ্রির দিকে ফিরে বলল, 'সম্ভব।'

হাসি মুখে রানার দিকে ফিরল খান। উর্দুতে বলল, 'ওস্তাদ, ভাতিজা জানতে চায় আপনার মত কোটিপতি, যে কার্গো ব্যবসা সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে কেন এরকম একটা ফ্রেইটার কিনতে চায়। আমি বলেছি, আপনি ব্যবসায়ী। সিম্যান নন। ও ভাবছে, এই ব্যবসা খুবই রিস্কি ব্যবসা। আপনি নিশ্চয়ই আর কোনও মতলবে এটা কিনতে চাইছেন।'

একটু ভাবল রানা। 'লোকটা সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছ?'

'করেছি।' মাথা ঝাঁকাল পাঞ্জাবি। 'তা নিয়ে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই ভাতিজা সবদিক থেকে ফিট। আমাদের সঙ্গে নিয়ে নিলে মন্দ হবে না।'

'হুঁম। এটা বিক্রি হচ্ছে কী কারণে?'

'ক্যাপ্টেনই হচ্ছে এটার মালিক, ওস্তাদ। বয়স হয়ে গেছে তার। রিটায়ার করতে চায় বলে বিক্রি করবে। বিক্রির টাকায় বাকি জীবন কাটাবে।'

'আচ্ছা। তা হলে এটা বিক্রি হয়ে গেলে সে আর ক্যাপ্টেন থাকছে না?' রানা জানতে চাইল।

'না। থাকছে না। পদটা খালি হবে। আমরা ওয়ালডেনবার্গকে সেখানে অনায়াসে নিয়ে নিতে পারব। সেটাই ভাল হবে আমার মতে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এ লোক মালিকের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ। সাগর ভাল চেনে। জাহাজের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত প্রতিটা নাট-বল্টু সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে। অবশ্য... লোকটা আমাদের সাথে কাজ করতে রাজি হবে কি না, সেটা আলাদা কথা।' একটু বিরতি। কিছু ভাবল খান। তারপর আপনমনে মাথা দোলাল। 'আমার মনে হয় রাজি হবে। যদি পারিশ্রমিকের অংক তার পছন্দ হয়।'

'ও আমাদের ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করেছে মনে হয়,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল রানা।

'অবশ্যই! তবে লোকটার ধারণা আমরা ইংল্যাণ্ডে বেআইনী ড্রাগস রান করি। অবশ্য মনমত টাকা আয় হলে তাতে ও আপত্তি করবে না। ঝুঁকি নিতে রাজি হবে।'

'আগে ভেসেল কেনার ব্যাপারটা ফয়সালা হোক,' রানা বলল। 'তারপর সে-ই ঠিক করুক থাকবে, নাকি চলে যাবে।'

'একে ধরে রাখতে পারলে আমাদের সুবিধাই হবে, মেজর। প্রথম সুবিধা, লোকটা এই জাহাজ চেনে নিজের হাতের তালুর মত। আরেক সুবিধা, ও যদি আমাদের হয়ে কাজ করতে রাজি হয়, তা হলে এটাকে কিনে নেয়ার জন্য পিছনে লেগে থাকা সেই জাহাজ কোম্পানি সুবিধা করতে পারবে না। ওটার বদলে আমাদের কাছেই টেমপেস্টকে বিক্রি করার জন্য ক্যাপ্টেনকে রাজি করাতে পারবে এই লোক। এর মতামতের মূল্য দেয় মালিক। কারণ সে চায় নিজের অবর্তমানে টেমপেস্ট যেন ভাল হাতের তত্ত্বাবধানে থাকে। তবে আমার মনে হয়,' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল খান। 'লোকটাকে আমাদের সঙ্গে থাকার প্রস্তাব দিতে হলে আমাদের মিশনের ধরন সম্পর্কে অন্তত কিছুটা আন্দাজ দেয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে।'

'কিন্তু জানার পর যদি কুইট করে?'

'সে ঝুঁকি তো আছেই। তবে আমার মনে হয় তা করবে না। তা ছাড়া আমাদের হাতে বেশি সময়ও নেই মনে হয়?' সমর্থনের জন্য রানার মুখের দিকে তাকাল পাঞ্জাবি। ও মাথা দুলিয়ে সায় জানাতে বলল, 'এ অবস্থায় লোকটাকে বাদ দিলে উপযুক্ত আরেকজন ক্যাপ্টেন খুঁজতে হবে আমাদেরকে। তাতে কতদিন লাগবে তার ঠিক কী? মনে হয়, আমাদের কাজ সম্পর্কে আগে থেকেই

সামান্য আভাস দিয়ে দেখা যেতে পারে লোকটাকে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।'

ওর দিকে সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল খান। কিন্তু রানা মাথা নাড়তে একাই ধরাল।

জার্মান ফার্স্ট মেটকে দলে টানতে পারলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে, মনে মনে সেগুলো যাচাই করে দেখল রানা। হাতে সময় বলতে গেলে নেই, সবার আগে এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে। তাই টেমপেস্টকে হারানোর ঝুঁকি কিছুতেই নেয়া যাবে না।

ওয়ালডেনবার্গ এটা পেতে সাহায্য করতে পারবে ওকে এবং ক্যাপ্টেনের দায়িত্বও নিতে পারবে। উপযুক্ত দেখে নিজের নতুন ফার্স্ট মেটও জোগাড় করে নিতে পারবে নিজেই। ফ্রেইটারের বাকি স্টাফদের নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও পারবে।

কোথায় যেন পড়েছিল রানা, কাউকে দিয়ে ইচ্ছামত কাজ করিয়ে নিতে মানুষ ঘুষ দেয়ার মত যে অনৈতিক কাজটি করে থাকে, তারও একটা বিধান আছে।

সেটা এরকম : সবাইকে ঘুষ দিতে যেয়ো না। যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে, শুধু তাকে দাও। অধীনস্থদের কাছ থেকে সে-ই তোমার কাজ আদায় করে নেবে।

ওয়ালডেনবার্গকে দলে টানার জন্য রানাও অনেকটা সেই ধরনের সিদ্ধান্ত নিল। তাকে চমকে দিয়ে উর্দু ছেড়ে খাস জার্মান ভাষায় আলাপ শুরু করল। 'যা বলবার সরাসরি বলছি, হের ওয়ালডেনবার্গ। আমি টেমপেস্ট কিনলে এটায় করে বাদামের চালান আনা-নেয়া করব না। অন্য কার্গো ক্যারি করব। সেগুলো কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে, তবে কার্গো একবার আনলোড হয়ে গেলে শিপ বা চালকের কোনও ঝুঁকি থাকবে না। কারণ শিপ তখন থাকবে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্সের বাইরে, যাকে বলে আন্তর্জাতিক জলসীমায়। আমার একজন ভাল স্কিপার চাই। আমার এই বন্ধুটি বলছেন, আপনাকে দিয়ে আমার প্রয়োজন মিটবে। কাজেই আসুন, আসল কথায় যাওয়া যাক।

'যদি আমি এটা কিনতে পারি, আপনাকে ক্যাপ্টেনের পদ অফার করব। এখনকার বেতনের ঠিক দ্বিগুণ বেতন পাবেন আপনি, অন্তত ছয় মাস পর্যন্ত। এবং প্রথম শিপমেণ্ট জায়গামত পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশ হাজার ডলার বোনাস পাবেন। ধরুন, আর দশ সপ্তাহ পর।'

চুপ করে শুনে গেল ওয়ালডেনবার্গ। রানার কথা শেষ হতে একবার মিশ্রি খানকে দেখল, একবার রানাকে। হঠাৎ দাঁত দেখা দিল তার। 'ধরে নিন, ক্যাপ্টেন পেয়ে গেছেন আপনি।' ডান হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা।

'কিন্তু আগে এটা চাই আমি,' পা দিয়ে ডেকে আঘাত করল রানা। শেক হ্যাণ্ড করল তার সঙ্গে।

'কোনও অসুবিধে হবে না। দাম কত দিতে প্রস্তুত আছেন?'

'কত হতে পারে এটার দাম?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'এখন যেমন আছে, সেই অবস্থায় এটার বাজারদর এই ধরুন, ষাট হাজার পাউণ্ড। নট ডলার। পাউণ্ড।'

'ওয়েল, আমি সত্তর হাজার দিতে রাজি আছি,' রানা বলল। 'পাউণ্ড। নট ডলার।'

মাথা ঝাঁকাল ওয়ালডেনবার্গ। 'তা হলে ধরে নিন এটাও পেয়ে গেছেন আপনি। আমি আজই মালিকের সঙ্গে কথা বলব। আপনি ইটালিয়ান জানেন?'

'কিছু কিছু,' বলল রানা।

'ওতেই চলবে। বুড়ো স্পিনেত্তি আবার ঠিকমত ইংরেজি বলতে পারে না। তার সাথে দেখা করতে হবে আপনাকে। আমিও থাকব। কখন সময় দিতে পারবেন?'

'কাল সকালে?'

'ঠিক আছে। তাই হবে। কাল সকাল দশটায় এখানে দেখা করছি আমরা।'

ব্রাসেলস। ভাড়া করা লক-আপ গ্যারাজে নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছে মার্সিয়া। জায়গাটা মূল ব্রাসেলস শহরের ঠিক বাইরে। না কমার্শিয়াল, না রেসিডেনশিয়াল। আবার এক অর্থে দু'টোই। লোক চলাচল অনেক কম এখানে। বেশ নিরিবিলি।

গ্যারাজের দরজা লক করা। ভেতরের জায়গা যাতে বাড়ে, সে জন্য কাভার্ড ভ্যানটা বাইরে রেখে এসেছে মার্সিয়া। সামনেই লকড্ অবস্থায় আছে সেটা। আজ নিয়ে দ্বিতীয় বিকেল কাটাচ্ছে ও নির্জন গ্যারাজে। প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।

গ্যারাজের পিছনের দেয়াল বরাবর একটা ওয়ার্ক বেঞ্চমত আছে। আগে থেকেই ছিল। সেটার ওপর সাজানো আছে মার্সিয়ার যন্ত্রপাতি। আরেক দেয়ালজুড়ে উল্টো করে রাখা আছে পাঁচটা বড় আকারের ড্রাম। গাঢ় সবুজ রঙের। চুয়াল্লিশ গ্যালন বা দু'শো লিটারের হেভি লুব্রিকেটিং অয়েলের ড্রাম। প্রতিটার গায়ে ক্যাস্ট্রল অয়েল কোম্পানির সিল মারা। এ মুহূর্তে খালি।

মার্সিয়ার সুবিধার জন্য জাহাজের ব্যবহৃত মালপত্র বিক্রি করে, এমন এক প্রতিষ্ঠান থেকে এগুলো কিনে রেখে গেছে রানা। এ মুহূর্তে উল্টো করে রাখা আছে। ওগুলোর তলার বেশ বড় একটা অংশ সুন্দর গোল করে কাটা। ডিস্কের মত। এ কাজটাও রানা করিয়ে রেখে গেছে বন্দরের এক মেশিন-শপ থেকে।

গোল করে কাটা গর্তের চারদিকটা দেড় ইঞ্চি ফ্লাঞ্জ দিয়ে যত্নের সঙ্গে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ড্রামের অরিজিনাল বেজের ফ্লাঞ্জ কেটে তৈরি করা হয়েছে ওটা।

ভ্যান থেকে আগেই স্মাইজারের দু'টো ক্রেট বের করে রেখেছিল মার্সিয়া। সে দু'টোর বিশটা মেশিন পিস্তল এবং একশ'টা ম্যাগাজিন এখন ওই গর্ত দিয়ে ড্রামের পেটে তাদের জন্য তৈরি নতুন আশ্রয়ে যেতে প্রস্তুত প্রায়। পিস্তলগুলোকে এরইমধ্যে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে মমি বানিয়ে ফেলেছে ও।

প্রথমে চটচটে মাস্কিং টেপ দিয়ে প্রত্যেকটার আগা থেকে মাথা পর্যন্ত টাইট করে মুড়ে দিয়েছে। এক চুল পরিমাণ জায়গাও বাদ রাখেনি। প্রতিটার জন্য বরাদ্দ

পাঁচটা করে ম্যাগাজিনও একইভাবে টেপে মুড়ে আটকে দিয়েছে পিস্তলের সঙ্গে।

টেপ দিয়ে মোড়ার প্রক্রিয়া শেষ হতে প্রতিটা মেশিন পিস্তল পুরু পলিথিনের ভিন্ন ভিন্ন এনভেলপে পুরেছে মার্সিয়া। তারপর প্যাকেটগুলোকে বায়ু শূন্য করে মুখ সুতলি দিয়ে মজবুত করে বেঁধে ওটাকে আরেকটা একই রকম এনভেলপে ভরেছে। ওটার মুখও বাঁধা হয়েছে একইভাবে। এর ফলে আবার বাতাসের সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত শুকনোই থাকবে অস্ত্রগুলো। অন্তত রানা সেরকমই আশা করছে।

সবশেষে দুই ক্রেটের বিশটা মেশিন পিস্তল ও সেগুলোর ম্যাগাজিনসহ প্যাকেট করে সবগুলোকে দু'টো ওয়েবিং স্ট্র্যাপ দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে বড়সড় একটা বাণ্ডিল বানিয়ে ফেলল মার্সিয়া। ড্রামের তলারদিকের নতুন কাটা মুখ দিয়ে ভেতরে ভরে দিল, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দু' হাতে আস্তে করে নামিয়ে রাখল মেঝেতে। চওড়া ড্রাম, কাজেই বাণ্ডিলটা রাখার পরও চারদিকে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়ে গেল।

প্রথম বাণ্ডিল ভেতরে রেখে ড্রামের তলা নতুন করে সিল করার কাজে লাগল ও। মেশিন-শপ থেকে টিনপ্লেটের নতুন ডিস্কও কাটিয়ে রেখে গিয়েছিল রানা, তার একটা তুলে নিয়ে খোলা মুখটার ওপর রাখল মার্সিয়া। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওটাকে আস্তে আস্তে ডানে-বাঁয়ে করে সেট করল। রিমের সঙ্গে একদম খাপে খাপে মিলে গেল টিনপ্লেট ডিস্কের মুখ।

নতুন মুখ কাটার কারণে অরিজিনাল তলার যে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ওভারল্যাপ বেরিয়ে ছিল, সেটা নিখুঁতভাবে ঢাকা পড়ে গেল। এবার কালো সানগ্লাস চোখে দিয়ে গ্যাস বটল ও বার্নার চালিত স্টিম জেট অন করল মার্সিয়া। একটা সফট সোল্ডারিং স্টিক নিয়ে সাবধানে টিনপ্লেটের বডির সঙ্গে টিনপ্লেটের ডিস্ক ঝালাই করার কাজ শুরু করে দিল। এ পদ্ধতিকে সুয়েটিং বলে।

মেটালের সঙ্গে মেটাল ঝালাই করে জোড়া লাগানো যায়। সে জোড়া সাধারণত অত্যন্ত মজবুত হয়ে থাকে। কিন্তু ইগনাইটেবল ফিউয়েল বা দাহ্য জ্বালানি অথবা তেল যে ব্যারেলে একবার রাখা হয়, সেটা খালি করে ফেলা হলেও ভেতরের দেয়ালে পদার্থটার পাতলা একটা আবরণ থেকেই যায়। সেই মেটাল কোনও কারণে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পর্দাটা উগ্রগন্ধী ধোঁয়ায় পরিণত হয়। ঝালাই করার সময় এটা ঘটতে পারে। খুব সহজে বিস্ফোরণও ঘটতে পারে সে সময়। তাই লোয়ার টেম্পারেচারে, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সুয়েটিং করতে হয়।

এভাবে এক টুকরো টিনপ্লেট আরেক টুকরো টিনপ্লেটের সঙ্গে জুড়ে দেয়া যায় ঠিকই, কিন্তু সে জোড়া খুব বেশি মজবুত জোড়া হয় না। কাজ মোটামুটি চলার মত হয়। তা-ও যদি সে ড্রাম খাড়া করে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়, গড়াগড়ি না খায় ড্রাম, ভিতরের জিনিসপত্র ইচ্ছামত নড়াচড়া করার সুযোগ না পায়, অথবা হ্যাণ্ডলিঙের সময় 'ধাম! ধুম!' করে আছাড় মারা না হয়।

ক্লান্তিকর কাজটা শেষ করতে পেরে হাঁফ ছাড়ল মার্সিয়া। সোলডারিং রডের পড়ে থাকা টুকরোগুলো কুড়িয়ে-কাছিয়ে ব্যাগে পুরল। তারপর ড্রামটা ঠাণ্ডা হতে

ঝালাই করা অংশের ওপর দুনিয়াব্যাপী ক্যাস্ট্রল অয়েল ড্রামের যে নির্দিষ্ট রং আছে, সেই রং স্প্রে করল অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে।

পেইন্ট শুকানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিল মার্সিয়া। তারপর সাবধানে ওটাকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করাল। উপরের সত্যিকারের মুখ, স্ক্রু-ক্যাপটা খুলল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে। গ্যারেজের আরেক কোনায় রাখা অনেকগুলো বড় বড় জেরি-ক্যানের একটা এনে ড্রামের মুখে ফানেল পরাল। ওর মধ্য দিয়ে লুব্রিকেটিং অয়েল ঢালতে লাগল ড্রামে।

এমারেল্ড গ্রিন রঙের চটচটে, ঘন তরল পদার্থ বগ-বগ শব্দে নীচের দিকে ছুটল জায়গা করে নিতে। ধীরে ধীরে দখল করে নিল ড্রাম ও মেশিন পিস্তলের মাঝের এয়ার স্পেস। নিঃশব্দে উপরের দিকে উঠে আসার ফাঁকে অস্ত্রগুলোর মাঝের প্রতি বিন্দু জায়গা, ওয়েবিং আর সুতলির গিঁটের ফাঁক, সব দখল করে নিল। পলিথিন ব্যাগগুলো বায়ুশূন্য করে নেয়া হয়েছিল। তারপরও কিছু খুদে বুদ্বুদ দেখা গেল ওগুলোর ভিতরে। পিস্তলের ম্যাগাজিন, ব্যারেল আর ব্রিচের মধ্যে আটকে আছে।

বুদ্বুদগুলোর কারণে মেটালের ওজনের ভারসাম্য কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হলো। বাণ্ডিলগুলো প্রায় ওজনশূন্য হয়ে হেভি অয়েলের মধ্যে নাকানি চোবানি খেল। তারপর খুব মন্থর গতিতে তলিয়ে যেতে শুরু করল। প্রথম ড্রাম ভরতে দু'টো জেরি-ক্যান দরকার হলো। তেল ব্রিম পর্যন্ত উঠে আসতে হিসাব করে দেখল মার্সিয়া, মেশিন পিস্তলের বাণ্ডিল ভেতরের দশ ভাগের সাত ভাগ জায়গা খেয়ে ফেলেছে, তেলের ভাগে জুটেছে তিন ভাগ মাত্র।

দু'শো লিটারের ড্রামে ষাট লিটার লুব্রিকেটিং অয়েল ঢেলেই ক্ষ্যান্ত দিতে হলো। ভরে গেছে। কাজ শেষ হতে জেরি-ক্যান সরিয়ে রাখল মার্সিয়া। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে এমারেল্ড গ্রিন তরল পদার্থটার সারফেস পরখ করে দেখার চেষ্টা করল।

কিন্তু সবুজের মাঝে হালকা সোনালি আভার পিচ্ছিল লুব্রিকেটিং অয়েল টর্চের আলো ফিরিয়ে দিল।

তলায় কী আছে বোঝার কোনও উপায়ই নেই। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ড্রামটার তলার চারদিকের মাটি ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখল মার্সিয়া। লিক করেনি। টিনপ্লেটের নতুন তলাটা ভালভাবেই জোড়া লেগেছে।

কাজটা নির্ঝঞ্ঝাটে এবং ঈর্ষণীয় সাফল্যের সঙ্গে শেষ করতে পারায় অদ্ভুত এক গর্ব অনুভব করল মার্সিয়া। গ্যারাজের দরজা খুলে বাইরে চোখ বোলাল কিছুক্ষণ। না, কারও খেয়াল নেই ওর গ্যারাজের দিকে। নিশ্চিন্ত মনে ভ্যানটা ভিতরে নিয়ে এল ও।

এখন জার্মান মার্কিংওয়ালা মেশিন পিস্তলের ক্রেট ও ম্যাগাজিনের কার্টনের কাঠগুলো নষ্ট করতে হবে ওকে। একটা অব্যবহৃত টিনপ্লেট ডিস্ক নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

পরেরটা হারবারের পানিতে ডুবে মরবে, এবং আগেরগুলো বনফায়ারের আগুনে আত্মাহুতি দেবে।

ছয়

ডক্টর ইভানভ ওরফে মিখাইল মিখাইলোভিচ রেগে আগুন হয়ে আছেন। এরকম আজকাল প্রায়দিনই হচ্ছে। কথার আগে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন প্রতিভাধর এই বিজ্ঞানী। পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে হবে তাঁর বয়স। দীর্ঘদেহী।

ডাইনিং টেবিলের ওপাশে মুখোমুখি বসা স্ত্রীর দিকে চোখ গরম করে তাকালেন তিনি। 'এই বুরোক্র্যাসিই যত নষ্টের গোড়া, বুঝলে? কী আজব কাণ্ড দেখো! এই অবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হবে, ততদিন যে এই পোড়ার দেশের কোনও উন্নতি হবে না, এই সহজ কথাটা আমাদের কর্তাদের মাথায় কেন ঢোকে না, বোঝা ভারি মুশকিল।'

'তুমি ঠিকই বলেছ, মিখাইল,' সান্ত্বনার সুরে বললেন তাঁর স্ত্রী। আরও এক কাপ চা ঢাললেন, কালো রঙের। যেমন কড়া, তেমনি বিচ্ছিরি রকম তেতো। তাঁর স্বামীর পছন্দের চা।

'এই নাও,' কাপটা এগিয়ে দিলেন মহিলা। মনে মনে চাইছেন যাতে স্বামীর মুখটা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে। 'আমার মনে হয় এটা স্রেফ ভুলের কারণে হয়েছে।'

'বাইরের দুনিয়া যদি জানত আমাদের ভেতরের খবর!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। স্ত্রীর মন্তব্য কানে যায়নি। 'যদি জানত আমরা কমিউনিজমকে বিদায় করতে পারলেও পুরনো সিস্টেমকে বিদায় করতে পারিনি, এখনও সেটা আমাদের কাঁধে সিন্দবাদের ভূতের মত চেপে বসে আছে, তা হলে তাজ্জব না হয়ে পারত না।'

'চা খাও,' নিজের কাপের চিনি নাড়তে নাড়তে বললেন স্ত্রী। 'ধৈর্য ধরো। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আর হয়েছে!' গজগজ করতে করতে চুমুক দিলেন মিখাইল মিখাইলোভিচ। এই মুহূর্তে সাইবেরিয়ান নিউ ল্যাণ্ডের বিশাল ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্সে একটা জটিল গবেষণায় ব্যস্ত তিনি। গবেষণা প্রায় শেষ পর্যায়ে। এরকম জটিল একটা সময়ে অফিশিয়াল নির্দেশ জানানো হয়েছে: আরেকবার পশ্চিম আফ্রিকার রিপাবলিক অভ জাংগারোর হিন্টারল্যাণ্ডে যেতে হবে তাঁকে।

বেশ কয়েক মাস আগে দেশটির মিনারাল রিসোর্স সার্ভে করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল মিখাইলোভিচকে। ভীষণ দুর্গম অঞ্চল ছিল সেটা। রাস্তাঘাটের নাম-নিশানা পর্যন্ত নেই। কোমর সমান কাদা ভেঙে চলতে হয়। শীতের দেশের মানুষ, ওরকম জঘন্য জায়গায় গিয়ে কাদাপানিতে হাবুডুবু খেয়ে দীর্ঘ সাত মাস পরিশ্রম করে কাজটা শেষ করেছিলেন তিনি। রিপোর্টও দাখিল করেছিলেন জায়গামত।

কিন্তু সেটার পরিণতি কী যে হয়েছিল তা কোনওদিন জানার সৌভাগ্য হয়নি

মিখাইলোভিচের। অন্য সব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সেটার কথা মোটামুটি ভুলেই গিয়েছিলেন। হঠাৎ আবার সেই যন্ত্রণার উদয় হয়েছে নতুন করে। নির্দেশ এসেছে আবার রিপাবলিক অভ জাংগারোর হিন্টারল্যাণ্ডে যেতে হবে তাকে। গিয়ে মিনারাল সার্ভের অভিনয় করতে হবে।

তারপর পুরনো সার্ভে রিপোর্টটাকে সামান্য অদল-বদল করে সাবমিট করতে হবে—তাতে ক্রিস্টাল মাউন্টেন রেঞ্জে প্ল্যাটিনাম পাওয়া গেছে কথাটার উল্লেখ থাকতে হবে। কিছুটা লো গ্রেডের অবশ্যই। তারপর বাকিটা বুঝবে ফরেন মিনিস্ট্রি। কী আর করা!

বিরক্তি, রাগ, সবকিছু গিলে খেয়ে প্রায় শেষ করে আনা হাতের প্রজেক্ট অন্য একজনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ডক্টর ইভানভ। নির্দেশমত জাংগারোর জন্য গঠন করা নতুন সার্ভে টিমের জন্য আধ ডজন সাপ্লাই ডিরেক্টরেটের কাছে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র-যন্ত্রপাতি ইত্যাদির রিকুইজিশন পাঠিয়ে দিয়ে সেসব পৌঁছার অপেক্ষায় ছিলেন।

জিনিসগুলো আসবে, ক্রেটবন্দি হয়ে জাহাজ বোঝাই হবে। তাঁর টিমও প্রায় রেডি যাত্রা করার জন্য। নিজেদের ব্যবহার্য সবকিছু প্রস্তুত, এমনকী পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট আর ক্যাম্প বেড পর্যন্ত। ডক্টর ইভানভের আশা ছিল ভাগ্য সহায় হলে সাইবেরিয়ার সংক্ষিপ্ত, অথচ আশ্চর্য লোভনীয়, ঝলমলে গ্রীষ্ম হাড়কাঁপানো হেমন্তের পেটে ঢুকে যাওয়ার আগেই দেশে ফিরে আসতে পারবেন তিনি। পরিবার নিয়ে ক'টা দিন আনন্দ-ফুর্তি করতে পারবেন। কিন্তু গতকালকের একটা চিঠি তাঁর সেই আশার গুড়েও বালি ছিটিয়ে দিয়েছে।

সরাসরি ডিরেক্টরের কাছ থেকে এসেছে চিঠিটা। তাতে সোজা-সাপ্টা ভাষায় যা বলা হয়েছে, তার সারমর্ম এরকম: ট্রান্সপোর্ট ডিরেক্টরেট অতি সম্প্রতি জানিয়েছে যে, বহির্বিশ্বে সরকার পরিচালিত কোনও কনফিডেনশিয়াল সার্ভে টিমের জন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ফরেন মিনিস্ট্রি তাঁর মিশনের জন্য জাতীয় এয়ার লাইন্সকে তাদের একটা লাইনারকে নিয়োগ করার অনুরোধ জানালে সংস্থাটি মধ্য প্রাচ্য পরিস্থিতির কারণে তাতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। কোনও মিলিটারি ফ্রেইটারও এ-কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম আফ্রিকায় যাওয়া-আসার কাজে মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করা ছাড়া সার্ভে টিমের কোনও বিকল্প নেই। তাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, পশ্চিম আফ্রিকা উপকূল হয়ে দূর প্রাচ্যে যাতায়াতকারী কোনও মালবাহী জাহাজে রিপাবলিক অভ জাংগারো যেতে হবে তাঁর সার্ভে টিমকে। ফেরার সময় হলে রাষ্ট্রদূত লিওনিদ দবরোভলস্কিকে জানাতে হবে। তিনি ওই মুহূর্তে দেশের পথে রয়েছেন, এমন কোনও ফ্রেইটারে তাঁর টিমকে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সার্ভে টিমের পোর্ট অভ ডিপারচার এবং তারিখ যথানিয়মে অবহিত করা হবে। অথরাইজড্ এমবার্কেশন ভাউচার্স নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করা হবে। কাজেই...

'পুরো গ্রীষ্ম সাগরেই বরবাদ হয়ে যাবে আমার,' বিলাপ করে উঠলেন ডক্টর

ইভানভ। ‘আর ওখানে গিয়ে আবার বর্ষাকালের গলা সমান কাদার মধ্যে হাবুডুবু খেতে হবে!’ একটু থামলেন তিনি। ‘কেন যে ওরা সময়ের কাজ সময়মত করল না! কেন ফেলে রাখল আমার এত কষ্টের রিসার্চ রেজাল্ট? আবার কীজন্যে সার্ভের “অভিনয়” করতে হবে আমাকে?’

গলা ক্রমে চড়তে লাগল বিজ্ঞানীর।

পরদিন সকালে টেমপেস্টের ডেকে ওটার মালিক-কাম-ক্যাপ্টেন আলেসান্দ্রো স্পিনেট্টির সঙ্গে বেচাকেনার বিষয়টা চূড়ান্ত করতে বসল মাসুদ রানা। মিশ্রি খানও আছে সঙ্গে। ও পক্ষে ফার্স্ট মেট কার্ল ওয়ালডেনবার্গ আছে মালিককে সাহায্য করতে।

ইটালিয়ানের বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। নারকেলের রশির মত পাকানো পেশি। মুখটা লম্বাটে, কুঠারের মত একটু বাঁকা। বুক দেখলে বোঝা যায় ওটা এক সময় ব্যারেল ছিল। মাথায় কাত করে বসানো আছে সাদা টপের পিক্‌ড্ ক্যাপ।

ফ্রেইটারের ডেকে বসেই নেগোসিয়েশন শুরু করে দিল লোকটা। যদিও কথা ছিল তার লইয়ার, গুইলো পণ্টির অফিসে কাজটা সারা হবে। কিন্তু তার অফিসটা নাকি এমন এক মহাব্যস্ত সরু গলিতে, যেখানে প্রতিমুহূর্ত দাঙ্গা লেগে থাকে। ভায়া গ্রামশ্চি নাম সে গলির। সত্যি সত্যি দাঙ্গা নয় অবশ্য। ভিড়-ভাট্টা আর চিৎকার-চেঁচামেচির দাঙ্গা।

ইটালির আইনী কারবার ঐতিহ্যগতভাবেই শামুকের গতিতে চলে। আর জেনোয়ায় চলে আর্থ্রাইটিক স্নেইল বা বেতো শামুকের গতিতে। নড়তে-চড়তেও মাস লেগে যায়। তাই প্রাথমিক আলোচনা ফ্রেইটারে বসেই সারা হলো।

সত্তর হাজার পাউণ্ডেই টেমপেস্টের মালিকানা হাত বদল হলো। আলেসান্দ্রো স্পিনেট্টি যে কারেন্সিতে দাবি করবে, সেই কারেন্সিতেই দাম পরিশোধ করবে রানা। পাকা কাগজপত্র হাতে পেলেই ক্রেডিয়েটব্যাংকে ফোন করে তার অ্যাকাউন্টে টাকাটা ট্রান্সফার করার নির্দেশ দেবে।

রানার অফার করা ছয় মাসের প্যাকেজ ডিল লুফে নিল ফার্স্ট মেট, ওয়ালডেনবার্গ। অন্য দুই কর্মচারীর একজন, ইঞ্জিনিয়ারও থাকছে। লোকটা সার্বিয়ান, পালোয়ান টাইপের। ওয়ালডেনবার্গ আগেই জানিয়েছে রানাকে, এত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার জীবনে খুব কমই দেখেছে সে। তার বেতনও দ্বিগুণ করে দিল ও। অপর কর্মচারী, ডেকহ্যাণ্ডকেও আপাতত রেখে দিল।

সবকিছু ঠিকই থাকল, কেবল জেনোয়ার বেতো আইনের কারণে লইয়ারের পুরো পাঁচটা দিন লেগে গেল সমস্ত কাগজপত্র জোগাড় করতে। তা-ও প্রাথমিক পর্যায়ের।

এমভি টেমপেস্ট যেহেতু ইটালিতে রেজিস্টার্ড ও রেসিডেন্ট ভেসেল, সেহেতু ইটালিয়ান আইনের চক্করে সেটার হস্তান্তর প্রক্রিয়াও অত্যন্ত জটিল হয়ে দেখা দিল। মোট তিনটে চুক্তি হলো শেষের দিন। প্রথমটায় আলেসান্দ্রোর স্পিনেট্টি মেরিটিমো লাক্সেমবার্গের টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ-র কাছে বিক্রি

হয়ে গেল। দ্বিতীয়টায় কার্ল ওয়ালডেনবার্গ রানার প্রস্তাব অনুযায়ী টেমপেস্টের ক্যাপ্টেন হিসেবে ছয় মাসের জন্য চুক্তিভুক্ত হলো। শেষেরটায় হলো ইঞ্জিনিয়ার ও ডেকহ্যাণ্ড।

আলেসান্দ্রো স্পিনেট্টির লইয়ার গুইলো পণ্টির কাজের গতি দেখে রানার মনে হলো, এ লোক দেশের আইনগত কাজ দ্রুত সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বকালের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করতে যাচ্ছে। তারপরও কাগজপত্র পেতে পাক্কা চারদিন লেগে গেল।

নিউ ইয়র্ক। স্টাডির টেবিলে পাশাপাশি কয়েকটা গ্রাফ রেখে তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে আছে বাকি বিল্লাহ। খুব মন দিয়ে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে আরও দু'জন আছে। এরা আমেরিকান। একজন সাদা, একজন কালো। মাইক্রোসফটের প্রোগ্রামিং সৃষ্টির জগতের মুকুটহীন রাজা সবাই। গোলকধাঁধার জগতের বাসিন্দা।

তাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে কাজ কাজ আর কাজ নিয়ে। অফিসে না থাকলেও কাজ করে তারা। অবচেতন মনে সারাক্ষণ কাজের চিন্তা ঘোরাফেরা করে। তাদের ওঠা-বসা, ধ্যান-জ্ঞান, বর্তমান-ভবিষ্যৎ, সবকিছু মাইক্রোসফটের নিত্য নতুন প্রোগ্রামিং সৃষ্টি করাকে ঘিরে আবর্তিত হয়।

এ মুহূর্তে তাদের সামনে দুনিয়ার জিনিসপত্র ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আছে। প্রজেক্টর মেশিন আর স্লাইড থেকে শুরু করে পাহাড় সমান প্রিণ্ট-আউট, মহাজটিল সমস্ত অ্যানালাইসিসের রিপোর্ট, হাজারটা গ্রাফ, এক্স-রে ফিল্ম, কমপিউটার, অ্যাশট্রে উপচানো সিগারেটের ফিল্টার, কফির কাপ, বিয়ার ক্যান, সিগারেটের প্যাকেটসহ আরও কত কী!

প্রজেক্টরে স্লাইড ঢোকানো। ইণ্ডিকেটরের সবুজ আলো জ্বলছে। দেয়ালের মসৃণ গায়ে একটা বিশেষ ধরনের চিপের এনলার্জড্ ইমেজ ফুটে আছে।

এবারের উইক এণ্ডের দুটো দিন এই রুমটার মধ্যেই কাটিয়ে দিয়েছে বাকি বিল্লাহ। চোখ গর্তে বসে গেছে। কালি পড়ে গেছে নীচে। চুল এলোমেলো। দাড়ি কামানো হয়নি দু'দিন। গত কিছুদিন থেকে এরকমই চলছে। যতক্ষণ বাসায় থাকে, স্টাডি থেকে বলতে গেলে বেরই হয় না সে। নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না।

এক সময় কাজ থেকে মাথা তুলল সে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন। অন্য দু'জন ঘুরে তাকাতে মৃদু হাসি ফুটল বাকি বিল্লাহর মুখে। সামনের গ্রাফটার এক জায়গায় কলম দিয়ে টোকা মারল। 'হিয়ার,' আবার খোঁচা দিল। 'সি?'

সহকর্মীদের জবাবের অপেক্ষায় না থেকে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করল তারকালোকের শুকতারা। মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক টার্মস বেরোচ্ছে তার অনর্গল।

লণ্ডন। নির্দিষ্ট ক্যাম্পিং গুডস স্টোরে বাকি মালপত্রের অর্ডার প্লেস করতে পেরে

লম্বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ফায়জা। স্টোর থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ক্যাব ডাকল। চাহিদা অনুযায়ী হ্যাভারস্যাক আর স্লিপিং ব্যাগের জন্য অ্যাডভান্স করে পাকা রিসিট নিয়ে এসেছে ও।

কাল দুপুরের পর ডেলিভারি দেয়া হবে জিনিসগুলো। একই দিনে বড়ো দুই কার্ডবোর্ডের বাক্স ভর্তি মিলিটারি স্টাইলের ন্যাপস্যাক আর বেরেটও ইস্ট লণ্ডনের এক ওয়্যারহাউস থেকে ডেলিভারি দেয়া হবে।

আগে যা কিছু সংগ্রহ করেছে ফায়জা, সবগুলো মিলিয়ে বিশাল তিনটে কনসাইনমেণ্ট হয়ে গেছে। এ-মুহূর্তে তুলোঁর পথে রয়েছে সেসব। প্রথমটা এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা, ভাবল ও। বাকি দুটো ট্র্যানজিটে আছে। আগামীকাল হ্যাভারস্যাক আর স্লিপিং ব্যাগের চতুর্থ ক্রেট শিপিং এজেন্টের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারপর আর এক সপ্তাহ সময় থাকবে ওর হাতে।

তিনদিন আগে রানার সঙ্গে কথা হয়েছে ফায়জার। রানা নির্দেশ দিয়েছে ৩০ মে-র মধ্যে মার্সেই বন্দরে পৌঁছতে হবে ওকে। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

ফলে মনটা উড়ু উড়ু হয়ে আছে ওর। এই মুহূর্তে লণ্ডন ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে যেন।

এমভি টেমপেস্টের কাগজপত্র হাতে পেয়ে জেনোয়ার হোটেল থেকে কয়েকটা চিঠি পাঠাল মাসুদ রানা। প্রথমটা হ্যামবার্গের জোহান শ্লিংকারের কাছে। তাকে জানিয়ে দিল যে জাহাজ মাদ্রিদ থেকে মালের চালান বহন করে নিয়ে যাবে, সেটার নাম : এমভি টেমপেস্ট। ওটার আগের মালিক ছিল জেনোয়ার স্পিনেট্টি মেরিটিমো শিপিং কোম্পানি।

জেনোয়ার ব্রিটিশ ভাইস কনসালের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, টেমপেস্ট লয়েড'স শিপিং লিস্টের অন্তর্ভুক্ত।

জানতে চাইল, আর্মস শিপমেণ্ট কোন্ পোর্ট থেকে জাহাজে তোলার পরিকল্পনা আছে শ্লিংকারের। ম্যানিফেস্ট তৈরি করতে তথ্যটা টেমপেস্টের ক্যাপ্টেনের প্রয়োজন হবে।

চিঠিতে টেমপেস্টের পূর্ণ বর্ণনা দিল রানা। জানাল, পনেরো দিনের মধ্যে আবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

দ্বিতীয় চিঠিটা পাঠাল অ্যালান বেকারের নামে। ইউগোস্লাভ কর্তৃপক্ষকে সে যাতে ক্যারিইং ভেসেলের নাম-বর্ণনা নিশ্চিত করে বলতে পারে, সেজন্য বিস্তারিত জানাল। এর উপর তারা এক্সপোর্ট লাইসেন্স অনুমোদন করবে।

শেষের চিঠিটা দীর্ঘ হলো। ওটা লিখল লাক্সেমবার্গে টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ-র চেয়ারম্যান এমিল স্টাইনকে। নির্দেশ দিল, চারদিন পর তার অফিসে টাইটানিক হোল্ডিংস কোম্পানির বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠানের জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে। মিটিঙের এজেণ্ডায় দুটো রেজোলিউশন থাকতে হবে।

প্রথম রেজোলিউশনে সত্তর হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে স্পিনেট্টি মেরিটিমো কোম্পানি এবং তার যাবতীয় সম্পদ কিনে নেয়ার বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অন্যটায় থাকবে সত্তর হাজার পাউণ্ডের সার্টিফাইড চেকের বিনিময়ে জেমস ব্রাউনের নামে এক পাউণ্ড মূল্যের আরও সত্তর হাজার বেয়ারার শেয়ার ইসু করার প্রসঙ্গ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মেডিটারেনিয়ানের প্রায় নির্জন উপকূল ধরে পশ্চিমের পানে ছুটে চলেছে লেফটেন্যান্ট আতাসীর ভ্যান। হেরেস থেকে তুলোঁয় চলেছে। মাঝে মাঝে বিপরীত দিক থেকে একটা-দু'টো গাড়ি এসে 'শোঁ-ও-ও!' করে পাশ কাটাচ্ছে।

বাঁদিকে বিস্তীর্ণ বালুকাবেলা। সেখানে ক্রমাগত মাথা কুটছে ফেনার মুকুট পরা মেডিটারেনিয়ানের ফসফরেসেন্ট পানি। আর ডানদিকে আকাশের গায়ে ফুটে আছে দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়সারি। কনিফারের মৃদু সুবাস আসছে ওদিক থেকে। মৃদু বাতাসের তাড়নায় কানের পাশের চুলগুলো সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

অবিস্মরণীয় এক সন্ধ্যা, ভাবল আতাসী। কোমল পরিবেশ, শীতল প্রকৃতি। চাঁদ উঠি উঠি করছে আকাশে। এ পরিবেশের কোনও তুলনা হয় না। জীবন নতুন করে মোহনীয় লেগে উঠল ওর। গত কয়েকটা দিন কাজের চাপে কোনওদিকে তাকানোর সময় হয়নি। আজ আর চাপ নেই।

ম্যারাথন দৌড়ের শেষ ল্যাপে রয়েছে এখন লেফটেন্যান্ট। ফিনিশিং লাইনের দিকে ছুটছে। মোটামুটি চাপমুক্ত। তাই প্রকৃতি মোহনীয় হয়ে উঠেছে তার চোখে। এ সময় মার্সিয়া পাশে থাকলে বেশ হতো, ভাবল আতাসী। বেশ কিছুদিন হলো দেখা নেই দু'জনের। তবে অনেকদিন পর মনের মত কাজ পেয়ে চুটিয়ে উপভোগ করছে আতাসী। ভুলে থাকতে পেরেছে স্ত্রীর সাময়িক অভাব।

মার্সিয়ার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বেদুঈন। ওদের জীবনে বড় ধরনের একটা পরিবর্তন এসেছে ইদানীং। এখন আর আল-ফাত্তাহর গোপন কম্যাণ্ডো মিশন নিয়ে যখন-তখন ছুটতে হয় না বলে জীবনে স্থিতি এসেছে। হাতে অখণ্ড অবসর। তাই নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখার জন্য স্বামীকে নিয়ে একটা হোটেল খোলার স্বপ্ন দেখেছিল মার্সিয়া।

আতাসীও স্থায়ী কিছু একটা করার কথা ভাবছিল। স্ত্রীর প্ল্যান পছন্দ হতে উঠেপড়ে লাগল সে। সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করে গাজায় মনের মত একটা হোটেল খুলে বসল একদিন। কিন্তু কপাল মন্দ। ইজরায়েলি বোমা বর্ষণে এক রাতের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সব। বিশাল এক ভবনের নীচের দুটো তলা নিয়ে ছিল ওদের রেস্টুরেন্ট ও শপিং কমপ্লেক্স। গোটা ভবন ধুলোয় মিশে গেল। ওটাকে আবার খাড়া করার উপায় নেই তার। পুঁজি নেই।

তারপর মাস ছয়েক চাকরি করে সংসার চালিয়েছে লেফটেন্যান্ট। এই সময় মাসুদ রানার ডাক পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ এসেছে তার। কারণ আতাসী-মার্সিয়া জানে, এই মানুষটার এ ধরনের ডাকের সঙ্গে যুদ্ধের একটা সংযোগ আছে। তাই সবকিছু পিছনে ফেলে ছুটে এসেছে ওরা।

প্রায় সমস্ত বেদুঈনের মত ওদের রক্তেও যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য নেশা আছে। ভেতর ভেতর প্রতি মুহূর্ত নীরবে কাজ করে। বুকের মধ্যে যুদ্ধের শব্দহীন

দামামা বাজে। অনেকদিন অকাজে বসে থাকায় সেসবের গায়ে জং পড়ার দশা হয়ে গিয়েছিল। রানার আহ্বানে সাড়া দেয়ায় তা কখন যেন ঝরে গেছে। নতুন যুদ্ধের নেশায় পেয়ে বসেছে বেদুঈনকে।

কী যুদ্ধ, কীসের যুদ্ধ, জানে না সে। মার্সিয়া, ফায়জা বা মিশ্রি খান—ওরাও জানে না। কিন্তু তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই বিন্দুমাত্র। কারণ ওরা মাসুদ রানাকে জানে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, তাকে দিয়ে খারাপ কিছু হতে পারে না। এবারের উদ্দেশ্যের পিছনেও ভাল কিছুই রয়েছে নিশ্চয়ই।

রানাকে যারা চেনে, তারা ভাল করেই জানে ওর মত নির্ভীক লিডারের অধীনে কাজ করতে পারার মজাই আলাদা। এটা বহু পরীক্ষিত। ওরা সবাই অতীতে রানার নেতৃত্বে বেশ ক'টা কমাণ্ডো মিশনে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেকটার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। ওদের সবার অন্ধ বিশ্বাস, এবারেরটাও সেরকমই কিছু হবে।

মিশ্রি খান নামের লোকটার সারাক্ষণ সিগারেট ফোঁকা পছন্দ নয় আতাসীর, কিন্তু তার একটা মন্তব্য খুব মনে ধরেছে। লণ্ডনে ওদের প্রথম সাক্ষাতের দিন লোকটা বলেছিল, '...মেজর আমাদেরকে এ কাজে ডেকে এনে আসলে সম্মানিত করেছেন। ... এটাকে আমরা পুনর্মিলনী হিসেবেও ধরে নিতে পারি।'

কানের কাছে বিপরীত দিকে ছুটে যাওয়া একটা ট্রাকের বিকট হর্ন বেজে উঠতে কিছুটা চমকে মাটিতে ফিরল আতাসী। রিয়ার ভিউ মিররে ওটার টেইল লাইটের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে আপনমনে মাথা দোলাল। ঠিক। মেজর আসলেই সম্মানিত করেছে তাদেরকে। নইলে এ কাজ করার জন্য লোকের অভাব তার নিশ্চয়ই ছিল না।

শেষ দু'টো আউটবোর্ড ইঞ্জিন নিয়ে তুলোঁয় চলেছে সে। ওগুলো যাতে নিঃশব্দে চলে, সে জন্য রানার কথামত ঝানু মেকানিক দিয়ে ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে আণ্ডারওয়াটার একজস্ট জুড়ে নিয়েছে আতাসী। এখন বণ্ডেড ওয়্যারহাউস, মেরিটাইম ডুফট-এর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছে। তিনটে ইনফ্লেটেবল ডিঙ্গি আগেই সেখানে পৌঁছে দিয়েছে ও।

গত পনেরো দিনে ওর নামে লণ্ডন থেকে ফায়জার পাঠানো অ্যাসর্টেড ক্লোদিঙের চারটে বড়সড় ক্রেটও এক্সপোর্ট হওয়ার অপেক্ষায় আছে সেখানে। সবকিছু মেরিটাইম ডুফটকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারবে সে।

লাক্সেমবার্গে টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ-র বোর্ড মিটিংটা হলো বিস্ময়কর রকম সংক্ষিপ্ত। কোম্পানির নিয়ন্ত্রক, মাসুদ রানা ওরফে জেমস ব্রাউন উপস্থিত ছিল না সে মিটিঙে।

মাসুদ রানা আগেই এমিল স্টাইনের সঙ্গে দেখা করে গেছে। স্পিনেট্টি শিপিং কোম্পানি এবং সেটার ভেসেল, এমভি টেমপেস্ট কেনা সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র তুলে দিয়ে গেছে তার হাতে। সঙ্গে টাইটানিক হোল্ডিংসের নামে সত্তর হাজার পাউণ্ডের সার্টিফাইড চেক।

পরদিন বিকেলে টাইটানিক হোল্ডিংসের নামে ইসু করা সত্তর হাজার অর্ডিনারি বেয়ারার শেয়ার তুলে দিল মিস্টার স্টাইন রানার হাতে। সেই সঙ্গে

একটা এনভেলপ। ওটায় আছে হোল্ডিংসের কাছে টেমপেস্টকে বিক্রির যাবতীয় ডকুমেন্টস এবং আলেসান্দ্রো স্পিনেট্টির নামে হোল্ডিংসের পক্ষ থেকে ইসু করা ক্রস্‌ড্ চেক। আলেসান্দ্রো স্পিনেট্টির আইনজীবী, সেনিয়র গুইলিও পণ্টির নাম ও তার জেনোয়া অফিসের ঠিকানা লিখে ওটার মুখ সিল করে দিয়েছে সে।

শেষ যে ডকুমেন্টটা দিল, সেটা মিশ্রি খান ওরফে সুয়েটিং রাফায়েলকে স্পিনেট্টি মেরিটিমো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করা সম্পর্কিত বোর্ড মিটিঙের সিদ্ধান্ত।

দু'দিন পর ইটালিয়ান লইয়ারের অফিসে সে ডিল চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করল। জেমস ব্রাউনের স্পিনেট্টি মেরিটিমোকে দেয়া সত্তর হাজার পাউণ্ডের চেক অনার করল ক্রেডিয়েটব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটির একশভাগ আইনগত মালিক হলো টাইটানিক হোল্ডিংস।

কার্ল ওয়ালডেনবার্গকে ছয় মাসের জন্য টেমপেস্টের ক্যাপ্টেন নিয়োগ করা হলো। সার্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ারকেও। এক মাসের বেতন নগদে পরিশোধ করা হলো তাদের দু'জনকে। ঠিক হলো, বাকি পাঁচ মাসের বেতন তারা লইয়ার গুইলিও পণ্টির মাধ্যমে পাবে। ক্রু ছোকরাকে এক মাসের অগ্রিম বেতন ও মোটা বোনাসসহ বিদায় করে দেয়া হলো। বাকি দায়িত্ব মিশ্রি খানের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাকে ব্রিফ করল রানা।

'ফার্স্ট মেট আর ক্রু-র রিপ্লেসমেন্টের ব্যাপারে কী করবে ঠিক করেছ?'

'কার্ল ওয়ালডেনবার্গ এরমধ্যেই মানুষ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে,' মিশ্রি খান বলল। 'এই বন্দরে কাজের লোক গিজগিজ করে। তাদের মধ্য থেকে "গুড হার্ড মেন, হু আস্ক নো কোয়েশ্চেনস" ধরনের প্রজাতি খুঁজছে ভাতিজা কার্ল। ভাববেন না, ওস্তাদ। জোগাড় হয়ে যাবে সময়মত।'

'গুড,' সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লেগে পড়ো তা হলে। লম্বা যাত্রার জন্য কমপ্লিট ইঞ্জিন ওভারহল অ্যাণ্ড সার্ভিসিং সেরে টেমপেস্টকে রেডি করো। পোর্টের সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দাও। কাগজপত্র তৈরি করো নতুন ক্যাপ্টেনের নামে। ম্যানিফেস্ট তৈরি করবে এভাবে : তুলোঁ থেকে সাধারণ কার্গো লোড করতে মরক্কো যাবে টেমপেস্ট। ওকে? ফিউয়েল আর রসদ বোঝাই করো। আমরা ছাড়াও বাড়তি এক ডজন লোকের রসদ চাই। সেই পরিমাণ বাড়তি ফ্রেশ ওয়াটার, বিয়ার, ক্যাণ্ডি, সিগারেট, চা আর কফি। সবকিছু রেডি করে তুলোঁয় নিয়ে এসো এটাকে। এজেন্সি মেরিটাইম ডুফটে আমার খোঁজ কোরো। আমাদের সবাইকে ওখানে পাবে। অল রাইট?'

'অল রাইট, ওস্তাদ।'

পরদিন দুপুরের দিকে প্যারিসে পৌঁছল রানা। শেডিউল অনুযায়ী সন্ধ্যার পর আতাসীও পৌঁছল নিজের খালি ভ্যান নিয়ে। তৎক্ষণাৎ সড়ক পথে ব্রাসেলস যাত্রা করল দু'জনে।

লণ্ডন। বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানির চেয়ারম্যান মেজর লুটনের সঙ্গে তৃতীয়

দফা বৈঠকে বসল নমিনি ডিরেক্টর, হ্যারল্ড রবার্টস। গত কয়েক সপ্তাহে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে সে মেজরের সঙ্গে। কয়েকবারই তাকে লাঞ্চে নিয়ে গেছে, তার গিল্ডফোর্ডের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেছে।

এরমধ্যে কথায়-বার্তায় রবার্টস তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে বোরম্যাক যদি আবার ব্যবসায় নামতে চায়, তা হলে বড় অংকের পুঁজি অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে। সে রাবার বা আর যা-ই হোক। তৃতীয় বৈঠকে সেই প্রসঙ্গই তুলল সে। প্রস্তাব দিল এ-জন্য অন্তত পাঁচ লাখ নতুন শেয়ার ইসু করা প্রয়োজন।

প্রস্তাব শুনে চেয়ারম্যান দ্বিধায় পড়ে গেছে দেখে তাকে আশ্বস্ত করা হলো, জুইংলি ব্যাংক এ জন্য ফাণ্ডের জোগান দেবে। বোরম্যাকের পুরনো শেয়ার হোল্ডার যারা আছে, তারা বা নতুন কেউ যদি সেসব শেয়ার কিনতে আগ্রহী না হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। তাদের হয়ে ব্যাংকই সব কিনে নেবে।

আশা আছে, নতুন শেয়ার ছাড়া হলে বর্তমান শেয়ারগুলোর দাম এক শিলিং তিন পেন্সের জায়গায় বেশ অনেকটা বেড়ে যাবে। নিজের এক লাখ শেয়ারের কথা চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল মেজর লুটন।

নমিনি ডিরেক্টর তাকে মনে করিয়ে দিল যে কোম্পানির বিধান অনুযায়ী দু'জন ডিরেক্টর একমত হলেই কোরাম পূর্ণ হয়। কাজেই সে আর মেজর এ মুহূর্তে যেহেতু একমত, সেহেতু ইচ্ছে করলেই তারা বোর্ড অভ ডিরেক্টর্সের মিটিং তলব করতে পারে। যে-কোনও প্রস্তাব পাশও করতে পারে। এ ব্যাপারে আর কারও মতামত গ্রহণের দরকার নেই।

তারপরও মেজরের মধ্যে খানিকটা ইতস্তত ভাব থাকায় বাকি চার ডিরেক্টরের নামে চিঠি ইসু করা হলো। তাতে মিটিঙের কথা জানিয়ে বলা হলো, শেয়ার ইসুর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার জন্য বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একমাত্র কোম্পানি সেক্রেটারি, সিটি সলিসিটর যোগ দিল সে মিটিঙে।

তাতে রেজোলিউশন পেশ ও পাস, দুটোই হলো। প্রতিটা চার শিলিং দামের নতুন শেয়ার ইসুর ঘোষণা পোস্ট করা হলো। পুরনো স্টক হোল্ডারদের 'আগে এলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে যার যত খুশি শেয়ার কেনার সুযোগ দেয়া হলো।

এক সপ্তাহের মধ্যে লাগ ভেলকি শুরু হয়ে গেল। মেসার্স অ্যাডামস, মেসার্স বল, মেসার্স কার্টার, ও মেসার্স ডেভিস জুইংলি ব্যাংকের মাধ্যমে কোম্পানি সেক্রেটারির নামে চেক পাঠিয়ে দিল। তারা সবাই আরও পঞ্চাশ হাজার করে নতুন শেয়ার কিনতে আগ্রহী। আগেরগুলো তো থাকলই।

বোরম্যাকের শেয়ারের আগের রেকর্ড যে যাচ্ছেতাই ছিল, সে কথা অনেকেই ভোলেনি। তাই ওটার নতুন শেয়ার কেনা নিয়ে এই অপ্রত্যাশিত হুড়োহুড়ি অনেক স্টকিস্টের চোখে পড়ে গেল। দু'জন সিটি স্পেকুলেটর আন্দাজ করল, এর মধ্যে কিছু একটা রহস্য না থেকেই পারে না।

ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তারা বোরম্যাকের কোম্পানি সেক্রেটারিকে প্রস্তাব দিল—যত শেয়ার অবিক্রিত থেকে যাবে, সব তারা কিনে

নিতে আগ্রহী। তাদের জানা ছিল না যে কোম্পানির নতুন নমিনি ডিরেক্টর হ্যারল্ড রবার্টস আগে থেকেই তাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

জুইংলি ব্যাংকের পক্ষ থেকে একই প্রস্তাব পেশ করে এবং 'আগে এলে আগে পাবেন' জাতীয় সুযোগের ভিত্তিতে আগেই বগলদাবা করে বসে আছে সে।

তারপরেও মোট চার হাজার শেয়ার বেহাত হয়েই গেল। অফারের ক্লোজিং ডেটে বাকি অবিক্রীত দুই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ার হ্যারল্ড রবার্টস ওরফে জুইংলি ব্যাংক কিনে নিল। ওগুলো নিজের দুই কাস্টমারের নামে কিনেছে জুইংলি। মেসার্স এডওয়ার্ডস এবং মেসার্স ফ্রস্টের নামে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট-এর গোপন কথাটি সঙ্গোপনেই থাকল। সাধারণ মানুষ জানল না যে মেসার্স অ্যাডামস, বল, কার্টার ও ডেভিস তাদের আগের কেনা পঁচাত্তর হাজার শেয়ারের সঙ্গে নতুন পঞ্চাশ হাজার শেয়ারের মালিক হলো।

তবে বোরম্যাকের বর্তমান শেয়ার সার্কুলেশন এক লাখ থেকে দেড় লাখে উঠে যাওয়ায় তাদের শেয়ার দশ পার সেন্টের নীচেই রয়ে গেছে। ফলে তাদের পরিচয় প্রকাশ করার কোনও বাধ্য-বাধকতা থাকল না। মেসার্স এডওয়ার্ডস ও ফ্রস্টের শেয়ার এক লাখ আটচল্লিশ হাজার করে। এটাও দশ পার সেন্টের নীচে।

কেউ জানল না এই অভিনব প্রক্রিয়ায় বোরম্যাকের নয় লাখ ছিয়ানব্বই হাজার শেয়ারের মালিক হয়ে গেছে পাইরেট গুন্থার। যাকে বলে ওভারহেলমিং মেজরিটি। এতে তার প্রথমবারে তিন লাখ শেয়ার কিনতে খরচ হয়েছে ষাট হাজার পাউণ্ড, পরেরবার পাঁচ লাখের জন্য এক লাখ পাউণ্ড।

গুন্থার আশা করছে জাংগারোর ক্রিস্টাল মাউন্টেন আবিষ্কারের কথা যখন 'ফাঁস' হবে, তখন এই খাত থেকে অন্তত আশি মিলিয়ন পাউণ্ড ঘরে তুলতে পারবে সে।

বিকেলে ব্রাসেলসে পৌঁছে হলিডে ইনে উঠল ওরা। খানিক পর আতাসী চলে গেল মার্সিয়ার লক-আপ গ্যারাজে। একটু রাত হলে বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ বর্ডারের দিকে রওনা হবে ওরা, আলাদাভাবে দুই ভাগে।

তেলের ভ্যান নিয়ে আতাসী-মার্সিয়া যাবে আগে। রানা যাবে ভোরবেলা, আতাসীর খালি ভ্যান নিয়ে। জোরে চালিয়ে বর্ডারের কাছের শহর ডিনান্টে পৌঁছে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে।

আতাসীকে বিদায় দিয়ে ডিনার সেরে হোটেলে ফিরল ও। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বিছানায়। যাত্রা শুরু করার আগে যতটা সম্ভব ঘুমিয়ে নেয়ার ইচ্ছা। কিন্তু হলো না। চোখ প্রায় লেগে এসেছে রানার, এই সময় কানের কাছে বিরক্তিকর 'টুক, টুক! টুক, টুক!' শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। খিঁচড়ে গেল মেজাজ।

চোখ না মেলেই দাঁতে দাঁত চাপল রানা। বিড়বিড় করে বলল, 'ধুশ্ শা-লা!'

'উঁহুঁ, দুলাভাই।'

চট্ করে চোখ মেলল ও। 'কে?'

অল্প ওয়াটের নীল আলোয় মুখের ওপর সোহেলকে ঝুঁকে থাকতে দেখে বোকা হয়ে গেল। ও ঘুমিয়ে আছে দেখে ঘুম ভাঙাতে বেডসাইড টেবিলে মৃদু শব্দে তবলা বাজাচ্ছিল সোহেল। ধমক লাগাল রানাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে। 'মুখ বন্ধ কর্! মশা ঢুকে পড়বে তো।'

'তুই?' বিস্ময় সামলে নিয়ে উঠে বসল রানা। হাত বাড়িয়ে বেড সাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে দরজার ওপর চোখ বোলাল। বন্ধই আছে। ছিটিকিনি ভেতর থেকে লাগানো। 'রুমে ঢুকলি কীভাবে?'

'ইচ্ছে থাকলে উপায়ের অভাব হয় না। বুঝলি, হাঁদারাম!'

'তা বুঝলাম, কিন্তু আমার রুমে... '

হাত তুলে অ্যাটাচড্ বাথরুম দেখাল সোহেল। 'পাশের রুম হয়ে। বাথরুমের কানেক্টিং দরজা দিয়ে।'

'তুই পাশের রুমে উঠেছিস?'

'আজ্ঞে।'

'আমি এখানে আছি জানলি কী করে?'

গা জ্বালানো হাসি ফুটল সোহেলের মুখে। 'শা-লা! খুব তো বাহাদুরী করিস ডালে ডালে থাকিস বলে। আমি যে পাতায় পাতায় থাকি, তা জানিস? গুন্থার তোকে ধরে "খাসী" করে দেয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোথায় কয় পা ফেলেছিস, সব আমার জানা আছে, বুঝলি?'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সোহেল। রুমের ওপর চোখ বোলাল বিরক্ত চেহারায়। 'বাই গড, রানা! তুই লেম্যান হয়ে গেলি নাকি? একটা মেয়ে চাইল আর তোকে ফাঁসিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল?' দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'নাহ্! কেন যে মাসে মাসে এক কাঁড়ি টাকা দিয়ে তোর মত অকম্মা পোষা হয়,' শ্রাগ করল, 'বুঝি না।'

রানা হাসল। উঠে হেলান দিয়ে বসল হেডরেস্টের সঙ্গে। 'তোর মতো পেটি অফিসার কোনওদিন বুঝবেও না। ওসব সিনিয়রদের ব্যাপার-স্যাপার। কিন্তু তুই পৃথিবীর আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে এসেছিস কেন, তার ব্যাখ্যা দে।'

'তোর শিয়রে যমরাজ নাচছে শুনে ভাবলাম দেখে আসি কীভাবে শালার জানটা কবচ করা হয়। ব্যস।' শ্রাগ করে একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'একমাত্র শালার দুলাভাই হওয়ার যে কী জ্বালা, তা তুই বুঝবিনে রে। নে, ওঠ্।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'ওই শালার মাইক্রো চিপ্‌টার কয়েক ধরনের এক্স-রে করাতে হবে। বেলজিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাবলিশমেণ্টের একটা ল্যাবরেটরিতে যেতে হবে।'

'কিন্তু... '

'কোনো কিন্তু নেই। ওঠ্ তাড়াতাড়ি। এখনই বেরুতে হবে।'

কোটের পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করল সোহেল। একসঙ্গে যুক্ত নকল চাপদাড়ি, থ্যাবড়া নাক আর মোটা হাড়ের ফ্রেমের চশমার একটা সেট বের হলো ওর মধ্য থেকে।

'এটা পরে নে। আমার রুম হয়ে বের হব আমরা। কেউ চিনতে পারবে না তোকে।'

'কিন্তু... শুধু শুধু... '

'দ্যাখ, রানা! গত দুটো দিন বিছানায় পিঠ লাগিয়ে দেখিনি। জেটল্যাগ আর ঘুমের অভাবে এমনিতেই আমার মাথার ঠিক নেই। বেশি কথা বলাবি তো জুতিয়ে তোর বিষ ঝাড়ব এখন।' পরক্ষণে করুণ চেহারায় তাকাল। 'তোকে নিয়ে অলরেডি অনেক বড় বিপদে আছি। তা আর বাড়াসনে, দোস্ত।'

'তাই নাকি?'

'আবার জিগায় "তাই নাকি"!' হাত তুলল। 'তুই ব্যাটা কাজ ফেলে মেয়েদের নিয়ে ইয়ে করে বেড়াবি, আর তার মাশুল দিতে আমাকে রিলে রেস দিয়ে বেড়াতে হবে সারা দুনিয়ায়। শা-লা, স্পাই হয়েছেন!'

সোহেলের হাবভাব দেখে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল ওর পক্ষে। 'তোর এতো রাগের কারণ কিন্তু বুঝলাম না!'

'তা বুঝবে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল সোহেল। 'এতক্ষণ মঙ্গল গ্রহের ভষায় কথা বলছি তো আমি!'

বিছানা থেকে নামল রানা। ওর মেজাজ আসলেই বিগড়ে আছে, বুঝতে পারছে। 'ঠিক আছে, বাবা, যাচ্ছি।' শার্ট-প্যান্ট পরল ও। কোট গায়ে দিয়ে চুল আঁচড়াল।

সোহেল আপনমনে বকবক করে চলেছে, 'এতদিন এক বুড়োর জ্বালায় অস্থির ছিলাম। এখন জুটেছে আরেকটা বুড়ো। এমন তিরিক্ষি যে আমাদের বুড়োও তার কাছে হালে পানি পায় না। সেই লোক বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আমি এক্স-রে, অ্যানালাইসিস রিপোর্ট, এইসব নিয়ে ফিরলে বাকি কাজ করবে।'

'কার কথা বলছিস?' বন্ধুর মুখোমুখি বসল রানা।

'বসের এক পুরনো বন্ধু। আনিসুর রহমান নাম।'

রানা ভুরু কোঁচকাল। 'শুনিনি।'

'ভদ্রলোক ন্যাটোতে ছিলেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত। এখন আছেন ইন্টেল-এ। প্রি-অ্যারেঞ্জড্ সিগন্যাল জ্যামিং এক্সপার্ট।' সিগারেট ধরাল সোহেল। 'আটকে গেছেন।'

'আটকে গেছেন মানে? তার আবার কী হলো?'

'তাঁর কিছু হয়নি, হয়েছে তোর। তোকে বিপদ থেকে বাঁচাতে বুড়ো ধরেছে তাঁকে। তিনি ধরেছেন বেলজিয়ান অথরিটিকে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু বেলজিয়ান অথরিটি তাঁকে সহযোগিতা করতে রাজি হবে কেন?'

'হবে না কেন? বললাম না, এক সময় ন্যাটোর এক্সপার্ট ছিলেন তিনি। ওরা খুশি মনেই তাঁর উপকার করবে। আমি দেখা করে এসেছি এখানকার কনসার্নড রিসার্চ অফিসারের সঙ্গে। ওরা তোর অপেক্ষায় আছে।'

'আচ্ছা। তা, নতুন করে এক্স-রে করাতে চাইছিস কেন এটার? যেগুলো পাঠিয়েছিলাম... '

'ওগুলো দেখানো হয়েছে তাঁকে। সবগুলো পরীক্ষা করার পর কিছু নতুন টেস্ট করাতে বলেছেন।' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সোহেল। 'কী জিনিস বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস, জানিস?'

মাথা দোলাল ও। 'মিনি বোমা।'

'কী ধরনের?'

'রিমোট-কন্ট্রোলড্। কমপিউটার অপারেটেড। বাটন টিপে দূর থেকে যে কোনও সময় ফাটিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'এবং ফাটলে ওটা বহনকারী এবং তার আশপাশের দশ-বিশ গজের মধ্যে যারা থাকবে, তারাও মরবে, ঠিক?' রানাকে 'হ্যাঁ' সূচক মাথা দোলাতে দেখে বলল, 'বুঝে দ্যাখ তা হলে। এই জিনিস নিয়ে তুই নিশ্চিন্তে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিস, আর... '

'চিন্তার কিছু নেই,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'এটাকে সামাল দেয়ার উপায় খুব শিগগিরি বেরিয়ে যাবে আশা করি।'

তাকিয়ে থাকল সোহেল। 'বের করবেটা কে, বাকি বিল্লাহ?'

অবাক হলো রানা। 'তুই জানিস... ?'

'তুই নিউ ইয়র্কে মাইক্রোসফটের অফিসে গেছিস, তারপরও কিছু জানতে বাকি থাকে নাকি? যেসব এক্স-রে রিপোর্ট ঢাকায় পাঠিয়েছিস তুই, সব বিল্লাহর তৈরি। কিছুদিন পর আনিস সাহেব দেশে এসেছেন শুনে আমাদের বুড়োকে আর কে পায়! তাড়া করে ধরে এনেছে বেচারাকে। ওঠ্, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

'আরে, দাঁড়া না!' এক পা জুতোর মধ্যে ভরে দিল রানা। 'আমার হিসেব তা হলে ঠিকই ছিল।'

'কীসের?'

'আমার সন্দেহ ছিল, বুড়া মিয়া এই খবর পেয়ে ঢাকায় বসে নিশ্চয়ই তড়পাচ্ছে,' বলল রানা। 'এ ব্যাপারে কিছু একটা করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।'

'তাতে কী হলো?'

'না, মানে, তাই রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আর কী। নইলে বুড়ো শুধু শুধু টেনশন করত।'

এইবার পুরো বিগড়ে গেল সোহেলের চেহারা। ফরসা মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'তুই ঠিক জানিস, বুড়ো একাই তোর জন্য টেনশন করে?'

মনে মনে জিভ কাটল ও। 'আরে দূর! তা কেন হতে যাবে?' দ্রুত পাশ কাটাবার চেষ্টা করল। 'তুইও করিস। অনেকেই...'

অন্য পা-টা জুতোয় ঢোকাতে যাচ্ছিল রানা, এই সুযোগে বিদ্যুৎ গতিতে

হাত চালাল সোহেল। বাঁ কান মুচড়ে ধরল জোরে। 'পাম্প দিস, শা-লা! আমাকে? ধরা খেয়ে আবার নাটক করিস্?'

টানের চোটে শুয়ে পড়ার দশা হলো রানার। অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করল ও। গরম হয়ে ওঠা কান ডলতে লাগল চেহারা বিকৃত করে। পাল্টা মার লাগাতে গিয়েও সামলে নিল। 'যা, শালা! মেহমানের গায়ে আর হাত তুললাম না, মাফ করে দিলাম এবারের মত।'

আসলে অন্য সময় হলে সোহেলকে ছেড়ে দিত না। পাল্টা কিছু একটা নিশ্চয়ই করত। কিন্তু আজ চেপে গেল, কারণ একটা অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছে ও। বেখেয়ালে বেফাঁস মন্তব্যটা করে একান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়েছে।

'আবার কেলিয়ে পড়ছে দেখো!' রানাকে ঢিল দিতে দেখে ধমক লাগাল সোহেল। 'চল্, তাড়াতাড়ি।'

সাত

ইউগোস্লাভ স্টেট আর্মস কোম্পানির অফিস বিল্ডিং থেকে ঝলমলে সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এল অ্যালান বেকার। চেহারায় পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি। সে যতটা আশা করেছিল, তারচেয়েও অনেক মসৃণ গতিতে কাজটা সমাধা হয়েছে।

মাসুদ রানার পাঠানো টাকা আর রিপাবলিক অভ টোগোর এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট হাতে পেয়েই বেলগ্রেডের কাছে পার্চেজ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করে সে, সাদা লেটারহেডে নিজে লেখা লেটার অভ অথরিটিসহ। ছোটো অর্ডার, লাভ বলতে গেলে তেমন হবে না। তবু ব্যবসা বলে কথা। এবার না হলে আগামীবার যে হবে না, কে বলতে পারে তা?

স্টেট আর্মস কোম্পানির মিস্টার পাভলোভিচের সঙ্গে দীর্ঘ পাঁচদিনের আলোচনা অবশেষে সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করল। প্রথমে তারাও খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল ছোটো অর্ডারের কারণে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এত ছোটো অর্ডার সাধারণত প্লেস করা হয় না। তবে ইউগোস্লাভ কর্তৃপক্ষের দৃঢ় বিশ্বাস, পরীক্ষা করে দেখার জন্যই এত অল্প মাল কিনছে টোগো।

পরীক্ষার ফল পজিটিভ হলে নিশ্চয়ই বড় অর্ডার প্লেস করা হবে। তাই হয়ে থাকে সাধারণত। এবং সে জন্যই লাইসেন্সধারী আর্মস ডিলারদের সাধারণের তুলনায় অনেক গুণ বেশি কমিশন দিয়ে থাকে বেলগ্রেড। ভবিষ্যৎ ব্যবসা ধরার ইনভেস্টমেণ্ট।

বিনা ওজরে টোগোলিজ এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট গ্রহণ করল বেলগ্রেড। মালের পুরো দাম পরিশোধ করল বেকার। স্টেট ওয়্যারহাউস পরিদর্শনের সুযোগ পেল।

সেখানে নিজে সবকিছু বাছাই করল বেকার। একজোড়া বাজুকা ও

একজোড়া মর্টার লঞ্চার। প্রতিটার বেস-প্লেট আর সাইটিং মেকানিজম। তারপর বাছাই করল চল্লিশটা বাজুকা রকেট এবং তিনশ মর্টার বোমা।

আর্মির লরিতে করে নির্ধারিত বণ্ডেড ওয়্যারহাউসে পাঠিয়ে দেয়া হবে এগুলো। সময়মত ওখান থেকে তুলে নিতে আসবে টেমপেস্ট।

দায়িত্বটা কাঁধ থেকে নামাতে পেরে ফুরফুরে মেজাজে হ্যামবার্গ ভায়া মিউনিখ ফ্লাইটে চড়ে বসল বেকার।

জোহান শ্লিংকার তখন মাদ্রিদে। এক মাস আগে নাইন এমএম বুলেটের চাহিদা সম্পর্কে তার মাদ্রিদ পার্টনারকে বিস্তারিত লিখে জানিয়েছিল সে। জেমস ব্রাউনের পাঠানো বাকি ২ লাখ ৬২ হাজার ডলারের একটা ব্যাংকার'স চেক হাতে পেয়েই চলে এসেছে সে ওগুলো সংগ্রহ করতে। নিজের কাজের জন্য জোগাড় করা এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট নিয়ে। এটা সিরিয়ান।

এসব বিষয়ে ইউগোস্লাভ ফর্মালিটি যতখানি, স্প্যানিশ ফর্মালিটি তার চেয়ে বহুগুণ বেশি জটিল। এ দেশে দুটো অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়। একটা হার্ডওয়্যার কেনার জন্য, অপরটা তা এক্সপোর্ট করার অনুমতির জন্য। প্রথমটা করতে হয় কেনার তিন সপ্তাহ আগে। পরের বিশদিন সেটা মাদ্রিদের সংশ্লিষ্ট তিনটে ডিপার্টমেণ্টে গোঁত্তা খেয়ে বেড়ায়।

প্রথম ডিপার্টমেণ্ট ফিনান্স মিনিস্ট্রি। তাদেরকে আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে হয় যে ক্রেতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট ব্যাংক নির্দিষ্ট অংক হার্ড কারেন্সিতে বুঝে পেয়েছে কি না। আগে এ দেশে হার্ড কারেন্সি বলতে আমেরিকান ডলারকেই বোঝাত। কিন্তু এখন ইংলিশ পাউণ্ড বা জার্মান মার্ক বা ইউরো সবই চলে।

দ্বিতীয় ডিপার্টমেণ্ট ফরেন মিনিস্ট্রি। এই মিনিস্ট্রিকে নিশ্চিত হতে হয় যে ক্রেতা দেশটি স্পেনের দৃষ্টিতে বৈরী কোনও দেশ কি না। সিরিয়া সেই গোষ্ঠীভুক্ত তো নয়ই, বরং উল্টো। কেননা স্পেনের উৎপাদিত বেশিরভাগ অস্ত্রশস্ত্রের সবচেয়ে বড়ো ক্রেতাই হচ্ছে আরব দেশগুলো। ওই অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে স্পেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই ফরেন মিনিস্ট্রি সিরিয়ায় বল অ্যামো রফতানি অনুমোদন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না।

তৃতীয় এবং শেষটা হলো ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। সিক্রেট লিস্টের অন্তর্ভুক্ত কোনও অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে কি না বা সেসব 'রফতানির জন্য নয়' ক্যাটেগরির কিছু কি না, তা নিশ্চিত হতে হয় এই মিনিস্ট্রিকে। জিনিসটা সাধারণ স্মল আর্মস অ্যামো হওয়ায় কেউ কোনও আপত্তি তুলল না।

তবে একটা সান্ত্বনা থাকল এই যে এবার রুটিন বিশদিনের প্রয়োজন হলো না ঝামেলা মিটতে, আঠারো দিনেই কাজ সমাধা হয়ে গেল শ্লিংকারের। তিনটে দরজা পার হওয়ার সময়ে সিরিয়ান এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট অনুমোদনকারী কাগজপত্রের দলাটা আরও খানিকটা পুরু হলো।

ওগুলোর গায়ে অনুমোদনের পাকা সিল যখন পড়ল, তখন সেটা ডোশিয়ে হয়ে গেছে। এরপর মাল সিইটিএমই ফ্যাক্টরি থেকে মাদ্রিদের উপকণ্ঠে স্প্যানিশ আর্মির এক ওয়্যারহাউসে নিয়ে মজুদ করা হলো।

বাকি কাজ স্প্যানিশ আর্মি মিনিস্ট্রির। সেটার এক্সপোর্ট সেকশনের প্রধানের নাম কর্নেল অ্যান্টোনিও সালাযার।

শ্লিংকার মাদ্রিদে এসেছে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে স্প্যানিশ সরকারের কাছে এক্সপোর্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদন জানাতে। এখানে এসে এমভি টেমপেস্টের যাবতীয় তথ্য হাতে পেয়েছে সে। সেই অনুযায়ী স্প্যানিশ অথরিটির সাত পৃষ্ঠার প্রশ্নমালা পূরণ করে জমা দিতে পেরেছে।

শ্লিংকারের অ্যাপ্লিকেশন ফরম অনুযায়ী এমভি টেমপেস্ট মালের চালান গ্রহণ করতে জুন মাসের বিশ তারিখ থেকে বাইশ তারিখের মধ্যে ভ্যালেন্সিয়ায় পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারপর সেখান থেকে মাল ট্রাকে করে দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য সিরিয়ান কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে।

আর্মির একটা খুদে বাহিনী পাহারা দিয়ে ভ্যালেন্সিয়ায় পৌঁছে দেবে মালগুলো যাতে ব্যাস্ক বা আর কোনও সশস্ত্র গ্রুপ পথের মাঝে ছিনিয়ে নিতে না পারে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী বেলজিয়ামের দক্ষিণের সীমান্ত শহর ডিনাণ্টে আতাসী-মার্সিয়ার সঙ্গে মিলিত হলো রানা। দুপুর প্রায় হয়ে এসেছে তখন। মেইন স্ট্রিটের এক কাফের সামনে পার্ক করা ছিল মার্সিয়ার ঝক্কর মার্কা শেভ্রোলে।

'কখন বর্ডার পার হচ্ছি আমরা?' কাফেতে লাঞ্চ খেতে বসে প্রশ্ন করল মার্সিয়া।

'কাল খুব ভোরে,' বলল রানা। 'সূর্য ওঠার আগে।'

শেষ বিকেলের দিকে বেলজিয়াম-ফ্রান্স বর্ডারের দিকে রওনা হলো ওরা। আতাসীর ভ্যান নিয়ে আগে আগে রওনা হয়ে গেল রানা। মার্সিয়ার তেলবাহী শেভ্রোলে থাকল মাইল দুয়েক পিছনে। বর্ডারের পাঁচ মাইলের মধ্যে পৌঁছে হাইওয়ে ছেড়ে একটা ব্রাঞ্চ রোডে ঢুকে পড়ল রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

একটু পর রাত নামল সীমান্তে। ওদের খানিকটা পশ্চিম দিয়ে গেছে ফ্রান্সমুখী হাইওয়ে। মাঝে মাঝে দ্রুত ধাবমান দুয়েকটা হেড লাইটের আলো দেখা যেতে লাগল ওদিকে, সঙ্গে গাড়ির মৃদু গুঞ্জনের দূরাগত আওয়াজ। নইলে বাতাসে গাছের আয়েশী দুলুনির সরসর আর ঝিঁঝি বাহিনীর গান ছাড়া চারদিকে শুনশান নীরবতা। সময় যেন চলতে ভুলে গেছে এখানে।

রাত বাড়ছে। খিদে লেগে উঠতে সঙ্গে নিয়ে আসা হালকা খাবার দিয়ে পেট ঠাণ্ডা করল ওরা। রানা আর আতাসীকে ভ্যানের পিছনের খালি জায়গায় ঘুমানোর প্রস্তাব দিল মার্সিয়া, কিন্তু রাজি হলো না কেউ। মাথার মধ্যে মাল নিয়ে বর্ডার পার হওয়ার উদ্বেগ আছে, এ অবস্থায় ঘুম আসবে না। সময় কাটাতে কিছুক্ষণ পুরনো দিনের গল্প করল ওরা, তা-ও জমল না শেষ পর্যন্ত।

আর কিছু করার নেই দেখে সিগারেট ধরিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। ঘড়ি দেখে আর ঝিঁঝিসহ নানান পোকার কোরাস শুনে সময় পার করতে লাগল।

বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ বর্ডারের কিছু কিছু জায়গা দিয়ে বেআইনী মালামাল এপার-ওপার করা তেমন কঠিন কাজ নয়। বরং একটু সতর্ক থাকলে হেন

জিনিস নেই যা পারাপার করা যায় না। লা পেন-এ ভূমধ্যসাগর ও লাক্সেমবার্গের লংওয়ে জাংশনের কাছের ফ্রেঞ্চ-বেলজিয়ান বর্ডার বহু মাইল বিস্তৃত।

তার দক্ষিণ-পুব প্রান্তের বেশিরভাগ আবার গভীর বন। হান্টিং কান্ট্রির মধ্যে দিয়ে গেছে। বর্ডার অতিক্রম করার মত প্রচুর সাইড রোড আর ট্র্যাক আছে সেই অংশে। ওগুলো সংখ্যায় এত বেশি যে পোস্ট থাকলেও লোকবলের অভাবে তার বেশিরভাগই খালি থাকে। তাই দু' দেশের সরকার ওই এলাকায় 'না হলে চলে না' জাতীয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে।

সেটার নাম ফ্লাইং কাস্টমস। কাস্টমস অফিশিয়ালদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একেকটা ইউনিট, যেদিন যে বর্ডার পোস্টে ইচ্ছা হয় পাহারা দিতে বসে যায়। তা-ও আবার এই আছে, এই নেই ধরনের পাহারা। কোনও ধরাবাঁধা সময়সীমা মেনে চলে না তারা। বাকি পোস্টগুলো খালিই পড়ে থাকে। মানুষজনের ছায়াও চোখে পড়ে না। এসব পোস্টের নাম হাওয়াই পোস্ট।

ওগুলো যদি কখনও চালু থাকে, তা হলে প্রতিটা গাড়িই বর্ডার অতিক্রম করার সময় অবধারিতভাবে সার্চ হবে। বিনা তল্লাশীতে পার হতে পারে না একটাও। আর যেগুলো সত্যিকারের পোস্ট, সেগুলোতে দশটা গাড়ির মধ্যে সবগুলো না হলেও একটা গাড়ি অন্তত তল্লাশীর মুখে পড়বেই। সেদিক থেকে হাওয়াই পোস্টের চেয়ে এগুলোই বরং কিছুটা নিরাপদ।

তৃতীয় বিকল্প একটা আছে। সেটা হলো, পোস্ট আছে অথচ তাতে অফিশিয়াল থাকে না, নিশ্চিতভাবে জানা এরকম রাস্তা দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে বর্ডার পার হওয়া। ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেন চোরাচালানীদের মাল পারাপারের স্বীকৃত রাস্তা এগুলো। নাম শ্যাম্পেন রান। দু' দেশের সরকারই শ্যাম্পেন রান সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

বেলজিয়ান পান রসিকরা ফ্রেঞ্চ শ্যাম্পেনের ভক্ত, আবার ফ্রেঞ্চ চোরাচালানীরা বেলজিয়ান কাস্টমসকে ইমপোর্ট ডিউটি দিতে নারাজ। তাই শ্যাম্পেন রানের সৃষ্টি হয়েছে।

অনুন্নত বিশ্বের কোনও অঞ্চলে শ্যাম্পেন রান জাতীয় স্বীকৃত অথচ অরক্ষিত বর্ডার ক্রসিং পয়েন্ট থাকতে পারে, এমনটা কল্পনাই করা যায় না। বেলজিয়ান-ফ্রেঞ্চ বর্ডারে আছে, কারণ উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ তাদের নাগরিকদের টনটনে দেশপ্রেম আর জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। তারা জানে, এ পথে দেশের জন্য ক্ষতিকর কিছু এপার-ওপার করবে না তারা।

মাসুদ রানাও যে শ্যাম্পেন রানের খবর জানে, সেটা অবশ্য তাদের জানার কথা নয়।

ডিনান্ট থেকে দক্ষিণে গেলে প্রথম যে ফরাসি শহর পড়ে, সেটার নাম গিভেট। এখানে আঙুলের মত সরু একটা ফরাসি করিডর আছে, তিনদিক থেকে বেলজিয়ান ভূখণ্ড ঘেরা। এটাও হান্টিং কান্ট্রি। বর্ডার পারাপারের প্রচুর ট্র্যাক আর পথ আছে এখানে। তার অনেকগুলোই শ্যাম্পেন রান।

এরকম একটা রানার লক্ষ্য। বছর দুয়েক আগে বন্ধু গগলের সঙ্গে সেই পথে বর্ডার অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা আছে ওর।

সূর্য ওঠার খানিক আগে সেই পথে এগোল ওরা। আগে আগে চলল ফরাসি ভ্যানটা। রানা চালাচ্ছে। তেলের ড্রামবাহী বেলজিয়ান ভ্যানটা আছে দু'শো গজ পিছনে। ওটা চালাচ্ছে আতাসী। মার্সিয়া পাশে বসা।

ডিনান্ট থেকে দক্ষিণের রাস্তাটা বেশ ভাল। দু'পাশে গায়ে গায়ে লাগানো গ্রাম। সূর্যোদয়ের একটু আগের আবছা অন্ধকারে ডুবে আছে। ঘরবাড়ির কাঠামো অনুমান করা যায়, দেখা যায় না। ডানদিকের প্রার্থিত রাস্তাটা পেয়ে ভ্যান ঢুকিয়ে দিল রানা। হান্টিং কান্ট্রির মধ্য দিয়ে বর্ডারের সমান্তরালে সাড়ে চার কিলোমিটার পথ পেরিয়ে গতি কমাল।

নাইটগ্লাস চোখে লাগাল রানা। ওটা ঘুরিয়ে ফোকাস স্থির করল তিন-চারশ' গজ সামনের নির্দিষ্ট বেলজিয়ান হাওয়াই পোস্টটার ওপর। রাস্তার দু'পাশে দুটো স্টিলের ব্যারিয়ার, আকাশমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকের ব্যারিয়ারের কাছে ছোটো একটা কাঁচ ও কাঠের বুদ। দু'বছর আগে এই পোস্ট হয়ে বর্ডার অতিক্রম করেছিল রানা। তখনও ব্যারিয়ারগুলো এভাবেই ছিল। সময়ের বিবর্তনে চেহারা কিছুটা পাল্টে গেছে। রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে অন্যরকম হয়ে গেছে। এই যা।

যেমন থাকার কথা ছিল, তেমনি আছে পোস্টটা—ফাঁকা। কেউ নেই। তবু বেশ অনেকটা সময় নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওটা পর্যবেক্ষণ করল রানা। না, সত্যিই কেউ নেই।

বেলজিয়ান বর্ডার পোস্ট পেরিয়ে নো ম্যানস ল্যাণ্ডে ঢুকল ওরা। ওপারের চেয়ে এ অংশে বন অনেক ঘন। তার মধ্য দিয়ে দেড় কিলোমিটার এগোতে ফরাসি পোস্ট দেখা গেল। এটাতেও কেউ নেই। নিশ্চিত হয়ে আতাসীকে ভ্যান ঘোরাতে বলল রানা। খানিক পর দুটো ভ্যানের পিছনদিক একসঙ্গে জোড়া লাগল।

একটার চেয়ে অন্যটার ফ্লোর দেড় ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে থাকল। তবে হ্যাণ্ড ক্রেডলে করে ড্রামগুলোকে এক ভ্যান থেকে আরেক ভ্যানে নিতে তেমন অসুবিধে হলো না। কাজ শেষ করে বেলজিয়ান ভ্যানটাকে আরও ঘন বনের মধ্যে নিয়ে গেল আতাসী। লাইসেন্স প্লেট আর উইণ্ডস্ক্রিন স্টিকার খুলে নিয়ে ওটাকে ঠেলে একটা গ্র্যাভেল পিটে ফেলল।

তারপর ফরাসি ভ্যানে উঠল সবাই মিলে। আতাসী বসল ড্রাইভিং সিটে। বিনা বাধায় বর্ডার পেরিয়ে এসে এ-ওয়ান অটোরুট ধরল সে। ঘণ্টা দুয়েক একটানা চলার পর লিয়ঁ, এভিগনন হয়ে তুলোঁমুখী এ-সিক্সে উঠল। এখন আর চিন্তার কিছু নেই। ভ্যানটা আতাসীর নিজ নামে কেনা। বৈধ ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স রয়েছে ওর।

প্রশ্ন করা হলে বলতে পারবে : তুলোঁয় তার এক বন্ধুর কৃষি খামার আছে। তিনটে ট্রাক্টর আছে তার। সেগুলোর জন্য পাঁচ ব্যারেল তেল নিয়ে যাচ্ছে সে। রানা আর মার্সিয়া হিচহাইকার।

প্যারিসের কিছুটা দক্ষিণে অরলি এয়ারপোর্টের পথ নির্দেশক তীর দেখে গাড়ি থামাল আতাসী। গাড়ি থেকে নামল রানা। 'সাবধানে যেয়ো তোমরা।

আমি চার-পাঁচদিনের মধ্যে ফিরব।'

প্রায় নীরবে বিদায় পর্ব সারল ওরা। ভ্যান রওনা হয়ে গেল দক্ষিণের পানে, রানা কাছের এক গ্যারাজ থেকে ফোন করে ট্যাক্সি আনিয়ে চলল এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। সূর্য ডোবার আগেই লণ্ডন পৌঁছে গেল ও।

পৌঁছেই কনসোর্টিয়ামের আনট্রেসেবল নাম্বারে ফোন করল মাসুদ রানা। হ্যারিসের জন্য নিজের ফিরে আসার মেসেজ দিয়ে রাখল। তারপর গোপন সেল ফোনটা বের করে চেক করল প্রার্থিত মিসড্ কলটা এসেছে কি না। আসেনি। বোকার মত ব্ল্যাঙ্ক মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

এই নিয়ে চারবার হলো। দেড় মাসের বেশি হতে চলল সাড়া নেই। নাহ্, আর দেরি করা যায় না। এবার একটা কিছু না করলে চলছে না। কী করা যায় ভাবছে রানা, এমন সময় ডান হাতটা হঠাৎ চুলকে ওঠায় চমকে উঠল ভীষণভাবে। হাত থেকে পড়েই যাচ্ছিল সেল ফোনটা, কোনওমতে ধরল আবার।

চিপ যেখানে বসানো হয়েছে, সেখানটা চুলকাচ্ছে। কাঁপছে। মনে হলো চামড়ার নীচে কী যেন একটা আছে। হেঁটে বেড়াচ্ছে। গা শিরশির করছে। এমন হচ্ছে কেন? এটা তো সেই পরিচিত অনুভূতি নয়! তা হলে... ? ঘাবড়ে গেল রানা। কোন টেকনিকাল ত্রুটি দেখা দেয়নি তো? এখনই কি ফাটবে বোমাটা? মারা যাচ্ছে ও? কয়েক মুহূর্তের জন্য দিশেহারা বোধ করল রানা। তারপর তৈরি হয়ে গেল মৃত্যুসহ যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপর হঠাৎ করেই আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল সবকিছু। কম্পনের অনুভূতিটা মিলিয়ে গেল পুরোপুরি। তবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ও। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে হাতের ওপর। জানে না, এর পরই ফাটবে কি না ওটা।

চিকন ঘামে কপাল ভিজে উঠেছে ওর। কারও ইচ্ছায় না হোক, স্রেফ টেকনিকাল কোনও ভুলেই যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে জিনিসটা? যদিও নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হয়েছিল কোনও বিপদ ঘটবে না। কাজ করতেও অসুবিধা হবে না। এতদিন তেমন কোনও অসুবিধে হয়ওনি।

কিন্তু এইমাত্র যা ঘটে গেল, তারপর আর ওই কথাটায় বিশ্বাস রাখতে পারছে না রানা। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই।

যদি কারও আঙুলের টিপ লেগে যায় লাল বোতামটায়? ব্যস, মরতে হবে ওকে? বুকের মধ্যে শীতল একটা ক্রোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। শীতল, ভয়ঙ্কর ক্রোধ।

হ্যারিসকে তলব করে এর ব্যাখ্যা চাইতে হবে। বোঝাপড়াটা এখনই সেরে ফেলতে হবে। এভাবে কাজ করা সম্ভব নয়। সামনের টেবিলে সেল ফোন রেখে সোজা হলো ও। সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশ করল ওটার মনিটর। এক মুহূর্ত পর রিং হলো। মনিটরে নামটা দেখে বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো রানার।

'হ্যালো!'

'কেমন আছেন, মাসুদ ভাই?'

'ভাল না।' অজান্তেই গলা চড়ে গেল ওর। 'জিনিসটা প্রবলেম করছে।'
'প্রবলেম?' পাশে আর কেউ আছে সম্ভবত, তার সঙ্গে চাপা স্বরে দ্রুত কিছু বলল কলার। 'ঠিক কী রকম বলুন তো, ভাইয়া?'
'ওই জায়গায় চামড়ার নীচে চুলকাচ্ছে। এইমাত্র... '
'চুলকাচ্ছে? আর কাঁপে, নড়েচড়ে, তা-ই না?'
'হ্যাঁ।'
'ব্যস! তা হলেই কেল্লা ফতে হয়ে গেছে!' প্রবল আত্মবিশ্বাস ফুটল তার কণ্ঠে।
'মানে?'
হা-হা করে হেসে উঠল বিলাই হ্যাকার ওরফে বাকি বিল্লাহ। প্রতিভাবান মানুষটার পাগলা হাসি শুনে বোকা বনে গেল রানা। উন্মাদ হয়ে গেল নাকি! হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ও সামনের দেয়ালটার দিকে। তারপর বুঝল। দুই চোখের বাইরের কোণে চামড়ায় ভাঁজ পড়ল ওর। হাসতে শুরু করেছে। ওর মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে বিল্লাহর হাসি।
তবে আটলান্টিকের ওপারের হাসিটার কোনও তুলনা হয় না। সাফল্যের আনন্দে প্রাণ খুলে হাসছে তো হাসছে তো হাসছেই।

পরদিন দুপুরের পর আর্লিংটন হাউজে ওর সঙ্গে দেখা করতে এল হ্যারিস। আজ নতুন দৃষ্টিতে দেখল রানা লোকটাকে।
'এরপরের স্টেজ কী?' ওর প্রস্তুতি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে জনতে চাইল সে।
'পাঁচদিনের মধ্যে আবার ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি আমি,' বলল রানা। 'টেমপেস্টে প্রথম পর্যায়ের কার্গো লোডিং সুপারভাইজ করতে হবে।'
'কী কী মাল, জানাতে আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?'
না শোনার ভান করল রানা। 'চারটে আলাদা ক্রেটে অ্যাসর্টেড ইউনিফর্মস আর ওয়েবিং লোড করা হবে। হ্যামবার্গ থেকে কেনা কিছু নন-মিলিটারি স্টাফ থাকবে। কাস্টমস চেক করলেও ভয় নেই। ওগুলোর কোনোটাই অবৈধ নয়।'
'কিন্তু আর্মস? ইনফ্লেটেবল ডিঙ্গি বা আউটবোর্ড ইঞ্জিন, এইসব নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে? যদি কাস্টমস অফিসাররা বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করে ড্রামগুলো?'
শ্রাগ করল রানা। 'তা হলে জাংগারো মিশন খতম।'
'কী বলছেন?'
ওয়াল্টার হ্যারিসের পলকহীন সাপের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল ও, 'নতুন কিছু বলেছি কী? এ ধরনের কাজে সব সময়ই সব হারাবার ঝুঁকি থাকে।'
'তা থাকে। কিন্তু আপনি ইচ্ছে করলে অর্ডার দিয়ে এক জায়গা থেকেই সব আর্মস কিনতে পারতেন।'
মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'সব জিনিস এক জায়গায় পাওয়া যায় না। কিছু

ব্রাসেলস থেকে, কিছু স্পেন থেকে আর কিছু ইউগোস্লাভিয়া থেকে কিনতে হয়েছে। বিশেষ করে আর্মস আর বুলেট এক জায়গা থেকে কিনতে গেলে সেটা হয়ে যেত ম্যাচিং পেয়ার। লোকে ভাবত একদল মানুষের জন্য কেনা হচ্ছে। কোনও বিশেষ অপারেশনের জন্য। তাতে মিশনের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারত।'

মাথা দোলাল হ্যারিস। চিন্তিত। 'তা ঠিক। আপনার কমাণ্ডো বাহিনী কোথায়?'

'লাটাকিয়ায়,' রানা বলল। 'লিবিয়া উপকূলে।'

'যাওয়ার সময় তুলে নিয়ে যাবেন?'

'ফ্রেইটারে?' মাথা নাড়ল ও। 'না। ওটায় এত লোকের জায়গা হবে না। ওরা সাধারণ লাইনারে যাবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল হ্যারিসের। 'কিন্তু... তাতে নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটবে না ওদের? চেকিঙে অস্ত্র ধরা পড়ে গেলে?'

'অস্ত্র থাকলে তো! ওদের কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। সব থাকবে আমার জিম্মায়।' একটু বিরতি। 'আমি কালকেই চলে যাচ্ছি। মাল লোড হয়ে গেলে ভেসেল ব্রিন্দিসির পথে রওনা হয়ে যাবে। আমি ইউগোস্লাভ আর্মস পিক-আপ করে ভ্যালেন্সিয়া যাব স্প্যানিশ অ্যামোর জন্য।'

'আই সি।'

'আপনাকে বিশেষ করে যে জন্য ডেকেছি। আফ্রিকান কোস্টে যত পোর্ট আছে, সবগুলোর ইনশোর চার্ট দরকার আমার,' রানা বলল। 'ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে কেপ টাউন পর্যন্ত সবগুলোর। জোগাড় করে রাখবেন দয়া করে। যাত্রার আগে নিয়ে যাব আমি।'

ভুরু কোঁচকাল মার্টিন। কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। দরজার বাইরে পা রেখে বলল, 'বেশ। আর কিছু?'

'হ্যাঁ,' চেহারা কঠোর হয়ে উঠল রানার। 'রিমোট কন্ট্রোলটা কার হাতে আছে আমি জানি না। আপনার হাতে থাকলে মন দিয়ে শুনুন, অথবা আর যার কাছে আছে, তাকে আমার হয়ে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন, আমাকে নিয়ে এই যে খেলা চলছে, তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।'

একটু ইতস্তত ভাব দেখা গেল মার্টিনের মধ্যে। 'কেন বললেন কথাটা?'

'অর্থাৎ আপনার কাছে নেই ওটা। অল রাইট, যার কাছে আছে তাকে বলবেন কথাটা। সে মনে হয় বুঝবে কেন বলছি।' লোকটার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল ও।

দু' ঘণ্টা পর, মাইনিং কোম্পানি ম্যানসন'স কনসোলিডেটেড-এর হেড অফিসে পৌঁছল মাসুদ রানা। কোম্পানির বর্তমান মালিক, টমাস ম্যানসনের রাজকীয় অফিসে।

ওর বক্তব্য শুনে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা। আরও আধ ঘণ্টা পর রানা উঠল।

'আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। যা বলেছি খেয়াল রাখবেন।'

হুঁশ হতে তাড়াতাড়ি মাথা দোলাল টমাস ম্যানসন। 'অভ কোর্স! অভ কোর্স! নিশ্চয়ই মনে থাকবে।'

কিছু কাগজপত্র ধরিয়ে দিল রানা ওর হাতে। 'এগুলো রাখুন। সার রিচার্ড, ডক্টর হুপার, জেমস ব্রাউন ও তার অসুস্থ বোন, এই চারজনের হত্যাকারীর নাম-ঠিকানা আছে এতে। গ্রেফতার করানোর মত যথেষ্ট প্রমাণও আছে। আমি থাকতে পারছি না বলে আপনাকে দিয়ে গেলাম।' একটু বিরতি। 'সময় হলে আমার লোক খবর দেবে। তখন অ্যাকশনে যাবেন। মনে রাখবেন, সময়ের একটুও হেরফের হয় না যেন।'

'অবশ্যই! অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সার,' কাঁপা গলায় বলল টমাস ম্যানসন। চোখে পানি এসে গেছে। 'আপনার এই ঋণ আমি কখনও শোধ করতে... '

'ওসব ভুলে যান,' রানা বাধা দিল। 'আমি চাই অপরাধী ধরা পড়ুক। উপযুক্ত শাস্তি পাক।'

পরদিন সকালে রানাকে নিয়ে হিথরো থেকে আকাশে উঠল সাবেনা এয়ারলাইনসের জেট। দক্ষিণ লণ্ডনের আকাশে চক্কর দিয়ে আপন গন্তব্য ব্রাসেলসের উদ্দেশে ছুটল। পোর্ট উইং দিয়ে নীচে তাকাল রানা।

সকালের ঝলমলে তাজা রোদে কেন্ট-এর শ্বাসরুদ্ধকর স্নিগ্ধ চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। একরের পর একর জমি গোলাপি আর সাদা চাদর দিয়ে মুড়ে রেখেছে কে যেন। আপেল, নাশপাতি আর চেরির বাগান ওগুলো।

বেঁচে যাওয়া টাকা তুলে নিয়ে ক্রেডিয়েটব্যাংকের অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করতে ঘণ্টা দুয়েক লাগল রানার। গুজেনসকে শেষবারের মত বিস্মিত করে সেই টাকায় আটাশটা সার্টিফাইড ব্যাংক চেক নিল ও—প্রতিটা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের।

বিশ্বের যে-কোনও দেশের যে-কোনও ব্যাংকে নতুন অ্যাকাউন্টে পরিণত করা যাবে ওগুলোকে। বাকি টাকা পাঁচ হাজার ডলারের বারোটা ট্রাভেলার্স চেক করিয়ে নিল ও। কাউন্টার সিগনেচার দিলেই নগদ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ওগুলোকে। তারপর আরও যা বাঁচল, নগদ তুলে নিল।

টেমপেস্টের ক্যাপ্টেন আর ক্রুদের পিছনে এর একটা অংশ খরচ করতে হবে ওকে। কারণ লোকগুলো যখন জেনে যাবে লুব্রিকেটিং অয়েলের ড্রামে আসলে কী আছে, বিভিন্ন পোর্ট থেকে ক্রেটে করে কী মাল তোলা হচ্ছে, টেমপেস্ট আসলে কোন্ মিশনে যাচ্ছে, তখন কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। সবার মুখ বন্ধ করতে হবে। তাতে অবশ্য বেশি খরচ হবে না।

বাকি টাকা নিয়ে অন্য পরিকল্পনা আছে ওর।

রাতটা ব্রাসেলসে কাটিয়ে পরদিন ফার্স্ট ফ্লাইটে প্যারিস হয়ে মার্সেই পৌঁছল রানা। আগেরদিন নিজের শেষ কিছু কাজ গুছিয়ে নিতে মার্সেই এসেছিল আতাসী। কাজ সেরে থেকে গিয়েছিল ওর জন্য। দু'জনে ট্যাক্সিতে তুলোঁ পৌঁছল দুপুর নাগাদ।

আট

মিশ্রি খান বাদে আসন্ন জাংগারো মিশনের অন্য চার সদস্য মিলিত হলো তুলোঁয়। পাঞ্জাবি খান অনুপস্থিত, কারণ সে তখন টেমপেস্ট নিয়ে সাগরে, তুলোঁ থেকে একশ মাইল বা তারও কিছু দূরে রয়েছে। পরদিন, সোমবার দুপুরের দিকে পৌঁছবে।

বেশ কয়েক সপ্তাহ পর আবার একত্রিত হতে পেরে খুশি হলো সবাই। একটা অভিজাত রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে লাঞ্চ খেয়ে যার-যার ব্যক্তিগত কেনাকাটা সারতে বের হলো। কাজ শেষ হতে হারবারের অপরূপ শোভা আর মানুষের আনাগোনা দেখে কিছু সময় পার করল ওরা।

এই ফাঁকে সবাইকে অজানা অভিযান সম্পর্কে ব্রিফ করল রানা। এবারও গন্তব্যের নাম প্রকাশ করল না ও। কেউ জানতেও চাইল না। তবে ফায়জাকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলো। 'যদি ওরা মানতে রাজি না হয়?' বলল ও। 'তোমরা দু'জনই নেই। এই অবস্থায় যদি বেঁকে বসে?'

'আমার মনে হয় না তেমন কিছু করবে,' ওর একটা হাত মুঠোয় নিয়ে মৃদু চাপ দিল রানা। 'টাকার নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

ওদেরকে চারটের দিকে হোটেলে পাঠিয়ে দিল রানা। তারপর পরিস্থিত বোঝার জন্য একা বন্দরে চলে এল।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটা নৌ-বন্দরের মধ্যে একটা হচ্ছে ফ্রান্সের তুলোঁ হারবার। বন্দরের গোটা আকাশ ঢেকে রেখেছে ফরাসি যুদ্ধ জাহাজগুলোর পাহাড় সমান সুপারস্ট্রাকচার। হারবারের সেদিনকার মূল আকর্ষণ ছিল আগের দিন ফ্রেঞ্চ ক্যারিবিয়ান টেরিটরিতে লম্বা সফর শেষ করে ফিরে আসা অতিকায় ব্যাটল ক্রুজার, জাঁ বার্ট।

জেটিতে গিজগিজ করছে ওটার নাবিক বাহিনী। ব্যাক-পে'র নগদ নারায়ণে সবার পকেট ভর্তি। মনের মত সুন্দরীর খোঁজে হন্যে হয়ে বন্দরে ঘুর ঘুর করছে সবাই। সুন্দরীরাও কম যায় না। এরকম সুযোগের অপেক্ষাতেই থাকে তারা। কাজেই রূপের মোহনীয় শর দিয়ে কে কতজন পুরুষকে ঘায়েল করতে পারে, এ মুহূর্তে সেই প্রতিযোগিতায় মেতে আছে। হাজারো মানুষের সামনে চুমোচুমি আর অজায়গায় হাত বোলানো চলছে।

হারবারের সাগরমুখো প্রশস্ত এসপ্লানেড ভর্তি অজস্র কাফে আর রেস্তরাঁ, সবগুলোয় ভ্রমণ পিয়াসীদের উপচে পড়া ভিড়। মেডিটারেনিয়ান অঞ্চলের প্রতিটি দেশের মানুষ জীবন উপভোগ করতে এখানে আসে।

দুনিয়ার আর সব নৌ বন্দরের মত এখানকার বাতাসেও সেই চিরচেনা ডিজেল, মবিল, দড়ি-কাছি আর মশলার ঝাঁঝাল গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

সোমবার দুপুরের পর হারবারে নাক ঢোকাল টেমপেস্ট। দূর থেকে ওটাকে

পুবের জেটিতে নোঙর ফেলতে দেখল মাসুদ রানা। দীর্ঘ একসারি কাস্টমস শেড, ওয়্যারহাউস আর হারবার অফিসের কাছে। পঞ্চাশ মিটার দূরে, জেটির এক বোলার্ডে বসে ওটার গতিবিধি লক্ষ করছে রানা।

মিশ্রি খান আর কার্ল ওয়ালডেনবার্গকে ডেকে ঘোরাঘুরি করতে দেখল ও। সার্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেল না। লোকটা নিশ্চয়ই প্রিয় ইঞ্জিনের সান্নিধ্য ছেড়ে নড়তে চাইছে না। দুটো নতুন মুখ দেখল ও। কাছি দিয়ে টেমপেস্টকে বাঁধছে জেটির সঙ্গে। এদেরকে নিশ্চয়ই ওয়ালডেনবার্গ নিয়োগ দিয়েছে।

একটা পিচ্চি রেনাও গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে টেমপেস্টের গ্যাংওয়ের কাছে গিয়ে থামল। গাঢ় রঙের সুট পরা এক গোলগাল ফরাসি নামল গাড়ি থেকে, টেমপেস্টে গিয়ে উঠল। আতাসী জানাল লোকটা এজেন্সি মেরিটাইম ডুফটের প্রতিনিধি। একটু পর তার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গও নেমে এল জেটিতে। একসঙ্গে কাস্টমস জেটির দিকে চলে গেল তারা।

প্রায় এক ঘণ্টা পর শেড থেকে বের হলো ওরা। শিপিং এজেন্ট কার ছুটিয়ে শহরের দিকে চলে গেল। ক্যাপ্টেন গিয়ে উঠল টেমপেস্টে। আরও আধ ঘণ্টা পর উঠল রানা। মিশ্রি খান দাঁত বের করে হাসল ওকে দেখে। ইশারায় নীচের ক্রু'স সেলুনে ডাকল।

কম্প্যানিয়নওয়ে বেয়ে নীচে চলে এল মাসুদ রানা। হালকা নীল ধোঁয়ার একটা পর্দা ভেসে বেড়াচ্ছে সেলুনে। 'কেমন হলো তোমার যাত্রা, খান?'

পাঞ্জাবি দাঁত বের করে হাসল। বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে বৃত্ত বানিয়ে নাচাল। 'একদাম ফাস ক্লাস, ওস্তাদ। কোই কুছ ন্যহি পুছা।'

'তাই?'

'হাঁ। কিন্তু ভাতিজা ওয়ালডেনবার্গ এখনও ভাবছে আমরা ইংল্যাণ্ডে বেআইনী ইমিগ্র্যান্ট রান করাতে যাচ্ছি।' কিছু মনে পড়ল মিশ্রির। 'ওস্তাদ, লুব্রিকেটিং অয়েলের কী অবস্থা?'

'সব রেডি,' রানা বলল। কিছু টাকা তার সামনে রাখল। 'বিকেলে ভ্যানে করে নিয়ে আসবে আতাসী, পাঁচ ড্রাম। এই নাও টাকা। আতাসীকে তেলের দাম পে করে লোক দেখানো পাকা রশিদ লিখিয়ে নেবে।'

'ঠিক হ্যায়।' টাকা পকেটে রাখল সে।

'একটু আগে কে এসেছিল, শিপিং এজেন্ট না?'

'হ্যাঁ। প্রথমে কোথায় যাচ্ছি আমরা, ওস্তাদ?'

'ব্রিন্দিসি।'

'ব্রিন্দিসি থেকে কী তুলতে হবে?'

'কিছু না। আমি জার্মানি থেকে ব্রিন্দিসি পোর্ট অথরিটির মাধ্যমে কেবল করব তোমাকে। ওখান থেকে কোথায় যেতে হবে, কবে পৌঁছতে হবে জানাব।'

'তারপর?'

'তারপর কোনও লোকাল এজেন্টকে দিয়ে ইউগোস্লাভিয়ার নির্দিষ্ট এক পোর্টের বার্থ রিজার্ভ করবে।'

'ওখান থেকে কিছু তুলতে হবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আশা করছি। প্রয়োজনীয় চার্ট জোগাড় করেছ তো?'
'হ্যাঁ। জেনোয়া থেকে সব কিনে নিয়েছি।'
রানার সিগারেট নিল না মিশ্রি খান। 'আপনার ওইসব খেয়ে আমার নাতিরও নেশা মিটবে না,' বলে নিজের ব্র্যাণ্ডের একটা ধরাল। কটুগন্ধে ভরে উঠল সেলুন। 'ভাতিজিরা কখন উঠবে জাহাজে?'
'রাত গভীর হলে।'
মাথা দোলাল খান। কিছু ভাবল। 'ওদেরকে চোরের মত উঠতে দেখলে ক্যাপ্টেন ভাববে তার ধারণাই ঠিক। আমরা আদম পাচারকারীই।'
রানা হাসল মৃদু। 'যা খুশি ভাবুক না।'
'তবে ইউগোস্লাভিয়া থেকে অন্য কিছু তোলা হলে ওর ধারণা পাল্টাতে পারে।'
'ওকে স্পিড বোট, ইঞ্জিন, ওয়াকি-টকি, এইসব লোড করা হবে জানিয়েছিলে তো?'
মাথা ঝাঁকাল পাঞ্জাবি। 'হ্যাঁ।' একটু বিরতি। 'তা নিয়ে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু... মনে হয় আর্মসের বেলায় বলবে।'
'জানি। তখন ব্যাটাকে কিনে নেব! কিছু টাকা খসবে, আর কী। কোনও অসুবিধা হবে না।'
নীরবে মাথা দোলাল মিশ্রি খান।
'দু'জন নতুন হ্যাণ্ড দেখলাম যেন?'
'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন ভাতিজার নিয়োগ করা। ফার্স্ট মেট নরবিট্টো, ডেকহ্যাণ্ড কিপরিয়ানি। নরবিট্টো হচ্ছে ইটালিয়ান। আমার ধারণা, কোনও অকাজ করে কারাবিনিয়ারির তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল। বোটে আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছে। খোলা সাগরে যাওয়ার জন্য অস্থির।'
'ভাল। তা হলে চাইলেও মাঝপথে কোথাও নেমে পড়তে পারবে না।'
ওয়ালডেনবার্গ এসে দাঁড়াল সেলুনের দরজায়। রানাকে দেখে হাসল। 'কেমন আছেন?'
'ভাল। থ্যাংক ইউ। আপনার কেমন চলছে?'
কাঁধ ঝাঁকাল জার্মান। 'মন্দ না। ভালই চলছে।' নিজের রিক্রুট বলে নরবিট্টো আর কিপরিয়ানিকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কিন্তু ওরা বিশেষ আগ্রহ দেখাল না রানার ব্যাপারে। খানিক পর মিশ্রি খানকে কিছু নির্দেশ দিয়ে বিদায় নিল ও।
শেষ বিকেলে এজেন্সি মেরিটাইম ডুফট থেকে দুটো ভ্যান এল মালপত্র নিয়ে। টেমপেস্টের গ্যাংওয়ের গোড়ায় থামল। প্রথম ভ্যান থেকে নামল দুপুরের সেই প্রতিনিধি। কাছের কাস্টমস শেড থেকে ক্লিপবোর্ড হাতে একজন কাস্টমস অফিসারও এল। তারপর টেমপেস্টের ডেরিকের সাহায্যে ভ্যানের ক্রেটগুলো এক এক করে তোলা হলো খুদে ফ্রেইটারে।
চারটে ক্রেটে আছে অ্যাসর্টেড রাফ ক্লোদিং—বেল্ট, বুট, ক্যাপ। তিনটা বড় ক্রেটে আছে তিনটে ইনফ্লেটেবল ডিঙ্গি, তিনটে আউটবোর্ড ইঞ্জিন। দুই ক্রেট

বোঝাই ফ্লেয়ার, বিনকিউলার, জাহাজের গ্যাসচালিত ফগহর্ন, রেডিওর যন্ত্রাংশ এবং ম্যাগনেটিক কম্পাস। শেষ ক্রেটের মালামাল টেমপেস্টের স্টোরের জন্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে লিস্টে।

কাস্টমস অফিসার ক্রেট পরীক্ষা না করেই কার্গো ম্যানিফেস্টে সিল মেরে দিল। এজেন্সি মেরিটাইম ডুফটকে চেনে তারা। জানে, তাদের মাল পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় না।

ছয়টার দিকে আতাসী এল পাঁচ ড্রাম ক্যাস্ট্রল লুব্রিকেটিং অয়েল নিয়ে। ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে পাশাপাশি দুটো প্ল্যাংক বিছাল ও। তার উপর দিয়ে ড্রামগুলো সাবধানে গড়িয়ে নামিয়ে আনল দুই ইটালিয়ানের সাহায্যে। নীচে এনে ক্রেডলের উপর বসানো হলো ওগুলোকে, তারপর টেমপেস্টের উইঞ্চে করে ঝোলাতে ঝোলাতে ডেকে নিয়ে তুলল ওয়ালডেনবার্গ।

অন্যদিকে মিশ্রি খান সারাক্ষণ প্রায় অহেতুক দৌড়-ঝাঁপ আর 'হেই, সাবধান! হেই আস্তে!' করে চেঁচামেচি করে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলার জোগাড় করল। ড্রামগুলোকে পরে ডেক থেকে নামিয়ে নেয়া হলো টেমপেস্টের শীতল হোল্ডে। হ্যাচ কভার টেনে ক্ল্যাম্প লাগিয়ে দেয়া হলো। টাকা দিয়ে বিদায় করা হলো লে. আতাসীকে।

টেমপেস্টের একশ' গজ দূরের এক বোলার্ডে বসে গোটা লোডিং পর্ব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করল মাসুদ রানা। মিশ্রি খানের খবরদারি দেখে হাসল মনে মনে। লোডিং শেষ হতে শান্ত হয়ে এল টেমপেস্টের পরিবেশ। ক্যাপ্টেন ও তার তিন সহযোগী নীচের ডেকে চলে গেল কিছু সময়ের জন্য। সার্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ার উঠে এল লোনা বাতাসে দম নিতে।

আধঘণ্টা পর সবার অলক্ষে জেটিতে নেমে এল মিশ্রি খান। একটু দূরে মিলিত হলো রানার সঙ্গে।

'আমি জানতাম, কোনও ঝামেলা হবে না,' হাসল পাঞ্জাবি।

রানার মুখেও স্বস্তির হাসি। 'কার্গোর ওপর কড়া নজর রাখবে তুমি। ড্রামের কাছে কাউকে ঘেঁষতে দিয়ো না। অন্তত ইউগোস্লাভিয়া পৌঁছানো পর্যন্ত। তারপর ভেতরের কথা জানানো হবে ওয়ালডেনবার্গকে।'

আরও খানিক পর ওদের সঙ্গে যোগ দিল মিশনের বাকি তিন সদস্য—লেফটেন্যান্ট আতাসী, মার্সিয়া ও ফায়জা। টকটকে লাল সূর্যটা হারবারের পানিতে সেদিনকার মত ডুব দিতে চলেছে। বাতাসে ঢেউ উঠছে দূরের খোলা সাগরে। সাদা, ফসফরেসেন্ট ফেনায় ভরে আছে চারদিক।

দূরে এক-আধটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে—এক ঢেউয়ের সামনে থেকে সরে গিয়ে পরের ঢেউ থেকে বাঁচতে নতুন করে অবস্থান বদল করছে, বারবার, ওস্তাদ ব্যালেরিনার মত।

সাড়ে আটটায় রানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফ্রেইটারে ফিরে গেল মিশ্রি খান। সময়ের সঙ্গে ক্রমে বন্দরের তৎপরতাও কমে আসতে লাগল। নির্জন জেটির প্রায় অন্ধকার এক প্রান্তে উপযুক্ত ক্ষণের অপেক্ষায় থাকল রানা-ফায়জা, আতাসী-মার্সিয়া।

'তোমাকে এবার খুব মিস করেছি,' ফায়জা নিচু কণ্ঠে বলল। অল্প আলোয় কালো চুলের ফ্রেমে ওর ফরসা, অপূর্ব সুন্দর মুখটা কমনীয় লাগল। 'ঠিকমত দুটো কথা বলার সময়ও হলো না।'

রানা হাসল। 'আমারও তো সেই একই কথা। আমিও তোমাকে মিস করেছি।'

'মিথ্যে বলছ। তুমি অনেক বদলে গেছ,' অনুযোগের সুরে বলল মেয়েটা।

হাসল রানা। 'তাই নাকি?'

'হেসো না।' একটু বিরতি। 'আমি বুঝতে পারছি না এতদিন পর কী ভেবে আমাদেরকে মনে করলে তুমি। আমাদের মিশন কী, এখনও জানি না। তবে এ কাজ তুমি অন্যদের দিয়েও করিয়ে নিতে পারতে, এটুকু বুঝি।'

'তোমাদের দেখতে ইচ্ছে হয়েছে, তাই ডেকেছি। ব্যস।'

ওর চোখে চোখে চেয়ে হাসল ফায়জা। 'তোমাকে যদি না চিনতাম, তা হলে কথাটা বিশ্বাস করতাম।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার জন্য একটা ধাঁধা হয়ে থাকল ব্যাপারটা। চেষ্টা করে দেখো জবাবটা বের করতে পারো কি না। আমি ফিরে এসে শুনব।'

'কবে ফিরছ?'

'এখনই বলতে পারছি না,' ফায়জার কপালের ওপর এসে পড়া কিছু চুল কানের পিছনে নিয়ে গুঁজে দিল ও। 'ড্রামগুলোর ওপর বিশেষ নজর রেখো।'

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ফায়জা। কোনও প্রশ্ন মুখে এসে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। 'রাখব।'

ফায়জার একটা হাত নিয়ে খেলা করতে লাগল রানা। ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'একটা প্রশ্ন করবো, যদি কিছু মনে না করো।'

ভুরু কোঁচকাল কালোকেশিনী ফায়জা। 'করবো না। বলো, কী জানতে চাও।'

'তোমার... তোমাদের বিয়েটা ভেঙে গেল কেন? ভালোবেসেই তো বিয়ে করেছিলে।'

কিছুক্ষণ কথা জোগাল না ফায়জার মুখে। অপলক তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। এক সময় নড়ে উঠল। 'এতকিছু জানো যখন, বাকিটাও নিশ্চয়ই জানো!'

না শোনার ভান করল রানা। ওর মনোযোগ ঘোরাতে ব্যর্থ হয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফায়জা। মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

'গামালের পরিবারের ডিম্যাণ্ড মেটাতে পারেনি আমার বাবা,' উদাস কণ্ঠে বলল ও। 'অনেক টাকা। বিয়ের সময় কথা ছিল এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করে দেয়া হবে। কিন্তু... ব্যবসায় লোকসানের জন্য দিতে পারেনি। তারপর... '

'তোমাদের ওদিকে জানতাম ছেলে পক্ষকেই যৌতুক দিতে হয়,' বাধা দিয়ে বলল ও।

'সেটা নির্ভর করে দুই পক্ষের সামাজিক মর্যাদার ওপর। যে পক্ষের

স্ট্যাটাস নিচু পর্যায়ের, সেই পক্ষকে যৌতুক দিতে হয়।' কিছু অবাধ্য চুল চোখের উপর এসে পড়ায় পিছনে সরিয়ে দিল ফায়জা। 'গামালের বাবা পুরনো দিনের মানুষ। মর্যাদাবোধ টনটনে। ছেলের শ্বশুর কথা না রাখলে আত্মীয়দের কাছে মুখ থাকে না। তাই... দোষ আসলে আমার ভাগ্যের।'

'ওকে আবার পেতে ইচ্ছে করে না?'

'না!' এত দ্রুত জবাবটা এল যে অবাক না হয়ে পারল না মাসুদ রানা। 'অনেক যত্নে সাজিয়েছিলাম... স্বপ্নের অনেক জাল বুনেছিলাম... সব ছিঁড়ে গেছে। এখন ছোটোখাটো একটা ব্যবসা নিয়ে আছি। ভালোবাসার জালে আর জড়াতে চাই না।'

'সরি,' ওর হাতে মৃদু চাপ দিল রানা। 'তোমাকে কষ্ট দিলাম। মাফ করে দিয়ো। যদি...'

গলা খাঁকারির শব্দে ঘুরে তাকাল রানা। 'ওস্তাদ, ভাতিঝিরা এখন উঠে পড়ুক। সময় হয়ে গেছে।'

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল রানা। একটা বাজতে চলেছে। 'হ্যাঁ। ঠিক আছে।'

নীরবে হাত নেড়ে বিদায় নিল ওরা। আরেকবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে টেমপেস্টের গ্যাং প্ল্যাঙ্কের দিকে এগোল দ্রুত পায়ে। উঠে পড়ল চট্ করে। যাত্রী তোলার অনুমতি নেই টেমপেস্টের, ক্যাপ্টেন আর ক্রু-রা ছাড়া অন্য কারও ওঠা সম্পূর্ণ নিষেধ বলে এই সতর্কতা। ব্রিজ থেকে ওয়ালডেনবার্গ ব্যাপারটা লক্ষ করে ঠোঁট টিপে হাসল একটু। তার ধারণা কতটা নির্ভুল বুঝতে পেরে মনে মনে বাহবা দিল নিজেকে।

ভোর হতে বেশি দেরি নেই, এই সময় জেটি থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল টেমপেস্ট। ঘুরে খোলা সাগরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল পিছনে জোর আলোড়ন তুলে। যতদূর দেখা যায় ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা ও আতাসী। এক সময় ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল ওটার নেভিগেশন লাইট।

সকাল দশটায় রানাকে নিজের ভ্যানে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিল আতাসী। 'তোমার সাথে যেতে পারলে খুশি হতাম, বস্,' বলল আতাসী। 'অথবা ওদের সাথে,' সাগর ইঙ্গিত করল।

'বুঝতে পারছি,' মাথা দোলাল রানা। 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই জানিয়েছি, তোমার যাওয়ার ব্যাপারটা আমি পাকা করেই এসেছি। তাছাড়া এ কাজ করার মত আর কেউ এমনিতেও নেই আমাদের মধ্যে। এটা না হলে আমাদের মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

একটু ভাবল ও। 'তুমি ফ্রেঞ্চ জানো, তা ছাড়া আমি বাদে দলের একমাত্র তোমাকেই চেনে ওরা। বুঝতেই পারছ, ব্যাক-আপ ফোর্স না থাকলে আমাদের কোনও আশা নেই। ওরা অনেক আশা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আর... যা যা বলেছি মনে রেখো। ভাইটাল পয়েন্ট ওগুলো।'

'বলতে হবে না। আমি জানি,' হাসল বেদুঈন। 'অল রাইট, বস্। কী বলেছি ভুলে যাও।'

শেকহ্যাণ্ড করল রানা। 'চলি। খেয়াল রেখো নিজের দিকে। এক মাস পর দেখা হবে।'

আধ ঘণ্টা পর রানাকে নিয়ে উড়াল দিল ওর হ্যামবার্গ ভায়া প্যারিস ফ্লাইট।

ক্লারেন্স। সিটি স্কয়ারে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে আজ। সকাল থেকে দলে দলে এত মানুষ এসেছে যে এখন সেখানে পা রাখাই দায় হয়ে উঠেছে। হই-হই আনন্দ ধ্বনিতে শহর মাথায় তুলে রেখেছে জনতা। নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো সবাই আছে তার মধ্যে। নানান ব্যানার-ফেস্টুন আর রং-বেরঙের বেলুন শোভা পাচ্ছে তাদের হাতে। আনন্দের বন্যা বইছে যেন সারা শহরে।

প্রকাশ্যে এক অপরাধীর প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হবে। বিদেশি নাগরিক সে। নাম : হেনরি গোমেজ। হোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মালিক ছিল এক সময়। এ দেশে বাস করে এ দেশেরই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। বিচারও হয়ে গেছে। তার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় জাংগারোর লাইফ প্রেসিডেন্ট, *উম থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবা স্বয়ং মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন গোমেজকে।

হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে অ্যাসেগাই দিয়ে মাথা কেটে সে দণ্ড কার্যকর করা হবে আজ। বেলা বারোটায় উফা প্রিজন থেকে ভ্যানে করে নিয়ে আসা হলো ডাণ্ডা-বেড়ি পরানো গোমেজকে। জনতার আকাশ ফাটানো ধিক্কারের মধ্য দিয়ে *উম থাকাতি* কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের নেতা পিয়েরে ওকুম্বা ও তার সঙ্গীরা তাকে ধরে নির্দিষ্ট মঞ্চে তুলল।

তারপরের সমস্ত ঘটনা স্লো মোশন ছায়াছবির মত ঘটতে লাগল। ভিড়ের মধ্য থেকে কিমবাকে বেরিয়ে আসতে দেখল গোমেজ। চোখে খুনীর দৃষ্টি, হাতে অ্যাসেগাই। রোদ লেগে চিকচিক করছে ওটার তীক্ষ্ণ ফলা। কসাই ওকুম্বা তার সঙ্গীদের সাহায্যে গোমেজকে মঞ্চের ওপর চিত করে ঠেসে ধরল। দু'হাতে অ্যাসেগাই তুলল কিমবা। গোমেজ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, কিন্তু আওয়াজ বের হচ্ছে না। কোপ মারল কিমবা।

পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে উঠে বসল গোমেজ। তীব্র আতঙ্কে ঘোলা হয়ে গেছে দৃষ্টি। দরদর করে ঘামছে। আহত পশুর গোঙানি বের হচ্ছে গলা দিয়ে। হুঁশ হতে নিজেকে উফা প্রিজনের মেঝেতে পাথরের ঠাণ্ডা বিছানায় দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ ফিরল তার। তা হলে দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ!

বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল সে। অনেক উঁচু স্কাই লাইট দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে তার সেলে। সকাল হয়েছে। কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না তার। নিজেকে সুস্থির করতে দু' হাঁটু শক্ত করে জড়িয়ে ধরল গোমেজ। ব্যাপারটা সত্যি নয় বুঝতে পেরে স্বস্তির ধারা বইল দেহে। কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সেটা। প্রশস্ত করিডরের আরেক মাথা থকে একটা মোটা গলার চিৎকার কানে আসতে স্বস্তি উবে গিয়ে, আবার আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে।

শুরু হয়ে গেছে উফার রোজকার কার্যক্রম। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে নীরব

কান্নায় ভেঙে পড়ল গোমেজ। তার নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে, জানে সে। মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাকে। সিটি স্কয়ারে প্রকাশ্যে কার্যকর করা হবে দণ্ড। কিন্তু সেটা যে কবে, তা এখনও নিশ্চিত হয়নি। কেউ বলে জাংগারোর স্বাধীনতা দিবসে। কেউ বলে কিমবার ক্ষমতা দখলের বছর পূর্তির দিনে।

তবে এখানকার কায়া গার্ডরা ব্যাপারটা নিয়ে গোমেজের সঙ্গে নির্মম রসিকতা করতে ছাড়ে না। যখন-তখন এসে সেলের লোহার গরাদের ওপাশ থেকে ডাকে। 'ওঠো, মিস্টার। তোমাকে সিটি স্কয়ারে নিয়ে যেতে এসেছি আমরা।'

তাদের রসিকতায় গোমেজ আতঙ্কে নীল হয়ে উঠলে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে চলে যায় লোকগুলো। করিডোরে তাদের হাসির রেশ ভেসে বেড়ায় অনেকক্ষণ ধরে।

ঈশ্বরের কাছে কী অপরাধ করেছে বুঝতে পারে না গোমেজ। না, চোখ বুজলেই নিত্য দুঃস্বপ্ন, চোখ খুললে গার্ডদের নিষ্ঠুর, অমানবিক রসিকতা আর সহ্য হয় না। এখন সত্যি সত্যি নিজের মৃত্যুই কামনা করে গোমেজ। কী লাভ বেঁচে থেকে? কেউ নেই তার, কিছু নেই। পথের ফকির হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও তো ভাল তার।

হাঁটুর উপর মাথা রেখে শব্দহীন কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অঝোর ধারার পানির মধ্য দিয়ে জেমস ব্রাউনের চেহারাটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। লোকটাকে প্রথম দেখার মুহূর্তে চিনতে পেরে অজানা আনন্দে বুক ভরে উঠেছিল তার। কে জানত তাকে সাহায্য করতে গিয়ে এভাবে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে সে? লোকটা বলেছিল, ফিরে আসবে। কোথায়?

হ্যামবার্গ। নির্দিষ্ট রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে বসেছে রানা ও অ্যালান বেকার। 'কবে পাচ্ছি মাল?' রানা জানতে চাইল।

সামান্য ইতস্তত ভাব দেখা দিল আর্মস ডিলারের মধ্যে। 'ওরা বলছে, আট থেকে দশই জুনের মধ্যে যে-কোনওদিন পৌঁছে যাবে। গতকাল রি-কনফার্মও করেছে।'

'এত দেরি?' আপনা থেকে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। 'দুই-তিন তারিখে না ডেলিভারি দেয়ার কথা ছিল?'

'ছিল। কিন্তু ওদের নিজেদের কী এক অসুবিধার কারণে দেরি হয়ে গেল। লোকেশন জানা থাকলে ডিলে হওয়ার কথা আমিই জানাতাম আপনাকে। ক'দিন পরে আসতে বলতাম।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। একশ' দিনের টার্গেট অনুযায়ী কাজে হাত দিয়েছিল ও। কিন্তু মাঝখানে আরেক জরুরি পরিস্থিতি দেখা দেয়ায় এখন যেমন করে হোক, তার আগেই কাজ সারতে হবে ওকে। এমন এক সময়ে শেডিউলে এত গড়বড় ঘটে গেলে বড় ধরনের বিপদে পড়ে যেতে হবে।

'ঠিক আছে,' চিন্তা-ভাবনা করে বলল ও। 'যা হওয়ার হয়েছে। আর না হলেই বাঁচি।'

'না, না,' দ্রুত মাথা নাড়ল বেকার। 'আর হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এতেই যথেষ্ট বিব্রত হয়েছে বেলগ্রেড।'

'মাল কোন্ পোর্ট থেকে লোড করতে হবে?'

'প্লোচে পোর্ট থেকে।'

'কী নাম বললেন?'

'প্লোচে। জায়গাটা এড্রিয়াটিক কোস্টে। বানান পি-এল-ও-সি-ই, কিন্তু উচ্চারণটা হবে প্লোচে। স্প্লিট আর দুব্রোভনিকের মাঝখানের ছোট এক পোর্ট।'

'কত ছোট?' গোটা ইউগোস্লাভ উপকূল কাভার করার মত প্রয়োজনীয় এরিয়া চার্ট জেনোয়া থেকে কিনে নিয়েছে মিশ্রি খান, কিন্তু সেগুলো বড়ো বড়ো পোর্টের চার্ট। এই পোর্ট সেসবের মধ্যে আছে কি না সন্দেহ হলো রানার। নামটা এই প্রথম শুনল ও। আফ্রিকার সমস্ত চার্ট ওয়াল্টার হ্যারিস নিয়ে আসবে। চূড়ান্ত বৈঠকে রানাকে দেবে সে ওগুলো।

'খুব ছোটো পোর্ট। অনেকেই চেনে না। ইউগোস্লাভরা ওটাকে শুধু আর্মস রফতানির কাজে ব্যবহার করে। আমার মতে এ কাজে ছোটো পোর্ট ব্যবহার করাই ভাল। কারণ এসব জায়গায় লোডিং ফ্যাসিলিটিস ভাল হয়।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

'ভ্যালেন্সিয়া হওয়ার চান্স বেশি,' বলল জোহান শ্লিংকার। 'তবে স্প্যানিশ অথরটি চাইলে পোর্ট চেঞ্জও করতে পারে।'

'তারিখ?' রানা প্রশ্ন করল।

'বিশে জুন।'

শ্লিংকারের শেডিউলে কোনও ঘাপলা হয়নি দেখে আশ্বস্ত হলো রানা। বিশ তারিখেই ভ্যালেন্সিয়ায় নোঙর করার অনুমতি চাওয়ার কথা আছে মিশ্রি খানের। তার নড়চড় হচ্ছে না।

চার্ট দেখে টেমপেস্টের গতি এবং প্লোচে থেকে ভ্যালেন্সিয়ার দূরত্ব মিলিয়ে হিসেব করল রানা। 'আমি বিশ তারিখ রাতেই মাল লোডিং করাতে চাই।'

'কোনও অসুবিধে নেই,' শ্লিংকার বলল। 'আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি আমার মাদ্রিদ পার্টনারকে। ওখানকার ট্রান্সপোর্টিং, লোডিং ইত্যাদি সে-ই দেখাশোনা করে।'

'একবার ডিলেড হয়েছে এরইমধ্যে। বিশ তারিখে এদিকের কাজ শেষ করতে না পারলে আমার টাইম শেডিউল পুরো এলোমেলো হয়ে যাবে।'

'সেরকম কিছু ঘটবে না আশা করি,' আর্মস ডিলার জোর দিয়ে বলল।

'আমি নিজেও ভ্যালেন্সিয়া থেকে শিপে উঠতে চাই।'

'লোডিঙের সময়?' মাথা নাড়ল শ্লিংকার। 'পুরো পোর্ট এরিয়া চেইন-লিঙ্ক ফেন্স দিয়ে ঘেরা থাকে আর্মস লোডিঙের সময়। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া সে সময় কারও পক্ষেই ভেতরে ঢোকা সম্ভব না। আর জাহাজে উঠতে চাইলে পাসপোর্ট কন্ট্রোলের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তার ওপর ওটা অ্যামো ক্যারি করবে বলে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের গোড়ায় একজন গার্ডিয়া সিভিলও থাকবে।'

'মনে করুন, একজন ক্রুম্যান তার মা মারা যাওয়ায় হঠাৎ শিপ ছেড়ে দেশে চলে গেছে,' রানা বলল। 'ক্যাপ্টেনের তখন একজন নতুন ক্রুম্যান দরকার হলো,' রানা বলল। 'তাকে সে যদি স্থানীয়ভাবে নিয়োগ করতে চায়, পারবে নিশ্চয়ই?'

হাসি ফুটল জার্মান আর্মস ডিলারের মুখে। 'শিওর। নিশ্চয়ই পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে আপনার মার্চেন্ট সিম্যান'স আইডি কার্ড থাকতে হবে। জেমস ব্রাউন নামে।'

'জানি,' বলল রানা। 'তবু আরেকটু নিশ্চিত হয়ে নিলাম। এনিওয়ে, থ্যাঙ্ক ইউ।'

মাথা ঝাঁকাল জোহান শ্লিংকার। 'ঊনিশ তারিখে মাদ্রিদেই থাকব আমি। মিন্দানাও হোটেলে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'আমি ঊনিশ তারিখ সকালে মাদ্রিদ আসছি।'

সার্ডিনিয়ার উত্তরের শেষ সীমা থেকে কর্সিকার দক্ষিণ প্রান্তকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সরু চ্যানেল, বাইট অফ বনিফেসিওর স্বচ্ছ নীল পানির বুক চিরে গুড় গুড় গুড় গুড় শব্দ করে এগিয়ে চলেছে এমভি টেমপেস্ট। আট নট গতিতে। মাথার ওপর আগুন ঢালছে সূর্য। প্রচণ্ড গরমে গায়ের চামড়া পুড়ে যাওয়ার দশা, তবে রক্ষা যে অল্প হলেও বাতাস আছে।

বেশি কষ্ট হলে পুরুষরা তবু গায়ের শার্ট খুলে কোনওমতে কাজ চালিয়ে নিতে পারছে, কিন্তু মেয়েদের অবস্থা এক কথায় অবর্ণনীয়। গরমে অস্থির। না ভেতরে টিকতে পারছে, না বাইরে।

এ মুহূর্তে আফটার স্ট্রাকচারের ত্রিপলের ছাউনির নীচে রয়েছে মার্সিয়া-ফায়জা। ব্রিজের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গল্প করছে।

মিশ্রি খানের অবস্থা খুব খারাপ। দু'দিন আগেও মা-বোনদের সামনে কুর্তা খুলতে শরমিন্দা হতো লোকটা। এখন সে-সবের বালাই নেই। মেইন হোল্ডের হ্যাচ কভারের ওপর ভেজা তোয়ালে বিছিয়ে অনেকটা পদ্মাসনে বসে আছে সে। পরনে জাঙ্গিয়া ছাড়া কিছু নেই। চামড়া পুড়ে ইঁটের মত লাল হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন কার্ল ওয়ালডেনবার্গ একা বসে আছে ব্রিজে। শার্টের সবগুলো বোতাম খোলা। শার্টের নীচে কিছু নেই বলে প্রশস্ত লোমশ বুক বেরিয়ে আছে। মেরুদণ্ড খাড়া। চোখ সরু করে সামনে তাকিয়ে আছে সে। ঘামছে দরদর করে। ওদিকে ডেকহ্যাণ্ড কিপরিয়ানি ফোরপিকের রেইলে সাদা রং করছে। ঠোঁটে সিগারেট। বাতাসে তারপিনের গন্ধ ভাসছে। ফার্স্ট মেট নরবিট্টো নিজের বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে। নাইট ওয়াচে ছিল সে।

প্রত্যেকে গরমে অস্থির, কেবল সার্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ার রাদকো গ্রুবিক নির্বিকার। গরম নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই লোকটার। তন্দুর রুটির চুলোর মত গরম ইঞ্জিনরুম থেকে বলতে গেলে বেরই হয় না। সারাক্ষণ ইঞ্জিন নিয়ে আছে। উঁকি দিলেই চোখে পড়ে ওটার কোনও না কোনও অংশে তেল দিচ্ছে সে।

অলস বসে থাকলে আতাসীর কথা ভেবে প্রায়ই উদাস হয়ে পড়ে মার্সিয়া। ও কোথায় আছে, কী করছে, কিছুই জানে না।

জানে না, এ মুহূর্তে পশ্চিম আফ্রিকায় কোন্ বিশেষ গোপন মিশনে রয়েছে আতাসী। মাসুদ রানার প্রতিনিধিত্ব করছে। ওখানে গরম নেই। ঘোর বর্ষা মওসুম শুরু হয়ে গেছে।

নয়

দুব্রোভনিক। আট তারিখ সন্ধ্যার পর রানার হোটেলে এল অ্যালান বেকার। দীর্ঘপথ জার্নি করে আসায় ক্লান্ত। রাতের জন্য নিজেও ওই হোটেলে রুম নিল। ডিনার সেরে টেরেসে বসল ওরা। রানা জানাল, টেমপেস্ট নয় অথবা দশ তারিখ রাতে প্লোচে পৌঁছবে।

'আপনার মাল পৌঁছে গেছে ওখানে,' বেকার খবর দিল। চেহারায় সন্তুষ্টি। 'ওখানকার সরকারী ওয়্যারহাউসে স্টোর করা আছে, সেনা পাহারায়। আমার অ্যাসিসটেন্ট জিলজাক আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে বেলগ্রেড থেকে কনফার্ম করেছে খবরটা।'

খুশি হলো রানা। পরদিন সকালে বেকারসহ ট্যাক্সিতে করে রওনা হলো একশ' কিলোমিটার দূরের প্লোচে বন্দরের উদ্দেশে। কিন্তু ট্যাক্সিটা এমনভাবে লাফাতে শুরু করল, ওর ভয় হলো ভুল করে হাড়গোড় ভাঙার মেশিন ভাড়া নিয়ে ফেলেছে বুঝি। ওটার চাকা নিশ্চয়ই চৌকো আর সাসপেনশন কাস্ট আয়রনের তৈরি।

মাইলের পর মাইল বিস্তৃত, নির্মল উপকূলরেখা অতিক্রম করে স্লানো নামের ছোটো এক শহরে কিছু সময়ের জন্য থামল ওরা। প্লোচে আর দুব্রোভনিকের ঠিক মাঝখানে শহরটা। এখানে কফি খেয়ে, হাত-পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার যাত্রা। লাঞ্চের আগেই প্লোচে পৌঁছে গেল ওরা। হোটেলের টেরেসের ছায়ায় চারটে বাজার অপেক্ষায় থাকল। লাঞ্চের পর চারটায় আবার পোর্ট অথরিটির অফিস খোলে।

প্লোচে বন্দর বেশ পরিচ্ছন্ন। এতই পরিচ্ছন্ন যে মনে হয় গোটা এলাকা রোজ ঝাঁট দিয়ে সাফ করা হয়। বন্দরটাকে মূল সাগর থেকে আড়াল করে রেখেছে পেলিয়েসাক নামের দীর্ঘ এক পেনিনসুলা। প্লোচের দক্ষিণ প্রান্তে শুরু সেটার। শেষ হয়েছে নব্বই মাইল উত্তরে। ভেতরে ঢোকার পথটা বেশ সরু। লেগুনটা ত্রিশ মাইলের মত লম্বা। পানি গাঢ় নীল। সাঁতার, মাছ ধরা বা সেইলিঙের আদর্শ একটা জায়গা।

হেঁটে পোর্ট অফিসের দিকে এগোচ্ছিল ওরা। হঠাৎ কোত্থেকে ছোটো, তোবড়ানো এক ফোক্সভাগেন উদয় হলো। ওদের পিছনে কড়া ব্রেক কষে ঘন ঘন হর্ন বাজাতে লাগল। জায়গায় জমে গেল রানা। ওর প্রথম অনুভূতি বলল,

কোথাও বড় ধরনের কোনও গোলমাল হয়ে গেছে।

শুরু থেকেই একটা অজানা ভয় কাজ করছিল ওর মনে। হতে পারে তা কাগজ-কলমের ছোট্ট একটা ভুল, যা থেকে সন্দেহের উৎপত্তি হতে পারে। একেবারে শেষ মুহূর্তে চালান আটকে দিতে পারে ইউগোস্লাভ কর্তৃপক্ষ। তারপর লোকাল পুলিশ স্টেশনে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর...

পালাবার পথ নেই। যা ঘটবে তা ঠেকানোরও উপায় নেই। কাজেই সাহস করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। যে লোকটাকে গাড়ি থেকে নেমে হাসিমুখে হাত নাড়তে দেখল, সে পুলিশ হলেও হতে পারে। তবে ওর জানামতে এই এলাকার দেশগুলোয় পুলিশের হাসি আর বাঘের দুধ, একই রকম দুর্লভ। স্ট্যাণ্ডিং অর্ডারবলে নিষিদ্ধ। আড়চোখে পাশে তাকাল রানা। বেকারের প্রতিক্রিয়া দেখে ঢিল দিল পেশিতে।

'কেমাল জিলজাক,' বলল সে। 'আমার অ্যাসিসটেণ্ট।'

কালো ভাল্লুকের মত বিশালদেহী মানুষ জিলজাক। অত্যন্ত খোশমেজাজি ধরনের। প্রথম নজরেই লোকটাকে পছন্দ হয়ে গেল রানার। কাছে এসে দু' হাতে বেকারকে আলিঙ্গন করল সে। রানার সঙ্গে সহকর্মীকে পরিচয় করিয়ে দিল বেকার। শেকহ্যাণ্ড করে ওর উদ্দেশে কিছু বলল লোকটা। রানার মনে হলো ভাষাটা সম্ভবত সার্বো-ক্রোয়াট।

ইংরেজি বলতে পারে না জিলজাক, তাই ভাঙা ভাঙা জার্মান আর ইউগোস্লাভ ভাষায় আলোচনা শুরু করল আর্মস ডিলার। একটু পর কাস্টমস চিফসহ সবাই মালগুলো কী অবস্থায় আছে দেখতে এল ওয়্যারহাউসে। ভেতরের এক কোনায় রাখা আছে রানার অর্ডার দেয়া মালের ক্রেট—মোট তেরোটা।

একটা ক্রেটে আছে দু'টো বাজুকা। অন্য দু'টোয় বেস-প্লেট আর সাইটিং মেকানিজমসহ দুটো মর্টার। বাকি দশটায় অ্যামো। চারটে ক্রেটের প্রতিটায় দশটা করে বাজুকা রকেট এবং বাকি ছয়টায় তিনশ' মর্টার বোমা।

ক্রেটগুলো নতুন কাঠের তৈরি। ভেতরে কি আছে তা লেখা নেই। তবে কিছু সিরিয়াল নাম্বার স্টেনসিল করা আছে। আর আছে এমভি টেমপেস্ট নামটা।

আর্মস কেনাবেচার ক্ষেত্রে ক্রেটের মধ্যে স্ক্র্যাপ আয়রন ভরে দেয়ার ঘটনা মাঝেমধ্যে ঘটে থাকে, তাই কোনও কোনও আর্মস রফতানীকারী দেশ আইন করে দিয়েছে : তাদের কোনও ডিলার বা ক্রেতা যদি মাল ক্যারিয়ারে তোলার সময় উপস্থিত থাকে এবং মালামাল ঠিক আছে কি না দেখতে চায়, তা হলে তাকে দেখার সুযোগ দেয়া হবে। ইউগোস্লাভিয়া সেইসব দেশের অন্যতম।

কাজেই বেকারের দাবি অনুযায়ী প্রতিটা ক্রেট খুলে দেখার সুযোগ দেয়া হলো ওদেরকে। তারপর নতুন স্টিলের স্ট্র্যাপ দিয়ে মজবুত করে আটকে দেয়া হলো ক্রেট।

চেকিং শেষ হতে কেমাল জিলজাক আর কাস্টমস অফিসার এক কোনায় গিয়ে নিচু কণ্ঠে ভ্যাড়ভ্যাড় করে কী সব বলতে লাগল। একটা বর্ণও বুঝল না

রানা। তবে লোকগুলো যে একই আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছে, এটুকু কেবল বুঝল। সাতটা মেজর ভাষাসহ কয়েক ডজন ভাষা চলে ইউগোস্লাভিয়ায়। কোনটা যে কী, বোঝে কার সাধ্য!

এক সময় ঘুরে তাকাল জিলজাক। ভাঙা ভাঙা জার্মানে কিছু বলল বেকারকে। বেকার বিব্রত হলো।

'কী বলছে?' বলল রানা। 'কোনও অসুবিধা?'

বেকার হাসল। 'না। অফিসার ওর কাছে জানতে চেয়েছে তার জন্য কিছু "ইয়ের" ব্যবস্থা আছে কি না,' বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে বিশেষ এক ইঙ্গিত করল। 'ও বলে দিয়েছে, সে যদি পেপারওয়ার্কস ট্রাবল-ফ্রি রাখতে পারে, সময়মত টেমপেস্টে মাল তুলে দিতে পারে, তা হলে আমরা দেখব ব্যাপারটা।'

খোলা জায়গায় আসতেই স্লেজহ্যামারের মত আঘাত করল এড্রিয়াটিকের কড়া রোদ। দ্রুত হোটেলে ফিরে এল ওরা। এখন টেমপেস্টের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। হালকা স্ন্যাকস আর কফির অর্ডার দিয়ে টেরেসে এসে বসল সবাই। সময় যত গড়াচ্ছে, জিলজাকের খোশ মেজাজ ততই বেশি খোশ হতে শুরু করেছে। ভীষণ গল্পবাজ মানুষ। সূর্য এড্রিয়াটিকে ডুব দিল এক সময়। গোধূলি লগ্ন আচমকা হারিয়ে গেল।

মাঝরাতের দিকে হাঁটতে হাঁটতে পোর্টে চলে এল সবাই। টাইম শেডিউল অনুযায়ী হারবারে ঢোকার সময় হয়ে এসেছে টেমপেস্টের। রাত দু'টোয় প্লোচে হারবারের দেয়াল ঘুরে ভেতরে নাক ঢোকাল জাহাজটা। এক ঘণ্টা পর বন্দরের একমাত্র পাথরের জেটিতে ওটাকে বেঁধে ফেলা হলো।

ফোরপিকে মিশ্রি খানকে দেখতে পেল রানা। এক হাতে ডকের আলো থেকে চোখ আড়াল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। রানাকে খুঁজছে নিশ্চয়ই। হাত নাড়ল রানা। জবাবে মিশ্রিও নাড়ল। ওয়ালডেনবার্গকে গ্যাংপ্ল্যাঙ্কের মাথায় এসে দাঁড়াতে দেখল ও, ফার্স্ট মেটের সঙ্গে কথা বলছে।

সবার অলক্ষে চট করে টেমপেস্টে উঠে পড়ল রানা। মিশ্রি খানকে বিশেষ এক ইঙ্গিত করে ক্যাপ্টেনের পিচ্চি কেবিনে ঢুকল। মিশ্রি খান ক্যাপ্টেনকে ডেকে আনল, ভেতরে এনে দরজা লাগিয়ে দিল। 'বসুন,' ক্যাপ্টেনকে বলল রানা। 'জরুরি কথা আছে।'

টেমপেস্টকে কি মাল নিতে এখানে আনা হয়েছে, সে কথা রয়ে-সয়ে, সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করল রানা।

'আমি কখনও আর্মস ক্যারি করিনি,' ও থামতে মুখ খুলল জার্মান। 'আপনি বলছেন এগুলো লিগ্যাল। কত ভাগ লিগ্যাল?'

'একশ ভাগ। বেলগেড থেকে কেনা হয়েছে এগুলো। ট্রাকে করে এখানে আনা হয়েছে। অথরিটি জানে সব। না জানলে তারা এক্সপোর্ট লাইসেন্স ইসু করত না।'

'ওটা জাল হতে পারে না?' ওয়ালডেনবার্গ বলল।

'পারে। তবে এটা জাল নয়। এ দেশে আইন অনুযায়ী আমার মাল সম্পূর্ণ লিগ্যাল।'

'যে দেশে যাবে, সে দেশের আইনে?'

'যে দেশে যাবে, টেমপেস্ট সে দেশের আঞ্চলিক জলসীমায় ঢুকবে না,' বলল রানা।

একটু ভাবল লোকটা। 'তারপর?'

'এখান থেকে বেরিয়ে আরও দুটো পোর্টে যেতে হবে। আরও কিছু মাল তোলা হবে। কোনো জাহাজ পোর্টে মাল নিতে ভিড়লে ওটা আগের পোর্ট থেকে কী মাল তুলেছে তা চেক করা হয় না, আপনি জানেন। যদি আগে থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে সে ব্যাপারে গোপন কোনও তথ্য না থাকে।'

'ম্যানিফেস্টে উল্লেখ নেই, এমন কিছু যদি শিপে থাকে, আর যদি সেটা সার্চ হয় এবং থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়ে, তা হলে কিন্তু জাহাজটা আটকে দেবে অথরিটি,' বলল ওয়ালডেনবার্গ। 'আমাকে জেলের ঘানি টানতে হবে। আজকাল সবাই আর্মসের শিপমেন্ট খোঁজে।'

'যে-পোর্টে শিপ মাল নিতে আসে, সেই পোর্টে খোঁজে না!' বলল রানা।

কিছু ভাবল ক্যাপ্টেন। 'আপনার মাল যখন লিগ্যাল, তখন ম্যানিফেস্টে উল্লেখ থাকলে দোষ কোথায়?'

'এখান থেকে ভ্যালেন্সিয়ায় যাবো,' বিরক্তি চেপে রেখে বলল রানা। 'ম্যানিফেস্টে ওগুলোর কথা লেখা থাকলে স্প্যানিশ অথরিটি আমাদেরকে ঢুকতে দেবে?'

মিশ্রি খানের ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে নিল ক্যাপ্টেন। গম্ভীর মুখে বসে আছে সে। এদিকে তাকাচ্ছে না লোকটা। কিন্তু কান খাড়া। 'এর মধ্যে স্পেন আসে কীভাবে? ওখানে কেন যাব আমরা? কোন পথে?'

'কেন, ব্রিন্দিসি হয়ে!' রানা বলল। 'মনে নেই, মাল নিতে ব্রিন্দিসি গিয়েছিলেন আপনি? কিন্তু মাল রেডি হয়নি দেখে মালিকের নির্দেশে সেখান থেকে ভ্যালেন্সিয়া গেছেন লাটাকিয়ার জন্য নতুন মাল লোড করতে। আপনি মালিকের নির্দেশ না মেনে চাকরি করবেন কী করে?'

চিন্তিত চেহারায় মাথা চুলকাল ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু... যদি স্প্যানিশ পুলিশ সার্চ করে?'

'কারণ ছাড়া কেন করবে? আর যদি করেও, জাহাজের বিলজ-এ থাকবে ক্রেট।'

'সেখান থেকেও যদি খুঁজে বের করে ফেলে,' ওয়ালডেনবার্গ সতর্ক করল, 'তা হলে সারা জীবন জেল খাটতে হবে আমাকে।'

অনেক কথা খরচ করতে হলো লোকটাকে পথে আনতে। অবশেষে রানা 'ঝুঁকি বোনাস' হিসেবে দশ হাজার পাউণ্ড দিতে রাজি হওয়ায় রফা হলো। কাজ শুরু হওয়ার আগে পাঁচ হাজার দিয়ে দিল রানা, বাকি পাঁচ হাজার পাবে পরে।

মার্সিয়া ও ফায়জার সঙ্গে মিনিট দুয়েক কথা বলে জেটিতে নেমে গেল রানা। সন্তুষ্ট মনে হোটেলে ফিরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মনে জমে থাকা উদ্বেগের কারণে ঘুম এল না। আর মাত্র তিনটে ধাপ, তারপর মিশনের সাফল্য কেউ ঠেকাতে পারবে না। এই পর্যায়ে যেন বড় ধরনের কোনও

গোলমালে জড়িয়ে যেতে না হয়, সে জন্য মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল রানা।

সকাল সাতটায় চারজন সশস্ত্র গার্ডের পাহারায় লোডিং শুরু হয়ে গেল। দিগন্ত ছাড়িয়ে মাথা তুলেই গনগনে আগুন ঢালতে শুরু করে দিয়েছে সূর্য। ট্রলিতে করে ওয়্যারহাউস থেকে ডকে নিয়ে আসা হলো প্রতিটা ক্রেট, তারপর টেমপেস্টের জাম্বো ডেরিকের সাহায্যে ফ্রেইটারে তোলা হতে লাগল এক এক করে। তেমন বড় নয় ওগুলো, কাজেই অসুবিধে হলো না।

ডেরিক সেগুলোকে কেবলের সাহায্যে ঝুলিয়ে হোল্ডে নামিয়ে আনছে, তারপর অপেক্ষমাণ মার্সিয়া, ফায়জা আর কিপরিয়ানি ঝুলন্ত ক্রেট জায়গামত ঠেলে নিয়ে সাজিয়ে রেখে কেবল খুলে দিচ্ছে। নয়টার মধ্যেই লোডিং পর্ব শেষ হয়ে গেল, টেমপেস্টের হ্যাচ কভার বসে গেল জায়গামত।

একটু পর জেটি ছেড়ে আবার খোলা, সুনীল সাগরে ভেসে পড়ল টেমপেস্ট। এবারের গন্তব্য ভ্যালেন্সিয়া।

পরে শুনেছে রানা, ভ্যালেন্সিয়ার পর টেমপেস্টের গন্তব্য তারই জন্মস্থান ব্রিন্দিসি শুনে নাকি হাত-পা লেগে এসেছিল ফার্স্ট মেট নরবিট্টোর। তখন টেমপেস্ট সেখান থেকে তিন ঘণ্টার দূরত্বে ছিল। কী কারণে নাকি সেখানকার পুলিশ তাকে খুঁজছে। যতক্ষণ ব্রিন্দিসিতে ছিল টেমপেস্ট, ততক্ষণ ভুলেও চেহারা দেখায়নি সে। ইঞ্জিনরুমে গিয়ে লুকিয়ে বসে ছিল। কেউ তাকে খুঁজতে আসেনি যদিও।

বন্দর ছাড়ার আগে অফিসারদের জন্য অ্যালান বেকারকে পাঁচশ' ডলার দিল রানা। খুব দ্রুত হাত বদল হলো টাকাটা। আড়াইশ' ঢুকল যে অফিসার লোডিং তদারক করেছে তার পকেটে, বাকিটা কাস্টমস চিফের পকেটে।

লাঞ্চের পর হলিডে রিসোর্ট দুব্রোভনিকের পথে রওনা হয়ে গেল রানা। ওর চোখের সামনে সূর্যটা ডুবে গেল এড্রিয়াটিকে।

লণ্ডন। শনিবার। সান লাউঞ্জে বসে অলস সময় পার করছে বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। ইদানীং তার ব্লাড প্রেশার একটু বাড়তির দিকে মনে হচ্ছে। মাথা কেমন ভার ভার লাগে। মানসিক চাপ থেকে হচ্ছে এটা। রানার জাংগারো মিশনের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, চাপটা তত বাড়ছে একটু একটু করে।

তৃতীয় কাপ কফির কথা বলে ফরেন অফিসের কর্মকর্তা, বন্ধু গুলের কথা ভাবল। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। জাংগারো সিচুয়েশনের নতুন কোনও ডেভেলপমেণ্ট হলো কি না জানতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটির দুটো দিন সে কেণ্টে কাটায়, তার গ্রামের বাড়িতে। ডিরেক্টরি থেকে সেখানকার নাম্বার নিয়ে ফোন করল গুস্থার।

'অনেকদিন হলো তোমার সাড়া নেই,' গুলের সাড়া পেয়ে বলল পাইরেট। 'তাই ভাবলাম খবর নিই কেমন আছ।'

'মন্দ নয়, ভায়া। অফিসে কাজের চাপ আপাতত কম আছে, তাই মোটামুটি ফুর্তিতেই আছি,' বলে হা হা করে হাসল লোকটা। 'তারপর তোমার খবর বলো। ইন ফ্যাক্ট, আমিও দু'দিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম।'

আগ্রহ তুঙ্গে উঠল গুন্থারের। মনটা অজানা শঙ্কায় কুঁকড়ে গেল। গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, 'আমার সৌভাগ্য বলতে হবে। কেন ভাবছিলে?'

'ওই যে, জাংগারো না ক্যাংগারো, কী নাম সেই দেশটার?'

'জাংগারো,' আরও শক্ত হয়ে গেল পাইরেট। 'কেন?'

'তোমাকে ওখান থেকে দূরে সরে থাকতে বলেছিলাম না? এখন দেখছি ভালই করেছিলাম।'

বাতাস থেকে সমস্ত অক্সিজেন শুষে নিয়েছে কে যেন, দম নিতে পারছে না গুন্থার। হাঁসফাঁস করছে ডাঙায় তোলা মাছের মত। 'কেন?' গলা ভেঙে গেল।

'বলেছিলাম না ওই দেশটা নিয়ে বিগ পাওয়ারদের আনহেলদি খেলা চলছে?'

'হুঁম! তো কী?'

'খবর পেলাম ক'দিন পর রাশান খনিজ সম্পদ সার্ভে টিম রওনা হবে জাংগারোর পথে। তার কিছুদিন পর আমেরিকান টিমও নাকি যাচ্ছে। বুঝলে? রীতিমত কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে। আমার ধারণা ছিল এ কাজে ওরা ছয় মাস-নয় মাস লাগিয়ে দেবে। কিন্তু এখন দেখছি সবকিছু রাতারাতি ঘটে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছি না আসলে কী চলছে ওখানে।'

ঘাম ছুটে গেল পাইরেটের। 'তুমি শিওর?' শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। কপালের বাঁ পাশে একটা শিরা দপ দপ করে লাফাচ্ছে। সর্বনাশ করেছে! 'এত কুইক প্রগ্রেস?'

'সেরকমই তো শুনতে পাচ্ছি।'

দুঃসংবাদটা শুনে গুন্থার এতই প্রভাবিত হলো যে কয়েক মুহূর্তের জন্য সম্পূর্ণ মূক-বধির বনে গেল। একটু পর ফোনে এড্রিয়ান গুলকে 'হ্যালো, হ্যালো!' করে চেঁচাতে শুনে হুঁশ হলো তার। '... শুনছ আমার কথা?'

'অ্যাঁ... ? হ্যাঁ, শুনছি। সরি।'

অনেক কষ্টে আরও মিনিটখানেক কথা চালিয়ে গেল গুন্থার। তারপর ফোন রেখে গুম মেরে বসে থাকল। মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

এখন কী হবে? এত স্বপ্ন, এত পরিকল্পনা এক লহমায় বিলীন হয়ে যাবে? অনেক কষ্টে নিজেকে সুস্থির করল টাইকুন। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে লাগল। এত অস্থির হওয়ার কী আছে? নিজেকে প্রশ্ন করল সে। রাশান-আমেরিকান সার্ভে টিম জাংগারো যাচ্ছে শুনে এত ঘাবড়াবার কী আছে? সার্ভে টিমই তো। কোনও সৈন্য বাহিনী তো নয়। আমি পাঠাচ্ছি সৈন্য। তা হলে চিন্তার কী আছে?

ওরা যদি আগামীকাল রওনা হয়, মাসখানেকের মত নিশ্চয়ই লাগবে। এদিকে একশ' দিনের ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী মাসুদ রানারও আর ত্রিশ দিনের মধ্যে জাংগারো পৌঁছে যাওয়ার কথা। একবার পৌঁছতে পারলেই হলো। তারপর কার সাধ্য গুন্থারের বিজয় ঠেকায়?

কিমবাকে খতম করে ববিকে ক্ষমতায় বসানোর পর মার্টিন যদি তাকে দিয়ে

আমেরিকা ও রাশার সমস্ত কর্মকাণ্ড স্থগিত করার ঘোষণা দেয়, বা টিম দু'টোকে বেরই করে দেয় সে দেশ থেকে, কার কী করার থাকবে? কিছুই না।

নিজের বেতনভুক কর্মচারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিকে দিয়ে গুন্থার তখন যা খুশি ডিক্রি জারি করাতে পারবে। তা হলে এত ঘাবড়ানোর কী আছে? কিন্তু... এই সময়ের মধ্যে সত্যি সত্যি কাজটা শেষ করা যাবে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার। কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না সে।

রানার কথা ভাবল গুন্থার। এই অবস্থায়ও লোকটা হুমকি দেয়, ভাবতে ভারী অবাক লাগে তার! ব্যাটাকে আরেকবার শক ট্রিটমেণ্ট দেয়া দরকার, ভাবল সে। ক'দিন থেকে এ নিয়ে ভাবছে গুন্থার। মার্টিনকে ধমক দেয়ার মত স্পর্ধা দেখানোর জন্য তার বিচারে কিছু শাস্তি আগে থেকেই পাওনা আছে মাসুদ রানার, সেই সঙ্গে মিশন একটু তাড়াতাড়ি করার তাগাদা দেয়ার জন্য... দেবে নাকি একটা... নাকি...

রিসিভার লক্ষ্য করে থাবা চালাল গুন্থার। 'মার্টিন? এখনই আমার বাসায় চলে এসো।'

দেখা যাক, মার্টিন কী বলে। ভাবল সে।

কার্ল ওয়ালডেনবার্গ সম্পর্কে মাসুদ রানার ধারণায় কোনও ভুল ছিল না। মানুষটা আসলেই কাজের। কাজের বলেই পরের গন্তব্যে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আসল ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো সে। ইঞ্জিনিয়ার রাদকো গ্রুবিক, ফার্স্ট মেট নরবিট্টো ও ডেকহ্যাণ্ড কিপরিয়ানি, সবাইকে একে একে নিজের কেবিনে ডেকে পাঠাল একটা গোপন প্রস্তাব দেয়ার জন্য।

বিষয়টাকে সাদা চোখে যত সাধারণই মনে হোক না কেন, ভেতরে ভেতরে একেবারেই উল্টো। প্রস্তাব নয়, ব্যাপারটাকে এক ধরনের শমন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে মেরিটাইম জগতের বাসিন্দারা। অভিজ্ঞরা জানে, ক্যাপ্টেনের এমন প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হলো অজান্তে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা।

জাহাজ যখন গভীর সমুদ্রে, দুর্ঘটনায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকারীর হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে। গভীর, কালিগোলা অন্ধকার রাতে কিনারা থেকে পা পিছলে পানিতে পড়ে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে সাগরে।

টেমপেস্টের তিন ক্রুম্যানেরই বিষয়টা কমবেশি জানা ছিল, তাই অমত না করে এক কথায় রাজি হয়ে গেল তারা। ট্রাভেলার্স চেকের মাধ্যমে পাওয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ড থেকে নিজের অংশ রেখে বাকিটা তাদের তিনজনের মধ্যে মর্যাদা অনুযায়ী ভাগ করে দিল ওয়ালডেনবার্গ।

ফার্স্ট মেট নরবিট্টো দেশের পানি সীমা থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পেরে এমনিতেই যার পর নাই পুলকিত ছিল, তার ওপর অপ্রত্যাশিতভাবে নগদ এক হাজার পাউণ্ড হাতে পেয়ে একেবারে ডগোমগো হয়ে উঠল খুশিতে। ক'দিন পর আরও এক হাজার পাবে, কাজেই হাসতে হাসতে কেবিন থেকে বের হলো সে। তার মত সুখী আর কে আছে?

রাদকো গ্রুবিক প্রস্তাব শুনে প্রথমে স্প্যানিশ কারাগারের কথা ভেবে ক্যাপ্টেনের মতই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওয়ালডেনবার্গের হাতে ধরা কাগজগুলোর সম্মোহনী শক্তির কাছে হার মানতেই হলো তাকে। সাধে কী আর বলে জাদুই ক্ষমতা আছে টাকার? ডলারে নিল নিজের ভাগের টাকা। এর সঙ্গে আরও জমিয়ে একদিন সে নিজেও জাহাজের মালিক হবে, সেই রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে ফিরে গেল ইঞ্জিনরুমে।

বাকি থাকল ক্রুম্যান কিপরিয়ানি। জীবনে এই প্রথম বেআইনী মালামালে ভর্তি কোনও জাহাজে চাকরি করছে জানতে পেরে লোকটা খুশিই হলো। স্প্যানিশ কারাগার সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তার। তাই কৃতার্থ মনে টাকা নিয়ে ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলল না। তারপর দেশের জনপ্রিয় একটা গান, 'জীবন কত মজার রহস্যে ভরা' গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল।

আর কোনও ঘাপলা নেই বুঝতে পেরে মার্সিয়া-ফায়জাসহ নীচে চলে এল মিশ্রি খান। ক্রেটগুলো খুলে আরেকবার চেক করল সবকিছু। তারপর সারা দুপুর বসে স্মাইজারগুলোর মত প্রতিটা আইটেম ডবল পলিথিনের প্যাকেটে ভরে হোল্ডের মেঝেরও নীচে সাজিয়ে রাখল। কাজটা শেষ হতে সরিয়ে রাখা প্ল্যাঙ্কগুলো জায়গামত বসানো হলো। তার উপরে রাখা হলো ক্লোদিং, ডিঙ্গি আর অ'উটবোর্ড এঞ্জিন ইত্যাদির ক্রেট।

সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ডেকে কফি নিয়ে বসল মিশ্রি খান। এ-কথা সে-কথার পর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে, এমনভাবে বলল, সে ঠিক করেছে পরদিন সকালে ক্যাস্ট্রল অয়েলের ড্রামগুলো স্টোর্স লকারের পিছনে নিয়ে রাখবে।

কারণ? মিশ্রি খান ধীরেসুস্থে কারণটা ব্যাখ্যা করতে নিভাঁজ চেহারায় ভাঁজ ফুটল ওয়ালডেনবার্গের। মেজাজ বিগড়ে গেল। ধৈর্য হারিয়ে নানান অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিল বাড়াবাড়িরও একটা সীমা আছে। এত বাড়াবাড়ি তার পছন্দ নয়।

কিন্তু মিশ্রি খানের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। নির্বিকারই থাকল সে। বরং এমনভাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল, ভাবখানা যেন দোষটা কী হয়েছে বুঝতে পারছে না।

তবে মানুষ বশ করার জন্মগত ক্ষমতাবলে মাত্র বিশ মিনিটেই লোকটাকে লাইনে নিয়ে এল মিশ্রি। অটরান্টো চ্যানেল হয়ে আইওনিয়ান সাগরের দিকে চলেছে টেমপেস্ট, এই সময় বরফ গলল। হাসতে শুরু করল ওয়ালডেনবার্গ।

'স্মাইজার?' বলল সে। 'ব্লাডি স্মাইজার, হাহ্! ওগুলোর কথা তো এতদিনে ভুলেই গেছে পৃথিবী।'

শ্রাগ করল পাঞ্জাবি। 'অসুবিধে নেই। আমরা নতুন করে মনে করিয়ে দেব আবার।'

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা। 'বিলিভ মি, আপনাদের সাথে অ্যাকশনে যেতে পারলে খুব খুশি হতাম আমি। পৃথিবীকে নতুন করে স্মাইজারের গান শোনানোর অ্যাডভেঞ্চারে অংশ নিতে পারলে নাতি-পুতিদের কাছে বলে যাওয়ার মত একটা গল্প জমত স্টকে।'

ইউগোস্লাভ আর্মসের চালান লোড করার পর হ্যারিসের সঙ্গে রানার শেষ মিটিংটা হবে রোমে, ক'দিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল সেটা। এর প্রথম কারণ, দুব্রোভনিক থেকে রোম কাছে হয়। দ্বিতীয় কারণ, নির্দিষ্ট দিনে মাইক্রোসফটের 'আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ' নামের এক আন্তর্জাতিক মেলা শুরু হবে সেখানে।

অনুষ্ঠানে মাইক্রোসফটের বড়ো একটা প্রতিনিধি দল যোগ দেবে। তাদের মধ্যে গ্লোবাল টেকনিকাল ও ট্যাকটিকাল চিফও থাকছে। তার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে হবে রানাকে। শেষ লোডিং স্টেশন ক্যাস্টেলনে না হয়ে যদি ভ্যালেন্সিয়াতেই হতো, তা হলেও রোমে আসতে হতো রানাকে।

নির্দিষ্ট সময় রোম ইণ্টারকণ্টিনেণ্টাল হোটেলে পৌঁছল রানা। বিল্লাহর রুমে। কিছু সময় একান্তে আলোচনা করল ওরা। তারপর ছোটো একটা চিপ এগিয়ে দিল বিশেষজ্ঞ।

'মাসুদ ভাই, আপনার চিপটার বিস্ফোরণের ক্ষমতা আমি নষ্ট করে দিয়েছি। তারপরও এটা আপাতত কিছুদিনের জন্য সঙ্গে রাখতে হবে আপনাকে। ঝুঁকি এড়াতে।'

জিনিসটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। চকোলেট রঙের ছোট্ট একটা টিউব। কড়ে আঙুলের চেয়েও সরু, ইঞ্চি দেড়েক লম্বা। ওটার এক প্রান্তে পিনের মাথার মত একটা সরু, লাল আলো টিপ্ টিপ্ করছে। এত সরু যে ভালো করে না তাকালে দেখা যায় না।

'কী এটা?'

'সিগনাল প্রিভেণ্টিভ ক্যাপসুল। অ্যাকটিভেট করা আছে। সব সময় সঙ্গে রাখবেন। এটা আপনার হাতের চিপে অনবরত রিভার্স সংকেত পাঠাতে থাকবে। যতক্ষণ এটা সঙ্গে থাকবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ।'

'আর এটা হচ্ছে এই বোমাটা যে বসিয়েছে, তার বিষ ঝাড়ার ওষুধ।' একটা সুদৃশ্য কলম বের করল সে। কালো রঙের কলম। ভুরু নাচাল, 'কই, আপনার সেই লোক তো এল না?'

'এসেছে।' রানার আঙুল অনুসরণ করে তাকাল বিল্লাহ।

ছোটোখাটো এক লোক দাঁড়িয়ে আছে রুমের আরেক মাথায়, লম্বায় বড়জোর সাড়ে চারফুট হবে। গায়ের রং কুচকুচে কালো। কাঠির মত সরু সরু হাত-পা। পরনে রেডিমেড সুট, অন্তত দুই সাইজ বড়। ঢলঢল করছে। টাইয়ের নট্ গলার বেড়ের চেয়েও চওড়া। গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আর্ম চেয়ারের পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। সরল, নিষ্পাপ দুটো চোখ মেলে দেখছে ওকে।

একটা পা নাচাচ্ছিল সে, বিল্লাহ ঘুরে তাকাতে স্থির হয়ে গেল। হাত তুলে সালামের ভঙ্গি করল তাড়াতাড়ি। অবাক হলো বিল্লাহ লোকটার দু' চোখে রাজ্যের সরলতা দেখে।

'এই লোক...' বিস্ময় হজম করতে না পেরে রানার দিকে ফিরল বিল্লাহ। 'ইনি কখন ঢুকলেন রুমে?'

'আমার সঙ্গেই।' ওর মনের অবস্থা আঁচ করে মৃদু হাসল রানা। 'মনে হয় তোমার চোখে পড়েনি। ওরই নাম গিলটি মিয়া।'

'গিলটি মিয়া?' ভুরু কুঁচকে উঠল বিল্লাহ্‌র।

'হ্যাঁ, ঠিক কী করতে হবে বুঝিয়ে দাও ওকে।'

আরও আধ ঘণ্টা পর বাকি বিল্লাহর কাছ থেকে বিদায় নিল রানা ও গিলটি মিয়া। 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বিল্লাহ্।'

'ভুলে যান,' বাধা দিল বিশেষজ্ঞ। 'সেদিন ওই বিপদে আপনি আমাকে উদ্ধার না করলে আজ আমি এইটুকু করতে পারতাম না। আজ যদি আমার কাছে আপনি কিছুটা ঋণী হয়েও থাকেন, তা হলে সেইদিনের জন্যে আপনার কাছে সারাটা জীবন ঋণী থাকব আমি।'

ভুরু কুঁচকে উঠল বিল্লাহ্‌র। 'বাহ্! খুব দামি একটা কথা বলে ফেললাম দেখছি!' হা হা করে হেসে উঠল। একটু পর সামলে নিয়ে বলল, 'গিলটি মিয়া, ভুল করবেন না যেন!'

'কী যে বলেন, সার। আমার হলো... '

'বত্রিশ বচোরের প্র্যাকটিস,' বাধা দিয়ে গিলটি মিয়ার বলার ঢং নকল করল বিল্লাহ্। 'জানি।'

গত আধ ঘণ্টায় সন্দেহ প্রকাশ করতে গিয়ে তার এই একটি বাক্য কম করেও ডজনখানেক বার শুনতে হয়েছে বিল্লাহকে।

দশ

ক্লারেন্স। সূর্য উঠেছে সবে। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা শুরু হয়নি বলে চারদিক নীরব। প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের দোতলায় হাতে নকশা করা আবলুশ কাঠের বিশাল এক ডেস্কের পিছনে বসে আছে প্রেসিডেন্ট কিমবা। তার প্যালেস অফিসে।

সিংহাসনের মত চেয়ারটায় বসে সামনের দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকল সে বিড়ালের মত জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে। ঠোঁটের দু' প্রান্ত ঘৃণা, বিরক্তি বা অপছন্দের ভঙ্গিতে নীচের দিকে নেমে আছে। নাকের দু' পাশেও কিছু দাগ দেখা যাচ্ছে। সারাক্ষণ নাক কুঁচকে রাখার ফল। কুঠারের মত লম্বাটে মুখটা ভীতিকর লাগছে।

প্যালেসের কোথাও দু'টো চড়ুই ডাকছে। নীরবতার মাঝে আওয়াজটা বেশ জোরাল হয়ে বাজছে কানে।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার পর নড়ল সে। ডানদিকে একটা পেপারওয়েটের নীচে কয়েকটা টাইপ করা শিট রাখা আছে। ওগুলো সামনে

নিয়ে এল। একটা নামের তালিকা ওটা। আর মাসখানেক পর জাংগারোর স্বাধীনতা দিবস। কিমবার ক্ষমতায় বসার পর প্রথম অনুষ্ঠান।

ওইদিন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবে তার সরকার, পিয়েরে ওকুম্বার নেতৃত্বাধীন কিমবা প্যাট্রিয়টিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশন। আনন্দ-উৎসব করবে। দিনভর পটকা-বাজি ফুটবে। চোখের পানিও কম ঝরবে না।

কারণ সেদিনের কর্মসূচির একটা হলো প্রমাণিত দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক ইরুবা-টিভদের সিটি স্কয়ারে খতম করা। তার হাতের তালিকায় সেইসব অভিযুক্তদের নাম আছে। বেশ কয়েকজনের। উফা প্রিজনে মৃত্যুর দিন গুণছে তারা। আগামী ক'দিনে আরও কিছু যোগ হতে পারে তাদের সঙ্গে।

কিমবার মনের গোপন বাসনা ছিল স্বাধীনতা দিবস নাগাদ হাজার পঞ্চাশেক জন্মশত্রু ইরুবাকে খতম করে রেকর্ড সৃষ্টি করার। কিন্তু সে ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে হলে আরও অন্তত দশ-পনেরো হাজার মানুষ হত্যা করতে হবে। এত অল্প সময়ে তা কিছুতেই সম্ভব না।

বিষয়টাকে যে যেভাবেই দেখুক না কেন, কিমবা দেখে তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে। ইরুবাদের সঙ্গে তার কায়াদের মারামারি-কাটাকাটি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। স্মরণাতীত কাল থেকে। কায়াদের অনেক ভুগিয়েছে ওরা। অনেক চোখের পানি ঝরিয়েছে। এখন হিসেবটা সমান সমান করতে হবে। দয়ামায়া দেখাতে গিয়ে সময় নষ্ট করা চলবে না।

এ কথা কে না জানে, মানুষের মন থেকে পুরনো ঘৃণা সহজে দূর হয় না?

কিমবাও তো মানুষ! তার একেকটা শত্রুর মৃত্যুর অর্থই হচ্ছে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দিন দিন আরও জোরদার হওয়া। সেটাই তো কামনা তার দেবতাদের। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে তার দেবতাদের চাওয়া পূরণ করবে না, তাই হয় নাকি? হাজার কথার এক কথা, ফ্রান্সিস কিমবা অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন মানুষ। অকল্পনীয় ধূর্ত।

চলার পথ পরিষ্কার রাখতে অশিক্ষিত দেশবাসীর সামনে নিজেকে নানাভাবে উপস্থাপন করেছে কিমবা। দেবতাদের বরপুত্র সে, দেশবাসীর মনে এই ধারণা এখন বদ্ধমূল। প্রত্যেকের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। ভয় না, ত্রাস। কিমবা এখন মূর্তিমান ত্রাস। কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র বিদ্রোহের আভাস পেলেই তাকে খতম করে দেয়। সে জানে, বেঁচে থাকতে হলে দয়া-মায়া দেখালে চলে না। শত্রুর শেষ রাখা উচিত নয়।

এ পর্যন্ত যা করেছে ভালই করেছে কিমবা। দেশের কিছু না হোক, তার নিজের অনেক কিছুই হয়েছে। নিজস্ব আর্মি বাহিনী গড়ে তুলেছে, যার প্রতিটা সদস্য যে-কোনও মুহূর্তে তার জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তার চেয়েও বহুগুণ নিবেদিতপ্রাণ আরেকটা বাহিনী তৈরি করেছে। স্পেশাল কায়া ব্রিগেড।

গত পাঁচ মাস ধরে তাদেরকে মস্কোয় কমাণ্ডো ট্রেনিং দিচ্ছে রাশান ট্রেইনাররা। কোর্স শেষ করে আগামী মাসে দেশে ফিরছে তারা। কিমবা মনেপ্রাণে চাইছিল স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে যোগ দেবে কায়া ব্রিগেড। সবাই দেখবে তার নতুন কিলিং মেশিনের চেহারাটা। কিন্তু হলো না। টাইম

শেডিউল অনুযায়ী স্বাধীনতা দিবসের দু' সপ্তাহ পরে ফিরবে তারা।

মনে মনে হাসল সে। এ মুহূর্তে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার বিশেষ কোনও কারণ নেই তার। কেননা ওটা এখন তার বডিগার্ড বাহিনীর সঙ্গে রাশানদেরও মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। প্যালেস পাহারার কাজে তাদেরও ছোটো একটা দল যোগ দিয়েছে। কিমবা জানে, নিজেদের স্বার্থ ছাড়া এক পা নড়ে না কোনও বিগ পাওয়ার। এটাও তারা স্বার্থ উদ্ধারের খাতিরেই করছে। তাকে খুশি রাখতে।

তারপর... চোখের কোণ দিয়ে এক পরিচারককে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মনোযোগ ছিন্ন হলো কিমবার। মুখ তুলল সে। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে পরিচারক লোকটা। এক ধরনের সংকেত ওটা—অর্থ, নাস্তা দেয়া হয়েছে।

অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল *উম থাকাতি*। খাবে না। 'কফি।'

লোকটা বিদায় হতে সামনের তালিকাটার দিকে মন দিল সে। নামগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল। তৃতীয় শিটের শেষদিকে একটা নামের ওপর চোখ আটকে গেল। অভিযুক্তের নাম, পেশা, অভিযোগ ইত্যাদি এভাবে লেখা আছে :

নাম : হেনরি গোমেজ

জাতীয়তা : লেবানিজ

পেশা : হোটেল ব্যবসা। জাংগারোর একমাত্র মানসম্পন্ন হোটেলের মালিক।

অভিযোগ : ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী সন্দেহভাজন এক বিদেশি টুরিস্টকে সহযোগিতা করা।

দণ্ড : মৃত্যু।

এর সম্পর্কে জানে কিমবা। এখানকার বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, বিশেষ করে আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে লোকটার কড়া দহরম-মহরম আছে। তার হোটেলের বার চালু রাখার জন্য এমব্যাসির কর্মচারীরা তাকে নিয়মিত মদ সাপ্লাই করে।

বিদেশিদের সঙ্গে বেশি ওঠা-বসা লোকটার। তার ওখানে রোজ আড্ডা বসে বিদেশিদের। কিমবার ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের অনেকের মতে এই লোকের কাজকর্ম বেশিরভাগই সন্দেহজনক।

গত মার্চ মাসের শেষদিকে ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী সন্দেহভাজন এক বিদেশি টুরিস্টকে গাইড সার্ভিসের নামে ক্লারেন্সের সব জায়গার, প্রতিটা স্থাপনার ছবি তোলার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছে এই লোক। মতুবা নামের এক ইরুবা কিশোরকে তার গাইড হিসেবে সঙ্গে দিয়েছিল গোমেজ। খুব গরিব পরিবারের ছেলে।

সার্ভিসের বিনিময়ে সেই বিদেশি লোকটা মতুবাকে পাঁচশ' ফ্রেঞ্চ-আফ্রিকান ফ্রাঙ্ক বখশিশ দিয়েছিল।

কয়েকদিন টাকাটা লুকিয়ে রাখে সেই ছেলে। পরে কেনাকাটা করার সময় চেনা দোকানে নোটটা ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। ওর মত একটা গরিব ছেলে এতবড় নোট কোথায় পেল, ওকুম্বা খবর পেয়ে তা জানার চেষ্টা করতেই আসল সত্য প্রকাশ পায়। ছেলেটা অবশ্য সব কথা বলার সুযোগ পায়নি। জেরার মুখে ফট্ করে মরে যাওয়ায় পুরোটা জানা যায়নি।

তবে গোমেজের অপরাধ ওকুম্বা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। ফলে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে উম *থাকাতি* কিমবা। গোমেজের দণ্ড বিশেষভাবে কার্যকর করার সুপারিশ জানানো হয়েছে তার প্যাট্রিয়টিক ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে।

তাকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে খোয়ার উপর দিয়ে হেঁচড়ে টানা হবে ওইদিন। হাজারো মানুষের চোখের সামনে দেখানো হবে দেশদ্রোহিতার কী শাস্তি।

এক্সেলশিয়র হোটেল। রোম। ওয়াল্টার হ্যারিসকে দ্য টাইমস-এ মগ্ন দেখল মাসুদ রানা। নিশ্চয়ই সকালে রোমের ফ্লাইট ধরার আগে হিথরো থেকে কিনেছে।

হোটেলের লাউঞ্জে লোকজন নেই বলতে গেলে। প্রায় ফাঁকা এ-মুহূর্তে। লেট-মর্নিং কফি পানকারীরা বাইরের টেরেসে গিয়ে বসেছে। এক ইঞ্চি দু' ইঞ্চি করে এগোতে থাকা রোমের ঘন ট্রাফিকের অগ্রাভিযান দেখছে। চিৎকার, হই-হট্টগোল আর গাড়ি বাহিনীর বিকট, বিচিত্র হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা।

এ মুহূর্তে সাতটা অভিযান চলছে ব্যস্ত-সমস্ত, হন্তদন্ত এবং ঘর্মাক্ত রোম শহরে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিযানটা চালাচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের গারবেজ ওয়ার্কাররা। আগেরদিন নগরবাসী ও টুরিস্টদের ফেলে দেয়া ফলমূল-উচ্ছিষ্ট এবং অন্য সব আবর্জনা পরিষ্কার করতে গলদঘর্ম হচ্ছে তারা। গরমে সেদ্ধ হয়ে এর মধ্যেই দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে দিয়েছে ওগুলো।

রানাকে দেখে হাসল হ্যারিস। দুব্রোভনিক থেকে রোম কাছে হয় বলে ওর সঙ্গে এখানে মিলিত হতে চেয়েছিল রানা শেষবারের জন্য। রানার অবশ্য জানা নেই, এর মধ্যে গুন্থারের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেছে হ্যারিসের। আজ এখানে রানা আর গুন্থার, দু'জনের ইচ্ছাই একযোগে পূরণ করতে এসেছে সে।

রোমের বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাফিক জ্যামে এক ঘণ্টারও বেশি আটকে থাকতে হয়েছিল রানাকে। এক্সেলশিয়রের ঠাণ্ডা লাউঞ্জে এসে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

'বসুন,' বলল হ্যারিস। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। 'আমার অ্যাসোশিয়েটরা অধীর আগ্রহে আপনার যাত্রা শুরু করার অপেক্ষায় আছে।'

'আমি এখান থেকে মাদ্রিদে যাব,' বলল রানা, 'বুলেটের কনসাইনমেণ্ট তুলে নিতে। তারপর যাত্রা শুরু হবে।'

'দু'-চারদিনের মধ্যেই আশা করি?' গভীর প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে থাকল যুবক।

'ওই রকমই,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'চার্টগুলো এনেছেন?'

ইঙ্গিতে চেয়ারের পাশে রাখা নিজের পেট ফোলা অ্যাটাশে কেসটা দেখাল হ্যারিস। 'লণ্ডনের লিডেনহল স্ট্রিটে অনেকগুলো দোকান আছে। ওদের কারবারই হচ্ছে দুনিয়ার যত মেরিটাইম চার্ট নিয়ে। ওখানে ঘুরে ঘুরে আপনার চাহিদা অনুযায়ী এগুলো জোগাড় করেছি। কিন্তু আপনি যাচ্ছেন নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। এত চার্ট কী কাজে লাগবে?'

'নিরাপত্তার কাজে,' বলল ও। বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। গন্তব্য নিয়ে যদি কারও মনে সন্দেহ দেখা দেয়, কাস্টমস বা পুলিশ যদি বিনা নোটিশে জাহাজ সার্চ করতে আসে এবং সামনে একটাই চার্ট দেখতে পায়, তা হলে ওদের গন্তব্য স্পষ্ট হয়ে যাবে তাদের কাছে। তাই এতগুলো চেয়েছে। আসলে এমনকী ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গকেও রানা জানায়নি, কোন দেশে যেতে চাইছে ও।

ওর অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাটা মনে ধরল হ্যারিসের। 'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'স্লাইডগুলো এনেছেন?'

'এনেছি।'

জাংগারোয় ঘুরে ঘুরে প্রচুর ছবি তুলেছিল রানা। শহরের এবং উপকূল রেখার কিছু স্কেচও এঁকেছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হোটেলে বসে। ফিরে এসে সেসবের স্লাইড তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব হ্যারিসের কাঁধে চাপিয়েছিল ও। পরে টেমপেস্টে বসে ওগুলো দেখবে বলে একটা স্লাইড প্রজেক্টরও কিনেছে রানা।

'আমার অ্যাসোশিয়েটরা আপনার প্রোগ্রেস জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে,' হ্যারিস বলল।

বর্তমানে মিশন কোন পর্যায়ে আছে, সামনে আর কত বাকি, সংক্ষেপে জানাল রানা। হ্যারিস দ্রুত হাতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো টুকে নিল। রানা তাকিয়ে আছে দেখে বিব্রত চেহারায় হাসল। 'ওদেরকে জানাতে হবে,' ব্যাখ্যা করল সে।

'বুঝেছি।'

'এখন কোথায় আছে টেমপেস্ট?'

'দক্ষিণে। সার্ডিনিয়ার পশ্চিমে। এন রুট ফর ভ্যালেন্সিয়া।'

তথ্যটা টুকে নিল হ্যারিস। 'কতদিনের মধ্যে জাংগারো পৌঁছানো সম্ভব হবে মনে করেন?'

'কোনওরকম বাধা না পড়লে পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন।'

মাথা দোলাল যুবক। বিড়বিড় করে বলল, 'গুড।'

'এবার আপনাদের প্রস্তুতির খবর বলুন।'

'কীসের প্রস্তুতি?' ঘুরে তাকাল হ্যারিস।

'আমরা স্ট্রাইক করার পর আপনাদের যা করতে হবে, তার ব্যবস্থা করেছেন? কখন দায়িত্ব নেবে নতুন সরকার?'

'তা নিয়ে চিন্তা করবেন না,' এক হাত তুলে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল লোকটা। 'নতুন সরকার পুরোপুরি প্রস্তুত। সময় হলেই ক্ষমতা গ্রহণ করবে।'

অ্যাটাশে কেস থেকে ছোটো অক্ষরে, ঘন টাইপ করা তিনটে ফুলস্ক্যাপ শিট

বের করল সে। 'এগুলোয় আপনার জন্য বিশেষ নির্দেশ আছে। আপনি যে-মুহূর্তে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের পজেশন টেক ওভার করবেন, জাংগারান আর্মি-গার্ড ধ্বংস হবে বা পালিয়ে যাবে, তখন থেকে কার্যকর হতে হবে এগুলো।'

সিগারেট ধরাল হ্যারিস। 'নাউ, রিড অ্যাণ্ড মেমোরাইজ। আমরা এখান থেকে বিদায় নেয়ার আগেই শিটগুলো নষ্ট করে ফেলতে হবে। তথ্যগুলো এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আর কোড-ওয়ার্ড, সব মাথার স্টোরে জমা করে রাখতে হবে,' নিজের মাথার পাশে টোকা দিল যুবক।

অবাক হলেও চেহারা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল প্রথম শিটে। ওর আগেই সন্দেহ ছিল যে গুন্ডার লোকটা লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিকে জাংগারোর নতুন প্রেসিডেন্টের পদে বসাতে চাইবে। এখানে তাকে শুধু 'মিস্টার এক্স' বলে সম্বোধন করা হলেও লোকটা যে ববিই, তাতে সন্দেহ রইল না ওর।

চোখ তুলে তাকাল রানা। 'আপনি কোথায় থাকবেন?'

'আপনার ধারেকাছেই,' ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে থাকল হ্যারিস। রানাকে বোঝাতে চাইছে, ওর বিস্মিত হওয়াটা পুরোপুরি উপভোগ করছে সে।

ব্যাটা নিশ্চয়ই মনরোভিয়ার কথা বোঝাতে চাইছে, ভাবল রানা। ওখান থেকে জাংগারো যাওয়ার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। 'আমার মেসেজ পিক করতে পারবেন, সে ব্যাপারে আপনি শিওর?'

'উপযুক্ত রেঞ্জ আর পাওয়ারের রেডিও সেট থাকবে আমার সঙ্গে। সেরা রেডিও। সঠিক চ্যানেল আর ফ্রিকোয়েন্সিতে পাঠানো হলে যে কোনও মেসেজ পিক করতে পারব। টেমপেস্টের রেডিও নিশ্চয়ই আরও বেশি পাওয়ারের হবে। দ্বিগুণ দূরত্ব থেকেও ক্লিয়ার মেসেজ পাঠানো যাবে ওটার মাধ্যমে।'

সবগুলো শিট পড়ে টেবিলে রেখে দিল রানা। 'আইডিয়া মন্দ নয়। আমি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্রডকাস্ট করব। আপনি অ্যালার্ট থাকবেন।'

'নিশ্চয়ই থাকব। তবে একবারে শুনতে না-ও পেতে পারি, তাই আধ ঘণ্টা পর আরেকবার করবেন। তা হলে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।'

'অল রাইট,' বলল রানা। 'তবে আমার ধারণা, ক্লারেন্সে কী ঘটেছে তা জানাজানি হয়ে গেলে পথের মধ্যে বিপদে পড়তে পারেন আপনারা। কারণ বর্ডার পোস্ট পাহারা দেয় কায়া গার্ডরা। তারা তখন পালাবার চেষ্টায় থাকবে। সামনে যে পড়বে, তাকেই কচুকাটা করবে।'

বাঁকা হাসি ফুটল হ্যারিসের মুখে। 'চিন্তা করবেন না। সময়মত আমাদেরকে সাহায্য করার লোক মজুদ থাকবে।'

ব্যাটা হয়ত জাংগারোতে স্থানীয় লোকজন কিছু ভাড়া করেছে এরমধ্যে। ভাবল রানা। কিন্তু কী ধরনের লোক? যুদ্ধ করার মত ট্রেনিং আর অস্ত্র কী আছে তাদের?

প্রথম দেখার দিন থেকেই রানা মোটামুটি নিশ্চিত ছিল একে খাটো করে দেখা উচিত হবে না। মানুষটা আর যা-ই হোক, ভীরু নয়। উপযুক্ত সহায়তা

পেলে কিছু করে দেখানোর মত যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। নইলে গুন্থারের মত পাষণ্ডের ডান হাত হতে পারত না সে।

চিন্তিত মনে এক্সেলশিয়র থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। নাকেমুখে আগুনের হলকা লাগতে আপনাআপনি চোখ কুঁচকে উঠল ওর। কড়া রোদে গায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়ার দশা হলো। একদম শেষবেলায় স্পেনেও যে একটা ধাক্কা খেতে হবে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না ওর।

ওদিকে রানা বেরিয়ে গেছে দেখে লণ্ডনে টেলিফোন করতে উঠল ওয়াল্টার হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিন।

বিসিআই। ঢাকা। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের মুখোমুখি বসা প্রি-অ্যারেঞ্জড় সিগন্যাল জ্যামিং স্পেশালিস্ট। তাঁর পাশের চেয়ারে সোহেল বসেছে। স্পেশালিস্ট একটা রিপোর্টে চোখ বোলাচ্ছেন। নানান সায়েন্টিফিক টার্মসে ভরা বেশ দীর্ঘ একটা রিপোর্ট। রাহাত খান দিয়েছেন। সময় নিয়ে ওটা পড়া শেষ করলেন তিনি।

'মাই গুডনেস! বেশ পাওয়ারফুল বোমা দেখছি।' অবাক হলেন বৃদ্ধ। 'তুমি না বলছিলে দশ-বিশ গজ রেঞ্জ? কীসের দশ-বিশ গজ! এটা ফাটলে পঞ্চাশ গজ রেডিয়াসের ভেতরকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যেত সব! একেবারে ভর্তা হয়ে যেত।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'ব্রাসেলস টেস্টের রিপোর্টেও একই কনক্লুশন এসেছে, আনিস ভাই।'

'আসারই কথা।' একটু বিরতি। 'তবে তোমার কাজটা যে সময়মত হয়েছে, সেটাই আসল কথা। মানুষটা প্রাণে বেঁচেছে।'

'হ্যাঁ। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময়মত সাহায্য না পেলে... '

ঘন ঘন মাথা নাড়লেন আনিসুর রহমান। 'কেন লজ্জা দিচ্ছ, রাহাত? আমি আর কী করার সুযোগ পেলাম? এই লোকটাই তো করল যা করার। কিন্তু... লোকটা কে?' আপনমনে মাথা দোলালেন। 'ইঞ্জিনিয়াস। লোকটাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। বাঙালি?'

মৃদু হাসি ফুটল রাহাত খানের মুখে। মাথাটা ওপর-নীচ করলেন। 'হ্যাঁ, বাঙালি। আপনার মত আরেক রত্ন। তবে দুঃখের বিষয়, এনআরবি।'

চোখ কুঁচকে তাকালেন বিশেষজ্ঞ। 'এনআরবি? সেটা কী?'

'নন রিটার্নিং বাংলাদেশী। প্রবাসী।'

শব্দ করে হাসলেন স্পেশালিস্ট। 'মন্দ বলোনি। এনআরবি, অ্যাঁ?' রিপোর্টগুলোর মাঝে ডুবে থাকলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা দোলালেন। 'বুঝলে, ভায়া? ভেবে বলো, আমরা যদি এনআরবি না হতাম, উপযুক্ত প্রযুক্তির সাথে যুক্ত না থাকতাম, তা হলে এই জিনিসটার নেচার, ধ্বংসকরী ক্ষমতা, এসব এত দ্রুত জানা সম্ভব হত? এটাকে ইনঅ্যাকটিভেট করে বাঁচানো যেত ওই ছেলেটাকে? সেই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি কী আমাদের দেশে আছে?'

জবাব খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকলেন রাহাত খান।

'তবে আসল কাজ এ-লোক একাই করেছে। কীভাবে জানো? চিপটার ফ্রিকোয়েন্সি বের করেছে, তারপর কিছুদিন সেই অনুযায়ী রিভার্স সিগন্যাল দিয়ে ওটার এক্সপ্লোডিং পাওয়ার অলমোস্ট জিরোতে নামিয়ে এনেছে।' নীচের ঠোঁট কামড়ে কী যেন ভাবলেন। 'প্রশংসা করতেই হবে।'

মাথা দোলালেন রাহাত খান। 'আপনার রিপোর্টেও একই কনক্লুশন এসেছে, আনিস ভাই।'

'ওয়েল, সো ফার সো গুড। সুযোগ হলে একে আমার তরফ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে দিয়ো, কেমন?'

মনরোভিয়া। ট্যাক্সি থেকে নেমে ফুটপাথে দাঁড়াল সে। কালোর রাজ্যে সুদর্শন এবং প্রায় সাদা চামড়ার দীর্ঘদেহী, সুদর্শন যুবকের ওপর অনেকেরই চোখ আটকে গেল। নেমপ্লেটে কালো অক্ষরে লেখা নামটা আরেকবার দেখল আগন্তুক: গোল্ডেন গেট, ১৫৭ ইস্ট ল্যারিংটন স্ট্রিট, পোর্ট সাইড (নর্থ), মনরোভিয়া।

ঠিকই আছে। কাঁচের সুইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। বাইরে ঝোলানো নাম-ঠিকানা একটা সাধারণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের। ওটায় আতাসীর কোনও কাজ নেই। ওর কাজ পাশের বিল্ডিঙে। আরেক অফিসে।

সেটার সামনের রুমে বসে নখের পরিচর্যা করছিল এক মেয়ে রিসেপশনিস্ট। ওকে দেখে নড়েচড়ে বসল। 'হ্যালো! ক্যান আই হেল্প ইউ, সাহ্?'

'আমি ডক্টর মুসা ওকোইর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

তড়াক করে উঠে পড়ল মেয়েটা। 'ফলো মি, প্লিজ।'

ওকে ভেতরের এক করিডরে নিয়ে এল মেয়েটা। বাঁ দিকে এক সারিতে তিনটে দরজা। সবগুলোই বন্ধ। মাঝের দরজায় টোকা দিয়েই ঝট্ করে খুলে ফেলল। গলা বাড়িয়ে বলল, 'মিস্টার ফ্রান্সিস এসেছেন, সাহ্।'

'কাম ইন, প্লিজ।'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রুমে ঢুকল আতাসী। দুজন লোক বসা ভেতরে। দু'জনই কালো ও বয়স্ক। একজনের বয়স পঞ্চাশের কোঠায় হবে, অনুমান করল লেফটেন্যান্ট। অন্যজনের সত্তরের কোঠায়। উঠে হ্যাণ্ডশেক করল তারা।

'বসুন, লেফটেন্যান্ট,' প্রথমজন বলল। আতাসীর সমান লম্বা লোকটা। হালকা-পাতলা, তবে সুঠাম দেহী। 'আমরা আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। আশা করি জায়গা চিনতে বেশি ঝামেলা হয়নি?' খাস ব্রিটিশ উচ্চারণের ইংরেজিতে বলল সে। বোঝা গেল পেটে কিছু বিদ্যা আছে।

'একদম না, ধন্যবাদ।'

'আমি উবাইদ আনওয়ার। আর ইনি ডক্টর ওকোই।' একটু বিরতি দিল। 'বসুন, প্লিজ।'

একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল আতাসী। ডক্টর মুসা ওকোইকে কাছ থেকে

লক্ষ করল। পেশাগত জীবনে সার্জন ছিলেন ভদ্রলোক, শুনেছে ও—জাদুকরী ক্ষমতার সার্জন। মানুষের শরীর কাটাছেঁড়া বা জোড়া দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ নাকি খুব কমই পাওয়া যাবে। বয়স সত্তরের কাছাকাছি হবে তাঁর। এ মুহূর্তে মিটিমিটি হাসিমুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন।

'চা দিতে বলি? অথবা কফি?' আনওয়ার বলল।

'কিছুই না, ধন্যবাদ,' মাথা নাড়ল আতাসী। 'আমাদের হাতে সময় কিন্তু খুবই কম। যা করার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করতে হবে। আমাকে কাজের জায়গায় পৌঁছে দিন। লোকজন দিন। আমি কাজ শুরু করতে চাই।'

'সবকিছু রেডি আছে, লেফটেন্যান্ট,' বললেন ডক্টর। 'আজই আপনাকে জায়গামত নিয়ে যাওয়া হবে।'

'জায়গাটা নিরাপদ তো?'

'একশভাগ,' আশ্বস্ত করল আনওয়ার। 'আশপাশের বিশ-ত্রিশ মাইলের মধ্যে মানুষের বাস নেই।' একটু বিরতি। 'আর... ক্লারেন্সেও উপযুক্ত লোক পাঠানো হয়েছে। ওখানকার সব ধরনের ডেভেলপমেন্টের লেটেস্ট খবর টাইম টু টাইম পেতে থাকব আমরা। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া যাবে।'

'আগে ওই লোকটির খোঁজ জানান আমাকে, প্লিজ।'

'নিশ্চয়ই। গোমেজ তো? আশা করছি কাল-পরশুর মধ্যেই পেয়ে যাব তার খবর।'

মাথা দোলাল চিন্তিত আতাসী।

লাঞ্চের ঘণ্টাখানেক আগে জুইংলি ব্যাংকে পৌঁছল জার্মান পাইরেট রুডলফ গুন্থার। শেষবার এখান থেকে ঘুরে যাওয়ার সময় যদিও ডক্টর স্টেইনহফারকে বলেছিল সে নিজে সহসা আর আসছে না। তার ফিনানশিয়াল পার্টনার সাইমন এনডিনই সবকিছু সামাল দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না কথা রাখতে। আসতেই হলো। টাকার মায়া বলে কথা!

তাছাড়া মাসুদ রানা তার কাজ সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়েছে। খুব শীঘ্রি আফ্রিকার পথে রওনা হবে সে রাউণ্ড-আপ সম্পন্ন করতে। এ সময় একবার ফাইনাল চেক-আপ না করলে শান্তি পাওয়া যাবে না বলে এসেছে। গুন্থারের আসার কথা জানা ছিল বলে নিজের দিনের প্রোগ্রাম সেভাবেই সাজিয়েছে স্টেইনহফার।

'ভাবলাম আসল কাজে হাত দেয়ার আগে আপনার সঙ্গে আরেকবার দেখা করে যাই,' বলল গুন্থার। 'কিছু সময় নষ্ট করে যাই আপনার।'

কৃতার্থ হয়ে গেল ব্যাংকার। এই লোকের চিকন ব্যবসায়িক বুদ্ধি এবং তার ও হ্যারল্ড রবার্টসের কৌশলে এরই মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ সোনালি হয়ে উঠেছে স্টেইনহফারের। এখন সে একশ' ভাগ নিশ্চিত, অবসর জীবনটা পরিবার-পরিজন নিয়ে একজন মিলিয়নেয়ারের মতই সুখে-শান্তিতে কাটাতে পারবে। বাড়ি-গাড়ি, সম্মান-প্রতিপত্তি কোনওকিছুর অভাব হবে না। যদিও জাংগারোর ক্রিস্টাল মাউন্টেন আবিষ্কারের কথা 'ফাঁস' করার সময় এখনও হয়নি। কিছুদিন

পর হবে। সে জন্য আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে।

আসল কলকাঠি তার হাতেই থাকছে। কাজেই সময়মত গুন্থারের প্রায় দশ লাখ শেয়ারের মধ্য থেকে সে যদি মোটা দাগের কিছু শেয়ার কিনে নেয়ার প্রস্তাব দেয়, লোকটা না করতে পারবে না। সে টাকা দিয়েই কিনবে। তাছাড়া এই লোকের ছয় ভুয়া বায়ারের প্রতিনিধিত্ব করছে সে, তাকে গুন্থার 'না' করবে কী করে?

যে মানুষটার জন্য এতকিছু সম্ভব হলো, মানে, অদূর ভবিষ্যতে হবে আর কী, তার জন্য খানিকটা সময় না হয় হলোই নষ্ট। এ আর এমন কী!

'আরে না! কী যে বলেন। আমরা আছিই তো আপনাদের মত বিলিয়নেয়ারদের সেবা করতে।'

পুরো এক ঘণ্টা ধরে কথা বলে গেল গুন্থার। প্যাডে কিছু অংক কষল। দু'জনে মিলে তা বিশ্লেষণ করল, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে সমর্থন করল। সবশেষে ব্যাংকারকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে উঠে পড়ল পাইরেট।

'আশা করছি সুখবরটা মার্কেটে হিট করার পর আবার আমাদের দেখা হবে।'

'আমিও সেই আশায় থাকলাম,' বলল নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ডক্টর। 'আগেই বলেছি আইনী ঝামেলা নিয়ে আপনাকে মোটেও মাথা ঘামাতে হবে না। ওসব আমি সামাল দেব।'

'ধন্যবাদ।'

দিনের শেষ ফ্লাইটে লণ্ডনে ফিরল গুন্থার। ব্রিফকেস দোলাতে দোলাতে হিথরোর মেইন টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে শোফারকে খুঁজতে গিয়ে বেখেয়ালে একজন ছোটোখাটো, বয়স্ক মানুষকে আঘাত দিয়ে বসল সে। হাঁটুতে তার ব্রিফকেসের শক্ত কোনার বাড়ি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা, ধপাস করে ফ্লোরে বসে পড়ল।

থতমত খেয়ে গেল গুন্থার। কি ঘটেছে বুঝতে পেরে জিভ কাটল। ব্রিফকেস ফেলে তাড়াতাড়ি দাঁড় করাল লোকটাকে। মুখ দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার খই ফুটছে : 'সরি, সার... সরি! দেখতে পাইনি, সার... বেশি লাগেনি তো? হাড্ডিতে লেগেছে...? চলুন, চলুন, আমার গাড়িতে করে... ' ইত্যাদি ইত্যাদি।

চোখমুখ কুঁচকে ব্যথা সামলানোর অভিনয় করতে লাগল গিলটি মিয়া। গুন্থারের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার গাড়ির দিকে এগোল। ততক্ষণে বিল্লাহর দেয়া কলমটা গুন্থারের কোটের ভেতরের পকেটে চালান করে দিয়েছে।

রাতে বাসায় ফিরে কোটের পকেটে চমৎকার একটা কলম পেয়ে উল্টে-পাল্টে দেখল গুন্থার। কার এটা? নিশ্চয়ই ব্যাংকারের হবে! কথা বলতে বলতে মনের ভুলে নিয়ে এসেছে হয়তো। বিরক্ত হলো সে। কিন্তু টেলিফোন বেজে উঠতে ওটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর সময় হলো না। পরেরবার সাক্ষাতে ক্ষমা চেয়ে ফেরত দেবে বলে ব্রিফকেসে তুলে রাখল সে কলমটা।

মাদ্রিদ। পাঁচ তলায় নিজের অফিসে একগাদা ফাইল সামনে নিয়ে বসে আছে কর্নেল অ্যান্টনিও সালাযার। স্প্যানিশ আর্মি মিনিস্ট্রির (ফরেন আর্মস সেলস) এক্সপোর্টিং অফিসের প্রধান। ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে সে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। ধূসর চুল। চেহারায় নজর কাড়ার মত বিশেষ কিছু নেই। নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

তবে সরকারের প্রতি তার আনুগত্য ইস্পাতের মত কঠিন। যাকে বলে আপসহীন। স্পেনের প্রতি গভীর মমতা আছে তার, আছে অফুরন্ত ভালবাসা। সত্যিকারের একজন স্প্যানিশ সে—বুট থেকে হ্যাট পর্যন্ত। এখন বয়স ছাপ্পান্ন। আর দু'বছর পর, আটান্নতে রিটায়ার করতে যাচ্ছে সে।

এ মুহূর্তে কর্নেল হলেও চাকরিতে ঢুকেছিল সার্জেন্ট হিসেবে। বড় কর্তাদের নির্দেশ পালন করে গেছে অন্ধের মত। সে যে-নির্দেশই হোক না কেন। ব্যাস্ক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে অ্যান্টনিও সালাযার। অন্য কোনও আর্মিতে বা অন্য কোনও সময়ে হলে যেখানে বড়জোর সার্জেন্ট-মেজর হিসেবে রিটায়ার করতে হত তাকে, সেখানে কর্নেল হয়ে রিটায়ারের সুযোগ পাওয়া তো বিশাল ব্যাপার।

স্পেন সরকার তার ওপর এতটাই আস্থাশীল যে বিদেশে আর্মস রফতানির মত টপ সিক্রেট, টপ সেনসিটিভ একটা কার্যক্রমের পুরোটা বলতে গেলে তার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। স্প্যানিয়ার্ডরা সবাই জানে তাদের দেশ কোনও অবস্থাতেই অস্ত্র রফতানি করে না। বড় চালানে তো নয়ই, ছোটো চালানেও না। যারা করে, শত মুখে তাদের প্রতি নিন্দা জানায় তারা।

অথচ ভেতরে ভেতরে অস্ত্র রফতানি করে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে স্পেন। এর পুরো দায়িত্ব সালাযারের কাঁধে। সে-ই ঠিক করে কোন্ এক্সপোর্ট লাইসেন্স অনুমোদন করবে, কোন্টা প্রত্যাখ্যান করবে।

এ-মুহূর্তে তার সামনে যে ডোশিয়েটা আছে, গত চার সপ্তাহ ধরে একই জায়গায় পড়ে আছে সেটা। ওটার ইনডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে পরীক্ষিত হয়ে এসেছে।

তারা মন্তব্য করেছে : বন্ধুপ্রতিম দেশ সিরিয়ায় আমাদের প্রস্তুত নাইন এমএম বুলেট রফতানির ক্ষেত্রে ফরেন পলিসির উল্লিখিত ও প্রতিষ্ঠিত শর্তসমূহের সাথে কোনও দ্বন্দ্ব বা দ্বিমত আছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

ডিফেন্স মিনিস্ট্রির মন্তব্যের নীচে ফিনান্স মিনিস্ট্রি লিখেছে : চার লাখ নাইন এমএম বুলেটের দাম এরইমধ্যে ব্যাংকো পপুলারের নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে ডলারে জমা করে দেয়া হয়েছে এবং তা তুলেও নেয়া হয়েছে।

ফাইলের প্রথম শিটটা হচ্ছে মালামালের মুভমেন্ট অর্ডারের দরখাস্ত। তার নীচেরটা এক্সপোর্ট লাইসেন্স, কর্নেলের নিজের স্বাক্ষর করা। ক্রেটগুলো এখান থেকে আর্মির সহায়তায় এরমধ্যেই ভ্যালেন্সিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এমভি টেমপেস্ট নামের একটা ফ্রেইটারে তুলে দেয়ার জন্য। কিন্তু পার্টি এখন ভ্যালেন্সিয়া থেকে লোডিং বন্দর অন্যখানে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রথম শীটে সেই আবেদন রয়েছে।

চোখ তুলে সামনে বসা সিভিলিয়ান অফিসারের দিকে তাকাল কর্নেল। 'পোর্ট বদল কেন?'

'কর্নেল, আগামী দু' সপ্তাহ ভ্যালেন্সিয়ায় কোনও বার্থ পাওয়া যাবে না,' বলে শ্রাগ করল লোকটা। 'এত বেশি চাপ যে ওরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না।'

গলা দিয়ে 'ঘোঁৎ!' জাতীয় একটা শব্দ বের হলো কর্নেলের। ঠিকই বলেছে অফিসার। ভ্যালেন্সিয়া বন্দর এ মুহূর্তে অসম্ভব ব্যস্ত রয়েছে। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে সব সময়ই ব্যস্ত থাকে ওটা। কাছের গানসিয়া থেকে আসা মিলিয়ন মিলিয়ন কমলা রফতানি হয় ভ্যালেন্সিয়া থেকে। কাজেই বছরের এই সময় মাঝেমধ্যে এই ধরনের মুভমেণ্ট অর্ডারে সই করতে হয় তাকে।

তবে কর্নেল কোনও বিচ্যুতি পছন্দ করে না। সে যত ছোটোই হোক না কেন। এই অর্ডারটাও পছন্দ করেনি সালাযার। খুব ছোটো অর্ডার। সন্দেহজনক। মাত্র চার লাখ বুলেট একটা কোয়াণ্টিটি হলো? একটা দেশের পুলিশ ফোর্সের জন্য এই পরিমাণ তার বিচারে খুবই কম হয়ে যায়। এক হাজার পুলিশ যদি টার্গেট প্র্যাকটিসে এই চার লাখ রাউণ্ড খরচ করে, তা হলে এক ঘণ্টায় ফুরিয়ে যাবে।

অ্যাণ্টোনিও সালাযার জোহান শ্লিংকারকেও পছন্দ করে না। ভারী পিছলা মানুষ। বাইন মাছের মত। এমন কৌশলে পা ফেলে, ধরা যায় না। এবারও তাই করেছে লোকটা। জর্ডানের দশ হাজার আর্টিলারি শেলের একটা অর্ডার ছিল, নিজের অর্ডারটা তার মধ্যে ভরে মিনিস্ট্রির অনুমোদনসহ পাঠিয়ে দিয়েছে। খাটাশ ব্যাটা এগুলোর দামও আগেভাগে পরিশোধ করে দিয়েছে।

শ্লিংকারের আবেদনের ওপর শকুন দৃষ্টি বোলাল কর্নেল। কোনও গড়বড় দেখতে পেল না। ঠিকই আছে। বাইরে গির্জার ঘণ্টা একটা ঘোষণা করল। লাঞ্চ টাইম। কোথাও সন্দেহ করার মত কিছু চোখে পড়ছে না। এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেটসহ সবই নির্ভেজাল। সিল-ছাপ্পরে কোনও দুই নম্বরি হয়নি।

যদি কোথাও সামান্যতম ত্রুটি চোখে পড়ত কর্নেলের, এণ্ড ইউজার সার্টিফিকেট বা যে কোম্পানি এমভি টেমপেস্টের মালিক; আর্চডাচি অভ লাক্সেমবার্গের সেই টাইটানিক হোল্ডিংস এসএ-র কোনও কাগজপত্রে, একটা তিল পরিমাণ ভুল, তা হলে আর দেখতে হত না।

কিন্তু সবকিছুই 'ওকে' আছে দেখা যাচ্ছে। কোনও গোলমাল নেই। কাজেই তারও কিছু করার নেই। কাউকে সে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করতেই পারে। কিন্তু মানুষটা একজন বৈধ আর্মস ডিলার। তার অর্ডার ফিরিয়ে দিতে পারে না সে।

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কর্নেল সালাযার। দরখাস্তের নীচে খসখস করে সই করে 'ধাম!' করে সিল মেরে দিল। তারপর ফাইলটা বন্ধ করে ঠেলে দিল সিভিল অফিসারের দিকে।

'নিয়ে যান,' গম্ভীর গলায় বলল কর্নেল। 'পোর্ট স্থানান্তরের আবেদন অনুমোদন করা হলো।'

ভাষণ শেষ করে থামল আতাসী। টেবিলে ঢেকে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেল দু'-ঢোক। কপালের ঘাম মুছল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। সামনে বসা ষাট-সত্তরজন তরুণ-যুবকের অপলক দৃষ্টি সেঁটে আছে বেদুঈনের মুখের ওপর।

মনরোভিয়ার বিশ মাইল উত্তরের এক ফার্মহাউস এটা। একেবারে নির্জন। মাঝে মধ্যে একটা-দু'টো পাখির ডাক কানে আসছে, নইলে পিন-পতন নিস্তব্ধতা।

উপস্থিত সবার চেহারা দেখে বোঝা যায় এখানে যা চলছে, তা সবাই বেশ উপভোগ করছে। ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে। বিরতির সময় চা-নাস্তা পরিবেশন করা হলো।

সবার ওপর একে একে চোখ বোলাল আতাসী। ছাত্ররা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

দশ মিনিটের বিরতি শেষে টেবিলের ওপর থেকে একটা বড় কাগজের রোল নিয়ে উঠে দাঁড়াল আতাসী। কয়েকটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ জোড়া দিয়ে পুরোটা জুড়ে ক্লারেন্সের ম্যাপ আঁকা আছে ওটায়। মাসুদ রানা এঁকেছে। বিশেষ করে কিমবার প্যালেস, জাংগারো নদীর ওপারের আর্মি ব্যারাক, নদী পারাপারের কাঠের ব্রিজ, হারবারের গুবরে পোকা শিঙের মত সরু দুই বালুকাবেলা ইত্যাদি ভালই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ওটায়। একবার নজর বুলিয়েই চিনতে পারল ওরা কী দেখছে। তা হলে সত্যিই কিছু একটা ঘটতে চলেছে! ওরাই ঘটাবে সেটা!

আশার আলো জ্বলে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে।

কয়েক জায়গায় কালো রঙের বড় বড় ফোঁটা আঁকা আছে। ফোঁটাগুলোর নীচে লেখা রয়েছে কোন্টা কোন্ জায়গা। কাগজটা স্কচ টেপ দিয়ে দেয়ালে লাগানোর ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আবার শুরু হলো লেফটেন্যান্ট আতাসীর ভাষণ। ওদেরকে স্বপ্ন দেখাল সে। ভাষণ শেষ হওয়ার আগেই সামনে দাঁড়ানো বেদুঈন লোকটাকে ভালবেসে ফেলল ওরা।

লাঞ্চের পর অন্য কিছু শুরু করবে সে। মাসুদ রানার ডাক না আসা পর্যন্ত চলতে থাকবে সেটা। ট্রেনিং!

এগারো

দু'দিন পরের কথা। পোর্ট অভ এমবার্কেশন ভ্যালেন্সিয়ার জায়গা ক্যাস্টেলনে স্থানান্তর করা হয়েছে শুনে একটা ধাক্কা খেল মাসুদ রানা। 'কেন?' মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ওর।

শ্রাগ করল জোহান শ্লিংকার। 'ভ্যালেন্সিয়ায় বার্থ পাওয়া যাচ্ছিল না। নির্ধারিত লোডিং ডেট অনুযায়ী কাজ শেষ করতে হলে এ ছাড়া আর কোনও

উপায় ছিল না আমার।'

মিন্দানাও হোটেলের লাউঞ্জে কফিতে চুমুক দিতে দিতে আলাপ করছে ওরা। রাত হয়ে গেছে। আশপাশে লোকজন তেমন নেই। কয়েকজন নারী-পুরুষ ছাড়া-ছাড়া ভাবে বসা। একটা ছোটো মেয়ে চেয়ার-টেবিলের মধ্য দিয়ে ছোটাছুটি করে তার পাপির সঙ্গে খেলা করছে।

'ক্যাস্টেলন কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'ভ্যালেন্সিয়ার উত্তরে, চল্লিশ মাইল উজানে। ছোটো পোর্ট, বেশ নিরিবিলি। আপনার কাজের জন্য ভ্যালেন্সিয়ার চেয়ে বরং ক্যাস্টেলনই ভাল হবে। বন্দরে টেমপেস্টের নাক ঘোরানো সহজ হবে। ভ্যালেন্সিয়া থেকে কার্গো এজেন্ট আমাকে জানিয়েছে, লোডিং সুপারভাইজ করতে সে নিজে ওখানে যাবে।'

'টেমপেস্টকে জানানো হয়েছে এ কথা?'

মাথা নাড়ল শ্লিংকার। 'না। ভ্যালেন্সিয়া পোর্টে ঢোকামাত্র রেডিওর মাধ্যমে জানানো হবে। এতে সময় দু'ঘণ্টা বেশি লাগবে আর কিছু বাড়তি জ্বালানি পুড়বে, এই যা।'

একটু ভাবল রানা। 'এজেন্টকে আমার শিপে ওঠার খবর দিয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল জোহান শ্লিংকার। 'অবশ্যই! বলেছি, দশ দিন আগে ব্রিন্দিসি থেকে টেমপেস্টের একজন সিম্যান মায়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে নেমে গিয়েছিল। ক্যাস্টেলন থেকে জেমস ব্রাউন নামে অন্য এক সিম্যান উঠবে তার রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে। আপনার কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো? পাসপোর্ট, মার্চেন্ট সিম্যান'স কার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ তারিখ সকাল ন'টায় ক্যাস্টেলনের কাস্টমস অফিস খুললেই আমাদের এজেন্টকে ওখানে পাবেন,' শ্লিংকার বলল। 'লোকটার নাম সেনিয়র মসকার।'

'কিন্তু মাদ্রিদের পরিস্থিতি কেমন? সময়মত ক্যাস্টেলনে পৌঁছবে তো আমার মাল?'

'সে-নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। মুভমেন্ট অর্ডারে যখন সই হয়ে গেছে, তখন বাকি চিন্তাও ওরাই করবে। অর্ডার অনুযায়ী আর্মির সুপারভিশনে উনিশ তারিখ, অর্থাৎ আগামীকাল রাত আটটা থেকে মাঝরাতের মধ্যে যে-কোনও সময় ক্যাস্টেলনের দিকে রওনা হয়ে যাবে আমাদের মাল। পৌঁছবে পরদিন ভোর ছ'টায়। এরমধ্যে টেমপেস্ট যদি গতিপথ অলটার না করে থাকে, তা হলে ওইদিন সকালে ওটারও পৌঁছার কথা সেখানে।'

'অলটার করার কোনও কারণ নেই,' চাপা অস্থিরতা প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। 'মাল কখন পৌঁছায়, সেটাই কথা।'

হাসল শ্লিংকার। 'রিল্যাক্স, ম্যান। চিন্তা নেই। যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি মাল ক্যারি করবে, সেটার ম্যানেজার আমার বন্ধু মানুষ। তাকে বলা আছে, কনভয় ওয়্যারহাউস থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে সে আমাকে ফোন করবে।'

দিনের বাকিটা সময় অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে পার করল রানা। রাতে ঘুম

বলতে গেলে হলোই না। পরদিন কোনওমতে লাঞ্চ সেরেই অ্যাভিনিউ হুয়ান কার্লোসের হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে চলে এল ও। নীচতলায় তিনটে কার রেণ্টাল সার্ভিসের অফিস আছে। সেগুলো ঘুরে একটা স্পোর্টস মডেল হোনডা পছন্দ হলো, এভিস কার রেণ্টাল সার্ভিসের। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য ওটা ভাড়া নিয়ে শ্লিংকারের হোটেলে চলে এল রানা।

আটটার দিকে ডিনার খেল রানা ও শ্লিংকার, তবে রানার জন্য সেটা খাওয়া যতটা না হলো, তারচেয়ে বেশি হলো গেলা। তার এক যুগ পর দশটা বাজল। তারপর সাড়ে দশটা। ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানির ম্যানেজারের ফোনের অপেক্ষায় বসে বসে ঘামতে লাগল ওরা। ক্রমে এগারোটার কাঁটা পেরিয়ে এল ঘড়ি। টেলিফোনের সাড়া নেই। মাসুদ রানা আর জোহান শ্লিংকার, দু'জনেই যে যার টেনশন নিয়ে আছে।

মাঝরাত পেরিয়ে গেল কাঁটা, তবু টেলিফোন নীরব। তারপর সাড়ে বারোটা বাজল। রুমের মধ্যে অস্থির পায়ে পায়চারী করছে রানা। রাগে, হতাশায় বেহাল দশা। একটু পর পর বাঘের চোখে তাকাচ্ছে শ্লিংকারের দিকে। বিড়বিড় করছে।

বারোটা চল্লিশে ঘরের মধ্যে বোমা পড়ল যেন। টেলিফোনটা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠতে লাফ দিয়ে ঘুরল রানা। ডিলার ওটার কাছেই বসা ছিল, চোখের পলকে থাবা চালাল সে রিসিভার লক্ষ্য করে। স্প্যানিশে হড়বড় করে কিছু বলল।

'কী বলছে!'

হাত নেড়ে থামার ইঙ্গিত করল শ্লিংকার। 'মোমেণ্ট!' কয়েক সেকেণ্ড পর আরেকজন কেউ কথা বলতে লাগল তার সঙ্গে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর হাসি ফুটল ডিলারের ক্লান্ত মুখে। 'গ্রাসিয়াস!'

'কনভয় রওনা হয়ে গেছে,' রিসিভার রাখল সে। 'পনেরো মিনিট আগে... ' ঘুরে তাকিয়ে থেমে গেল।

রানা নেই হয়ে গেছে। ততক্ষণে লিফটের কাছে পৌঁছে গেছে ও। পাঁচ মিনিট পর নীচের কার পার্কে ছোটোখাটো হুঙ্কারের সাথে স্টার্ট নিল রানার হোনডা। গেট দিয়ে রকেটের বেগে বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় উঠে বাঁক নিল। তারপর ছুটল মাদ্রিদ-ভ্যালেন্সিয়া মোটরওয়ে ধরে। দ্রুতগামী কার নিয়ে মালবাহী ট্রাককে তাড়া করে ধরা কোনও ব্যাপার নয়, ব্যাপার হয়ে উঠল রাতের বেলা মোটরওয়ের চলমান গাড়ির বহর থেকে নির্দিষ্ট একটা গাড়িকে খুঁজে বের করতে পারা।

মাদ্রিদ উপ-শহরের গোলকধাঁধা থেকে বের হতে চল্লিশ মিনিটের মত লাগল। তারপরই একশ' আশি কিলোমিটার গতিতে হোনডা ছোটাল রানা। মোটরওয়েতে শত শত মালবাহী লরি, রাতের আঁধার ভেদ করে গর্জন করতে করতে উপকূলের দিকে ছুটে চলেছে। হোনডার হেড লাইটের আলোয় পাহাড়সারির গায়ে ওগুলোর দানবীয় ছায়া খেলা করছে।

ভ্যালেন্সিয়ার চল্লিশ মাইল পশ্চিমে রেকুইনা শহর পেরিয়ে আসার পর রানা যা খুঁজছিল তার দেখা পাওয়া গেল। ত্রিপল দিয়ে ঢাকা একটা আট টনী ট্রাক।

পিছনে একটা আর্মি ক্যারিয়ার আছে, পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে। সামনে আছে একটা ফোর ডোর সেলুন। ওটার ব্যাক সিটে একজন ক্যাপ্টেনকে বসা দেখা গেল।

নিশ্চিন্ত হয়ে একসিলারেটর দাবিয়ে ধরল রানা। তীরবেগে উপকূলের দিকে ছুটল। ঘুমন্ত ভ্যালেন্সিয়ার বাইরের রিং রোড দিয়ে ঘুরে বার্সেলোনাগামী ই টোয়েন্টিসিক্স হাইওয়েতে উঠল। একটু পর গতি কমাতে বাধ্য হলো মাসুদ রানা। সামনে কমলার ভারে কাত হয়ে পড়া শত শত ফার্ম লরি, ঢিমে তালে চলছে।

ধীর গতিতে মাইল চারেক এগোল রানা। পাহাড় কেটে অতীতে রোমান সৈন্যদের নির্মাণ করা সাগুনটোর অলৌকিক দুর্গ চোখে পড়ল। পরে মুর মুসলমানরা ওটাকে ইসলামের দুর্গে রূপান্তরিত করেছিল।

চারটার একটু পর ক্যাস্টেলন পৌঁছল ও। রাস্তার পাশে একটু পর পর লাগানো পুয়ের্টো লেখা সাইন অনুসরণ করে পোর্টের দিকে চলল। দূর থেকে মূল পোর্টে ঢোকার গেট বন্ধ দেখে গাড়ি সাইড করে স্টার্ট অফ করল রানা।

গেটে তালা মারা। ভেতরে গার্ডরুমে বসে বসে ঝিমাচ্ছে গার্ড। ছয়টা না বাজা পর্যন্ত এখন বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ক্রুম্যান জেমস ব্রাউনের কাগজপত্র, সিম্যান'স আইডি কার্ড, সব জেনুইন। কাজেই বোর্ডিং নিয়ে কোনও অসুবিধে হলো না। তারপর আর্মি ও কাস্টমসের কড়া খবরদারিতে মাল লোডিং ইত্যাদি সারতে সারতে দুপুর হয়ে গেল। হোনডা স্পোর্টসের চাবিসহ কিছু টাকা সেনিয়র মসকারকে দিয়ে এসেছে রানা। পরে সে মাদ্রিদে পৌঁছে দেবে গাড়িটা।

সাড়ে বারোটায় হারবার থেকে নাক বের করল টেমপেস্ট, দক্ষিণের কেপ সান অ্যান্টোনিওর দিকে চলল। রানা আফট ডেকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্রমে ক্যাস্টেলনের পিছিয়ে পড়তে থাকা দেখছে। সমস্ত ধকল পেরিয়ে এসে অবশেষে লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু করতে পেরেছে, ভাবনাটা অসুস্থ করে তুলছে ওকে।

টেমপেস্ট যত এগোচ্ছে, ক্যাস্টেলনের সমতল, সবুজ কমলার বাগান ততই একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। পিছনে কারও পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরল রানা। ওয়ালডেনবার্গ।

চোখাচোখি হতে হাসল জার্মান। 'এটাই আমাদের লাস্ট পোর্ট ছিল তো?'

'হ্যাঁ। হ্যাচ খোলার লাস্ট পোর্ট ছিল,' বলল রানা।

'মানে আবারও... ?'

শ্রাগ করল ও। 'সরি। আরও একবার থামতে হবে। তবে কোনও পোর্টে যেতে হবে না। সাগরেই থাকব আমরা। কিছু লোক উঠবে। তারা লঞ্চে করে আসবে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল ক্যাপ্টেনের। 'কারা?'

'স্থানীয় শ্রমিক, ডেক কার্গো হ্যাণ্ডলিঙের।' ওয়ালডেনবার্গের সন্দেহ যাচ্ছে না দেখে আবার কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'অ্যাট লিস্ট, এই পরিচয়ে তোলা হবে

তাদেরকে।'

'কোথায়?'

'আফ্রিকান কোস্টে।'

'আফ্রিকান কোস্টে? আমার কাছে যে চার্ট আছে, তাতে বড়জোর জিব্রাল্টার স্ট্রেইট পর্যন্ত যেতে পারব আমি।'

জিপ-আপ উইণ্ড ব্রেকারের ভেতরের পকেট থেকে বেশ কিছু চার্ট বের করল রানা। বাড়িয়ে ধরল লোকটার দিকে। 'এই নিন। এগুলোর সাহায্যে আমাদেরকে ফ্রিটাউন, সিয়েরা লিওন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবেন আপনি।'

'ফ্রিটাউন?'

মাথা দোলাল রানা। 'ওখান থেকেই লোক উঠবে।' একটু থামল। 'দুই জুলাই দুপুরের দিকে ওখানে পৌঁছতে হলে কোর্স আর স্পিড কী হওয়া চাই, আমি তার একটা খসড়া হিসেব করেছিলাম। একটু দেখে দেবেন ঠিক হয়েছে কি না?' এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল রানা।

রানার হিসেব দেখতে গিয়ে ভুরু কোঁচকাল ক্যাপ্টেন। কপালে ভাঁজ পড়ল। নিজেও হিসেবটা কষল, তারপর কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। 'আপনি আর কী কী জানেন?'

'কিছু বললেন?'

ওর প্রশ্ন না শোনার ভান করল ওয়ালডেনবার্গ। 'চোদ্দো দিনে এত পথ পাড়ি দিতে হলে প্রায় সর্বোচ্চ গতিতে চলতে হবে।'

'তাই চলব আমরা।'

স্টার্নের দিকে নজর দিল ও। চার-পাঁচটা সিগাল উড়ছে। কর্কশ কণ্ঠে ডাক ছাড়ছে মাঝেমধ্যে। লাঞ্চ তৈরিতে মগ্ন ফায়জা অথবা মার্সিয়ার ফেলে দেয়া রুটি বা সবজির টুকরো পানিতে পড়ার আগেই লুফে নেয়ার আশায় ঘুরঘুর করছে গ্যালির কাছে।

একটু থেমে মৃদু হেসে বলল রানা, 'আমাদের তাড়া আছে।'

আসলে বিশ দিন ব্যয় হবে পথে। ফ্রিটাউন ছাড়ার পর শেষ গন্তব্যে পৌঁছতে দুই দিনের পথ পেরোতে ছয়দিন ব্যয় করবে রানা, বিশেষ কারণে। তারপরও ওর বেঁধে দেয়া একশ' দিনের সময়সীমা শেষ হতে আরও চারদিন বাকি থাকবে। কিন্তু এতসব এখনই ক্যাপ্টেনকে জানানোর প্রয়োজন নেই।

ক্যাস্টেলন থেকে অনেক দূরে, উত্তরের অন্য এক পোর্ট থেকে আরেকটা জাহাজ জাংগারোর উদ্দেশে রওনা হলো। সেই পোর্টের নাম আরখানজেলস্কোই বা আর্কঅ্যাঞ্জেল। অনেক বড় জাহাজ ওটা, পাঁচ হাজার টনী মোটর ভেসেল। নাম কোমারভ।

হারবার থেকে খোলা সাগরে বের হতে সাহায্য করার জন্য ওটাকে পথনির্দেশ দিচ্ছে পোর্ট পাইলট।

ওটার ব্রিজের পরিবেশ লোভনীয় রকম উষ্ণ, আরামদায়ক। এবং নীরব। ক্যাপ্টেন আর পোর্ট পাইলট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে,

কোমারভের পোর্ট সাইড দিয়ে একের পর এক জেটি আর ওয়্যারহাউসের নিঃশব্দে পিছিয়ে যাওয়া দেখছে। দু'জনের হাতে কফির মগ। ধোঁয়া উড়ছে। আর কিছুদূর গেলে হারবার শেষ হয়ে খোলা সাগর শুরু হবে।

হেলমসম্যান ওটাকে পাইলটের নির্দেশিত পথে স্থির রাখার কাজে মগ্ন। তার বাঁ দিকে গাঢ় সবুজ রঙের রেডার স্ক্রিনটা একবার জ্বলে উঠছে, পরক্ষণে নিভে যাচ্ছে। একটা দানবীয় চোখ যেন—বন্ধ হচ্ছে আর খুলে যাচ্ছে।

রেডারের গোটা স্ক্রিন জুড়ে যে একটা ইরিডিসেন্ট সুইপ আর্ম সারাক্ষণ চক্কর মারে, সেটা প্রতিবার ঘুরে আসার সময় সামনে, অনেক দূরের উন্মুক্ত সাগরে অজস্র ছোটো ছোটো ডট দেখাচ্ছে। ওগুলো কঠিন বরফের পাহাড়। এত কঠিন যে পুরো গ্রীষ্মকালেও গলবে না। গলে না কখনও।

কোমারভের স্টার্নে আরও দু'জন দাঁড়িয়ে আছে রেইলিঙে হেলান দিয়ে। তাদের মাথার ওপর উড়ছে জাতীয় পতাকা। বাতাসে মন্থর গতিতে উড়ছে আর ফত ফত আওয়াজ করছে। পিছনে আরখানজেলস্কোইর ক্রমে আবছা হয়ে যেতে থাকা চেয়ে চেয়ে দেখছে তারা।

একটু পর সোজা হলেন ডক্টর ইভানভ। কালো সিগারেটের কার্ডবোর্ড ফিল্টার দাঁতে কামড়ে ধরে এদিক-ওদিক তাকালেন। লবণাক্ত বাতাসের গন্ধ আসছে নাকে। দু'জনেই মোটা উলেন জ্যাকেট গায়ে দিয়ে আছে তারা। কারণ জুন মাস শুরু হলেও হোয়াইট সি-তে সাধারণত জ্যাকেট ছাড়া খোলা ডেকে আসার উপায় থাকে না। শুধু শার্ট পরে তো মোটেই না।

ডক্টর ইভানভের সঙ্গী একজন টেকনিশিয়ান। বয়সে তরুণ। এই প্রথম বিদেশে যাচ্ছে বলে আসন্ন অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে উত্তেজিত। কিন্তু ডক্টর ইভানভের মুখ অন্ধকার। হাসি নেই।

'ডক্টর মিখাইলো...' শুরু করতে গিয়েও সঙ্গীর বিষণ্ন চেহারা দেখে থেমে গেল সে।

'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড,' বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে বিশেষ কায়দায় সিগারেটটা ধরলেন ডক্টর। টোকা দিয়ে যত দূরে সম্ভব পাঠিয়ে দিলেন। স্টার্নে প্রবল ঘূর্ণির ফলে ফেনা উঠছে, তার মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল ওটা। 'তুমি আমাকে মিখাইল বলে ডাকতে পারো।'

'কিন্তু ইনস্টিটিউটে তো আমরা... '

'এখন আর ইনস্টিটিউটে নেই আমরা, ডিয়ার ফেলো। একটা জাহাজে আছি। সমুদ্রে। যাত্রা শেষে এক জংগলে গিয়ে পৌঁছব। একদল বুনো মানুষের মধ্যে। সেখানে কয়েক মাস কাটিয়ে যখন ফিরব, আই মিন, যদি ফিরতে পারি আর কী, তখন এখানকার,' বুড়ো আঙুলের সাহায্য কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনের পোর্ট দেখালেন, 'গ্রীষ্ম হাড় কাঁপানো হেমন্তের পেটে ঢুকে যাবে এবারের মত। আমাদের দেখা হবে না।'

ডক্টরের মন মরা থাকার কারণ বুঝতে পেরে মনে মনে হাসল তরুণ। 'আই সি।' কিছু ভাবল। 'আগে কখনও জাংগারো গিয়েছেন আপনি, মিখাইল?'

'নইলে তোমাকে কী করে বললাম আমরা জংগলে যাচ্ছি?' কৌতুক ফুটল

বিজ্ঞানীর মুখে।

'ও। কেমন দেশটা?'

'দেশটা কেমন, শুনতে চাও? বন-জঙ্গলে ভর্তি। জলাভূমি, ইয়া বড় বড় মশা আর সাপের দেশ। একদল অপুষ্ট ছেলেপিলের দেশ। এইরকম ফোলা ফোলা পেট ওদের। অশিক্ষিত মানুষজন। তুমি যে ভাষাতেই কথা বলো না কেন, ওরা বুঝবে না।'

'ইংরেজি বুঝবে নিশ্চয়ই?'

মাথা নাড়ল ডক্টর। 'না হে। ইংরেজি-ফ্রেঞ্চ-স্প্যানিশ-রাশান কিচ্ছু বুঝবে না।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল জুনিয়র। 'কী বলছেন?' আসার আগে ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরি থেকে এনসাইক্লোপিডিয়া নিয়ে জাংগারো সম্পর্কে যতদূর সম্ভব জেনে আসার চেষ্টা করেছে সে। ওটার কোথাও লেখা ছিল না ও দেশের মানুষ একদম অশিক্ষিত।

'জানেন, ডক্টর? ক্যাপ্টেন বলছিলেন পথে যদি কোনও বিঘ্ন না হয়, তা হলে বাইশ দিনের দিন জাংগারোয় পৌঁছব আমরা।'

'তাই নাকি?' কৌতূহল নিয়ে জুনিয়রকে লক্ষ করলেন মিখাইল মিখাইলোভিচ। 'বাইশ দিনের দিন বিশেষ কিছু আছে মনে হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল যুবক। 'না। তার তিনদিন পর জাংগারোর স্বাধীনতা দিবস।'

'জাংগারোর স্বাধীনতা দিবস?' বিড়বিড় করে বললেন বিজ্ঞানী। 'তাতে আমার কী?' সিগারেট ধরালেন আরেকটা।

আজকাল রাগ করা প্রায় ভুলেই গেছেন তিনি। কথায় কথায় আর তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন না। স্ত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধে ভবিতব্যকে মেনে নিয়ে মেজাজটার মুখে লাগাম পরিয়ে রেখেছেন ডক্টর মিখাইলোভিচ। ওটাকে নিজের হাতে গড়ে নেয়ার সুযোগ নেই। পাগল-ছাগল বুরোক্র্যাটদের ইচ্ছাতেই চলতে হবে। কাজেই মেজাজ দেখিয়ে লাভও নেই।

'আমাদের দেশের বুরোক্র্যাসিই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া, বুঝলে?' বিড়বিড় করে বললেন মিখাইল মিখাইলোভিচ। 'এই অবস্থার পরিবর্তন যতদিন না হবে, ততদিন আমাদের পোড়া কপালে সুখ জুটবে না। দেশটারও কিসসু হবে না। যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই থাকবে।'

কীসের মধ্যে কী! হাতামাথা কিছু বুঝতে না পেরে বিজ্ঞানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল জুনিয়র।

মিখাইলোভিচ তখন জেগে জেগে ঝমাঝম্ বৃষ্টি, হাঁটু সমান প্যাচপেচে কাদা, সাপ-খোপ ইত্যাদির দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

কেপ স্পারটেল পেরিয়ে এসে মেডিটারেনিয়ানের সফর শেষ করল এমভি টেমপেস্ট। আর কিছুক্ষণ পর আটলান্টিকে নাক ঢোকাবে। এই সময় রেডিওর মাধ্যমে জিব্রাল্টারে একটা শিপ-টু-শোর টেলিগ্রাম পাঠাল রানা। জিব্রাল্টারকে অনুরোধ করল ওটা লণ্ডনে পাঠিয়ে দিতে। মিস্টার ওয়াল্টার হ্যারিসের নামে

পাঠানো হয়েছে ওটা, লণ্ডনের এক ঠিকানায়।

টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত বার্তাটা ছিল এরকম:

"প্লিজড্ টু অ্যানাউন্স ইওর ব্রাদার কমপ্লিটলি রিকভার্ড।"

এটা হচ্ছে গুন্থারের জন্য সংকেত : টেমপেস্ট তার শেডিউল অনুযায়ী যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

সেদিনই সন্ধের দিকে কনফারেন্স বসল জার্মান পাইরেটের অফিসে। পিটার মার্টিনের মুখে রানার করা টেলিগ্রামের খবর পেয়ে খুশিতে বাগবাগ হলো গো-গেটার। 'গুড! আর কয়দিন লাগবে ওটার টার্গেটে পৌঁছতে? বাকি আছে কয়দিন?'

'একশদিনের ক্যালেণ্ডার পুরো হতে?' মার্টিন বলল। 'আর মাত্র বাইশ দিন, সার।' টেলিগ্রামটা একবার খুলছে সে, একবার ভাঁজ করছে। 'মাসুদ রানার নিজের শেডিউল অনুযায়ী আশিতম দিনে ইওরোপ ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল তার। সেই হিসেবে আরও দু'দিন পর যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু আগেই চলে গেল।'

'ভালোই হলো! শুভ কাজে দেরি করতে নেই।' চুরুট ধরাল গুন্থার। 'সময়ের আগেই স্ট্রাইক করবে নাকি?'

'ঠিক বলতে পারছি না, সার,' মার্টিন বলল। 'এই লোকটা সম্পূর্ণ আলাদা ধাতুর তৈরি। এ পর্যন্ত এরকম কারও সঙ্গে আমি কাজ করিনি। এ চলে নিজের মর্জি অনুযায়ী। কারও পরোয়া করে না। তবে লোকটার ওপর কোনও দায়িত্ব দিয়ে যে একশ' ভাগ নিশ্চিন্তে থাকা যায়, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। আসল কাজ সময়মতই করবে সে।'

'মনরোভিয়ায় ভিলা ভাড়া করার কাজ কতদূর হলো?'

'হয়ে গেছে, সার।'

'হয়ে গেছে? গুড! তা হলে তোমার লণ্ডনে বসে থাকার আর কোনও কারণ দেখছি না আমি। সম্ভব হলে কালই প্যারিসে চলে যাও। কিগালি গিয়ে জাংগারোর অনারেবল ফিউচার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে তাকে ভজিয়ে-ভাজিয়ে নিয়ে যাও সেই ভিলায়। ভাল ভাল খাইয়ে রেডি করো। আর... যদি দেখো যেতে আঁইগুঁই করছে, তা হলে নগদ কিছু ধরিয়ে দিয়ো হাতে।'

চুরুটে ঘন ঘন কয়েক টান দিয়ে সুগন্ধী ধোঁয়ায় অফিস ভরিয়ে তুলল জার্মান পাইরেট। 'তুমিও তার সঙ্গে ক'দিন কাটাও গিয়ে। ফ্রেণ্ডশিপ গড়ে তোলো। প্রয়োজনীয় লোকবল, ট্রাক আর হান্টিং গান-টান রেডি করো। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল পিটার মার্টিন। 'পেরেছি।' বলল বটে, কিন্তু ববির মত একটা গরিলার সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ কীভাবে গড়ে তুলবে বা এক ছাদের নীচে কীভাবে থাকবে, মাথায় ঢুকল না।

'যেদিন মাসুদ রানা জানাবে স্ট্রাইক করতে যাচ্ছে, ঠিক সেইদিন আমাদের মতলব ওই লোকের সামনে প্রকাশ করবে। তার আগে না। খবরটা জানিয়ে ক্রিস্টাল মাউন্টেনে আমাদের কোম্পানির নামে সোল মাইনিং কনসেশন গ্র্যাণ্ট

করিয়ে নেবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডকুমেন্টে তার স্বাক্ষর নিয়ে নেবে। তারিখ দেবে এক মাস পরের। তারপর চারটে ভিন্ন ভিন্ন এনভেলপে আমার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবে সেগুলো। রেজিস্টার্ড ডাকে। বুঝতে পেরেছ তো?'

মাথা ঝাঁকাল মার্টিন। 'হ্যাঁ।'

সামনে ঝুঁকে এল পাইরেট। যেন ষড়যন্ত্র করছে, এমনভাবে নিচু কণ্ঠে বলল, 'মাসুদ রানা যতক্ষণ তোমাকে না জানাচ্ছে তার মিশন সফল হয়েছে, ততক্ষণ লোকটাকে তালাচাবি মেরে রেখো। সাবধানের মার নেই। রানার তরফ থেকে ফাইনাল খবর পেলে তখন আর চিন্তা থাকবে না।'

'আচ্ছা।'

'হফম্যান রেডি। এবার তোমরাও রওনা হও। মেইন রিমোট কন্ট্রোল আমার হাতে থাকছে। দ্বিতীয়টা তুমি নিয়ে যাবে। তুমি ওটার ব্লু বাটন টিপলে আমি এখানে "পজিটিভ" সিগনাল পাবো, রেড বাটন টিপলে পাবো "নেগেটিভ" সিগনাল।'

চুরুটটা অ্যাশট্রেতে টিপে নিভিয়ে দিল টাইকুন। মনে মনে হাসছে। মার্টিন জানে, সিগনাল পজিটিভ হলে বস কোনও অ্যাকশনে যাবে না। নেগেটিভ হলে যাবে। কিন্তু ...

'তারপরও মাসুদ রানার ব্যাপারে সাবধান থেকো। খুব সাবধান। ভুলেও আণ্ডারএস্টিমেট কোরো না লোকটাকে। ও সিম্পলি ভয়ঙ্কর। মুহূর্তের জন্য অসাবধান হলেই বিপদে পড়ে যাবে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে ওর লোকজনও থাকছে। কাজেই ডবল সতর্ক থাকতে হবে তোমাদেরকে।'

বাঁকা, কঠিন হাসি ফুটল মার্টিনের সুন্দর মুখে। 'আমার কথা ভাববেন না, সার। মাসুদ রানাকে আমি ভয় পাই না। ফুলপ্রুফ ডিফেন্স-স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিয়েই সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছি আমি। যখন ও বুঝতে পারবে কী ঘটে গেল, তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওর কিছু করার থাকবে না।'

মার্টিন বেরিয়ে যেতে পায়ে পায়ে বিশাল পিকচার উইণ্ডোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল রুডলফ গুন্থার। নীচের কর্মতৎপরতা দেখতে লাগল আনমনে। চিন্তায় ডুবে আছে।

সে জানে মাসুদ রানা মানেই মূর্তিমান বিপদ। অতীতে তার অনেক ক্ষতি করেছে লোকটা। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতেও করবে। বিশেষ করে এই ঘটনার পর। জাংগারো মিশনে তাকে অংশ নিতে বাধ্য করেছে সে। অ্যাকশনে প্রাণটা যদি যায়, তা হলে তো গেলই। কিন্তু যদি না যায়? যদি কোনোভাবে ফিরে এসে আসল খবর বের করে ফেলে? টের পেয়ে যায় এসবের পিছনে কে আছে? তা হলে আদাজল খেয়ে পিছনে লাগবে। এবং তেমন অবস্থা হলে এবার আর অল্পে রেহাই দেবে না।

তাই সে-ও তৈরি আছে মাসুদ রানার জন্য। এক্সক্লুসিভ আয়োজন। খেল খতম পয়সা হজম ধরনের।

আমাকে শাসায়! নিষ্ঠুর হাসি ফুটল জার্মান ব্যারনের ঠোঁটে। এত বড়

সাহস, আমাকে শাসায়!

অনেক বছর আগে এক স্প্যানিশ সমুদ্রচারী পশ্চিম আফ্রিকার এই অঞ্চল ঘুরে দেখতে এসে একদিন খুব ভোরে দূর থেকে তীরে একটা পাহাড় দেখতে পেয়েছিল। সূর্য উঠছিল তখন ওটার পিছন দিয়ে। উষার আলোয় পাহাড়টাকে দেখতে অবিকল সিংহের মাথার মত লেগেছিল তার চোখে।

স্প্যানিশ সমুদ্রচারী মুগ্ধ হয়ে সেই পাহাড়ের নাম রাখল লায়ন মাউন্টেন—সিয়েরা লিওন।

নামটা মুখে মুখে প্রচার পেয়ে গেল। পরে অন্য এক সমুদ্রচারী একই পাহাড় ভিন্ন আলোয় বা ভিন্ন চোখে দেখে নাম রাখে মাউন্ট অরিওল। সেই নামও মোটামুটি প্রচার পায়। সবশেষে এক সাদা চামড়ার মানুষ সিয়েরা লিওন বা মাউন্ট অরিওলের ছায়ায় একটা শহর দেখতে পায় এবং যে কারণেই হোক, সেটার নাম রাখে ফ্রিটাউন।

কালের আবর্তে মাউন্ট অরিওল হারিয়ে গেলেও প্রথম ও শেষের নাম দুটো আজও টিকে আছে।

দুপুরের পর ফ্রিটাউন উপকূলে পৌঁছল টেমপেস্ট। নোঙর ফেলল খোলা সাগরে, আন্তর্জাতিক জলসীমা থেকেও পৌনে এক মাইল বাইরে। রানার হিসেবের কোনও নড়চড় হয়নি। জুলাই মাসের দুই তারিখ আজ।

ক্যাস্টেলন ছেড়ে আসার পর দুটো বাদে বাকি সমস্ত কার্গো যেখানকারটা সেখানেই ছিল। রানার নির্দেশে কেউ সেগুলো স্পর্শও করেনি দেখেনি। ফ্রিটাউনে সার্চ পার্টি উঠতে পারে টেমপেস্টে।

যদিও সেরকম কিছু ঘটার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কেননা ফ্রিটাউনে টেমপেস্টের আনলোড করার বা এখান থেকে লোড করার মত কিছু নেই। ইণ্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ল অনুযায়ী জানা কথা, এ অবস্থায় একটা ভেসেল সার্চ করা হবে একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবু কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি রানা।

স্প্যানিশ অ্যামোর ক্রেটগুলো ছিল ঝকঝকে সাদা কাঠের তৈরি। গায়ে লেখা ছিল না ভেতরে কী আছে। শুধু কিছু সিরিয়াল নাম্বার ও এমভি টেমপেস্ট নামটা স্টেনসিল করা ছিল। পথে নামটা বাদে বাকি সব ডিস্ক স্যানডার দিয়ে ঘষে তুলে ফেলেছে রানা। নতুন স্টেনসিল করেছে : ড্রিলিং বিট। ক্যামেরুন উপকূলের অয়েল রিগের জন্য।

যে দুই কার্গোতে হাত দেয়া হয়েছে, তার একটা ছিল মিক্সড় ক্লোদিঙের। অন্যটা হ্যাভরস্যাক আর ওয়েবিঙের। মার্সিয়া, ফায়জা আর কিপরিয়ানি, এই তিনজন ওগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে আর ক্যানভাস নিডল দিয়ে তিনদিন ধরে সেলাই করে ব্যাকপ্যাক বানিয়েছে। তার প্রতিটার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কয়েকটা করে লম্বা, সরু পাউচ—যার মধ্যে একটা করে বাজুকা রকেট বহন করা হবে। আকৃতি হারিয়ে বর্তমানে পেইণ্ট লকারে পড়ে আছে ওগুলো, মোছামুছি করার র‍্যাগের স্তূপের মধ্যে।

ছোটো ন্যাপস্যাকগুলোকেও কেটেছেঁটে নতুন আকার দেয়া হয়েছে। ওগুলোর যে-শোল্ডার-স্ট্র্যাপ বুক ও কোমর বেড় দিয়ে ধরে রাখে, শুধু সেগুলো রেখে প্যাক কেটে ফেলা হয়েছে। একটা করে ডগ-ক্লিপ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটা স্ট্র্যাপের ওপরের দিকে। নীচের বেল্টে লাগানো হয়েছে আরও কয়েকটা বাড়তি ডগ-ক্লিপ। একটা করে মর্টার বোমার ক্রেট বহন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ওগুলো।

ফ্রিটাউন হারবারমাস্টারের অফিসের ছয় মাইল অফশোর থেকে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করল এমভি টেমপেস্ট। একটু পর পোর্টে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেল। তবে যেহেতু লোড বা আনলোড করার কিছু নেই ওটার, শুধু ডেক ক্রু নিতে এসেছে, তাই ব্যস্ত কুইন এলিজাবেথ-টু জেটির পরিবর্তে ক্যাপ্টেনকে পোর্টের সাধারণ বে-তে ঢুকতে বলা হলো।

পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলে ক্রু-র প্রয়োজন পড়লে সমস্ত জাহাজ ফ্রিটাউনেই আসে। কারণ এখানকার ক্রু-রা সবদিক দিয়ে সেরা। উষ্ণ মণ্ডলের আগুন ঝরানো সূর্যের নীচে সাদা চামড়ার সিম্যানরা কাজ করতে চায় না। কিন্তু লিওনিয়ানরা মুখ বুজে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। এ অঞ্চলে কাঠ নিতে আসা প্রতিটা স্টিমারেই এদের পাওয়া যাবে। উইঞ্চ অপারেট করে এরাই।

এদের কোনও চাহিদা নেই। খোলা ডেকে ঘুমায়, নিজেদের রান্না-বান্না নিজেরাই করে খেয়ে নেয়। প্রাকৃতিক দায় সারার হলে স্টার্নে চলে যায়। কাজের সময় দিনভর গাধার মত খাটতে পারে। কাজ শেষে নিয়োগকর্তারা তাদেরকে এখানে এনে টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়ে যায়। রানা এসেছে এরকম কয়েকজনকে নিতে।

ফ্রেইটার জায়গামত পৌছে অনড় হয়ে গেল। ওটার নোঙর ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে, গোড়ায় বাঁধা মোটা শেকল ঘড় ঘড় করে টানতে টানতে গভীর থেকে গভীরে নেমে যেতে লাগল। ফোরডেকে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দেখল।

মাথার ওপর গাঢ় রঙের ঘন মেঘ ভেসে আছে। অথচ বৃষ্টির দেখা নেই। গ্রিনহাউসের মত উত্তপ্ত হয়ে আছে পরিবেশ। রানার শার্ট ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে গায়ের সঙ্গে। পরিবেশ এখন থেকে এরকমই থাকবে, জানা আছে ওর। ওয়াটারফ্রন্টের ঠিক মাঝখানে বড় একটা হোটেল, রানার নজর সেটার ওপর।

ওটাতে থাকার কথা বেদুঈনের। যদি না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে এখনও এসে পৌছায়নি সে। কিন্তু ওদের জন্য টেমপেস্ট অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারবে না এখানে। সূর্যাস্তের আগে যদি আতাসি পৌছতে না পারে, তা হলে কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে এখানে রাত কাটানোর অনুমতি পেতে।

রিফ্রিজারেটর বা এয়ার কণ্ডিশনিং সিস্টেমে কোনও গোলমাল হয়েছে বলা যেতে পারে। এই দুই জিনিস কাজ না করলে যে জাহাজ চলতে পারে না, তা দুনিয়ার সমস্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ বোঝে। আরও কিছুক্ষণ পর চোখ সরিয়ে জেটিতে

বাঁধা একটা বড় জাহাজের দিকে নজর দিল রানা। এলডার ডেম্পস্টার নাম।

রানা দেখতে না পেলেও টেমপেস্টকে ঠিকই দেখেছে আর্তাসি। দূর থেকে ওটাকে দেখামাত্র শহরে ফিরে গেছে সে। গত চারদিন থেকে হোটেলে আছে সে একদল 'ক্রু' নিয়ে। এখন তাদেরকে নিয়ে টেমপেস্টে ওঠার সময় হয়েছে। মোট দশজন তারা। আতাসি বলেছে লোকগুলো 'ক্রু', তা নিয়ে কোনও সন্দেহ দেখা দেয়নি বন্দর কর্তৃপক্ষের মনে।

তবে এই মানুষগুলো দেখতে ঠিক লিওনিয়ানদের মত নয়। একটু যেন অন্যরকম। কিন্তু এই সামান্য ব্যতিক্রম নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। মিশ্র উপজাতির স্টিভেডোর বা ডেক ক্রু কতই তো আছে সিয়েরা লিওনে। রোজ জাহাজে উঠছে-নামছে। ওসব অত খুঁটিয়ে দেখার মত ফালতু সময় কোথায়?

দু'টোর কিছু পর কাস্টমস হাউসের দিক থেকে একটা ছোটো নৌকা ধীর গতিতে টেমপেস্টের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল। এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওটার পিছনের গলুইয়ে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে নৌকার দুলুনির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করছে। একটু পর টেমপেস্টে উঠল সে। সিয়েরা লিওনের অ্যাসিসটেন্ট চিফ কাস্টমস অফিসার।

পরনে সুন্দর ছাঁটের নেভি ব্লু ট্রাউজার্স আর টিউনিক। দুই কাঁধে পিতলের ব্যাজ চিকচিক করছে। মাথার পিক্‌ড্‌ ক্যাপ একেবারে নাক বরাবর তাক করা। কালো, লম্বাটে মুখ। নাকের নীচ থেকে সাদা দাঁত ঝিলিক মারছে দেখে বোঝা গেল লোকটা হাসছে। নইলে চেহারায় হাসির কোনও ছাপই নেই। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। বিশেষ মাহাত্ম্য আছে এসব ব্যাগের।

কাছে গিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল রানা অফিসারের সঙ্গে। নিজের পরিচয় দিল জাহাজ মালিকের প্রতিনিধি। তারপর ক্যাপ্টেনের রুমে নিয়ে এল লোকটাকে। তিন বোতল হুইস্কি আর দুই কার্টন সিগারেট কোনও বাক্য খরচ করা ছাড়াই হাত বদল হলো। চার্ট টেবিলে পড়ে থাকা একটা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে নাকেমুখে বাতাস করতে লাগল অফিসার।

এয়ার কণ্ডিশনিঙের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে প্রাণ জুড়িয়ে গেল তার। স্বস্তির সঙ্গে গাল ফুলিয়ে 'ফু-উ-উ!' করে ধোঁয়াটে গরম বাতাস ছাড়ল। বিয়ারে চুমুক দিয়ে যেন ইচ্ছে নেই, এমনভাবে টেমপেস্টের নতুন ম্যানিফেস্টের ওপর চোখ বোলাল।

ওতে লেখা আছে : ব্রিন্দিসি থেকে কিছু মেশিন পার্টস তোলা হয়েছে টেমপেস্টে। ড্রিলিং বিট। ক্যামেরুন উপকূলের কাছের এজিআইপি অয়েল কোম্পানির অফশোর কনসেশনের ড্রিলিং রিগের জন্য। স্পেনের ক্যাস্টেলন বা ইউগোস্লাভিয়ার প্লোচের কোনও উল্লেখই নেই ম্যানিফেস্টে।

ওটায় বাকি সব কার্গোর উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে : অয়েল রিগের জন্য পাওয়ার বোট (ইনফ্লেটেবল), ইঞ্জিন (আউটবোর্ড) এবং ট্রপিকাল ক্লোদিং (অ্যাসর্টেড)।

লেখা আছেঃ আনলোডিং শেষে ইওরোপে ফিরে যাওয়ার পথে আইভোরি কোস্টের সান পেদ্রো থেকে কিছু কফি আর কোকো নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

অ্যাসিসটেন্ট চিফ কাস্টমস অফিসার সিল মেরে ম্যানিফেস্ট অনুমোদন করল। এক ঘণ্টা পর বন্দরে ফিরে গেল সে উপহার সামগ্রী ব্যাগে ভরে নিয়ে।

ছয়টা বাজার পর আবহাওয়া একটু একটু করে ঠাণ্ডা হতে শুরু করল। একটা লংশোর বোটের ওপর চোখ পড়ল রানার। সৈকত ছেড়ে এদিকেই আসতে শুরু করেছে ওটা। এ্যামিডশিপে দুই স্থানীয় বোটম্যান লম্বা বৈঠা হাতে দাঁড়ানো, উপসাগরের পানি কেটে বোটটাকে টেমপেস্টের দিকে এগিয়ে আনছে।

আফট ডেকে এগারোজন আফ্রিকান বসা, মাথা গুণে সন্তুষ্ট হলো রানা। গোল করে মোড়ানো নিজ নিজ বিছানা হাঁটুর ওপর রেখে বসে আছে মানুষগুলো। আতাসি সামনের গলুইয়ে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসা। একটু পর বোটটা টেমপেস্টের গায়ে ভিড়ল। দড়ির মই বেয়ে তরতর করে ডেকে উঠে এল আতাসী। এ-কান ও-কান হেসে রানার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল।

'সব ঠিক আছে?' জানতে চাইল রানা।

হাসিটা ম্লান হলো বেদুঈনের। বিড়বিড় করে বলল, 'কোনওমতে আছে।'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। 'ঠিক আছে, পরে শুনব।'

'ক্রুদের' বিছানাগুলো নীচ থেকে ছুড়ে মারা হতে লাগল। উড়ে এসে ধুপ-ধাপ করে ডেকে আছড়ে পড়তে লাগল সেগুলো। লোকগুলোও উঠল এক এক করে। সবার আগে উঠলেন ডক্টর মুসা ওকোই। চওড়া হাসি হেসে রানার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। দু' হাতে আলিঙ্গন করলেন ওকে। বিড়বিড় করে বললেন কী সব।

সবাই এসে জড় হওয়ায় ডেকে ভিড় লেগে গেছে বুঝতে পেরে ওঁকে ছেড়ে দিল সে। ওয়ালডেনবার্গ ও তার মেট অবাক চোখে দেখতে লাগল নবাগতদের। একটু পর ক্যাপ্টেনকে সাগরে ফিরে যেতে বলল রানা।

'জা, জা!' মাথা দোলাতে দোলাতে ব্রিজে ফিরে গেল সে। ইঞ্জিনরুমে ঘণ্টি বাজার চাপা আওয়াজ উঠল।

থ্রটল টানল গ্রুবিক। গম্ভীর ডাক ছাড়ল শক্তিশালী ইঞ্জিন, খুদে চোং থেকে একরাশ ঘন কালো ধোঁয়া উঠল আকাশে। স্টার্ন ঘুরে যেতে শুরু করল। দক্ষিণে নাক ঘুরিয়ে পিছনে প্রবল আলোড়ন তুলে দৌড় শুরু করল টেমপেস্ট।

বারো

সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে গরম কমতে শুরু করেছে। বেশ দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এল পরিবেশ। নাক উঁচু করে পূর্ণ গতিতে ছুটছে টেমপেস্ট। ব্রিজে আতাসী ও রানার আধ ঘণ্টার রুদ্ধদ্বার বৈঠক হলো। বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে এল উদ্বিগ্ন রানা। চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ পড়েছে।

একটু পর নবাগতদের নিয়ে আফট ডেকে ওয়ার কাউন্সিলের প্রথম মিটিঙে

বসল ও। আতাসী, মার্সিয়া-ফায়জা আর মিশ্রি খান, সবাই আছে। নবাগত দশ যুবকও আছে। তাদের ওপর চোখ বোলাল রানা। প্রত্যেকে চেয়ে আছে ওরই দিকে। জাংগারান ওরা, টিভ উপজাতির।

গুফরান, আবরোজি, বাশার, ইমাম, আহমাদ, হাজি, রাব্বি, কিয়াম, ওমর ও হারুণ।

গুফরান বিশালদেহী মানুষ। রানার উরুর সমান হবে তার বাইসেপের বেড়। বুকটা ড্রামের মত। চলাফেরায় আছে বিদ্যুৎ গতি। শরীর অনুপাতে মাথা কিছুটা ছোটো। কোঁকড়া, খাটো চুল খুলি কামড়ে ধরে আছে। প্রশস্ত, ঢালু কপাল। আতাসী প্রথম দিনই তাকে নিজের সহকারী বানিয়ে নিয়েছে।

গুফরানের ঠিক উল্টো হাজি। পাতলা-দুবলা মানুষ। দেখলে মনে হয় সারা বছর অসুখে ভোগে। থুতনিতে এক মুঠো ছাগল-দাড়ি আছে। তাদের মধ্যে একমাত্র ওমরই কম লেখাপড়া করেছে। কোনওমতে সেকেণ্ডারি স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েছে সে। অন্য সবাই হয় গ্রাজুয়েট, নয় মাস্টার্স করা। অনেকে চাকরি করত।

ইব্রাহিম দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে এরা। কিন্তু তেমন সুবিধা করে উঠতে পারছে না। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এর সবচেয়ে বড় কারণ। নেতৃত্বের শূন্যতা আরেক কারণ। তবে সবারই কিছু না কিছু গেরিলা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। গত প্রায় এক মাস ধরে ওস্তাদ গেরিলা ফাইটার আতাসির ট্রেনিং পেয়ে তাদের মনোবল হাজার গুণ বেড়ে গেছে। তার পরীক্ষা দেয়ার জন্য মুখিয়ে আছে সবাই।

দলে দু'জন মেয়ে আছে দেখে প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিল তারা, কিন্তু ওদের সত্যিকারের পরিচয় সম্পর্কে রানার বক্তব্য ডক্টর অনুবাদ করে শোনালেন। বিস্ময়ের জায়গা দখল করল শ্রদ্ধা।

বক্তব্য রাখতে উঠে টানা বিশ মিনিট কথা বলে গেল লিডার মাসুদ রানা। কাকে কী করতে হবে, সে সম্পর্কে প্রাথমিক নির্দেশ দিল। জানিয়ে রাখল, পরিস্থিতি বুঝে এ নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে বাতিলও করা হতে পারে। পাশে দাঁড়িয়ে ডক্টর ওকোই রানার প্রতিটা বক্তব্য নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে শোনালেন। বলা শেষ হতে নবাগতদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিল রানা।

কোনও প্রশ্ন এল না।

পরবর্তী কয়েকটা দিন দলের সবাইকে নিয়ে বিরতিহীন কাজ করে গেল রানা। ডক্টর ওকোই বয়স্ক মানুষ, কখনও কায়িক পরিশ্রম করেননি বলে ওসবে অভ্যস্ত নন। তাই তাঁকে বেছে বেছে হালকা কাজ দেয়া হলো। বাকিদের কয়েকটা দলে ভাগ করে দিল রানা, সবাইকে আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেয়া হলো।

ক্যাস্ট্রল অয়েলের ড্রাম থেকে আসল জিনিস বের করার ভার পড়ল আতাসি ও মার্সিয়ার ওপর। ড্রামগুলোকে উল্টে নিয়ে হাতুড়ি ও ছেনি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই কমাণ্ডো। আতাসি ঝালাইয়ের জোড়ার মুখে ছেনি বসিয়ে হাতুড়ির কয়েক আঘাতে নকল তলা আলগা করে ফেলল। মার্সিয়া ডিস্ক উপড়ে ফেলে

ভেতর থেকে বের করে আনল বিশটা স্মাইজার ও একশ'টা ম্যাগাজিনের প্রথম পেট মোটা প্যাকেটটা।

ওটা খুলে প্রতিটা অস্ত্র ও ম্যাগাজিন আলাদা করা, সেগুলোকে সুতলির বাঁধন ও ডবল পলিথিন প্যাকেটের মোড়ক থেকে মুক্ত করে মাস্কিং টেপের আঠালো জাল থেকে ছাড়ানো ইত্যাদি কাজগুলোর দায়িত্ব আফ্রিকানদের দেয়া হলো। তারপর এক এক করে খোলা হলো বাকি ড্রামগুলো।

প্রতিটা স্মাইজার, প্রতিটা ম্যাগাজিন আলাদা আলাদাভাবে পরিষ্কার করে মুছে তেল-গ্রিজমুক্ত করা হলো। বেঁচে যাওয়া প্রায় সবটুকু ক্যাস্ট্রল অয়েল ছোটো ছোটো কন্টেইনারে ভরে রেখে দেয়া হলো পরে জাহাজের কাজে ব্যবহার করা যাবে বলে।

কাজটা করতে গিয়ে স্মাইজারের অপারেটিং মেকানিজম সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠল জাংগারানরা। অস্ত্র সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান বা ওয়েপন-ফ্যামিলিয়ারাইজেশন নিয়ে এদের জন্য একটা সংক্ষিপ্ত কোর্স পরিচালনা করার কথা ছিল রানার, সে কাজ অনেকটাই আপনাআপনি হয়ে গেল। তা ছাড়া এমন চমৎকার একটা অস্ত্র তাদের জন্য 'উপহার' আনা হয়েছে দেখে আনন্দের সীমা রইল না তাদের।

এরপর তাদের গোল করে বসিয়ে নাইন এমএম অ্যামোর প্রথম দশটা বাক্স খোলা হলো। ম্যাগাজিনে বুলেট লোড করার দায়িত্ব তাদেরকেই দেয়া হলো। প্রতিটা ম্যাগাজিনের ক্যাপাসিটি ত্রিশটা। কাজেই একশ'টা স্মাইজারের পাঁচশ' ম্যাগাজিন প্রথম দফাতেই পনেরো হাজার রাউণ্ড হজম করে ফেলল। আশিটা স্মাইজার এক পাশে আলাদা করে রেখে দেয়া হলো।

কাজটা শেষ হতে মার্সিয়াকে নিয়ে নীচে চলে গেল আতাসি। কার্গো হোল্ডে রাখা কাপড়ের বেল খুলে ইউনিফর্মের সেট তৈরির কাজে লেগে পড়ল। এক জোড়া করে টি-ভেস্ট, দুই জোড়া প্যান্ট, দুই জোড়া মোজা, এক জোড়া বুট, এক সেট ট্রাউজার্স, একটা বেরেট, একটা কমব্যাট ব্লাউজ ও একটা স্লিপিং ব্যাগ মিলিয়ে পূর্ণ করল প্রতিটা ইউনিফর্ম সেট।

সবগুলো আইটেম এক করে পেঁচিয়ে বাণ্ডিল তৈরি করা হলো। একটা করে স্মাইজার ও প্রতিটায় ত্রিশটা করে মোট দেড়শ' বুলেট ভর্তি পাঁচটা করে ম্যাগাজিন প্রথমে অয়েলক্লথে মুড়ে, তারপর পলিথিনের ব্যাগে ভরে বাণ্ডিলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। সবকিছু স্লিপিং ব্যাগ দিয়ে মুড়ে তৈরি করা হলো আরও বড় এক বাণ্ডিল। একজন সৈনিকের প্রয়োজনীয় পরিধেয়, অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদিসহ পরিপূর্ণ একটা সেট।

বাণ্ডিলগুলো দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধা হলো, যাতে বোঁচকার মতো কাঁধে ফেলে অনায়াসে পথ চলতে পারে যোদ্ধারা।

এভাবে প্রস্তুত বিশ সেট বাণ্ডিল এক পাশে সরিয়ে রাখা হলো। ওর মধ্যে বারোটা মূল অ্যাটাক ফোর্সের জন্য। তিনটে সেট তিন আফ্রিকানের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে। কারণ কমাণ্ডো সব মিলিয়ে পনেরোজন হলেও এই তিনজন শুরুতে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে না। তারা টেমপেস্টে থাকবে, রিজার্ভ ফোর্স।

দিনের আলো ফোটার পর তীরে যাবে তারা, যদি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে। তীরে গিয়ে মূল দলকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। কেউ আহত হলে সার্জন মুসা ওকোইর সহকারী হিসেবে কাজ করবে। এ জন্য প্রথমে মার্সিয়া-ফায়জাকে রেখে যেতে চেয়েছিল রানা। পরে সিদ্ধান্ত পাল্টেছে।

কারণ টিভদের এ ধরনের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। মার্সিয়া-ফায়জার ব্যাপারটা তার উল্টো। যথেষ্ট অভিজ্ঞ ওরা। কাজেই ওদেরকে নিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে মনে হয়েছে রানার। তবে অবস্থা বুঝে ব্যবহার করা হবে ওদের। অ্যাটাক ফোর্সের ব্যাক-বোন হিসেবে থাকবে ওরা।

রানার ধারণা, ও যে যুদ্ধ-কৌশল অনুসরণ করতে যাচ্ছে, তাতে আসলে হয়তো ওদেরকে তেমন একটা প্রয়োজনও পড়বে না। প্রথম ধাক্কা পুরুষ সদস্যরাই সামাল দিতে পারবে।

বাকি পাঁচ সেট ইউনিফর্ম স্পেয়ার হিসেবে থাকল।

ম্যাগাজিনে অ্যামো ভরার পর যেসব খালি প্যাকিং ক্রেট স্তূপ করে রাখা হয়েছিল, সেগুলোর কাঠ নষ্ট না করে অন্য কাজে লাগাল মিশ্রি খান। ডেকহ্যাণ্ড কিপরিয়ানিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ইনফ্লেটেবল পাওয়ার বোটের আউটবোর্ড ইঞ্জিনের আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্য অনেক খেটেপিটে তিনটে নতুন প্যাকিং ক্রেট তৈরি করল সেই কাঠ দিয়ে। তারপর ইঞ্জিন কেসিংগুলো ওপর থেকে ঢেকে দিল। তারপরও নীচে যেটুকু আলগা থাকল, সেটুকু ঢেকে দেয়া হলো ফোম রাবার দিয়ে।

ইঞ্জিনের একজস্ট পাইপের আওয়াজ যাতে বেশি না হয়, সে জন্য কেনার সময় রানার পরামর্শে অভিজ্ঞ মেকানিক দিয়ে ওগুলোর আণ্ডারওয়াটার একজস্ট তৈরি করিয়ে নিয়েছিল আতাসী। সেটা ইঞ্জিনের নীচের দিক থেকে বের হওয়া আওয়াজ চাপা দেবে, আর মিশ্রি-কিপরিয়ানির নতুন প্যাকিং ক্রেট চাপা দেবে ইঞ্জিন কেসিং থেকে বের হওয়া মেকানিকাল আওয়াজ। মিশ্রি খান বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে আতাসি খুশি হয়ে দু'জনকে চলনসই কার্পেণ্টারের স্বীকৃতি দিল।

এরপর মর্টার টিউবের দিকে নজর দিল মিশ্রি খান ও আতাসি। অভিযানের রাতে সম্ভবত এই জিনিসই সবার আগে ব্যবহার হবে। লেফটেন্যাণ্ট নিজের দুই মর্টার টিউব ক্রেট থেকে বের করল। ওগুলোর টার্গেট এইমিং মেকানিজমের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করল সময় নিয়ে। বেশ কয়েক বছর আগে শেষবার এ-জিনিস ব্যবহার করেছে সে। ভেবেছিল হয়তো মেকানিজম ভুলে গেছে। কিন্তু দেখা গেল মনে আছে, ভোলেনি কিছুই।

এক এক করে মোট সত্তরটা মর্টার বোমা প্রস্তুত করল দু'জন মিলে। বাক্স থেকে বের করে চেক করল সবগুলো। মিশ্রি খান প্রত্যেকটার নোজ-কোনে প্রাইমার বসিয়ে আর্ম করল। তারপর বক্সে রি-প্যাক করল প্রস্তুত করা বোমাগুলো।

আর্মি-স্টাইল ন্যাপস্যাক কেটে মর্টার বোমার ক্রেট বহন করার যে ওয়েবিং হার্নেসগুলো তৈরি করা হয়েছিল, তার ডগ-ক্লিপের সাহায্যে দুটো বাক্স আটকে নিল মিশ্রি খান।

তারপর দুই বাজুকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যদিও নির্দিষ্ট রাতে মাত্র একটা বাজুকা ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওদেরকে। কারণটা হলো বাজুকা ও তার গোলার ওজন। অস্ত্র-গোলাবারুদ সবকিছু নিজেদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে কমাণ্ডো বাহিনীকে। তাই কোনওমতেই একটার বেশি বাজুকা বহন করা সম্ভব হবে না।

ফোরপিকে এসে দাঁড়াল মিশ্রি খান। টেমপেস্টের স্টার্নে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা ফ্ল্যাগ পোলের চূড়াটাকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নিয়ে বাজুকার পিছনদিকে সেট করা এইমিং ডিস্ক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল। এক সময় যখন মনে হলো দু'শো মিটার দূরের একটা তেলের ব্যারেল নিশ্চিতভাবে উড়িয়ে দেয়া যাবে, তখন ক্ষান্ত দিল সে।

আবরোজিকে নিজের ব্যাক-আপ ম্যান হিসেবে বেছে নিয়েছে মিশ্রি খান। লোকটা ঢ্যাঙামত। মিশ্রি খানের জন্য নিজের লোডের সঙ্গে ব্যাক-প্যাকে দশটা বাজুকা রকেট অতিরিক্ত হিসেবে বহন করবে লোকটা। মিশ্রি খান তার স্বাভাবিক লোডের সঙ্গে বাড়তি আরও দুটো রকেট বহন করবে বলে মার্সিয়া তার বেল্টের সঙ্গে দুটো অতিরিক্ত পাউচ সেলাই করে দিয়েছে।

মাসুদ রানা কাজ শুরু করল অ্যানসিলারি বা সহায়ক গিয়ার নিয়ে। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার পরীক্ষা করার ফাঁকে ফায়জা-মার্সিয়াকে দেখাল ওগুলো কীভাবে কাজ করে। কমাণ্ডোদের সবাইকে একটা করে রিস্ট কম্পাস দিল ও। গ্যাসচালিত ফগ হর্নগুলো পরীক্ষা করল। পোর্টেবল রেডিও সেটগুলোও।

ফ্রিটাউন ছেড়ে আসার দু'দিন পর গভীর সাগরে জাহাজ থামিয়ে কমাণ্ডোদেরকে শূটিং প্র্যাকটিসে লাগিয়ে দিল রানা। মাঝ সাগরে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকল খুদে ফ্রেইটার। গভীর, টানা ঢেউয়ের দোলায় মৃদু মৃদু দুলছে। আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে আশপাশের বিশ মাইলের মধ্যে দ্বিতীয় জাহাজ নেই। স্মাইজারের হুঙ্কারে মনে হলো ক্লারেন্স থেকেও শোনা যাচ্ছে বুঝি।

ইমামের কারবাইনটা বারবার জ্যাম হয়ে যাচ্ছে দেখে বিরক্ত হয়ে সাগরে ফেলে দিল রানা। নতুন আরেকটা বের করে দিল তাকে। এরপর শুরু হলো ওয়েপন-ফ্যামিলিয়ারাইজেশন সেশন। প্রায় দু' ঘণ্টা একটানা চলল সেটা।

ক্যাস্ট্রল অয়েলের খালি ড্রাম পরে কাজে লাগবে বলে রেখে দেয়া হয়েছিল। তার কয়েকটাকে স্টার্নের পানিতে ভাসিয়ে দিল রানা। দুলতে দুলতে টেমপেস্ট থেকে একশ' মিটার পিছিয়ে যেতে সেগুলোর ওপর টার্গেট প্র্যাকটিস শুরু হলো।

এতদিন টিভরা চালিয়েছে দাদার আমলের অস্ত্র। বোল্ট-অ্যাকশন সেভেন পয়েন্ট নাইন টু এমএম মাউজার অথবা স্ট্যাণ্ডার্ড সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু ন্যাটো সেলফ-লোডিং রাইফেল। নতুন অস্ত্রে অভ্যস্ত হতে তাই একটু বেশি সময় লাগল। সবাইকে কমবেশি পাঁচশ রাউণ্ড গুলি ছুঁড়তে হলো। তারপর আত্মবিশ্বাস ফুটল মানুষগুলোর চেহারায়। হাসি ফুটল মুখে।

রানাও সঙ্গীদের নিয়ে প্র্যাকটিস করল। তবে ওরা স্মাইজারের সঙ্গে কিছু না কিছু পরিচিত বলে ওদের পাঁচজনের মাথাপিছু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটার বেশি

বুলেটের প্রয়োজন হলো না। চারটে ড্রাম ঝাঁঝরা করে ডুবিয়ে দিল সবাই মিলে। মোটমাট হাজার পাঁচেক বুলেট খরচ করে বিরতি দিল রানা।

এরপর এল মিশ্রি খানের একার পরীক্ষা দেয়ার পালা। শেষ ড্রামটা ভাসিয়ে দিয়ে দুশো মিটার পিছিয়ে যেতে দিল ও। তারপর দু' পা খানিকটা ফাঁক করে বাজুকা ডান কাঁধে নিয়ে দাঁড়াল। ডান চোখ ফায়ারিং সাইটে। টেমপেস্ট আর ড্রামের মৃদু দুলুনির গতি-প্রকৃতি সতর্কতার সঙ্গে বুঝে নিশ্চিত হয়ে নিল ও, তারপর সময় হয়েছে বুঝে ট্রিগার টেনে দিল। আকাশ ফাটানো হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গেল রকেট। উর্ধ্বাকাশে একরাশ পানির ফোয়ারা ছুটিয়ে বিস্ফোরিত হলো ড্রামটার মাথা।

একটু পর দ্বিতীয় রকেট ছুড়ল পাঞ্জাবি। ডেকে অপেক্ষমাণ কমাণ্ডো আর ক্রু, সবার চোখের সামনে আচমকা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ড্রামটা। টিনপ্লেটের ফ্র্যাগমেন্ট সাঁ সাঁ করে শূন্যে উঠে গেল। অনেকক্ষণ পর এখানে-ওখানে টুপ্ টাপ্ করে ঝরে পড়ল। দর্শকদের মধ্যে থেকে একটা চাপা আনন্দ ধ্বনি উঠল।

চোখ থেকে প্রটেক্টর গ্লাস খুলল মিশ্রি। মুখে লেগে থাকা কালিঝুলি এক হাতে মুছে নিয়ে রানার দিকে ফিরে তামাকের দাগ বসে যাওয়া দাঁত বের করে হাসল। 'ওস্তাদ, আপনি বলছিলেন না খুব ভারী একটা দরজা আমাদের ঢুকতে বাধা দেবে?'

'হ্যাঁ। পুরু কাঠের দরজা।'

'সময় হলে ওটাকে ম্যাচের কাঠি বানিয়ে আপনাকে উপহার দেব,' বলল সে। 'ওয়াদা।'

এক জায়গায় অনেক শব্দ করা হয়েছে, তাই পরদিন আবার চলতে শুরু করল টেমপেস্ট। দু'দিন চলার পর আরেকবার থামার নির্দেশ দিল রানা। এবার কার্গো হোল্ড থেকে অ্যাসল্ট ক্রাফট তিনটে বের করা হলো। বাতাস ভরে ফুলিয়ে মেইন ডেকে পাশাপাশি রাখা হলো।

রানা কালো রঙের ক্রাফট কেনার কথা বলে দিলেও বাজারে কালো পায়নি আতাসী। গাঢ় ধূসর রঙের কিনতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। তাতেও কাজ চালানো যেত, কিন্তু ওগুলোর নাকের রং গাঢ় কমলা হওয়ায় সেটা সম্ভব নয়। দু'পাশে ওগুলোর প্রস্তুতকারীর নামও একইভাবে লেখা। ঝলমলে কমলা রঙে। রেডিয়ামওয়ালা ঘড়ির কাঁটার মত জ্বলজ্বল করে রাতে। টেমপেস্টের স্টোর থেকে কালো রং এনে ওগুলোর নাক আর লেখা ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হলো। মন্দ হলো না কাজটা।

তারপর চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হলো ওগুলো। ইঞ্জিনের ওপর বসানো কাঠের ঢাকনা খুলে চালাতে গিয়ে দেখা গেল বোট চারশ গজের মধ্যে আসার পর অল্প অল্প গুঞ্জন শোনা যায়। আর ঢাকনা পরানো অবস্থায় চালালে ত্রিশ গজের মধ্যে চলে এলেও কোনও আওয়াজ পাওয়া যায় না। তবে সে ক্ষেত্রে চালাতে হয় সিকিভাগ গতিতে।

এ ছাড়া ঢাকনা পরিয়ে অর্ধেক গতিতে চালালে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে গরম হয়ে ওঠে ইঞ্জিন। গতি কম করে চালানো হলে সময় আরও কিছু বেশি নেয়

গরম হতে।

শব্দ ও গতির সেরা কম্বিনেশন আবিষ্কার করতে ঘণ্টা দুয়েকের জন্য বোট নিয়ে একা বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। অনেকভাবে পরীক্ষার পর নিশ্চিত হলো, জনসন মেরিন ইঞ্জিন যথেষ্ট শক্তিশালী। রিজার্ভ পাওয়ার অফুরন্ত। কাজেই পূর্ণ গতির এক তৃতীয়াংশই ওদের কাজের জন্য যথেষ্ট হবে। তার বেশি গতি তোলার প্রয়োজন পড়বে না।

টেমপেস্টে ফিরে এসে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা। টার্গেট এরিয়ার দু'শো গজের মধ্যে পৌঁছে সিকি ভাগেরও কম গতিতে এগোতে হবে প্রতিটা ইনফ্লেটেবলকে।

এরপর ওয়াকি-টকি পরীক্ষা করল লেফটেন্যান্ট আতাসী। বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প আর বজ্র ঝড়-বাদলের আশঙ্কা থাকার পরও গভীর সমুদ্রে গিয়ে ওগুলো টেস্ট করল। প্রতিবার আফ্রিকানদের দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গেল সে। টেমপেস্ট থেকে পাওয়ার বোটের বিভিন্ন দূরত্ব আর গতি, রাতে আর দিনে, সব অবস্থায় পরীক্ষা চালাল। পরিস্থিতি যা-ই থাক, উভয় পক্ষ মেসেজ স্পষ্ট শুনতে পায় দেখে সন্তুষ্ট হলো সে।

এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কমাণ্ডোদের মেণ্টাল স্ট্যাবিলিটির পরীক্ষা। রানা নিল সে পরীক্ষা। ডক্টর ওকোই আর মেয়েদের ছাড়া অন্য সবার ওপর দুই রাত এ পরীক্ষা চালানো হলো। এমনকি মিশ্রি ও আতাসীর ওপরেও। এক একজনকে নিয়ে টেমপেস্ট থেকে তিন মাইল দূরে গিয়ে এই পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে রানা। প্রথম তিনজনের ওপর চালায়নি কারণ তারা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিচ্ছে না।

ওই সময় বোট যাতে দিক হারিয়ে না ফেলে, সে জন্য ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গ টেমপেস্টের মাস্ট হেডে একটা অল্প শক্তির আলো জ্বেলে রেখেছে।

যাওয়ার সময় কমাণ্ডোদের চোখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিয়েছে মাসুদ রানা। জায়গামত পৌঁছে খুলে দিয়েছে বাঁধন, তারপর দশ মিনিট সময় দিয়েছে তাদের অসীম অন্ধকার ও দুস্তর সাগরের সঙ্গে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে তুলতে। ওই সময় প্রটলড্ ডাউন অবস্থায় ভাসে ইনফ্লেটেবল। কথা বলা নিষেধ।

বিশ্ব চরাচর নিস্পন্দ। কোথাও সাড়াশব্দ কিছু নেই। গতি নেই। আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। কেবল ছোটো ছোটো ঢেউয়ের বিরতিহীন 'হিশশ, হিশশ!' শব্দ, আর চোখেমুখে, কানে বাতাসের সুড়সুড়ি কমাণ্ডোদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে জীবন এখনও চলছে। একেবারে থেমে যায়নি। নইলে জীবন-মৃত্যুর মধ্যে খুব বেশি তফাত আসলে থাকত না ওই সময়।

রানা জানে অনিশ্চয়তার মধ্যে ষাট সেকেণ্ড পার করাই কত কঠিন ব্যাপার। সেখানে ছয়শ' সেকেণ্ড পার করা যে কী ভয়াবহ নরক যন্ত্রণার সমান, তা অনুমান করাও শক্ত।

প্রায় কবরের নীরবতা বিরাজ করে পরিবেশে। রাডার বার ধরে টিলারে স্থির হয়ে বসে থাকে রানা। পাওয়ার সেট করা থাকে এক তৃতীয়াংশ গতিতে।

ফাইনাল রান-ইনের সময় তা আরও কমিয়ে সিকিভাগে নামিয়ে আনা হয়।

সময় শেষ হতে শূন্যে ভাসমান খুদে আলোটার নীচে দোল খেতে থাকা টেমপেস্টে ফিরে এসেছে রানা। তখন সামনেই বসে থাকা কমাণ্ডোর ভেতরে জমে ওঠা টেনশন অনুভব করা গেছে স্পষ্ট। টেনশন জমে কারণ তারা জানে, আক্রমণের সময় এমন পরিবেশেই কাজ সারতে হবে তাদেরকে।

তারা জানে এটা কোনও মজার খেলা নয়, বাঁচা-মরার লড়াইয়ের খেলা।

হয় মারো, না হয় মরো—নাম এই খেলার।

ক্লারেন্স। কী এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল প্রেসিডেণ্ট *উম থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবার। শোয়া থেকে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে বসল সে। সন্ত্রস্ত, বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। ঘামছে দরদর করে। গলা দিয়ে অজান্তেই পাশবিক একটা চাপা গোঙানি বেরুচ্ছে। হাঁপাচ্ছে। প্রশস্ত বুকটা ওঠা-নামা করছে ঘন ঘন।

এমন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আগে কখনও দেখেনি কিমবা। একেবারে বাস্তবের মত। এতই বাস্তব যে সেটাকে শুধুই স্বপ্ন বলে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। অথচ বর্তমান পরিবেশ বলছে তাই ছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণ নিজের বেডরুমে, নিজের বেডে ঘুমিয়ে ছিল সে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরে তার বিশ্বস্ত কায়া বডিগার্ডদের হাঁটাহাঁটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এক হাতে কপালের ঘাম মুছে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কিমবা। র‍্যাতের কালো আকাশ নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে। যেন তাকেই লক্ষ করছে। হঠাৎ প্রবলভাবে শিউরে উঠল কিমবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। পানিতে পড়ে যাওয়া কুকুর যেভাবে গা ঝাড়ে, অনেকটা সেইভাবে। দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ফিরে আসতে শুরু করায় কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে।

একদল কঙ্কাল তাড়া করেছিল কিমবাকে। কবর থেকে উঠে। তার চোখের সামনে কবরের মাটি দু' হাতে খাবলা দিয়ে সরিয়ে উঠে এসেছিল ওগুলো। একদল মেয়ে। কী বিকট, পিলে চমকে দেয়া চেহারা মেয়েগুলোর। সারা গায়ে, মুখে কাদা মাখা।

কিমবা কেবল কঙ্কালই দেখেছে, ওগুলো মেয়ে না পুরুষ, তা বোঝার কোনও উপায় ছিল না। তারপরও সে কীভাবে যেন নিশ্চিত জানে, ওগুলো মেয়েদের কঙ্কালই ছিল। ভেতর থেকে কেউ বলে দিয়েছে হয়ত।

প্রাণপণে ওগুলোর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিমবা। সর্বশক্তিতে দৌড়ে সরে যেতে চাইছিল, কিন্তু পারেনি। সে যতই জোরে দৌড়ানোর চেষ্টা করে, পায়ের নড়াচড়া ততই মন্থর হয়ে আসে। মেয়েগুলোকে বড় বড় নখ সামনে বাড়িয়ে তেড়ে আসতে দেখে ভয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চেয়েছে কিমবা, তা-ও পারেনি। হাজার চেষ্টার পরও গলা দিয়ে গোঙানি ছাড়া কিছুই বের হয়নি।

মেয়েগুলো হঠাৎ সিংহে রূপান্তরিত হলো। তাড়া করে ধরে ফেলল তাকে। মাটিতে ফেলে শরীরের এখান-সেখান থেকে খাবলা মেরে মাংস তুলে নিতে

লাগল।

কী আশ্চর্য! মাংস ছেঁড়ার সেই চড় চড় শব্দটা এখনও একটু একটু কানে আসছে কিমবার। তারচেয়েও বড়ো আশ্চর্যের কথা, চারদিকে নিজের গোত্রের এত মানুষ দেখেছে সে, কিন্তু কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। সবাই চেয়ে চেয়ে তার দুর্দশা দেখেছে। তার সাহায্যের আবেদন কারও কানে ঢোকেনি। কেউ এগিয়ে আসেনি সাহায্য করতে।

ধাক্কাটা সামলে নিতে বেশ সময় লাগল জাংগারোর লাইফ প্রেসিডেন্ট কিমবার। রাত তখনও অনেক বাকি। তবু আর শুতে মন চাইল না।

জানে, আজ আর ঘুম আসবে না। তাই নেমে পড়ল বিছানা থেকে। আর দু'দিন পর স্বাধীনতা দিবস। তার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম। হাতে কত কাজ। এ সময় কম ঘুমানোই বরং ভাল। কাজে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু হলো না। ডুব দেয়ার চেষ্টা যতই করুক, দুঃস্বপ্নে দেখা মেয়েগুলোর সেই বিকট চেহারা বারবার ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

প্রথম রাতে রানা টেমপেস্টে ফিরে আসতে কার্ল ওয়ালডেনবার্গ হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াল। 'আশ্চর্য! আউটবোর্ড ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না,' বলল লোকটা। 'অথচ আমি সারাক্ষণ কান পেতে ছিলাম।'

'কার্পেন্ট্রি তা হলে ভালই হয়েছে বলছেন?'

'বলতেই হবে,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'আপনি দু'-তিনশ' গজের মধ্যে আসতে একটু একটু শব্দ কানে এসেছে। তা-ও ব্যাপারটা জানা না থাকলে শুনতে পেতাম কি না সন্দেহ। ওরা যদি খুব সতর্ক গার্ড না হয়, তা হলে আপনাদের অ্যাপ্রোচ টেরই পাবে না। ভাল কথা, আপনারা যেতে চান কোথায়? আমার আরও চার্ট দরকার হবে যদি... '

'আজ রাতে জানতে পারবেন কোথায় যাব।'

ডিনারের পর মেইন সেলুনে সবাইকে ডাকল রানা, ইঞ্জিনিয়ার গ্রুবিক বাদে। তাকে না হলেও চলবে বলে ডাকা হয়নি। ডক্টর ওকোই, আতাসি, মিশ্রি খান, মর্সিয়া-ফায়জা এবং দশ আফ্রিকান থাকল সেখানে। আরও থাকল ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গ, ফার্স্ট মেট নরবিট্টো ও ডেকহ্যাণ্ড কিপরিয়ানি। আর ঠিক তখনই...

ঠিক তখনই শুরু হলো ওর হাতের কাঁপন। ঠাণ্ডা হলো, গরম হলো, সুচ ফোটানোর অনুভূতি হলো। অসহ্য ব্যথায় গোঙানি বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে, সবার বিস্মিত চোখের সামনে অসহায় ভাবে গড়াগড়ি খেল ও ডেকের উপর। ঘেমে নেয়ে উঠল রানার সারা শরীর। আতাসী, মার্সিয়া, মিশ্রি খান ছুটে এল সবাইকে ঠেলে। ধীরে ধীরে কমে এল অকথ্য নির্যাতনের প্রকোপ, কিন্তু ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে ও। রানার যখন হুঁশ হলো, দেখল ওর মাথাটা কোলে নিয়ে মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে উদ্বিগ্ন ফায়জার মুখ।

ম্লান হাসল রানা। উঠে বসার চেষ্টা করল। আতাসী ও মিশ্রি খানের সাহায্য নিয়ে উঠে বসলও। বলল, 'ও কিছু না। ভয়ের কিছু নেই।'

'এমন রোগী আমি আমার জীবনে দেখিনি,' বললেন ডা. ওকুম্বা। 'ঘটনাটা কী, বলবেন, প্লিজ?'

'ও কিছু না,' আবার বলল রানা। 'সামান্য টরচার করা হলো আর কী, ব্যস। বেতারের মাধ্যমে।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'এবার অ্যাটাকের প্ল্যান নিয়ে...'

ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলল ক্যাপ্টেন মিশ্রি খান।

'ধানাই-পানাই বাদ দেন, ওস্তাদ! আগে আমরা জানতে চাই কোন হারামজাদা টরচার করছে আপনাকে, কেন আর কীভাবে। আপনার এক ডাকে দূর দেশ থেকে আমরা সবাই ছুটে এসেছি, আপনার কথায় লড়ব প্রাণ বাজি রেখে। আপনাকে আমরা আপন লোক মনে করি। সব কথা আমাদের জানার অধিকার আছে।'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানাল ওকে।

ডানহাত সামনে বাড়িয়ে সামান্য ফোলা জায়গাটা দেখাল রানা ওদেরকে। কপালের ঘাম মুছে সংক্ষেপে জানাল, কীভাবে ওকে জালে আটকে নিয়ে নিজের ইচ্ছেমত কাজ করিয়ে নিতে চাইছে রুডলফ গুন্থার নামে এক জার্মান ধনকুবের, লুঠ করতে চাইছে জাংগারোর অমূল্য সম্পদ, ক্রিস্টাল মাউন্টেনের সমস্ত প্ল্যাটিনাম।

চোখমুখ কঠোর হয়ে উঠল উপস্থিত সবার।

'কিন্তু, ওস্তাদ, এর একটা বিহিত করা যায় না? আমরা ক'জন যদি...'

'দরকার নেই, ক্যাপ্টেন। আর বড়জোর একবার এরকম কষ্ট দেবে। তারপর আমিই ওকে কষ্ট দেব বাকি জীবন। এবার...'

এবার কাজের কথা। সবার উপস্থিতিতে বিস্তারিত অ্যাটাক-প্ল্যান প্রকাশ করল রানা, ব্যাখ্যা করল, জবাব দিল প্রশ্নের। প্রজেক্টরের সাহায্যে বেশ কিছু স্লাইডও দেখানো হলো অ্যাটাক ফোর্সকে।

ওগুলোর বেশিরভাগই ছবি। রানা ক্লারেন্স সফরে এসে যে অজস্র ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তার মধ্য থেকে বাছা বাছা কিছু। তবে সবার নজর কাড়ল এক লোকের ছবি। মার্টিনের দেয়া কিমবার সেই ছবিটা। অতিরিক্ত এনলার্জ করা হয়েছিল বলে আগে চেহারাটা স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু এখন স্পষ্ট।

সবাই দেখল সিল্ক-টপ হ্যাট মাথায় দিয়ে বসে থাকা মাঝ বয়সী এক আফ্রিকানকে। গায়ে কালো রঙের ফ্রক-কোট, পরনে স্পঞ্জ-ব্যাগ ট্রাউজার্স। মুখটা লম্বাটে। কুঠারের মত বাঁকা। নাকের দু' পাশের চামড়ায় দুটো নিম্নমুখী গভীর দাগ। ঠোঁটের দুই কোনাও নীচের দিকে নেমে আছে। ঘৃণার উদ্রেক হলে বা কিছু মেনে নিতে না পারলে চেহারা এরকম হয়।

'আমার ভুল না হয়ে থাকলে ইনি নিশ্চয়ই কিম্ভূত ভায়া। অ্যাম আই রাইট, বস্?' আতাসী বলল। 'নাকি, আর আই রাইট?'

রানা মাথা ঝাঁকাল। 'ইউ অ্যাম রাইট।'

হেসে উঠল কেউ কেউ। ডক্টরসহ প্রতিটা আফ্রিকানের চেহারা থেকে ঘৃণা গলে গলে পড়তে লাগল কিমবার প্রতি।

ওটা রিপ্লেস করা হলো। বাকি সব ম্যাপ ও চার্ট। কিছু কেনা, কিছু রানার

নিজ হাতে আঁকা। এক সময় রানার ব্যাখ্যা শেষ হলো। স্তব্ধ বিস্ময়ে, রুদ্ধশ্বাসে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সবাই। পিন পড়লেও শোনা যাবে, এমন নীরব হয়ে আছে মেইন সেলুন। খোলা পোর্ট হোল দিয়ে সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ার রিং মন্থর গতিতে বেরিয়ে গিয়ে মিশে যাচ্ছে বাইরের কালো রাতে।

ওয়ালডেনবার্গের বোল ফুটল সবার আগে। 'গট ইন হিমেল (গড ইন হেভেন)!' বলল সে।

তারপর শুরু হলো প্রশ্নের তোড়। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে এক ঘণ্টার মত লাগল রানার। সবশেষে ক্যাপ্টেন একটা আবেদন জানাতে এল, তেড়িবেড়ি কিছু ঘটে গেলে সবাই যেন খুব দ্রুত টেমপেস্টে ফিরে আসে। যাতে সে লেজ দাবিয়ে ভাগতে পারে। দিগন্তের ওপারে উধাও হয়ে যেতে পারে সূর্য ওঠার আগেই।

তাই হবে, জানাল রানা।

'আপনি বললেন ওদের নেভি নেই। গানবোট নেই। এ কথার ওপর কতখানি নির্ভর করা যায়?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন।

'একশ' ভাগ।'

'হয়তো আপনি দেখতে পাননি বলে ভাবছেন... '

'আমি ভাবছি না,' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'যা সত্যি, তাই বলছি।' ওকোইর দিকে ফিরল ও। 'আপনি বলুন, ডক্টর।'

মাথা দোলাল লোকটা। ওয়ালডেনবার্গের দিকে ফিরে বলল, 'কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন। নেভি, গানবোট তো দূরের কথা, ফিশিং ট্রলার যে ক'টা ছিল, সেগুলোও নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। তাড়া খাওয়ার কোনও ভয় নেই আপনার।'

মিটিঙের সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। আফ্রিকানরা ডেকে উঠে এসে যে যার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়েও পড়ল। ডক্টর আর নরবিট্টো ঘুমাতে গেল। শেষরাতের ওয়াচ ডিউটি আছে নরবিট্টোর। ওয়ালডেনবার্গ হুইল হাউসে গিয়ে ঘণ্টি বাজাল। আবার ছুটল টেমপেস্ট। তিনদিন দূরত্বের গন্তব্যে।

রানা, আতাসি, মিশ্রি খান, মার্সিয়া আর ফায়জা ক্রু'জ কোয়ার্টার্সের পিছনের আফটার ডেকে এসে জড় হলো। আলোচনা শুরু হলো আবার। প্রত্যেকে একবাক্যে স্বীকার করল রানার পর্যবেক্ষণ ও আক্রমণ পরিকল্পনা এক কথায় নিখুঁত হয়েছে।

আতাসী ক্লারেন্সের লেটেস্ট পরিস্থিতি জানানোর পর আগের পরিকল্পনায় তড়িঘড়ি করে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়েছে রানাকে। ওর আগের আক্রমণ পরিকল্পনায় রাশান সৈন্যদের বিষয়টা ছিল না। এখনকারটায় আছে। সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দেয়া হয়েছে ব্যাপারটাকে। রাশান সৈন্যরা প্রশিক্ষিত, তাদেরকে মোকাবেলা করতে হলে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে ওদেরকে। তাতে ওদের যে কারও, অথবা সবার মৃত্যুও হতে পারে। তাই স্ট্র্যাটেজিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।

'সবই বুঝলাম,' ফায়জা বলল এক সময়। মেয়েদের জন্য সম্মুখ-যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে জেনে অভিমান করেছিল ওরা। পরে ভেতরের কারণ জানতে পেরে মেনে নিয়েছে সিদ্ধান্ত। 'কিন্তু তুমি সবকিছুতে এত হুড়োহুড়ি করছ কেন,

তা বুঝলাম না। তোমার ক্যালেণ্ডারের হিসেবেই আজ ছিয়ানব্বইতম দিন। আরও তিনদিন সময় তো হাতে ছিল।'

জবাব এল না। আনমনা হয়ে গেছে রানা।

তেরো

দেরিতে শুলেও ছিয়ানব্বইতম দিন সকালে সবাই তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল। রানা বাদে।

ও রাতে বিছানায় পিঠই ছোঁয়ায়নি বলতে গেলে। ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গের সঙ্গে ব্রিজে কাটিয়েছে, হুইলহাউসে টেমপেস্টের খুদে রেডারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে। গোল পেরিমিটারের মধ্যে ইরিডিসেন্ট সুইপিং আর্মটার অনবরত চক্কর মারা এবং নীচের দিকে একটু একটু করে ফুটে উঠতে থাকা জাংগারোর সবুজ কোস্টলাইনের ওপর সতর্ক নজর রেখে। চুপচাপ দেখে গেছে রানা, অভিব্যক্তিহীন চেহারায়।

'রাজধানীর দক্ষিণ উপকূলের ভিজুয়াল রেঞ্জের মধ্যে চলুন,' বলল রানা। 'তীরের সমান্তরালে উত্তরদিকে চলতে থাকুন, দুপুর নাগাদ যাতে এই জায়গায় পৌঁছানো যায়।' জাংগারোর উত্তর সীমান্তের লাইবেরিয়ার ওপর টোকা দিল তর্জনীর ডগা দিয়ে।

বিশ দিন হয়ে গেল লোকটার সঙ্গে সাগরে কাটিয়েছে রানা। মোটামুটি আস্থা এসে গেছে তার ওপর। প্লোচে বন্দরে ওর নগদ টাকার টোপ গেলার পর থেকে রানার মিশনেরই একটা অংশ বনে গেছে মানুষটা। রানার মিশন যাতে সফল হয়, সে জন্য নিজের তরফ থেকে যতটা সহায়তা করা দরকার করে আসছে। ওরা মিশনে রওনা হলে ওয়ালডেনবার্গ জাহাজ নিয়ে উপকূলের চার মাইল দূরে অপেক্ষা করবে কথা হয়েছে।

রানার ধারণা লোকটা কথা রাখবে। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেলেই ভয়ে পালিয়ে যাবে, অতটা ভীরু মনে হয় না তাকে। ওর আস্থা আছে, কমাণ্ডোরা যদি ওয়াকি-টকিতে ডিসট্রেস সিগন্যালও পাঠায়, তবু পালাবে না। সেরকম ইচ্ছা থাকলে বিপদ ঘটে গেলে সবাইকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিপে ফিরে আসার অনুরোধ করত না সে। চুপ করে থাকত।

ওয়ালডেনবার্গ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে তাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত। তা ছাড়া দুজন কমাণ্ডো ও ডক্টর ওকোই তো থাকছেনই জাহাজে, অতএব চিন্তার কিছু নেই।

সকাল গড়িয়ে চলল ধীরগতিতে। টেমপেস্টের টেলিস্কোপের সাহায্যে তীরের ওপর নজর রাখল ও। এক সময় জাংগারো নদীর মোহনা চোখে পড়ল। শামুকের চেয়েও ধীরগতিতে, এক চুল এক চুল করে পিছিয়ে যাচ্ছে তীর। দিগন্তের এক মাথা থেকে অন্য মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত গরান বন। নিচু, সবুজ।

দশটার দিকে সারিতে একটা ছেদ পড়ল। সবুজ ওখানটায় অফ হোয়াইট হয়ে গেছে। ওটা ক্লারেন্স।

পাশেই প্রতীক্ষায় থাকা ফায়জা, মার্সিয়া, আতাসী আর মিশ্রি খানের অস্থিরতা বেড়ে গেছে টের পেয়ে ওদের দেখার জন্য টেলিস্কোপ ছেড়ে দিল রানা। রুদ্ধশ্বাসে, নিবিষ্ট মনে শূন্যস্থানটা দেখল সবাই একে একে। পরেরজনকে দেখার সুযোগ দিল। মিশ্রি খানকে বেশি বেশি সিগারেট টানতে দেখা গেল। আতাসী ডেকের এ-মাথা ও-মাথা চক্কর খেতে লাগল। নতুন করে টেনশন জমতে শুরু করেছে সবার মধ্যে।

দুপুরে নির্ধারিত মেসেজ ট্র্যান্সমিট করল রানা। একটামাত্র শব্দ, 'প্ল্যানটেইন'। দশ সেকেণ্ড পর পর পাঁচ মিনিট ধরে ট্র্যান্সমিট করে গেল ও। তারপর পাঁচ মিনিট বিরতি দিয়ে আবার একই কায়দায় চালিয়ে গেল। এভাবে আধঘণ্টার মধ্যে তিনবার ট্র্যান্সমিট করল ও। মেইনল্যাণ্ডের কোথাও থেকে মার্টিন নিশ্চয়ই ওর গলা শুনতে পাবে, ভাবল ও।

এর অর্থ রানা তার লোকজন নিয়ে বিনাবাধায় জায়গামত পৌঁছে গেছে এবং সময়মত নির্ধারিত মিশনে হাত দিতে যাচ্ছে।

একই মেসেজ আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে আরও এক জায়গায় পাঠানো হলো। তবে সেটা ছিল একটু ব্যতিক্রমী ভাষার—আমরা প্রস্তুত।

ক্লারেন্স থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে এক হোটেলের বারান্দায় বসে রেডিওতে রানার ট্র্যান্সমিশন শুনতে পেল পিটার মার্টিন ও দানব হফম্যান। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল তারা। রেডিও নিয়ে বেডরুমে চলে এল মার্টিন।

জাংগারান আর্মির সাবেক প্রধান, গরিলা সদৃশ লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল অ্যাণ্টনি ববি ঝিম মেরে বসে আছে সেখানে। মদ গিলছে। তার সামনে বসে সতর্কতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করল মার্টিন, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে জাংগারোর প্রেসিডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করতে যাচ্ছে।

সারা দুপুর বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল গরিলা। বিকেলের দিকে হাসি ফুটল তার চাঁদের মত প্রায় গোল, বিশাল মুখটায়। একবার ক্ষমতায় বসতে পারলে যারা তাকে দেশছাড়া করার কাজে কিমবাকে সাহায্য করেছিল, তাদের কী অবস্থা করবে, সেই কথা ভেবে হাসি ক্রমে চওড়া হতে লাগল তার।

পিটার মার্টিনের সঙ্গে চুক্তি করল সে। নগণ্য একটা অঙ্কের প্রফিট-পার্টিসিপেশনের বিনিময়ে দশ বছরের জন্য ক্রিস্টাল মাউণ্টেনের এক্সক্লুসিভ মাইনিং কনসেশন অনুমোদন করল বোরম্যাক ট্রেডিং কোম্পানির নামে।

এর বিপরীতে ববির নামে এক সুইস ব্যাংকে পাঁচ লক্ষ ডলারের একটা সার্টিফাইড চেক জমা হলো।

রানার পরের মেসেজ দ্বিতীয় রিসিভিং স্টেশনে অন্যরকম সাড়া ফেলে দিল। মিশ্র অনুভূতি হলো উপস্থিত সবার মধ্যে।

ক্লারেন্স। আর মাত্র তিনদিন পর রিপাবলিক অভ জাংগারোর স্বাধীনতা দিবস।

আজীবন প্রেসিডেন্ট, উম *থাকাতি* ফ্রান্সিস কিমবার আমলের প্রথম। দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখতে নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠান আয়োজনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে এ মুহূর্তে। শহরের প্রতিটা ভবনের চূড়ায় বিলবোর্ড বসিয়ে প্রেসিডেন্টের বড় বড় প্রতিকৃতি টাঙানো হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের প্যাট্রিয়টিক ইয়ুথ দলের নেতা পিয়েরে ওকুম্বা তত্ত্বাবধান করছে সবকিছু।

তার বেশি আগ্রহ উফা প্রিজনের কিছু বন্দির চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা নিয়ে। তাদের মধ্যে একজনকে দুই মাস আগে সে নিজে পাকড়াও করেছিল—দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। লোকগুলোর অবস্থা সুবিধের নয়। সবাই কমবেশি আহত। অপরাধ স্বীকার করাতে গিয়ে এই অবস্থা করা হয়েছে লোকগুলোর।

ওই দিন সূর্য ওঠার পর পুশ কার্টে করে সিটি স্কয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের। সেখানে প্রেসিডেন্টের *স্বাধীনতা দিবস* ভাষণের পর কাজটা সারা হবে। স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিকতার একটা অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে এটাকে।

কিমবা নিজের ডেস্কে বসে একটা তালিকায় চোখ বোলাচ্ছে। স্বাধীনতা দিবসে দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ নাগরিককে কোন পদকের জন্য মনোনীত করা হয়েছে, এটা সেই তালিকা। পিয়েরে ওকুম্বার প্রস্তুত করা। দেখছে কিমবা, কিন্তু মন দিতে পারছে না। কেন জানি, মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে আজ।

দুপুরের পর অলস ভঙ্গিতে নাক ঘোরাল এমভি টেমপেস্ট। পেট বোঝাই মারণাস্ত্র আর একদল কমাণ্ডো নিয়ে ধীরগতিতে দক্ষিণে ফিরে চলল উপকূল ধরে। হুইল হাউসে বড় এক মগ কফি হাতে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। অবতরণ পর্ব কীভাবে সারার প্ল্যান আছে ওর, সে ব্যাপারে বলে চলেছে।

আতাসী, মিশ্রি খান, মার্সিয়া-ফায়জা ও ডক্টর ওকোই আছে সেখানে। বাকি সবাই বাইরে জটলা করছে। গুফরান, আহমাদ, বাশার, হাজি, রাব্বি, আবরোজি, ওমর, ইমাম, হারুণ, আর কিয়াম।

'সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আপনি উত্তরের বর্ডারে অপেক্ষা করবেন,' ক্যাপ্টেনকে বলল রানা। 'তারপর নয়টা বাজলে কোনাকুনি তীরের দিকে এগোতে শুরু করবেন। খুব ধীরগতিতে।' মগে চুমুক দিল ও। 'সূর্য ডোবার সময় আমরা অ্যাসল্ট ক্রাফট নামিয়ে ফেলব জাহাজ থেকে। যা যা তোলার তুলে ফেলব ওতে।

'আপনি রাত দুটো নাগাদ এখানে এসে থামবেন, তীর থেকে চার মাইল দূরে। পেনিনসুলার এক মাইল উত্তরে। সমস্ত আলো নেভানো থাকবে যাতে কেউ টেমপেস্টের উপস্থিতি টের না পায়। আমি যতদূর জানি ক্লারেন্স হারবারে রেডার নেই। তবে পোর্টে কোনও জাহাজ থাকলে আলাদা কথা।'

মাথা নাড়ল ওয়ালডেনবার্গ। 'থাকলেও পোর্টে নোঙর করা অবস্থায় রেডার চালু রাখা হয় না।' ইনশোর চার্টের ওপর ঝুঁকে ছিল সে। প্যারালেল রুল আর ডিভাইডার দিয়ে নিজের দূরত্ব মাপজোক করছিল। 'নিয়ম নেই।' মুখ তুলল

সে। 'আপনাদের প্রথম ক্রাফট কখন ইনশোরের দিকে যাত্রা করবে?'

'দু'টোর একটু পর,' বলল রানা। 'আতাসী ওর ক্রুদের নিয়ে আগে যাবে। মর্টার সেট করে অপেক্ষা করবে। বাকি দুই ক্রাফট যাবে এক ঘণ্টা পর।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল জার্মান।

'সময়ের হেরফের হলে চলবে না,' সতর্ক করল রানা। 'শুধু কম্পাস আর ক্যালকুলেশনের ওপর নির্ভর করে চলতে হবে আমাদেরকে। স্রেফ খালি চোখের ওপর ভরসা করে। কোনও আলোর সাহায্য পাওয়া যাবে না। তার মানে তীরের একশ গজের মধ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত মাটির দেখা পাব না আমরা।' শ্রাগ করল ও। 'বুঝতেই পারছেন।'

আবার মাথা ঝাঁকাল লোকটা। তারপর কী করতে হবে জানা আছে তার। আক্রমণ শুরু হওয়ার শব্দ কানে এলে চার মাইল দূরের অবস্থান ছেড়ে শামুকের গতিতে জাংগারোর পানি সীমায় নাক ঢোকাতে হবে। হারবারের মুখের দিকে এগিয়ে আসতে হবে তাকে। নতুন অবস্থান নিতে হবে ক্লারেন্সের দুই মাইল দক্ষিণে। হারবারের মুখের কাছে। তারপর থেকে ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত ওয়াকি-টকির ওপর নির্ভর করতে হবে।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সূর্য ওঠা পর্যন্ত ওখানেই থাকতে পারবে টেমপেস্ট। আর যদি তার আগেই পরিস্থিতি নাগালের বাইরে চলে গেছে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, তা হলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। টেমপেস্টের মাস্টহেড, ফোরপিক আর স্টার্নেরসহ সবগুলো নেভিগেশন লাইট জ্বেলে দিতে হবে। যাতে রিট্রিট করে আসা কমাণ্ডোরা পথের দিশা পায়।

একটু আগেভাগেই সন্ধে নামল সেদিন। একে মেঘ জমে আছে আকাশে, তার ওপর চাঁদ উঠবে অনেক দেরিতে। একটু পর শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। বেশ জোরেশোরে, ঝাঁপিয়ে নামল। গত দু'দিনে এই নিয়ে তিনবার তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে একাকার হয়ে গেল সবকিছু। ওয়েদার রিপোর্টে বলা হলো, রাতে উপকূলে আরও ভারী বর্ষণ হবে। তবে টর্নেডোর আশঙ্কা নেই।

মনে মনে চাইছে রানা, ওরা যখন খোলা ইনফ্লেটেবলে থাকবে, অথবা প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস দখলের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে থাকবে, তখন যেন মুষলধারায় বৃষ্টি না হয়।

সূর্য ডোবার আগে জিনিসপত্রের ওপর থেকে টারপুলিনের আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলা হলো। সবকিছু মেইন ডেকে এনে সারি দিয়ে রাখা হলো। অন্ধকার চেপে বসতে আতাসী ও মিশ্রি খানকে সঙ্গে নিয়ে কাজে লেগে পড়ল রানা। অ্যাসল্ট ক্রাফটগুলোকে বাতাস ভরে ফুলিয়ে পানিতে ভাসানোর আয়োজন করল।

ডেক থেকে মাত্র আট ফুট নীচে পানি। কাজেই ডেরিক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ল না। ধরাধরি করেই প্রথমটাকে পানিতে ভাসানো হলো। ওটার লম্বা পেইন্টারের অন্য মাথা টেমপেস্টের ফোরডেকের রেইলিঙের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে আটকে রাখল মিশ্রি খান। লেফটেন্যান্ট আতাসী রওনা হবে ওটা নিয়ে। পানিতে পেট রেখে অল্প অল্প দুলতে লাগল বোটটা। ঘষা খেতে লাগল টেমপেস্টের ধাতব গায়ে।

কমাণ্ডোরা আলাদা করে রাখা এক কুড়ি ইউনিফর্ম সেটের মধ্য থেকে পনেরোটা তুলে নিল। প্রস্তুত হয়ে নিল ঝটপট। এরপর মাসুদ রানা আর নরবিট্টো প্রথম হেভি আউটবোর্ড ইঞ্জিনটাকে হয়েস্টে ঝোলাল। সাবধানে ইনফ্লেটেবলটার স্টার্ন বরাবর নামিয়ে দিল। মিশ্রি খান সঙ্গে সঙ্গে ওটাকে স্ক্রু দিয়ে টাইট করে লাগিয়ে ফেলল ব্যাকবোর্ডের সঙ্গে। ওপরে কাঠের তৈরি মাফলার পরিয়ে দেয়া হলো। তারপর ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে দুই মিনিট চালিয়ে রাখল রানা।

সার্বিয়ান ইঞ্জিনিয়ার রাদকো গ্রুবিক আগেই সব ক'টা ইঞ্জিনের থরো চেক-ওভার করে রেখেছিল। একেবারে সেলাই মেশিনের মত চলতে লাগল ওগুলো, কোনওরকম শব্দ নেই। সামান্য যা-ও বা ছিল, ওপরের মাফলারের জন্য আরও কমে গেল। একেবারে মৌমাছির গুঞ্জনে পরিণত হলো।

ওপর থেকে জিনিসপত্র আতাসীর হাতে নামিয়ে দিল রানা। প্রথমে দিল মর্টারের বেসপ্লেট আর সাইট সিইং গিয়ার। তারপর মর্টার টিউব। চল্লিশটা মর্টার কিমবার প্রাসাদের ওপর ব্যবহারের জন্য নিয়ে যাচ্ছে আতাসী। আরও বারোটা নিচ্ছে ব্যারাকের ওপর ব্যবহারের জন্য। বাড়তি নিরাপত্তার খাতিরে আরও আটটাসহ মোট ষাটটা মর্টার চলেছে তীরে। মিশ্রি খান আগেই প্রতিটার প্রাইমার এবং ডেটনেটর সেট করে রেখেছে।

এক জোড়া ফ্লেয়ার লঞ্চিং রকেট আর দশটা ফ্লেয়ারও নিয়ে যাচ্ছে আতাসী। একটা ফগ হর্ন ও একটা করে ওয়াকি-টকি, কম্পাস, নাইটগ্লাস নিয়ে যাচ্ছে। কাঁধে স্মাইজার। কোমরের বেল্টে গুঁজে নিয়েছে পাঁচটা ফুল লোডেড ম্যাগাজিন। গুফরান ও আহমাদ যাচ্ছে ওর সঙ্গে। ওরা যে যার স্মাইজার, ওয়াকি-টকি, কম্পাস ইত্যাদি নিয়ে চলেছে। বেশি মালপত্রের ভারে একটু বেশি দেবে গেছে বোটটা। তবে ঝড়-ঝাপটার শঙ্কা যখন নেই, তখন অসুবিধা হবে না তাতে।

প্রস্তুতি শেষ হতে টেমপেস্টের রেইলিং ঘেঁষে সারি দিয়ে দাঁড়াল সবাই। রানা হুড পরানো টর্চ লাইটের আলোয় ঝুঁকে তিন সঙ্গীকে বিদায় দিল। আবেগ মাখা কোনও বিদায়বাণী উচ্চারিত হলো না। সবাই হাত নাড়ছে। রানা-ফায়জাও নাড়ল। নীরবে শেষ হলো বিদায় পর্ব। পেইন্টারে ঢিল দিল মিশ্রি।

আফটারডেকের দিকে পিছিয়ে পড়তে লাগল এক নম্বর অ্যাসল্ট ক্রাফট। অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওটা এক সময়। পেইন্টারটা আফটার রেইলের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে ফেলল মিশ্রি খান। সময় না হওয়া পর্যন্ত ওভাবেই থাকবে ক্রাফট। দোল খাবে অন্ধকার সাগরে।

দ্বিতীয় ক্রাফট ভাসাতে সময় লাগল কম। মিশ্রি খান, আবরোজি, কিয়াম, হাজি আর রাব্বি যাচ্ছে এটায়। আতাসীর বোটে লোড বেশি হয়ে যাওয়ায় বাড়তি একজন নিতে হচ্ছে মিশ্রিকে। তবে একটু চাপাচাপি করে বসা ছাড়া আর কোনও অসুবিধা হলো না এর ফলে।

নিজের আউটবোর্ড ইঞ্জিন নিজেই সেট করে নিল মিশ্রি খান। সঙ্গে নিল একটা বাজুকা আর বারোটা রকেট। তার মধ্যে দু'টো নিজের সঙ্গে নিয়েছে সে।

বাকি দশটা থাকছে তার ব্যাক-আপ ম্যান, আবরোজির কাছে। জ্যাকব ল্যাডার বেয়ে বাঁদরের মত সর সর করে বোটে নেমে পড়ল লোকগুলো। নিজের নিজের স্নাইজার ও পাঁচটা করে এক্সট্রা ম্যাগাজিন নিয়ে চলেছে বাকি সবাই। কোমরের বেল্টের ইজি-এক্সট্রাকশন পাউচে রয়েছে এক্সট্রা ম্যাগাজিনগুলো। এ ছাড়া একটা নাইট গ্লাস এবং একটা ওয়াকি-টকিও নিয়ে চলেছে। প্রথমটা মিশ্রির গলায় ঝোলানো আছে। ওয়াকি-টকি উরুর সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা।

ক্রাফটের নাকের আংটায় বাঁধা পেইন্টারের অন্য মাথা টেমপেস্টের রেইলিঙে বাঁধল মিশ্রি খান। তারপর হাত ছেড়ে দিল। ভেসে পড়ল ওদের ক্রাফট। একটু একটু করে প্রথমটার পাশে গিয়ে থামল। অন্ধকারে ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগল। প্রায় গায়ে গায়ে লেগে থাকা প্রথম বোটের আরোহীদের দিকে কেউ তাকাল না। কারও সঙ্গে কথা বলল না কেউ। ঘুরে তাকাল না পর্যন্ত। আসন্ন অভিযানের ভাবনায় মগ্ন।

তৃতীয় ও শেষ আউটবোর্ডে ওঠার জন্য প্রস্তুত হলো রানা। ওর সঙ্গে যাচ্ছে ফায়জা, মার্সিয়া আর হারুন। সবাই বোটে নেমে বসে পড়েছে। ডক্টর ওকোইর সঙ্গে কথা বলে রানাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল জ্যাকব ল্যাডারের দিকে, এমন সময় ব্রিজ থেকে ব্যস্ত পায়ে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গ।

রানার আস্তিন ধরে টান দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় একটা গোলমাল হয়ে গেছে।'

চমকে উঠল রানা। জায়গায় জমে গেল কোথাও মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে ভেবে। 'কী?' কোনওমতে বলল ও।

'একটা জাহাজ। ক্লারেন্সের দিকে আসছে।'

'অ্যাঁ?' হাবার মত তাকিয়ে থাকল ও।

'একটা জাহাজ,' ঢোঁক গিলল লোকটা। 'আমাদের চেয়ে দূরে আছে অবশ্য। ক্লারেন্সের দিকে আসছে।'

'কখন দেখলেন?'

'তা বেশ কিছুক্ষণ হবে,' ওয়ালডেনবার্গ বলল। 'আমি ভেবেছি উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণে যাচ্ছে বুঝি আমাদের মত। অথবা উত্তরে যাচ্ছে। কিন্তু ওটা তার কোনওটাই করছে না।'

'অর্থাৎ দাঁড়িয়ে আছে?'

'মনে হয়,' ঘন ঘন মাথা দোলাল জার্মান।

'আপনি শিওর?' দুই কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল রানা। 'সন্দেহ নেই কোনও?'

মাথা নাড়ল জার্মান। 'না। আমি জাহাজটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন থেকে চলার ওপরে থাকলে এতক্ষণে আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল ওটার। কিন্তু ওটা আগের জায়গাতেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না।'

'কীসের জাহাজ আন্দাজ করতে পারেন?' বলল রানা। 'অথবা কাদের হতে পারে?'

মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'সাইজ দেখে মনে হয় ফ্রেইটার। যোগাযোগ না

করলে শিওর হওয়া যাবে না কাদের।'

কয়েক মিনিট বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল ও। 'যদি ফ্রেইটার হয়, জাংগারোর জন্য মালপত্র কিছু নিয়ে এসে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই সকালের আগে হারবারে ঢুকবে না?'

মাথা দোলাল ওয়ালডেনবার্গ। 'তাই তো হওয়ার কথা। এ অঞ্চলের অনেক ছোটো পোর্টে রাতের বেলা হারবারে ঢোকা নিষেধ আছে জানি। হয়তো সে জন্যই ওটা এক জায়গায় বসে আছে। সকাল হলে ঢুকবে।'

'আপনি যখন ওটাকে দেখতে পেয়েছেন, ওটাও নিশ্চয়ই আপনাকে দেখতে পেয়েছে?'

'কোনও সন্দেহ নেই। আমরা ওটার রেডারে আছি।'

আরও কিছু ভাবল রানা। 'কিন্তু রেডারে ডিঙ্গি তো ধরা পড়বে না, কী বলেন?'

'তা হয়তো পড়বে না,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল জার্মান। 'রেডারের পিক-আপের জন্যে ডিঙ্গি খুব নিচু হয়ে যায়।'

'তা হলে আমরা যাচ্ছি,' দৃঢ়তা ফুটল ওর কণ্ঠে। 'এখন দেরি হয়ে গেছে অনেক। উইশ আস লাক, স্কিপার। আমরা ধরে নিতে পারি ওটা সকালে অনুমতি নিয়ে হারবারে ঢোকার অপেক্ষায় রাতটা বাইরেই কাটাবে।'

'গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাবে,' ক্যাপ্টেন বলল।

'শুনলই বা। তাতে হবেটা কী?'

হাসি ফুটল জার্মানের মুখে। 'কিছু না। তবে যা বলেছি মনে রাখবেন। মিশন যদি ব্যর্থ হয় আর আমরা সূর্য ওঠার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে না পারি, তা হলে দিনের আলোয় দূরবীনের সাহায্যে টেমপেস্টকে চিনে ফেলবে ওরা। তারপর... ' থেমে শ্রাগ করল। 'বুঝতেই পারছেন।'

'পারছি,' দিগন্তে চোখ রেখে বলল মাসুদ রানা। 'আমাদের ব্যর্থ হওয়া চলবে না।'

ওয়ালডেনবার্গ ব্রিজে ফিরে গেলে ডক্টর ওকোই এগিয়ে এলেন রানার দিকে। এতক্ষণ আড়াল থেকে ওদের দু'জনের কথা শুনেছেন তিনি। 'গুড লাক, মেজর,' নিখুঁত ব্রিটিশ উচ্চারণে বললেন তিনি। 'সি ইউ ইন দ্য মর্নিং।'

'শিওর,' বলে বোটে নেমে গেল ও। পেইণ্টার বেঁধে ভেসে পড়ল। দোল খেতে খেতে পিছিয়ে যেতে শুরু করল আউটবোর্ড। মুখ তুলে তাকাল। সামনের অন্ধকারে টেমপেস্টের স্টার্ন ধীর গতিতে উঠছে আর নামছে।

আউটবোর্ডের রাবারের গায়ে পানির চাপড়ের মৃদু 'ছলাৎ, ছল! ছলাৎ, ছল!' ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। টেমপেস্টের রাডার থেকে থেকে গরগরা করছে। পিছিয়ে যেতে লাগল রানার আউটবোর্ড। টান্ টান্ হলো পেইণ্টার।

চোদ্দ

তীরের দিক থেকে কোনওরকম আওয়াজ আসছে না। আসার কথাও নয় অবশ্য। কারণ তীর অনেক দূরে। ওদের শ্রবণ ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমারও ওপারে। যখন কাছে আসবে, তখন শব্দ করার মত কেউ থাকবে না। কারণ গোটা শহর তখন থাকবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

তবে রাতেরবেলা সামান্যতম শব্দও যে পানির ওপর দিয়ে অবিশ্বাস্য দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, সে-জ্ঞান রানার আছে। একটুখানি 'খুক্' কাশি বা গলা খাকারির আওয়াজ বাতাসেরও আগে মাইলের পর মাইল সফর করতে পারে পানির ওপর দিয়ে। তাই আজকের রাতের জন্য সিগারেট পান বা কোনও ধরনের আওয়াজ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

হাতঘড়িতে চোখ বোলাল রানা। নয়টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। অপেক্ষা করতে লাগল ও।

নয়টা। টেমপেস্টের হাল চাপা ঢেকুর তোলার মত শব্দ করে উঠল। নীরবে আলোড়িত হতে শুরু করল স্টার্নের পানি। বড় বড় বুদ্বুদ আর ফসফরাসের প্রলেপ মাখা সাদা, লম্বা রেখা জাগল পানিতে। ঢেউ এসে রানার অ্যাসল্ট ক্রাফটের ভোঁতা নাকে মৃদু চাপড় মারতে লাগল।

অবশেষে নড়ে উঠল টেমপেস্ট। তীরের দিকে রওনা হয়ে গেছে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আটাশ নটিকাল মাইল অতিক্রম করতে হবে ওটাকে। বোটের পাশে ঝুঁকে বসে পানিতে হাত ডুবিয়ে দিল রানা, গতির টান বোঝার চেষ্টা করছে।

আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। তবে তার মধ্যেও এখানে ওখানে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা আছে, সেখান দিয়ে নক্ষত্রের আবছা আলো আসছে নীচে। সে আলোয়, কষ্ট করে হলেও, মোটামুটি দেখা যায় চারদিক। ফুট বিশেক লম্বা দড়ির শেষ মাথায় বাঁধা মিশ্রি খানের বোটটা আবছামত দেখতে পেল রানা। তারও পিছনে রয়েছে আতাসীর প্রথম বোট। দেখা যাচ্ছে না ওটাকে।

বাতাসের গরম আঁচ লাগছে গায়ে। মনে হচ্ছে ওরা কোনও পুরনো গ্রিনহাউসের মধ্যে রয়েছে বুঝি।

কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সময় যেন থমকে গেছে। বিশ্বচরাচর অচল। ভিনগ্রহের কোনও সাগরে রয়েছে যেন ওরা।

কেবল টেমপেস্ট সচল। অন্ধকারে ভূতের মত, প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের পানে। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে তিনটে রাবারাইজড্ মৃত্যুদূতকে।

পাঁচ ঘণ্টা কাটতে পাঁচটা যুগ লেগে গেল যেন। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত কাটল সময়টা। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা আর কোনও শব্দ শোনা যায় কি না,

সেই অপেক্ষায় কান পেতে থাকা ছাড়া কারও কিছু করার ছিল না। নিকষ অন্ধকার ছাড়া দেখার কিছু নেই। টেমপেস্টের জং ধরা খোলের ভিতর পুরনো পিস্টনের ধুক পুক ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। কেউ যে ঘুমিয়ে সময় পার করবে, এই অবস্থায় সে প্রশ্নই ওঠে না। উল্টে প্রতি মিনিটে টেনশন একটু একটু করে বেড়েছে সবার।

তারপরও এক সময় প্রতীক্ষার পালা শেষ হলো। রানার ঘড়িতে তখন দু'টো বেজে পাঁচ মিনিট। টেমপেস্টের ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেল। গতি কমতে কমতে একেবারে থেমে দাঁড়াল ওটা। আফটার ডেকের রেইলিঙের ওপাশ থেকে চাপা 'হিশ্‌শ্‌!' শব্দ করল ক্যাপ্টেন ওয়ালডেনবার্গ। জানান দিল, সময় হয়েছে।

একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। এত আস্তে যে রানার মনে হলো ভুল শুনেছে ও। না, ভুল শোনেনি। ওটা আতাসীর অ্যাসল্ট ক্রাফট। ক্যাপ্টেন শিস বাজানোর তিন মিনিটের মধ্যে নিজের পথে রওনা হয়ে গেল সে। কেউ কিছু দেখতে পেল না, কেবল মৌমাছির গুঞ্জনের মত চাপা এক ধরনের আওয়াজ শুনতে পেল। এক সময় সেটাও নেই হয়ে গেল। চলে গেছে বেদুঈন।

দ্বিতীয় অ্যাসল্ট ক্রাফটের হেলমে নড়েচড়ে বসল মিশ্রি খান। ডান হাতে ধরা টুইস্ট-গ্রিপের পাওয়ার সেটিং পরীক্ষা করে দেখল। কম্পাসের রিডিঙের দিকে তীক্ষ্ণ নজর। চার থেকে সাড়ে চার মাইল পথ কোনাকুনি পাড়ি দিতে হবে, জানা আছে তার। ক্লারেন্সের হারবার ঘিরে রেখেছে যে দুই স্ট্যাগ গুবরের শিং, তার উত্তরেরটায় অবতরণ করবে ওরা। বাইরের দিকে।

যে পাওয়ার সেটিং আছে, তাতে ওই কোর্সে তীরের কাছে পৌঁছতে ত্রিশ মিনিটের মত লাগবে আতাসীর। পঁচিশ মিনিটের সময় ইঞ্জিন বন্ধ করে বাকি পথ চোখের দেখার ওপর নির্ভর করে এগোতে হবে তাকে। তারপর ফ্লেয়ার-রকেট আর মর্টার ইত্যাদি সেট করতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। কাজেই ঠিক করা আছে, পরের দুই বোট এক ঘণ্টা পরে আসবে। সে পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট আতাসী এবং তার দুই আফ্রিকান সঙ্গীই হবে জাংগারোর মাটিতে পা রাখা কমাণ্ডোদের প্রথম গ্রুপ।

টেমপেস্ট ছেড়ে আসার বাইশ মিনিট পর সামনের গলুই থেকে চাপা 'হিশশ!' শব্দ ভেসে আসতে শুনল বেদুঈন। গুফরান। তীর চোখে পড়ায় সতর্ক করছে। কম্পাস থেকে চট্ করে চোখ তুলল আতাসী, তাড়াতাড়ি থ্রটল টেনে কাছে নিয়ে এল অন্ধকারের মধ্যে আরেকটা গাঢ় অন্ধকার রেখা চোখে পড়তে । তিনশ' গজের মধ্যে এসে পড়েছে তীর।

মেঘের চাদরের ফুটো দিয়ে আসা তারার আবছা আলোয় চোখমুখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকল আতাসী। আর দু'শো গজ আছে। সামনে গরান বন। গাছের গোড়ায় পানির আছড়ে পড়ার 'ছলাৎ ছলাৎ!' শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডানদিকে তাকাল সে। দৃষ্টিসীমার প্রায় শেষ মাথায়, সাগর ও রাতের আকাশ যেখানে অস্পষ্ট দিগন্তে মিশেছে, সেখানে সরু একটা রেখা দেখা গেল।

ওখানটা ফাঁকা। কিছু নেই। পেনিনসুলার উত্তর তীরে পৌঁছে গেছে আতাসী। তিন মাইলের মধ্যে। কিন্তু এদিকে নয়। ক্লারেন্স পেনিনসুলার দক্ষিণ

তীরে যেতে হবে তাকে।

বোট ঘুরিয়ে ফেলল আতাসী, সাগরের দিকে ফিরে চলল। থ্রটল একেবারে লো করে রাখায় আওয়াজ বলতে গেলে নেই। তটরেখা যাতে দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে না যায়, সেদিকে লক্ষ রেখে আধ মাইল এগোল ও। তারপর ক্লারেন্স শহর তীরের যে অংশ, সেই অংশে পৌঁছে নাক ঘুরিয়ে পিঁপড়ের গতিতে ইনশোরের দিকে চলল।

টেমপেস্ট ছেড়ে আসার ঠিক আটত্রিশ মিনিট পর ইঞ্জিন অফ করল আতাসী। আপনা থেকেই ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল অ্যাসল্ট ক্রাফট। একটু পর গ্রাভেলের ওপর বোটের ফেব্রিক চাপা মুড়মুড় আওয়াজ তুলে থামল।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেফটেন্যান্ট। জিনিসপত্রের স্তূপ সাবধানে এড়িয়ে সামনের গলুইয়ে এসে দাঁড়াল। হালকা এক লাফ দিয়ে মাটিতে পা রাখল নিঃশব্দে। পেইন্টার মুঠোয় ধরে রাখল যাতে বোট ভেসে না যায়।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট যে যার জায়গায় স্থির হয়ে থাকল আতাসী, আহমাদ ও গুফরান। কান খাড়া করে রাখল সামনের গ্রাভেলের উঁচু টিলা আর লম্বা লম্বা ঘাস-পাতার আড়ালে থাকা ক্লারেন্স থেকে কোনওরকম সন্দেহজনক শব্দ আসে কি না, শোনার জন্য। নেই সেরকম কিছু। সবার অজান্তেই জায়গামত এসে পৌঁছতে পেরেছে ওরা।

নিশ্চিন্ত হয়ে কোমরের বেল্ট থেকে একটা মারলিন স্পাইক বের করল আতাসী। ওটাকে তীরের মাটিতে পুঁতে পেইন্টার বাঁধল ওটার সঙ্গে। তারপর কোমরের ওপরের অংশ ঝুঁকিয়ে হালকা পায়ে সামনের টিলাটার দিকে ছুটল। সি লেভেল থেকে বড়জোর পনেরো ফুট উঁচুতে ওটার চূড়া। ওপরে উঠে উঁকি দিল আতাসী। গভীর ঘুমে মগ্ন ক্লারেন্স।

ওর ডানদিকে, দশ গজ দূরে গুবরের শিং। কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। সোজা সামনে পানি। আয়নার মত নিশ্চল, টলটলে। ক্লারেন্স হারবার ওটা।

মিনিট পাঁচেক পর বোটের কাছে ফিরে এল লেফটেন্যান্ট। ফিসফিস করে কথা বলল দুই সঙ্গীর সাথে। তারপর সবাই মিলে কাজে হাত লাগাল। ব্যস্ত হাতে, তবে নিঃশব্দে জিনিসপত্র তীরে নামিয়ে রাখতে লাগল। গুফরান ও আহমাদ একটা একটা করে বোট থেকে নামিয়ে রাখছে সবকিছু, আতাসী তুলে নিয়ে টিলার মাথায় সাজিয়ে রাখছে।

শব্দ এড়াতে প্রতিটা প্যাকিং স্যাক দিয়ে মুড়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু তার দরকার ছিল না। নরম মাটিতে কোনও শব্দই হলো না। অস্ত্র-শস্ত্র নামানো শেষ হতে আতাসী সেগুলো সেট-আপ করতে লেগে পড়ল। দ্রুত, নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে সে।

ব্রিফিঙের সময় রানা বলেছে, এই শিঙের মাথায় দাঁড়ালে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলা দেখা যায়। যদিও এখন অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না। তবে তাতে কোনও অসুবিধে হবে না। প্রথম ফ্লেয়ার যখন আকাশে ছোঁড়া হবে,

তখন সবকিছু দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পাবে সবাই।

রানার হিসেব অনুযায়ী আতাসী এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে প্রাসাদের সামনের উঠানের দূরত্ব হবে ৭২১ মিটার। কাজেই কম্পাসের সাহায্যে প্যালেসের দূরত্ব সতর্কতার সঙ্গে হিসেব করল ও। মেইন মর্টারের এলিভেশন এমনভাবে সেট করল যাতে প্রথম রেঞ্জ-ফাইণ্ডিং বোমাটা উঠানের যথাসম্ভব মাঝখানে গিয়েই পড়ে।

তবে এ ক্ষেত্রে অসুবিধা হলো, বোমা ঠিক কোথায় গিয়ে পড়ল দেখার উপায় থাকবে না। বোমার ঘায়ে ছিটকে ওঠা এটা-সেটা দেখা যাবে অবশ্য। সেটাও কম হবে না। প্রথম মর্টার সেট করে দ্বিতীয়টা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল লেফটেন্যান্ট আতাসী। এটার বেসপ্লেট বসাল প্রথমটার থেকে দশ গজ দূরে।

প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস থেকে আধ মাইল দূরে, জাংগারো নদীর ওপারের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর ব্যারাক লক্ষ্য করে সেট করা হলো দ্বিতীয়টা। টার্গেট, রেঞ্জ আর বেয়ারিং, কোনওটাই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এটার, জানে আতাসী। এটা বসানো হচ্ছে ব্যারাকের ওপর বোমা ফেলার জন্য। যাতে আর্মি-পুলিশ, সবার মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। হামলাকারীদের প্রতিরোধ করার চিন্তা বাদ দিয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালায় ওরা যে যেদিক পারে।

এটা সামাল দেবে গুফরান। তাকে মর্টার ছোড়ার ট্রেনিং কাগজে-কলমে দিয়েই রেখেছে ও। আজ হবে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের দিন। ডজনখানেক রকেট বের করে ওর সামনে সাজিয়ে রাখল বেদুঈন, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলল। শেষ মুহূর্তের নির্দেশ।

এরপর রকেট লঞ্চার দুটোর মাঝখানে দুটো ফ্লেয়ার লঞ্চিং রকেট সেট করল আতাসী। দুই লঞ্চারে দু'টো ফ্লেয়ার ভরে প্রস্তুত রাখল। এই ব্র্যাণ্ডের ফ্লেয়ার বিশ সেকেণ্ড করে জ্বলে, জানা আছে ওর। ফ্লেয়ার আকাশে বিস্ফোরিত হলে তার আলোয় মর্টার অপারেট করতে হবে ওকে। সে ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ সারার কোনও বিকল্প নেই। তাই গুফরানকে এরমধ্যে এক্সট্রা হ্যাণ্ড হিসেবে কাজ চালানোর মত ট্রেনিং দিয়ে নিয়েছে।

হাতের কাজ শেষ হতে ঘড়ি দেখল লেফটেন্যান্ট। তিনটে বাইশ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সঙ্গীদের নিয়ে হারবারের পথে রওনা হয়ে গেছে মাসুদ রানা। ওয়াকি-টকি বের করে ওটার ওয়াস্প অ্যান্টেনা পুরোপুরি তুলে দিল আতাসী। সুইচ অন করে নির্ধারিত ত্রিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সেট গরম হয়ে ওঠার জন্য। তারপর আর অফ করা হবে না ওটা।

ঘড়ির কাঁটা ত্রিশ সেকেণ্ড পেরিয়ে আসার পর সংকেত দিল লেফটেন্যান্ট। এক সেকেণ্ডের বিরতি দিয়ে পরপর তিনবার 'ব্লিপ' বাটন টিপল সে নিজের প্রস্তুত হওয়ার কথা জানান দিতে।

রানার অ্যাসল্ট ক্রাফট তখন তীর থেকে এক মাইল দূরে। ক্রমে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে। চোখ দুটোকে রেডার বানিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে রানা। ওর বাঁ পাশে, একটু দূরে রয়েছে মিশ্রি খানের ক্রাফট—ফরমেশন অর্ডারে। সমান তালে ছুটছে। যমদূতের মত লাগছে

দু'টোকে।

মিশ্রি খান প্রথম শুনতে পেল আতাসীর সংকেত। তার হাঁটুর কাছ স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে রাখা ওয়াকি-টকি 'বয্য্!, বয্য্!' করে তিনবার চাপা শব্দ করল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রাফটের নাক সামান্য ঘুরিয়ে রানার বোটের পাশে চলে এল মিশ্রি। ফরমেশনে পরিবর্তন ঘটেছে টের পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা।

হাত তুলে তীর নির্দেশ করল পাঞ্জাবি, তারপর ওপরের পাটির দাঁতের সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে বিশেষ একটা শব্দ করেই আগের অবস্থানে সরে গেল ক্রাফট ঘুরিয়ে। আবার আগের মত দুই মিটার ফাঁক থাকল ও দু'টোর মাঝখানে।

অর্থটা বুঝল রানা। ওর সমস্ত অশুভ ভাবনা মিথ্যে প্রমাণ হয়েছে বুঝতে পেরে বুকের বোঝা অনেক হালকা হয়ে গেল। আতাসী সংকেত দিয়েছে তীর থেকে। হাতের কাজ শেষ করে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে লেফটেন্যান্ট। তীরের দিকে তাকাতে বেদুঈনের টর্চের চকিত ঝলক দেখল রানা। হুড পরানো, কলমের ডগার মত সরু একটা আলো।

রানা আর মিশ্রি খান, দু'জনেই দেখেছে আলোটা। দু'জনেই লক্ষ করেছে একটু বেশি ডানদিক ঘেঁষে জ্বলেছে। তার মানে ওরা বেশ অনেকটা উত্তরদিক ঘেঁষে এগোচ্ছে। স্টারবোর্ডের দিকে ক্রাফট ঘুরিয়ে দিল ওরা একযোগে। কোর্স সংশোধন করে নিল। আলোটা যেখানে জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল, সেখান থেকে একশ মিটার দক্ষিণে গিয়ে তীরে ওঠার ইচ্ছে রানার। হারবারের প্রবেশ পথটা ওখানেই।

ওদের ওয়াকি-টকি একযোগে আতাসীর সংকেতের জবাব দিতে আরেকবার আলো জ্বালল সে। ক্রাফট দু'টো তখন তীর থেকে তিনশ মিটার দূরে। আলোর অবস্থান দেখে আরও একবার কোর্স ঠিক করে নিল ওরা।

দু' মিনিট পর শব্দ চাপা দেয়ার জন্য গতি একেবারে কমিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে এল ও দু'টো। আতাসীর কাছ থেকে পঞ্চাশ মিটার দূর দিয়ে হারবারের খোলা মুখের দিকে চলল। ওদের তৈরি ঢেউ দেখতে পেল আতাসী। একজস্টের বুদ্বুদ দেখতে পেল। একটু পর কাঁচের মত মসৃণ, নিথর পানি কেটে হারবারে ঢুকে পড়ল ও দু'টো। অন্য মাথার ওয়্যারহাউসের দিকে চলল।

অল্প আলোকিত আকাশের পটভূমিতে বিশাল ওয়্যারহাউসটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। বোট যত এগোচ্ছে, তত বড় হচ্ছে ওটা। কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিশিপতঙ্গ বাহিনীর কোরাস চলছে যথারীতি। তবে সেটাও কম মনে হলো ওর। তীরে ভিড়ল ওরা। স্থানীয় জেলেরা যে পাশে তাদের নৌকা উল্টো করে রেখেছে, মাছ ধরার জাল শুকোতে দিয়েছে; তার বিপরীত পাশে; হারবারের ভেতরের ঢালে।

দু'টোর ইঞ্জিন একই সঙ্গে নীরব হয়ে গেল। আরোহীরা প্রত্যেকে অনড় বসে থাকল কয়েক মিনিট। চোখ ঘুরছে ডানে-বাঁয়ে। কোনও নড়াচড়া চোখে পড়ে কি না, বা কোনও হাঁক-ডাক ওঠে কি না, সেই আশঙ্কায় প্রতিটি পেশি টান টান। উল্টে রাখা নৌকাগুলোকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে।

ওগুলো আসলেই নৌকা না তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত অ্যামবুশ

পার্টি, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছে। না, শঙ্কার কিছু নেই। ক্রাফট থেকে নেমে এল রানা ও মিশ্রি খান। মাটিতে মারলিন স্পাইক গেঁথে যে-যার বোট মজবুত করে বাঁধল পেইণ্টার দিয়ে।

তারপর চাপা কণ্ঠে বলল রানা, 'গেট রেডি!' ত্রিশ সেকেণ্ড পর এল দ্বিতীয় নির্দেশ, 'কামন, লেট'স গো!'

ঢাল বেয়ে সতর্ক পায়ে ওপরে উঠে এল ও। সামনে ঝুঁকে আছে। হাতের স্মাইজার নাইন এমএম কারবাইন যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রস্তুত। বাকি সবাই একই ভঙ্গিতে অনুসরণ করে চলল ওকে।

একটু পর দলটাকে ওপরের সমতল ভূমিতে নিয়ে এল রানা। সামনেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে প্রেসিডেণ্ট কিমবার ঘুমন্ত প্যালেস। ভূতের বাড়ির মত। সারা প্যালেসে অল্প কয়েকটা আলো জ্বলছে। তা-ও টিমটিমে।

পনেরো

কুঁজো হয়ে নিঃশব্দে, চিতার মত ক্ষিপ্র পায়ে ছুটল ওরা নয়জন। এক সারিতে। রানা সবার আগে। কংক্রিটের উঁচু চাতালে উঠে এসে চারদিকে সতর্ক নজর বোলাল ও। ওয়্যারহাউসটাকে পাশ কাটিয়ে পিছনে চলে এল। এখান থেকে আকাশের গায়ে প্রায় পুরোটা প্রাসাদের কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়। মাত্র কয়েকশ' গজ দূরে। ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে তিনটে।

সামনে একটা ইঁট বিছানো রাস্তা। ইংরেজি 'টি'-এর মত। খানিকটা ঢালু হয়ে প্রাসাদের দিকে চলে গেছে ওটার এক মাথা। আরেক মাথা গেছে শহরের দিকে, সর্বশেষ মাথাটা গেছে এ শহরের একমাত্র মানসম্মত হোটেল, ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দিকে। হালকা যানবাহন চলাচলের উপযোগী নতুন রাস্তা।

আমদানী করা জিনিসপত্র ওয়্যারহাউস থেকে গাড়িতে করে সরাসরি প্রাসাদে নেয়া হয় এ-পথে। নইলে ওয়্যারহাউসের এই দরজা আর রাস্তা, কোনওটারই থাকার কোনও যুক্তি নেই। কারণ ওয়্যারহাউসের সামনে একটা রাস্তা আগে থেকেই আছে। একটু ঘুর পথে প্রাসাদের দিকে গেছে ওটা।

প্রাসাদের দু'শ গজ আগে ক্রস রোডে পড়বে ওরা। অভিজ্ঞতা থেকে রানা জানে, ওখানে অন্তত দু'জন প্যালেস গার্ড থাকবে। থাকার কথা। দু'টোকে নীরবে হজম করা যাবে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কায়া ব্রিগেডের স্মার্ট জওয়ান ওরা। কালাশনিকভ একে ফোর্টি সেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল নিয়ে প্যালেস গার্ড দেয়।

তার সঙ্গে আছে আরও বড় মাথাব্যথা, রাশান কণ্টিনজেণ্ট। ওরা কঠিন বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে। যদি সুযোগ পায়। তবে ভরসা আছে রানার। একেবারে অচিন্তনীয়, আকস্মিক আক্রমণের বিস্ময় লোকগুলো ঠিকমত কাটিয়ে উঠতে পারার আগেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় হয়ে যাবে ওদের।

দম বন্ধ করে আতাসীর সিগনালের অপেক্ষায় থাকল মাসুদ রানা। পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে, আতাসীর প্রথম রকেটই হবে ওদের জন্য হামলা চালানোর সংকেত। বলা আছে, ওটা শুরু হয়ে গেলে সবাইকে বুকে হেঁটে বাকি পথ এগোতে হবে। নইলে সেমসাইড হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

ওদিকে আতাসীও সেই অপেক্ষায় আছে। ফ্লেয়ার রকেট লঞ্চারের কাছে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমটা ছুড়তে প্রস্তুত। অন্য হাতে রয়েছে প্রথম মর্টার বোমা।

রানা আর মিশ্রি খান বাকি সাতজন কমাণ্ডোর চেয়ে খানিকটা এগিয়ে আছে। গরম ও চাপা উত্তেজনায় ঘামছে ওরা দরদর করে। গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে টিউনিক। মুখে লাগানো গাঢ় কালচে রঙের ডাই ঘামের সঙ্গে গলে গলে পড়তে শুরু করেছে।

আর কয়েক পা গেলেই তিন রাস্তার জাংশন। মাথার ওপরের মেঘের চাদরটা আরও খানিকটা বিস্তৃত হয়েছে। তারার আলোর পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েছে। চাঁদ এখন পর্যন্ত না উঠলেও প্যালেসের সামনের খোলা জায়গাটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। একশ' গজ দূর থেকে আকাশের গায়ে ওটার ছাদের রেখা আলাদা করতে পারছে রানা।

কিন্তু কপালে দুর্ভাগ্য লেখা থাকলে যা হয়, তাই হলো। একেবারে 'মালি'র ঘাড়ে পা দিয়ে ফেলল ও। মাটিতে আসন গেড়ে বসে ঘুমাচ্ছিল লোকটা। কায়া গার্ড। কালাশনিকভ কোলের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা। বিনা নোটিশে তার পিঠের ওপর গিয়ে পড়ল ও। আঁতকে উঠে ব্রেক কষল। চোখের পলকে বাঁ হাতে বেরিয়ে এসেছে কমাণ্ডো নাইফ।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল লোকটা। আচমকা ঘুম ভাঙা চোখে মাথার ওপর আধিভৌতিক একটা ছায়া দেখে ভয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় তার। কলজের পানি বরফ হয়ে গেছে। একটা ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে কালাশনিকভ তোলার চেষ্টা করল সে।

কিন্তু বুকের বাঁ দিকে পিনের খোঁচা খাওয়ার মত একটা অনুভূতির সঙ্গে হাত দুটো ঝপ্ করে ঝুলে পড়ল দু' পাশে। সে নিজেও ঝপ্ করে বসে পড়ল। ওদিকে কয়েক গজ দূরের লম্বা ঘাসের আড়ালে ছিল তার সঙ্গী, সে-ও হঠাৎ করেই উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

মিশ্রি খান এক লাফে পৌঁছে গেল লোকটার ঘাড়ের ওপর। কমাণ্ডো ছুরির এক ঝটকায় তার ক্যারোটিড আর্টারি থেকে জুগুলার ভেইন পর্যন্ত দু' ফাঁক করে দিল। চিত হয়ে পড়ে জবাই হওয়া খাসির মত হাত-পা ছুড়তে লাগল লোকটা। গলা দিয়ে মৃদু ঘড় ঘড় শব্দ বের হচ্ছে।

কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে ততক্ষণে। ওদের একশ' গজ সামনে, প্রাসাদের মেইন গেটের কাছ থেকে আরেকটা চিৎকার উঠল, সঙ্গে রাইফেলের বোল্ট টানার শব্দ। কিছু দেখেনি লোকটা। শব্দ শুনতে পেয়ে সন্দেহের ওপরে করছে যা করার। একটা সিঙ্গেল শটের শব্দে চমকে উঠল গোটা এলাকা।

এমন সময় রানার পিছনে, দূরে 'হু-উ-শ্‌শ্‌!' করে একটা শব্দ হলো। তার সঙ্গে বাঁশির মত একটা কান ফাটানো, তীক্ষ্ণ আওয়াজ দ্রুত ওপরে উঠে গেল। দুই সেকেণ্ড পর 'ফটাস্‌!' জাতীয় একটা শব্দের সঙ্গে তীব্র, চোখ ধাঁধানো নীলচে-সাদা আলোয় চারদিক ভেসে গেল।

প্রথমেই রানার চোখ গেল প্যালেসের দিকে। মেইন গেটের সামনে দু'টো মানুষের আকৃতি দেখতে পেল ও, হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। ডানে-বাঁয়ে থাকা ওর সঙ্গীরা ফ্যান আউট করছে, টের পেল রানা। ছড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণে শুয়ে পড়ল সবাই। ক্রল করে যতটা পারা যায় দ্রুত এগোতে লাগল প্যালেসের দিকে।

ওদিকে প্রথম ফ্লেয়ারের ল্যানিয়ার্ড বিচ্ছিন্ন করেই লঞ্চারের কাছ থেকে সরে এল লেফটেন্যান্ট আতাসী, প্রথম মর্টারটা ভরে দিল টিউবে। প্রচণ্ড ঝাঁকির সঙ্গে বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে আকাশে উঠে গেল সেটা, অর্ধ বৃত্তাকার গতিপথ ধরে লক্ষ্যের দিকে ছুটল। প্রথমে ফুটল ফ্লেয়ার, তার একটু পর মর্টার বোমা। ওটা কোথায় পড়ে দেখে নিয়ে দ্বিতীয় বোমা ছুঁড়ল আতাসী।

প্রথম চারটে বোমা সাইটিং শট হিসেবে ছুঁড়ল সে। সত্যিকারের আক্রমণ চালানোর আগে কোন্‌টা কোথায় পড়ছে বুঝে নেয়ার জন্য। পনেরো সেকেণ্ড পরপর লক্ষ্যে আঘাত হানল ওগুলো। গুফরানের হাত চলছে মেশিনের মত। খুব দ্রুত। প্রতি দুই সেকেণ্ড অন্তর একটা করে বোমা ছুঁড়তে পারছে আতাসী।

ওর প্রথম সাইটিং বোমাটা গিয়ে পড়ল প্যালেসের ছাদের ডান কার্নিশে। জায়গাটা বেশি উঁচুতে হয়ে গেল বলে ফলাফল দেখার সুযোগ হলো না। তবে ভেতরে ঢুকতে পারেনি ওটা। বেশ কিছু টাইলস গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ঝুঁকে ডিরেকশনাল এইমিং মেকানিজমের ট্র্যাভার্স নব সামান্য বাঁ দিকে ঘুরিয়ে অ্যাডজাস্ট করল আতাসী।

ফ্লেয়ার নিভে যাওয়ামাত্র ওর দ্বিতীয় বোমা আকাশে উঠল। পরক্ষণে এক লাফে পাশের রকেট-লঞ্চারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ফায়ারিং ল্যানিয়ার্ড ছিঁড়ে ফেলল হ্যাঁচকা টানে। 'হুশশ!' করে উঠে গেল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে আরও একজোড়া বোমা লঞ্চারে ভরে ফেলল আতাসী।

দ্বিতীয় ফ্লেয়ার ফুটল ঠিক প্যালেসের মাথার ওপর। তার চার সেকেণ্ড পর ল্যাণ্ড করল দ্বিতীয় বোমা। প্রায় জায়গামতই গেছে ওটা, তবে পড়ল খানিকটা এগিয়ে। মেইন গেটের ওপর।

দরদর করে ঘামছে লেফটেন্যান্ট আতাসী। হাতও পুরো ঘেমে গেছে, ফলে গ্রাব-স্ক্রু বারবার পিছলে যাচ্ছে আঙুলের মধ্যে। ওরই মধ্যে এলিভেশন-অ্যাঙ্গেল চুল পরিমাণ নিচু করল ও কোনওমতে। আরও খানিকটা বেশি দূরত্ব কভার করতে পারবে বলে লঞ্চারের নাকটা মাটির দিকে সামান্য নুইয়ে দিল।

মর্টারের বেলায় আর্টিলারির বিপরীত প্রিন্সিপল অনুসরণ করতে হয়। কামানের বেলায় বাড়তি রেঞ্জের সুবিধা পেতে হলে নল উঁচু করে গোলা ছুঁড়তে হয়। মর্টারের ক্ষেত্রে করতে হয় উল্টোটা। লঞ্চারের টিউব নিচু করে দিতে হয়।

ফ্লেয়ার নিভে যাওয়ার আগেই আতাসীর তৃতীয় মর্টার উড়াল দিল। তৃতীয়

ফ্লেয়ার ছোঁড়ার জন্য হাতে পুরো পনেরো সেকেণ্ড সময় আছে, কাজেই সুযোগটা অন্য কাজে লাগাল বেদুঈন। লঞ্চার ছেড়ে কয়েক লাফে একটু দূরে গিয়ে প্রথম ফগহর্ন অ্যাকটিভেট করল সে, এবং সময়মত আগের জায়গায় ফিরে তৃতীয় মর্টার বিস্ফোরণের ফলাফল দেখল।

ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে পিছনের উঠানে পড়ল ওটা। মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্য মর্টারের লেজের লাল আগুনের জিভটা দেখতে পেল আতাসী, তারপর নেই হয়ে গেল। ওটা কোনও বিষয় নয়। কারণ আতাসী এখন নিশ্চিতভাবে জানে, এতক্ষণে প্রার্থিত সঠিক রেঞ্জ ডিরেকশন পাওয়া গেছে। পরের বোমাগুলো আর আগে-পিছে পড়বে না। প্যালেসের সামনে অপেক্ষারত তার নিজের লোকদের বিপদে পড়ার ভয়ও আর থাকবে না।

ওদিকে রানা সঙ্গীদের নিয়ে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে আছে আতাসীর রেঞ্জিং শটের হাত থেকে বাঁচতে। বেদুঈনের প্যালেসের পিছনের গার্ড ব্যারাকের ওপর হার্ডওয়্যার বর্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা তোলায় ঝুঁকি আছে। তবু কর্তব্যের খাতিরে তৃতীয় মর্টার বিস্ফোরিত হওয়ার পর ঝুঁকিটা নিল রানা। পরের মর্টার ছুঁড়তে পনেরো সেকেণ্ড সময় নেবে আতাসী, সেই ভরসায়।

তৃতীয় ম্যাগনিশিয়াম ফ্লেয়ারের কড়া ফসফরেসেন্ট আলোয় প্যালেসের ওপর চোখ বোলাল রানা। দোতলায় প্রায় একযোগে দু'টো আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল। সেই সঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার। সারা প্যালেসে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে চিৎকারগুলো। কয়েকটা মোটা গলার কড়া ধমক শোনা গেল।

আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে হয়তো ভীত-সন্ত্রস্ত গার্ডদের। তারপর আর কোনও চিৎকার শোনা গেল না। একের পর এক বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজের তলায় চাপা পড়ে গেল সব।

পাঁচ সেকেণ্ডও পুরো হয়নি, তার সঙ্গে যোগ হলো আতাসীর ফগহর্নের দুনিয়া কাঁপানো হুঙ্কার, 'ভঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ-অঁ!'

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল গায়ে কাঁটা দেয়া সেই আওয়াজ, উপসাগরের বুক আর জাংগারোর উঁচু-নিচু মাটির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল। নরকের অভিশপ্ত শয়তানের দল একসঙ্গে জেগে উঠে নাকী সুরে বিলাপ শুরু করে দিয়েছে যেন! টানা, উন্মত্ত চিৎকারে মুহূর্তে ভরে উঠল ক্লারেন্সের আকাশ-বাতাস।

সূত্র জানা থাকার পরও রানা পর্যন্ত শিউরে উঠল। কায়া হোক বা রাশান প্যালেস গার্ডই হোক, জেগে উঠে যদিও বা একটু প্রতিরোধ গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা করছিল, এমন অভাবিত শব্দ-সন্ত্রাসে একেবারে কুঁকড়ে গেল তারা। হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো সবার।

সেই সঙ্গে একের পর এক বোমা ফাটতে লাগল প্যালেসের পিছনের উঠানে। পরেরবার রানা যখন মাথা তুলল, সামনেরদিকে নতুন কোনও ক্ষতি চোখে পড়ল না।

কথা ছিল একটা বোমা লক্ষ্যে আঘাত হানলেই রেঞ্জ ফাইণ্ডার রি-ফিক্স

করবে আতাসী। পরের বোমাগুলো সেখানে ফেলবে। তাই করছে এখন বেদুঈন। গ্যাস ক্যানিস্টার চালিত সত্তর সেকেণ্ড স্থায়ী ফগহর্নের করুণ বিলাপ ছাপিয়ে হারবারের মাথা থেকে 'ধাপ্ ধাপ্, ধাপ্ ধাপ্!' শব্দে মাটি কাঁপিয়ে বোমা ছুঁড়ে চলেছে তার জোড়া মর্টার টিউব। দু' সেকেণ্ড পর পর। ঠিক হার্টবিটের মত, শুনতে পাচ্ছে ওরা। নিয়মিত, ছন্দোবদ্ধ।

আতাসীর গুদামে মোট ষাটটা বোমা আছে। ওগুলো খরচ করতে প্রয়োজন হবে মোট একশ বিশ সেকেণ্ড। কথা আছে পঁচিশটা বোমা খরচ করার পর যদি কোনও কারণে দশ সেকেণ্ড বিরতি দেয় আতাসী, তা হলে ধরে নিতে হবে আর ছুঁড়বে না সে। রানা তার বাহিনী নিয়ে মুভ করবে তখন। নইলে ভয় থাকবে সেইমসাইড হয়ে যাওয়ার।

সেই বিরতির সময় রানা ওর বাহিনী নিয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারবে কিমবা-বধ পর্ব শেষ করতে। সে-সুযোগ এখনও আসেনি, তাই মাটি কামড়ে পড়ে আছে ওরা। আতাসীর উৎসব রকেটের মজুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামবে কি না, সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিল রানার মনে।

প্রথম গুলিটা হওয়ার পর যখন থেকে আতাসীর বোমা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ওরা নয়জন মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সামনে ছায়াছবির মত দৃশ্যাবলী দেখতে পাচ্ছে। এখন আর ফ্লেয়ার ছোঁড়ার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঠিক জায়গামত গিয়েই পড়ছে প্রতিটা বোমা। প্রতি দুই-তিন সেকেণ্ড পর পর প্যালেসের পিছনের ফ্ল্যাগস্টোন বসানো উঠান বিস্ফোরিত হচ্ছে। লাল আগুন লাফ দিয়ে উঠছে শূন্যে।

পাশে তাকিয়ে মিশ্রি খানকে দেখল রানা। সময় হয়েছে বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল। সঙ্গে সঙ্গে বাজুকা নিয়ে দল থেকে আলাদা হয়ে গেল সে। সঙ্গে গেল তার সহকারী আবরোজি, বাড়তি রকেট নিয়ে। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে প্যালেসের মেইন গেট বরাবর দু' পা ফাঁক করে দাঁড়াল মিশ্রি। লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়ল প্রথম রকেট।

বিশ ফুট লম্বা একটা আগুনের জিভ প্রচণ্ড গতিতে পাক খেল তার কাঁধে বসানো বাজুকার লেজের কাছে, পরমুহূর্তে আনারস সাইজের ওয়ারহেড মেইন গেট লক্ষ্য করে ছুটে গেল। দুই পাল্লার ভারী দরজাটার ওপরেরদিকে, একটু ডানদিক ঘেঁষে আছড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হলো ওটা। ওপরের অর্ধেক হাওয়া হয়ে গেল চোখের পলকে। দ্বিতীয় রকেটও মিস করল লক্ষ্য। ওপরের পাথরের ফ্রেম ওয়ার্কে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

তৃতীয়টা একদম জায়গামত গিয়ে পড়ল, ঠিক মাঝখানে। দুটো পাল্লারই ডানা গজাল যেন। বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে উঠেই সাঁ করে পিছিয়ে গেল। বিস্ফোরিত হলো শূন্যে। তবু থামার নাম নেই পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেনের, নিজের দু'টো স্টক শেষ করে সহকারীর বয়ে আনা আটটার মধ্যে চারটে শেষ করে তবে থামল। ততক্ষণে প্যালেসের বিভিন্ন অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

একপাশের দেয়ালের বড় একটা অংশ পুরোপুরি ধসে গেছে, পিছনের অনেকখানি জায়গা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। ওখানে কিছু একটায় আগুন ধরে

গেছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। রানার বুঝল ওটা গার্ড হাউস হবে। আগুনের মধ্যে থেকে হঠাৎ দু'টো মানুষের আকৃতি উদয় হলো। রাতের পোশাক পরা। সাদা চামড়ার মনে হলো লোকগুলোকে।

কারবাইন হাতে কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াল তারা। তারপর একেবারে কাছেই ল্যাণ্ড করা একটা মর্টারের আঘাতে চোখের সামনে হাড়-মাংসের দলায় পরিণত হলো। ওটা আতাসীর রকেট। মিশ্রি খান নীচতলা আর দোতলা লক্ষ্য করে আরও দু'টো মর্টার ছুড়ে ক্ষ্যান্ত দিল। বাজুকাটা মাথার ওপরে তুলে নীরবে ঝাঁকাতে লাগল। বিজয় ঘোষণা করছে।

ফগহর্নের বিলাপের তেজ কমে এল, তারপর আচমকা থেমে গেল। একই সঙ্গে আতাসীর রকেট বর্ষণের তোড়ও। মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনল মাসুদ রানা, তারপর চেঁচিয়ে অ্যাডভান্স করার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের। ও নিজে, মিশ্রি খান, মার্সিয়া ও ফায়জাসহ বাকিরা ছুটল সামনে ঝুঁকে, ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে প্যালেসের ভাঙা গেট লক্ষ্য করে।

বিশ গজমত এগিয়ে থামল রানা। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল পরবর্তী সংকেতের জন্য। কে কতগুলো বোমা ফেলেছে, সে হিসেব গুলিয়ে গেছে ওর। মনে নেই। তবে দীর্ঘ সময় ধরে বিরতিহীন বোমা বিস্ফোরণ আর ফগহর্নের চিৎকারের পর আকস্মিক এই নীরবতা অসহ্য লেগে উঠল। শব্দহীনতাই বরং বেশি করে কানে বাজতে লাগল।

তারচেয়েও বড় কথা, ওদের এতদিনের প্রস্তুতির পর এরকম একটা অপারেশন শেষ হতে দশ মিনিটও লাগল না, ভাবতেই কেমন অস্বাভাবিক লাগছে।

আতাসীর সঙ্গী গুফরানের কথা ভাবল মাসুদ রানা। লোকটা যদি তার সবগুলো রকেট আর্মি ব্যারাকে ঠিকমত পৌঁছে দিয়ে থাকতে পারে, এবং আর্মি-পুলিশ যদি ব্যারাক ছেড়ে দিগ্বিদিকে পালিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে ক্লারেন্সবাসীর মনের অবস্থা এখন কেমন হতে পারে?

মাথার ওপর পর পর দুটো ম্যাগনিশেয়াম ফ্লেয়ার বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ আর সাদা আলোর ঝলকানিতে বাস্তবে ফিরে এল রানা। কারবাইনটা বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ধরে দৌড় দিল বিশ গজ দূরের গেট লক্ষ্য করে। চাপা হুঙ্কার ছাড়ল, 'কামঅন!'

কয়েক পা গিয়ে স্মাইজারের নল ঘোরাল রানা। টানা ব্রাশ ফায়ার করতে করতে ছুটল। পাশে তাকায়নি ও, তবে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছে সঙ্গীরা ওর পাশেই ছুটছে। দলটা গেট পেরিয়ে প্রাসাদের আঙিনায় ঢুকে পড়ল ঝড়ের বেগে, তারপর খিলানের মুখে পৌঁছে ব্রেক কষল একযোগে। সামনের নারকীয় দৃশ্য যে কাউকেই থমকে দাঁড়াতে বাধ্য করবে।

প্রাসাদের নীচের খিলানটা বেশ উঁচু আর চওড়া। পিছনদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে বলে সামনের অংশ বিশাল একটা ফার্নেশের মুখের মত লাগছে ওদের। পিছনের উঠানে ভয়াবহ আগুন জ্বলছে। গায়ে কাঁটা দেয়া পড়-পড় শব্দ করছে আগুন।

বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে রানার মনে হলো, আতাসীর প্রথম সাইটিং শটের সময় কিমবার গার্ড বাহিনীর সদস্যরা সবাই ঘুমে অচেতন ছিল। এমনকী যে রাশান কন্টিনজেন্টের ভয় বেশি ছিল ওর মধ্যে, তারা পর্যন্ত। প্যালেস গার্ড দেয়ার প্রশ্নে কায়ারা তো নয়ই, ওদেরও তেমন মাথাব্যথা ছিল না।

কিমবার প্রাসাদের বাইরের নিরাপত্তা কত নিরাপদ, কতখানি নিশ্ছিদ্র করা যায়, এতদিন সবাই সেই প্রশ্ন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। মরণ যে দেয়াল টপকে এসে হানা দিতে পারে, এ ভাবনা হয়তো ভুলেও তাদের মাথায় কখনও আসেনি।

পিছনের কোর্টইয়ার্ডে প্রথম আঘাত হানে আতাসীর তৃতীয় সাইটিং মর্টার। বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে তখনই ব্যারাক থেকে বেরিয়ে পড়ে সৈন্যরা, তারপর বেদুঈনের একের পর এক মর্টারের ঘায়ে সেখানেই খতম হয়। একদিকের দেয়ালে একটা মই দেখল রানা। সেটার কয়েক ধাপে চারটে রোস্ট হওয়া দেহ ঝুলছে। একটা সুতোও নেই কারও পরনে। বীভৎস দৃশ্য। দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিল লোকগুলো।

বাকি সবাই মরেছে হয় মর্টারের সরাসরি আঘাতে, নয়তো হুড়োহুড়ির সময় স্টোন ফ্ল্যাগের ওপর আছড়ে পড়ে বিস্ফোরিত হওয়া মর্টারের ছিট্‌কে ওঠা শ্রাপনেলের আঘাতে।

স্তূপ হয়ে পড়ে আছে অসংখ্য দেহ। বেশিরভাগই মৃত। কিছু আছে আধমরা। আর আছে দুটো আর্মি ট্রাক, একটা মাইক্রোবাস, চারটে আর্মার্ড কার, পাঁচটা জিপ এবং একটা কালো রঙের প্রেসিডেনশিয়াল মার্সেডিজ কার। মার্সেডিজটা আলাদা একটা কাঠের ঘরে ছিল। বাকিগুলো পিছনের দেয়ালের সঙ্গে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোলার আঘাতে আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে সবগুলো। প্রতিটা গাড়ির সমস্ত টায়ার-টিউব পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। স্রেফ লোহা-লক্কড়ের স্তূপে পরিণত হয়েছে ওগুলো।

কয়েকজন প্রেসিডেনশিয়াল সার্ভেন্টের ওপর চোখ পড়ল ওদের। অবস্থান দেখে মনে হয় অতর্কিত হামলায় ঘুম ভাঙা দিশাহারার দল পালিয়ে যাবে বলে মেইন গেটের পিছনে জড় হয়েছিল এসে। এই সময় মিশ্রি খানের মর্টার সোজা দরজার ওপর এসে পড়ে এবং দরজার সঙ্গে তারাও উড়ে গেছে। খিলানের আণ্ডারকভার এরিয়ার সবখানে তাদের শরীরের ছিন্নভিন্ন অংশ, চুলসহ মাথার খুলির টুকরো ইত্যাদি সেঁটে আছে।

মূলটার ডান-বাঁয়ে আরও দু'টো খিলানপথ দেখল রানা। প্রথমটার মত প্রশস্ত নয়। দু'টোরই শেষ মাথায় ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি দেখা গেল। সেগুলোর ওপাশে, গ্রাউণ্ড লেভেলে কয়েকটা দরজা আছে। দু'দিকেই। দেখে মনে হয় ভেতর থেকে বন্ধ। সন্দেহজনক! ভাবল রানা।

রানার মনে হলো উপরের তলায় কাউকে পাওয়া যাবে না। যুক্তি অনুযায়ী অন্তত জীবিত কারও থাকার কথা নয়। কারণ মর্টার বৃষ্টি যখন শুরু হয়, তখন কয়েকটা গিয়ে উপরের ছাদে গিয়েই পড়েছিল। নিশ্চয়ই তখন প্রাণভয়ে নীচতলায় এসে আশ্রয় নিয়েছে উপরের লোকজন। কারণ নীচতলা বেশি সুরক্ষিত। এখন পর্যন্ত বলতে গেলে সম্পূর্ণ অক্ষতই আছে সেটা। ঝড়-ঝাপটা

যা লাগার ওপরতলাতেই লেগেছে।

তবু ফায়জা আর মার্সিয়াকে সাবধানে উপরতলায় চোখ বুলিয়ে আসার জন্য পাঠাল রানা। রাব্বি আর হারুণকে দিল ওদের সঙ্গে। পা টিপে টিপে এক সারিতে উপরে উঠে গেল ওরা। স্মাইজার কোমর সমান উচ্চতায় প্রস্তুত। আঙুল ট্রিগার গার্ডে। এরকম ক্ষেত্রে কিছু নড়লেই গুলি করতে হয়, জানা আছে টিভদের। কাজেই সে জন্য পুরোপুরি রেডি তারা। দম নিচ্ছে ঘন ঘন, কালো চেহারার মধ্যে সাদা চোখের মণি ঘুরছে।

এদিকে কিয়ামকে সিঁড়ি ও বন্ধ দরজাগুলোর উপর চোখ রাখতে বলে হাজিকে নিয়ে পিছনের উঠানে চোখ বোলাতে চলল রানা। কেননা ওর ইন্সটিংক্ট বলছে, দরজাগুলোর ওপাশে কী আছে তা পরে দেখতে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কারণ দরজাগুলো ওদের জন্য লোভনীয় ফাঁদ হতে পারে। ওরা দরজা খুলে উঁকি দিতে গেলে ভিতর থেকে বিপদ ঘটতে তো পারেই, পিছনের উঠান থেকেও আচমকা ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা কোনও চমক। ফাঁদে পা দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই রানার। তাই পা টিপে টিপে পিছনদিকে এগিয়ে চলল। হাজি একটু পিছনে থেকে অনুসরণ করছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এপাশের বন্ধ দরজাগুলো পেরিয়ে এল মাসুদ রানা। কোনও বিপদ ঘটল না। পিছনের শেষ মাথার দিকে চলল এক পা এক পা করে। উঠানের ঢোকার মুখে এসে দাঁড়াল, দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। বুকের দশ মনী বোঝাটা হালকা হয়ে গেল।

না, যা ভেবেছিল সেরকম কিছু নেই। কোনও চমক নেই। সামনেটা ভালমত দেখে নিয়ে খোলা উঠানে পা রাখতে যাচ্ছিল ও। হঠাৎ বাঁ দিক থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ শুনে ঝপ্ করে বসে পড়ল। দ্রুত ঘুরে তাকাল শব্দটার উৎসের দিকে। এক কায়া গার্ড। কারবাইন বাগিয়ে ছুটে আসছে।

রানাকে দেখামাত্র গুলি করা উচিত ছিল লোকটার। কিন্তু তা না করে রাইফেল বাগিয়ে মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করতে করতে ছুটে এল সে। হয়তো আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ভাবল রানা। হয়তো পালিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু তা জানতে গিয়ে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা।

কারবাইন তুলল গুলি করার জন্য। দরকার হলো না। ওর কয়েক হাত দূরে থাকতে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটা। হাজি গুলি করতে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ সময় নিজেই থেমে গেল তার অবস্থা দেখে। চিত হয়ে পড়ল লোকটা। কালো চেহারার মধ্যে উল্টে যাওয়া চোখের ধপধপে সাদা জমিনের কারণে বিকট লাগছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে মনে হলো। কিন্তু মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ছে বলে ঘড় ঘড় শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হলো না। চেহারা তীব্র ঘৃণায় বিকৃত।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। বুকে-পিঠে চারটে গুলি খেয়েছে মানুষটা, তারপরও বেঁচে ছিল। কতক্ষণ আগে গুলি খেয়েছে কে জানে! হয়তো আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জমে থাকা অন্তরের ঘৃণা প্রকাশের ঐকান্তিক ইচ্ছা

এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছিল তাকে। ভাবল রানা, কাজটা সম্পন্ন হতেই প্রাণটা বেরিয়ে গেছে।

পুরো কোর্টইয়ার্ডে রক্ত, ঘাম আর মৃত্যুর অসুস্থকর গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে ভাসছে বিষাক্ত করডাইটের তীব্র গন্ধ।

পিছনে চাপা পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা—যতটা না শুনল, তারচেয়ে বেশি অনুভব করল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ওপরে যাওয়ার বাঁদিকের সিঁড়ির কাছের একটা বন্ধ দরজা আস্তে খুলে গেল। এক লোক সন্তর্পণে পা রাখল বাইরে। মানুষটা বিশালদেহী। সাত ফুটের কম হবে না। নজর সামনে তার। খালি গা। হাতে রাইফেল। কোমরের কাছে আড়াআড়ি ধরে রেখেছে ওটাকে। আঙুল ট্রিগারে।

পিছনের সমস্ত চুল সর সর করে দাঁড়িয়ে গেল ওর। কিয়াম গুলি করছে না কেন এখনও? চিৎকার করে বোকা লোকটাকে সতর্ক করতে চাইল রানা, কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো খিলানপথে। একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। ওটা কিয়ামের গলা।

রানাও গুলি করেছিল পরক্ষণে, কিন্তু লাভ হলো না। একে দরজাটা এদিকে খোলে, তার উপর সিঁড়ির বাধা, লাগানো গেল না। ততক্ষণে পিছনে বিপদ আছে টের পেয়ে সামনের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে লোকটা। তাড়া করল রানা। ও খোলা জায়গায় আসতেই দৌড়ের উপর আচমকা ঘুরল লোকটা।

গুলি করল। রানাও গুলি করল, তবে আধ সেকেণ্ড দেরিতে। লোকটার গুলি ওর ডান গালে ছ্যাঁকা দিয়ে চলে গেল। পরক্ষণে শুয়ে পড়ে রানাকে পুরোপুরি ব্যর্থ করে দিল লোকটা। রানার সংক্ষিপ্ত বার্স্ট মিস হলো। পাঁচটা গুলি তার চুল ঘেঁষে চলে গেল। দ্রুত একটা গড়ান দিয়ে জায়গা থেকে সরে গেল সে। তারপর এক হাঁটুতে ভর দিয়ে আবার উঠে রাইফেল তুলল।

গুলি করল রানা। খট্ করে শূন্য চেম্বারে আঘাত করল হ্যামার। আঁতকে উঠল ও। গুলি নেই!

লম্বা এক লাফ দিয়ে কাছের পিলারের আড়ালে গা ঢাকা দিল রানা। তিন সেকেণ্ডের মধ্যে ম্যাগাজিন পাল্টে নিয়ে প্রস্তুত হলো। লম্বা দম নিয়ে সাবধানে উঁকি দিল আড়াল থেকে। ফাঁকা। নেই মানুষটা। হাওয়া হয়ে গেছে। পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল মাসুদ রানা। এতক্ষণে খেয়াল হলো লোকটা কায়া ছিল না। সাদা চামড়া ছিল! রাশান!

এক দৌড়ে কিয়ামের পাশে চলে এল রানা। হাজিও এল। কিন্তু কারও কিছু করার নেই তখন। লোকটার পড়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিল বেঁচে নেই সে। হঠাৎ কী খেয়াল হতে পিলে চমকে গেল রানার। লোকটা গেল কোনদিকে? সামনের দিকে না? প্যালেসের মেইন গেটের দিকে ছুটল ও। চিন্তাটা আরও আগেই কেন মাথায় আসেনি? দৌড়ে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল রানা। অজানা আশঙ্কায় চোখমুখ কুঁচকে আছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে রাশানটাকে এক ঝলক দেখতে পেল ও, বেরিয়ে যাচ্ছে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া মেইন গেট দিয়ে। রানাও ছুটল পিছন পিছন।

ওদিকে মিশ্রি খান ভেতরে আসার জন্য এগোচ্ছিল। মৃদু সুরে শিস বাজাচ্ছে। বাজুকাটা বুকের ওপর দু'হাতে ধরা। রকেট ফিট করা আছে টিউবের মাথায়।

বাইরে পা রেখেই তাকে ওই অবস্থায় দেখে চমকে উঠল রাশান, কিন্তু গতি কমাল না। দৌড়ের ওপর দিক বদলাল কেবল। দ্রুত দু'টো গুলি ছুঁড়ল মিশ্রিকে লক্ষ্য করে, তারপর ম্যাগাজিন খালি হয়ে যাওয়া অস্ত্র ফেলে বুক সমান ঘাস ঠেলে পালিয়ে যেতে লাগল। অস্ত্রটা লম্বা ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেল। একটা নাইন এমএম ম্যাকারভ।

আতাসীর ফ্লেয়ারের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে লোকটা।

দৃশ্যটা দেখে মূল ফটকে জমে গেল রানা। দু'টো গুলিই বুকে বিঁধেছে মিশ্রি খানের। পরের ঘটনা স্লো মোশন ছায়াছবির মত ঘটতে লাগল রানার চোখের সামনে।

গুলির আঘাতে পর পর দু'টো ঝাঁকি খেল মিশ্রি খান। পড়েই যাচ্ছিল, ঝুঁকে বাঁ হাত মাটিতে ঠেকিয়ে কোনওমতে সামাল দিল। বাজুকা ছাড়েনি সে হাত থেকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে আততায়ীর দিকে। নাগালের মধ্যে দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে লোকটা, তুমুল গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে। আর কয়েক পা যেতে পারলেই হারিয়ে যাবে অন্ধকারে।

হঠাৎ হুঁশ হলো ক্যাপ্টেনের। নড়ে উঠল। ঝাঁকি দিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেলল নিজেকে। তারপর যেন বিশ মনী ভার তুলছে, এমনভাবে দু' হাতে উঁচু করল বাজুকাটা। ধীরগতিতে, এক যুগ লাগিয়ে কাঁধে বসাল লঞ্চার। ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতে থাকা রাশানটার ঘাড় লক্ষ্য স্থির করতে কয়েক সেকেণ্ড বেশি সময় নিল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার।

একেবারে চোখের সামনে ইউগোস্লাভ আরপিজি-সেভেন ওয়ারহেডের বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখার সুযোগ সবার হয় না। মাসুদ রানার হলো। আর তিন-চার লাফ দিতে পারলেই বেঁচে যাবে রাশানটা, এমন সময় বোমাটা গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ের ঠিক মাঝখানে। পরক্ষণে ভোজবাজির মত চোখের সামনে থেকে সাত ফুটি বিশাল দেহটা আচমকা মুছে গেল। ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে আচমকা ইরেজার দিয়ে ঘষে মুছে ফেলা হলো যেন তাকে।

গোলা ছোঁড়ার আগ মুহূর্তে ঘুরে রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল মিশ্রি খান। তাই আগুনের লকলকে জিভের হাত থেকে বাঁচতে মাটিতে ডাইভ দিয়েছিল রানা। দৃশ্যটা দেখল মাটিতে শুয়েই, মিশ্রি খানের আট ফুট পিছন থেকে।

ট্রিগার টেনে দিয়ে আর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না জন্ম-যোদ্ধা। বিস্ফোরণের ফলাফল দেখল হয়তো, কিন্তু অন্তিম পর্দা পড়ে যাওয়া চোখের দেখা বলে দৃশ্যটা ওর অন্তর স্পর্শ করতে পারল না সম্ভবত। টিউব ছেড়ে দিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল সে, প্যালেসে ঢোকার মুখের শক্ত শানের ওপর।

এমন সময় আতাসীর শেষ ফ্লেয়ারটা ফাটল। আলো হয়ে উঠল সবকিছু। দৌড়ে গিয়ে মিশ্রি খানের মাথার কাছে বসল রানা। এক পলক দেখেই বুঝল,

চলে যাচ্ছে মানুষটা। ঘন ঘন দম নিচ্ছে। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ওকে চিনতে পেরে হাসির ভঙ্গি করল।

'ওস্তাদ! আমার... ' দম ফুরিয়ে গেল এইটুকুতেই। হাঁপাচ্ছে ভীষণভাবে। 'আমার... আমার... '

শেষ সময় এসে গেছে মিশ্রি খানের, বুঝতে অসুবিধে হয় না। অসহায় চোখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা। বুকের গহীনে বিদায়ের বাঁশি বাজছে। চোখের কোনা শিরশির করে উঠল।

'ওস্তাদ!' ফিসফিস করে ডাকল মিশ্রি খান।

গভীর মমতায় দীর্ঘকালের সহকর্মীর ঘামে ভিজে ওঠা কপালে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'কিছু বলবে, খান?'

'আমার... শাহিনাকে বলবেন... আমাকে যেন ক্ষমা করে। আমি পারলাম না... ওর... '

'শাহিনার চিকিৎসা হবে, ক্যাপ্টেন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'চিন্তা কোরো না। আমি ওর... '

আর কিছু বলতে পারল না রানা। দু'ফোঁটা পানি এসে ঝাপসা করে দিল ওর দৃষ্টি।

এই জন্যই মিশ্রি খানকে ডেকেছিল রানা। ওর ইচ্ছে ছিল, জাংগারো মিশনে অংশ নেয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে ওর হাতে শাহিনার চিকিৎসার যাবতীয় টাকা তুলে দেবে। কিন্তু নিয়তি যে রানার জন্য এতবড় একটা চমক তুলে রেখেছিল, কে জানত!

ঘড়ঘড় করে উঠল মিশ্রির বুকের মধ্যে। হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। 'সত্যি?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন, সত্যি। আমি ওর চিকিৎসা করাব। তোমার কাছে ওয়াদা করছি।'

'আল্লাহ্ তোমার...' রানার চোখে পানি দেখে থমকে গেল। তারপর ও। একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দিল, 'কাঁদে না, ওস্তাদ! আমরা সোলজার... আমাদের কাঁদতে নেই।'

ফ্লেয়ার নিভে গেল। কিন্তু অন্ধকার জেঁকে বসার সময় পেল না। যেন বীরের মৃত্যু-দৃশ্য আলোকিত করে রাখতেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল চাঁদ। বড়সড় গামলার মত গোল, বিশাল চাঁদ। তার কোমল, স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠল। মিশ্রি খানের চেহারাও হেসে উঠল যেন।

'দেখো, ওস্তাদ,' টেনে টেনে বলল সে। একভাবে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখটা হাসি হাসি। 'হামারা... মুলুক মে ভি আজ... ইতনা বড়া চাঁদ নিকলা হোগা... (আমার দেশেও আজ এত্ত বড় চাঁদ উঠেছে হয়তো...)'

কেশে উঠল মিশ্রি খান। কষা বেয়ে এক ঝলক তাজা রক্ত বেরিয়ে এল। 'উধার, শাহিনা... '

মাথা এক পাশে ঢলে পড়ল। স্থির হয়ে গেল দেহটা। তার একটা হাত ধরে বসে থাকল হতবুদ্ধি রানা।

ষোলো

শেষ ফ্লেয়ারটা ছোঁড়া হতে সোজা হয়ে দাঁড়াল আতাসী। মুখের, কপালের ঘাম মুছল। 'গুফরান!'

শুনতে পায়নি লোকটা, তাই গলা চড়িয়ে আবার ডাকল আতাসী। মাত্র দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না। কানের কাছে মর্টার ও ফগহর্নের ক্রমাগত হুঙ্কারে ওদের তিনজনেরই কানে তালা লেগে গেছে।

তৃতীয় ডাকে ঘুরে তাকাল লোকটা। আহমাদকে বাকি মর্টার, বোট ইত্যাদি সবকিছুর ওপর নজর রাখতে বলে গুফরানের দিকে ফিরল লেফটেন্যান্ট। 'এসো আমার সাথে।'

বালুকাবেলার মরে শুকিয়ে যাওয়া ঝোপঝাড়, ডালপালা ঠেলে মেইনল্যাণ্ডের দিকে ছুটতে শুরু করল। এদিকের কাজ শেষ, জানে আতাসী। কাজেই এখানে শুধু শুধু হাত গুটিয়ে বসে না থেকে ওদিকটাও দেখার ইচ্ছা হয়েছে। প্যালেস ঠাণ্ডা মেরে গেছে, ওদিকের ব্যারাকেরও কোনও সাড়া নেই। কাজ কতখানি হলো জানা দরকার।

দশ মিনিট দৌড়ে পেনিনসুলার শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা দু'জন। ঢাল বেয়ে কংক্রিটের উঁচু চাতালে উঠে আবার ছুটতে লাগল। তবে প্যালেসের দিকে না গিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরল আর্মি ব্যারাকে যাওয়ার জন্য। টেমপেস্টে ম্যাপ দেখে ওটার অবস্থান মুখস্থ করে নিয়েছিল আতাসী। খানিক দূর গিয়ে হেঁটে এগোল আধ পাকা, ছাল-চামড়া ওঠা রাস্তা দিয়ে।

পথের দু' পাশে থাকল দু'জন। কোনওরকম ঝামেলা দেখা দিলে সামাল দেয়ার জন্য স্মাইজার প্রস্তুত। অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ঝামেলার জন্য। রাস্তার প্রথম মোড়েই দেখা মিলল তার।

বিশ মিনিট আগে জাংগারো নদীর ওপারের ব্যারাক লক্ষ্য করে আতাসীর ছোঁড়া প্রথম মর্টারের ঘায়ে ব্যারাকের একটা অংশ উড়ে গিয়েছিল। ঘুমন্ত অধিবাসীরা ঠিকমত কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই আঘাত হানে দ্বিতীয় মর্টার। চরম হুলস্থূল পড়ে যায় সেখানে। আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আর্মি আর পুলিশের সদস্যরা।

যে যেখানে পেরেছে পালিয়ে গেছে। কিন্তু পরে তাদের মধ্য থেকে ডজনখানেক কায়া সৈন্য সাহস সঞ্চয় করে আবার একত্রিত হয়েছে রাস্তায়। অন্ধকার ঘর-বাড়ি ও পাম গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে তারা। ঘুম ভাংতেই দৌড়ে পালিয়ে এসেছে। পোশাক পরা দূরে থাক, অস্ত্রটা পর্যন্ত তুলে নেয়ার সময় পায়নি অন্ধকারে।

অর্ধ উলঙ্গ তারা। ঢোলা আণ্ডারপ্যান্ট ছাড়া পরনে কিছু নেই। দলের দু'জন কায়া গার্ডের ডিউটিতে ছিল। তারা ইউনিফর্ম পরে আছে। হাতে কারবাইন।

একজনের হাতে একটা গ্রেনেডও আছে। প্যালেসের দিক থেকে ভারী গোলা বর্ষণের তেজ কমে আসছে টের পেয়ে চাপা কণ্ঠে গুজগুজ করছে লোকগুলো।

এদিকে কানের কাছে একটার পর একটা বোমার বিস্ফোরণের কারণে বধির হয়ে গেছে আতাসী ও গুফরান। একটানা শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। নইলে সময় থাকতে লোকগুলোর কথাবার্তা কিছু না কিছু নিশ্চয়ই শুনতে পেত। সতর্ক হতে পারত। কিন্তু ঘটল অন্য কিছু।

ব্যাপার ঠিকমত বুঝে ওঠার মত সুযোগ ছিল না ওদের। তার আগেই গা ঢাকা দিয়ে থাকা দলটার একেবারে কাছে এসে পড়ল। এতই কাছে যে হাজার চেষ্টা করলেও কোনও প্রতিকার সম্ভব নয়। আতাসীর মুখে লাগানো ডাই অনেক আগেই ঘামের সঙ্গে গলে পড়ে গেছে। আসল চেহারা বেরিয়ে পড়েছে। ওদিকে চাঁদ ওঠার সময় হয়ে আসায় আকাশও একটু একটু আলো হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

তাই ওকেই আগে দেখল লোকগুলো, এবং মানুষটা যে তাদের মত কালো চামড়ার নয়, তা বুঝে নিতেও দেরি হলো না। এদিকে আতাসীর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় একেবারে শেষ সময়ে সতর্ক করল তাকে। পরিবেশে কিছু একটা গোলমাল আছে অনুমান করে আচমকা ব্রেক কষল সে। ঝট্ করে কারবাইন তুলল, চোখ কুঁচকে দেখার চেষ্টা করল সামনে কী ঘটছে।

পরক্ষণে 'ফায়ার!' বলে চেঁচিয়ে উঠেই ট্রিগার টেনে ধরল স্মাইজারের। চারজন কায়া প্রথম ধাক্কাতেই লুটিয়ে পড়ল নরম কাদায়, বাকি সবাই পাম গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে খিঁচে দৌড় লাগাল। আতাসী আর গুফরানের টানা ব্রাশে আরও দু'জন লুটিয়ে পড়ল। বাকিদের তাড়া করল আতাসী।

কিছুটা দৌড়ে গিয়ে গ্রেনেডওয়ালা লোকটা ঘুরে তাকাল, না থেমেই হাতের জিনিসটা কাঁধের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল পিছনে। ওই জিনিস আগে কখনও ব্যবহার করেনি সে, কাউকে করতেও দেখেনি। কিন্তু ওটার কাজ সম্পর্কে জানত। স্বপ্ন দেখত, একদিন কারও ওপর ওটা ব্যবহার করে নাম কিনবে।

কিন্তু দৌড়ের ওপরে মারার জন্য তার লক্ষ্য ঠিক ছিল না। অনেক উঁচুতে উঠে গেল গ্রেনেডটা। দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। পড়ল এসে সোজা গুফরানের প্রশস্ত বুকে। সঙ্গে সঙ্গে ওটা ক্যাচ ধরে ফেলল সে, জিনিসটা কী না বুঝেই। ধরতে গিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর মনে মনে হাসল ওটা কী টের পেয়ে। কায়া গাধাটা পিন খুলতে ভুলে গেছে দেখে হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল ওর! জায়গামতই রয়ে গেছে পিনটা।

পিন খুলে দ্রুত পালাতে থাকা লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল গুফরান। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না ওটা। একটা গাছের সঙ্গে 'থ্যাপ!' করে বাড়ি খেয়ে তার দিকেই ফিরে এল বুমেরাঙের মত। একেবারে কয়েক গজ সামনে এসে আছড়ে পড়ল বৃষ্টিভেজা নরম মাটিতে। সে তখন স্মাইজারে নতুন ম্যাগাজিন ভরে লোকগুলোকে তাড়া করতে যাচ্ছিল।

আতাসী চেঁচিয়ে সতর্ক করল গুফরানকে, কিন্তু সে চিৎকারের ভুল অর্থ করল টিভ। ভাবল, কয়েকজন কায়া গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ায় বিজয় উল্লাস

করছে বুঝি বেদুঈন। তাই সেদিকে মন না দিয়ে কোমরের কাছ থেকে গুলি করতে করতে সাত-আট পা দৌড়ে গেল ও, এমন সময় বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। একেবারে গুফরানের সামনে, তিন গজের মধ্যে।

পরের ঘটনা ঘটে গেল খুব দ্রুত। চোখের সামনে তীব্র আলোর ঝলকানি আর বিস্ফোরণের বিকট শব্দে অন্ধ এবং বধির হয়ে গেল সে। মনে হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী দু'টো হাত এক ঝটকায় মাটি থেকে শূন্যে তুলে ফেলল তাকে। ভাঙাচোরা পুতুলের মত আছড়ে ফেলল পাম গাছটার মোটা গুঁড়ির উপর।

তারপর নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল গুফরান, কারণ চোখ মেলতেই টের পেল কাদামাটির রাস্তায় পিঠ দিয়ে পড়ে আছে সে। কেউ একজন ঝুঁকে আছে তার ওপর। কাদায় হাঁটু গেড়ে তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। গলার কাছে খুব উষ্ণ একটা অনুভূতি হলো গুফরানের। ছোটবেলায় একবার খুব জ্বর হয়েছিল তার, সে-সময় এরকম লেগেছিল।

তবে অনুভূতিটা মন্দ লাগল না। বেশ ঘুম ঘুম একটা ভাব ঘিরে ধরল তাকে। আধো ঘুম, আধো জাগরণ। একটা গলা শুনতে পেল সে। কাছেই কে যেন কী বলছে তাকে। বারবার একই কথা বলছে।

'গুফরান!' আবার শোনা গেল কণ্ঠটা। 'গুফরান!'

গলাটা চিনতে পারল গুফরান। ওটা লেফটেন্যান্ট আতাসীর গলা। ওর ওস্তাদ আতাসী। ওকে গেরিলা যুদ্ধ শিখিয়েছে... হাতাহাতি লড়াই শিখিয়েছে... ওকে... চোখ ঘুরতে শুরু করল গুফরানের। তারপর স্থির হয়ে গেল দৃষ্টি।

ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে খালি চোখে দেখার মত মোটামুটি আলো ফুটল পুব দিগন্তে। টর্চ লাইট নিভিয়ে ফেলল কমাণ্ডোরা। মিশন অ্যাকমপ্লিশড্।

মিশ্রি খানের নিথর দেহটা রানা নিজে বয়ে নিয়ে এসেছে। পরম যত্নে শুইয়ে দিয়েছে নীচতলার হলওয়ের একপাশে মেঝেতে। রুমটার পুবদিক খোলা। ভেতরের আলো তাই দ্রুত বাড়ছে। তার মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে ভাতিজা আবরোজি। বিষণ্ন। মিশ্রির পাশে শোয়ানো হয়েছে গুফরান, কিয়াম ও হাজিকে।

চারজন কমাণ্ডোর চেয়ে একটু আলাদাভাবে শোয়ানো আছে আরেকটা মৃতদেহ। ওটা কিমবার।

রানা যখন মিশ্রি খানের মৃতদেহ তুলে আনছে, সেই সময় দোতলায় ফায়জার গুলি খেয়ে মরেছে লোকটা। রাষ্ট্রীয় ট্রেজারি যে রুমে, সেই রুমে গা ঢাকা দিয়ে বসে ছিল। উপরতলা সার্চ করে দেখতে গিয়ে ব্যাপারটা টের পায় ওরা। তাকে বেরিয়ে আসার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেয়। পরে মার্সিয়া গুলি করে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ায় পিছনের জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। তখন বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে ফায়জাকে।

বোনাস হিসেবে কিমবার প্যাট্রিয়টিক ইয়ুথের নেতা পিয়েরে ওকুম্বাসহ প্রেসিডেন্টের আরও ছয়জন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকেও পাওয়া গেছে প্যালেসে। গোলা বর্ষণের হাত থেকে বাঁচতে পুরনো এক সেলারে গা ঢাকা দিয়ে ছিল লোকগুলো।

তাদেরকে হাত-পা বেঁধে এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে। একটু পর পাঠিয়ে দেয়া হবে উফা প্রিজনে। গতকাল পর্যন্ত যে প্রিজনের নিয়ন্ত্রক ছিল তারা।

প্যালেসের প্রতিটা রুম নিজে সার্চ করে দেখেছে রানা। কিমবার কয়েকজন ডোমেস্টিক স্টাফ, ক্রালের ছোটোবেলার বন্ধু, প্যালেস সার্ভেন্ট, প্রটোকল অফিসার এবং চার-পাঁচজন মাঝবয়সী মহিলার মৃতদেহ এখানে-ওখানে পাওয়া গেছে। ওর ধারণা, স্বাধীনতা দিবসের আয়োজন-অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছিল লোকগুলো। সম্ভবত বৃষ্টির কারণে রাতে আর বের হতে পারেনি। জানত না, এই রাতই শেষ রাত হবে তাদের।

কিমবার মৃতদেহ বাদে বাকি দেহগুলো পিছনের কোর্টইয়ার্ডে নিয়ে স্তূপ করা হয়েছে। মেইন গেট মেরামত করার কোনও উপায় নেই আপাতত। তাই একটা স্টেটরুম থেকে বড় একটা কার্পেট নিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে, যাতে বাইরে থেকে ভেতরের বীভৎস দৃশ্য সবার চোখে না পড়ে।

পাঁচটায় রানার নির্দেশে স্পিড বোটে করে টেমপেস্টে ফিরে গেল মার্সিয়া। বাকি দু'টো বোটকেও টো করে নিয়ে গেছে ও। তার আগে ওয়ালডেনবার্গকে ওয়াকি-টকিতে 'সব ঠিক আছে' মেসেজ দিতে ভোলেনি রানা। সাড়ে ছয়টায় ডক্টর ওকোইসহ ফিরল মার্সিয়া। সঙ্গে তিন বোট ভর্তি বিভিন্ন মালামাল।

অবশিষ্ট বোমা, আশিটা স্মাইজার কারবাইন এবং প্রায় এক টন পরিমাণ নাইন এমএম বল।

রানার কথামত ভোর ছয়টায় শিপের রেডিওর সামনে বসল ক্যাপ্টেন। ওয়াল্টার হ্যারিস ওরফে পিটার মার্টিনের দেয়া নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে তিন শব্দের একটা মেসেজ ব্রডকাস্ট করল। সেটা এরকম : ব্যানানা, গুয়াভা ও ম্যাংগো। অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে, মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাহ হয়েছে, মিশন সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট কিমবা নিহত হয়েছে।

এই একই মেসেজ অন্য এক ফ্রিকোয়েন্সিতেও পাঠিয়ে দিয়েছে ওয়ালডেনবার্গ। তবে সেটার বক্তব্য এক হলেও অর্থ আলাদা। যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় : এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম ধরনের। প্রথম মেসেজটা মনরোভিয়ায় উল্লাসের সঙ্গে গৃহীত হলো। পরেরটা গৃহীত হলো আর কোথাও, আরও শতগুণ বেশি উল্লাসের সঙ্গে।

ডক্টর ওকোই প্যালেস ঘুরে ঘুরে দেখলেন কমাণ্ডো বাহিনীর তাণ্ডব। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'এর দরকার ছিল। এর দরকার ছিল।'

তিনি যে-কাজের ওস্তাদ, যে-কাজ করার জন্য তাঁর এই মিশনে অংশ নেয়া, সে কাজের জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন ডক্টর, কিন্তু কিছু করতে হয়নি। প্রয়োজনই হয়নি। যুদ্ধে আহত হয়নি এ-পক্ষের কেউ। নিহত হয়েছে চারজন। মৃতদের সেবা করার উপায় জানা নেই তার।

সকাল নয়টার একটু পর একটা দ্রুতগামী কোস্ট গার্ড এসে ভিড়ল ক্লারেন্স হারবারের একমাত্র জেটিতে। কোন্ দেশের কোস্ট গার্ড, বোঝার উপায় নেই। সমস্ত আইডেণ্টিফিকেশন মার্ক স্প্রে করে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

জনা পঞ্চাশেক টিভের একটা দল হুড়মুড় করে নেমে এল ওটা থেকে। ডক্টর ওকোইসহ কমাণ্ডো বাহিনীর কয়েকজন তাদেরকে রিসিভ করল। সেখানে বসেই স্লিপিং ব্যাগ দিয়ে মোড়া একেকটা বাণ্ডিল বিতরণ করা হলো সবাইকে। স্নাইজার ও এক্সট্রা ম্যাগাজিনসহ পরার ম্যাচিং জ্যাকেট, কমব্যাট ট্রাউজার্স, ওয়াটার-প্রুফড় ক্যানভাস জ্যাকবুট, বেরেট আর জিপ-ফ্রন্টেড কমব্যাট ব্লাউজ প্রভৃতির কমপ্লিট সেট। সবশেষে দশজনকে দশটা ওয়াকি-টকি দেয়া হলো।

পনেরো মিনিটের মধ্যে যেমন-তেমন একটা আধা সামরিক বাহিনী দাঁড়িয়ে গেল। জাংগারান প্যারা মিলিটারি ফোর্স। নির্দেশ যা কিছু দেয়ার, আগেই দেয়া ছিল রানার। কাজেই দেরি না করে কাজে লেগে পড়ল তারা। পাঁচজন করে দশটা ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। এখন থেকে ক্লারেন্সের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে এই বাহিনী। দলের নেতারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে।

ঘণ্টা দুয়েক পর আরও অন্তত দুইশ' টিভ আসছে প্যারা মিলিটারি বাহিনীতে যোগ দিতে। দল ভারী করবে।

প্রথম পঞ্চাশজনের মধ্য থেকে দশজন গিয়ে উফা প্রিজনের বন্দিদের মুক্ত করে দিয়েছে। কিমবা সরকারের নির্যাতনের শিকার হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিন গুণছিল মানুষগুলো। বেশিরভাগই নিরপরাধ। তাদের মধ্যে হোটেল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের মালিক গোমেজ ও আরও কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। জাতিসংঘ হসপিটালে ভর্তি করা হলো তাদের।

ভাগ্য ভাল গোমেজের, আর তিনদিন পর, স্বাধীনতা দিবসের দুপুরে বন্দিদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার কথা ছিল সিটি স্কয়ারে। প্রেসিডেন্ট কিমবার স্বাধীনতা দিবসের আনুষ্ঠানিক ভাষণের পর।

ওদিকে এসবের মধ্যে একটা অদ্ভুত দৈব-সংযোগের ব্যাপারও রয়েছে। সেটা হলো, রানার মিশনের একশতম দিনটিই ছিল জাংগারোর স্বাধীনতা দিবস।

গোমেজের দণ্ড যে ওই দিনই কার্যকর করা হবে, সে-কথা রানা জানে বলেই এগিয়ে এনেছে মিশন।

জাংগারো ঘুরে যাওয়ার সময় গোমেজকে একটা বিশেষ কাজ দিয়েছিল ও। ক্লারেন্সে নতুন কোনও পরিবর্তন ঘটে কি না, বিশেষ করে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসের গার্ড ব্যবস্থায় নতুন কিছু যোগ হয় কি না, কিছুদিন পর পর ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাতে থাকবে সে। কিন্তু লোকটা একবারও যোগাযোগ না করায় সন্দেহ হয় রানার।

ও বুঝতে পারছিল কোনও একটা গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। ডক্টর ওকোইকে কথাটা জানায় রানা। তুলোঁয় বিদায় নেয়ার সময় আতাসীকেও জানায়। তাদের গোপন খবরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত দিনের তিনদিন আগে আক্রমণ চালিয়েছে রানা।

যত পশ্চাৎপদ আর যোগাযোগ ব্যবস্থা যতই খারাপ হোক, খবর ছড়ায়

বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। রাতের অন্ধকারে প্যালেসে কী ঘটে গেছে, দিনের আলো ঠিকমত ফোটার আগেই সে খবর শহরের সবার জানা হয়ে গেছে। তার মধ্যে এরকম এক প্যারা মিলিটারি ফোর্সের আবির্ভাব ঘটায় জানের পানি শুকিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের। আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে কি না, সেই আতঙ্কে আছে। তাই সাড়ে দশটার মধ্যে নিজেদেরকে ঘরের মধ্যে পুরোপুরি বন্দি করে ফেলেছে ক্লারেন্সবাসী।

একটু আগে পর্যন্ত তাদের মধ্যে বাইরে উঁকি-ঝুঁকি মারার যে প্রবণতা ছিল, তা একদম গায়েব হয়ে গেছে।

এদিকে রাতের ভয়াবহ স্মৃতি মুছে ফেলার স্বার্থে প্রাসাদের সবগুলো মৃতদেহ পিছনের উঠানের এক জায়গায় নিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে আটটাই সাদা চামড়ার। রাশান। কিমবারটা অবশ্য আগের জায়গাতেই আছে। দুটো ইনফ্লেটেবল নিয়ে টেমপেস্টের পিছনে বেঁধে রাখা হয়েছে। বাকিটাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে হারবারের কয়েকশ' গজ দূরের এক ক্রিকে।

রকেট-লঞ্চার, টিউব আর বেসপ্লেট ইত্যাদি চোখের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্যবহার হওয়া প্যাকিং ক্রেটগুলো সাগরে ফেলে দেয়া হয়েছে। মোট কথা, বহিরাগতদেরকে দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে, তা প্রমাণ করার কোনো উপায় রাখা হয়নি।

ন'টার দিকে আতাসী দেখা করতে এল রানার সঙ্গে। ক্লান্ত, শোকাহত চেহারা। 'বস, আউটার অ্যাঙ্কারেজে কাল বিকেল থেকে একটা জাহাজ অপেক্ষা করছে,' বলল সে। 'কোমারভ নাম। রাশান। হারবারে ঢোকার অনুমতি চেয়ে সকাল থেকে বারবার মেসেজ পাঠাচ্ছে। বলছে, জাংগারান সরকারের অনুমতি নিয়েই এসেছে ওটা।'

একটু চিন্তা করল রানা। এক টুকরো কাগজে দ্রুত হাতে লিখল: REQUEST DECLINED FOR INDEFINITE PERIOD STOP

'কার্লকে গিয়ে বলো, টেমপেস্টের রেডিওতে কোমারভকে মেসেজটা পাঠিয়ে দিতে।'

দশটায় দোতলার মেইন ডাইনিং রুমে বসে কিপরিয়ানির তৈরি নাস্তা আর গরম কফি খেল রানা, মার্সিয়া ও ফায়জা। এরমধ্যে কিমবার রেডিও রুম খুঁজে বের করে সার্চ করে দেখা হয়েছে। ট্রান্সমিটার অক্ষতই আছে। দেয়ালে বুলেটের কয়েকটা ফুটো ছাড়া আর কোনও ক্ষতি হয়নি রুমটার। যখন খুশি নতুন প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারবেন।

কিমবার ব্যক্তিগত সেলারকে ন্যাশনাল আর্মারিতে রূপান্তর করা হয়েছিল। সেখানে প্রচুর রাশান অস্ত্র, গোলা-বারুদ পাওয়া গেছে। এত বেশি, যা দিয়ে দুই-তিনশ' সৈন্যের একটা প্রশিক্ষিত বাহিনীকে কয়েক মাস ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল। ন্যাশনাল ট্রেজারিতেও ভালই টাকা-পয়সা পাওয়া গেল।

'এবার কী?' নীরবতা ভাঙল ফায়জা।

'অপেক্ষা,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা।

'কীসের জন্য?' মার্সিয়া বলল।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। গাছের পাতায় এখনও কিছু কিছু বৃষ্টির পানি লেগে আছে। চিক চিক করছে সূর্যের আলো পড়ায়। নীচতলায় নিথর পড়ে আছে মিশ্রি খানের দেহটা। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একজন মানুষ জন্মের পর যতদিন দম নেয়, ততদিনের প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা ক্ষণ নিজেকে নিয়ে তার কত চিন্তা, কত যত্ন, কত সতর্কতা, কত পরিকল্পনা, কত আশা-নিরাশার দোলাচল। অথচ দম বেরিয়ে গেলেই যে এক মুহূর্তে সবকিছু ফুরিয়ে যায়, চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

দীর্ঘদিনের সহকর্মী মিশ্রি খান আর কোনওদিন মাটির শয্যা ছেড়ে উঠবে না, তার মুখে আর কখনও 'ওস্তাদ!' ডাকটা শুনতে পাবে না, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না রানা।

'নতুন সরকার গঠন হওয়ার জন্য,' বলল ও।

একটার খানিক পর পুরনো এক ল্যাণ্ড রোভারে চেপে ক্লারেন্স পৌঁছল ওয়াল্টার হ্যারিস। সঙ্গে জাংগারোর ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্টনিও ববি, জার্মান দানব হফম্যান এবং ছয়জন আফ্রিকান মার্সেনারি। হফম্যান ড্রাইভিং সিটে বসা।

মার্সেনারি গ্রুপটার সবার হাতে একটা করে কালাশনিকভ একে ফোর্টিসেভেন আছে। হফম্যানের পাশের সিটে একটা বড় হান্টিং রাইফেল কোলে নিয়ে বসে আছে হ্যারিস। সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে সে এদিক-ওদিক।

ডাইনিং রুমে বসেই ল্যাণ্ড রোভারের গর্জন শুনতে পেল রানা। শোর রোড ছেড়ে এদিকে ঘুরল ওটা। অসমান রাস্তার ওপর দিয়ে হেলেদুলে, মন্থর গতিতে প্যালেসের মেইনগেটের সামনে পৌঁছে থামল। ওখানটায় দরজার বদলে কার্পেট দেখে শ্রাগ করল মার্টিন। হফম্যানের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ঠোঁট নড়ল দানবের। কিছু বলল সে মার্টিনকে।

দোতলার জানালা দিয়ে তাকে জিপ থেকে নামতে দেখল রানা। চেহারায় সন্দেহ। রাইফেল বাঁ হাতে ঝুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল সে। এক হাতে কার্পেট সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। মূল খিলানের নীচে এক সারিতে আটজন আফ্রিকান সৈন্য অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কপাল কুঁচকে উঠল। ভাঁড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে... কারা? ভাবল সে।

সকাল থেকে যথেষ্ট ধকল গেছে মার্টিনের ওপর দিয়ে। তাই মন-মেজাজ ভাল নেই। আগে থেকে সবকিছু ব্যাখ্যা করাই ছিল। কখন কী করতে হবে বিস্তারিত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল কর্নেল ববিকে। কিন্তু মাতালের বাচ্চা মাতাল, সব মদের সঙ্গে গুলে খেয়ে বসেছিল। তাই সকালে টেমপেস্টের রেডিও কল পাওয়ার পর বিষয়টা নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে মার্টিনকে। এবং তাকে গাত্রোত্থানে রাজি করাতেই একটা ঘণ্টা বরবাদ হয়েছে তার।

মার্টিনের ধারণা, আসলে ভয় পেয়েছে ব্যাটা। নগদ টাকা আর সুযোগ-সুবিধার লোভ সামলাতে না পেরে ওদের সঙ্গে হাত মেলালেও আসল কাজের সময় ঘাবড়ে গেছে। হাতে তুলে দেয়া ক্ষমতা নিতেও ভয়!

রেডিও কল রিসিভ করার পর দেড় ঘণ্টার মত সময় লেগেছে তাদের রওনা হতে। মনরোভিয়া থেকে ক্লারেন্স মাত্র একশ' মাইল পথ। এই সামান্য পথ পাড়ি দিতেই লেগেছে চার ঘণ্টা। অথচ আর কোনও দেশ হলে এর অর্ধেকেরও কম সময় পৌঁছে যেতে পারত তারা। বর্ডারেও কিছু সময় নষ্ট হয়েছে কায়া গার্ডদের দর কষাকষির কারণে।

ক্লারেন্স থেকে বর্ডার পোস্ট ষাট মাইল দূরে বলে তখনও ওরা জানত না ক্লারেন্সে কী প্রলয় ঘটে গেছে। তাই বর্ডার আগলে বসে ছিল তখন পর্যন্ত। কাগজপত্র অনুযায়ী মার্টিনের দলটা ছিল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ক্যামেরা ক্রু, জাংগারোর ওয়াইল্ড লাইফের ছবি তুলতে এসেছে। তাই বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি বর্ডার পাড়ি দিতে।

'ক্যামেরা ম্যান' লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববির মাথায় বিরাট এক বাউলার হ্যাট আর চোখে পিরিচ আকৃতির গাঢ় কালো গ্লাস পরিয়ে দিয়ে তার চেহারা প্রায় ঢেকে রেখেছিল মার্টিন। তাকে চিনতেই পারেনি লোকগুলো। সে চেষ্টাও অবশ্য ছিল না তাদের। দর কষাকষি আর টাকা ভাগাভাগির দিকেই খেয়াল ছিল বেশি।

বর্ডার পেরিয়ে এসে ভালই চলছিল ল্যাণ্ড রোভার। ক্লারেন্সের দশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে একটা টায়ার বার্স্ট করায় আবার পনের-বিশ মিনিটের জন্য আটকে যেতে হলো। এই সময় নিজেদের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয় ওরা। কায়ারা দল বেঁধে পালাচ্ছে। জিপ দেখে দূর থেকে অতি উৎসাহী এক কায়া কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল।

যে টায়ারটা খেটেপিটে বদলে ফেলেছিল হফম্যান, একটা বুলেট সেটাকেই আবার ফুটো করে দিল। কী আর করা! বাকি পথ ফাটা টায়ারেই চালাতে হয়েছে, ফার্স্ট গিয়ারে।

দোতলার জানালায় রানাকে দাঁড়ানো দেখে হাসির ভঙ্গি করল মার্টিন। হাত নাড়ল। 'সব ঠিক আছে?'

'একদম!' শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা নীচে ফেলে দিল রানা। 'বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে ভেতরে চলে আসুন।'

'কিন্তু এরা কারা?' ইঙ্গিতে সৈন্যদের দেখাল যুবক।

হাসল রানা। থুতনি তাক করে গরিলা ববিকে দেখাল। 'নতুন প্রেসিডেন্টের টেম্পরারি বডিগার্ড। আমার তরফ থেকে।'

দ্বিধা দূর হয়ে গেল পিটার মার্টিনের। সঙ্গের গার্ডদের নীচে অপেক্ষা করতে বলে ববি আর হফম্যানকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল সে। তার লোকদের আপ্যায়ন করার নামে সিঁড়ির নীচের একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। পিঠে স্মাইজার ঠেকিয়ে নিরস্ত্র করা হলো তাদের। তারপর হাত-পা, মুখ বেঁধে ফেলে রাখা হলো। কেউ টেরই পেল না কী ঘটে গেছে।

রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দাঁত বের করে হাসল হফম্যান। বিজয়ীর হাসি। না দেখার ভান করল ও। লে. কর্নেল ববি প্রেসিডেনশিয়াল ডাইনিং রুমে বসল।

'তারপর?' মার্টিন বলল। 'কেমন কাটল রাত?'

রানা বলল, 'মন্দ না।'
'প্রেসিডেন্ট কিমবা?'
'নেই। নীচতলায় তার লাশ আছে।'
মাথা দোলাল মার্টিন। 'প্রেসিডেনশিয়াল বডি গার্ড?'
'আসুন,' বলে পিছনের একটা বন্ধ জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। শাটার বাইরের দিকে খুলে দিল। 'ওই যে।'
ওর চোখে চোখ রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। নীচে উঁকি দিয়েই থমকে গেল। চোখ আটকে গেল লাশের স্তূপের ওপর। চোখে পলক নেই। অস্বাভাবিক বড় সাইজের মাছিতে ভরে গেছে পিছনের উঠান। ওগুলোর পাখার গুঞ্জন শুনে মনে হয় প্লেনের ইঞ্জিন বুঝি।
তাড়াতাড়ি শাটার টেনে দিল মার্টিন। 'কারা?'
'প্যালেস গার্ড, ডোমেস্টিক স্টাফ, সার্ভেন্ট।'
'অল ডেড?'
'অল ডেড।'
'আর্মি?'
'বিশ-পঁচিশজনের মত মরেছে,' রানা বলল। 'বাকিরা ব্যারাক ছেড়ে পালিয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র ফেলে গেছে, নিয়ে যওয়ার সময় পায়নি। ওগুলো সব নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।'
'আপনার তরফের ক্যাজুয়ালটিজ?'
'চারজন মারা গেছে।'
'আমি দুঃখিত।'
সিলভারের ট্রে-তে করে কফি নিয়ে এল মার্সিয়া। কাপে ঢেলে প্রথমে হবু প্রেসিডেন্টকে পরিবেশন করল। তারপর মার্টিন, হফম্যান আর রানাকে। যোদ্ধার বেশে সজ্জিত একজন সুন্দরী যুবতীকে দেখে অবাক হলো নবাগতরা, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করল না। একটু পর নীরবে বিদায় নিল ও।
কফিতে চুমুক দিল মার্টিন। 'প্রেসিডেনশিয়াল আর্মারির কী অবস্থা?'
'ওটা সেলারে। আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'
মাথা ঝাঁকাল পিটার মার্টিন। 'ন্যাশনাল রেডিও ট্রান্সমিটার?'
'ওটাও নীচের তলায় আছে, আরেক সেলারে। অক্ষত। সম্ভবত ডিজেল পাওয়ারড্ জেনারেটরে চলে। আমরা চালু করার চেষ্টা করিনি অবশ্য।'
আবার মাথা ঝাঁকাল যুবক। পুরোপুরি সন্তুষ্ট। 'এখন তা হলে নতুন প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে পারেন?' দাঁত বের করে হাসল সে। 'সামরিক অভ্যুত্থান সফল হওয়ার কথা জানাতে পারেন দেশবাসীকে?'
শ্রাগ করল রানা। জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না।
মার্টিন হাসল ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরে।
'সেনাবাহিনীর সদস্যরা পালিয়ে গেছে,' রানা বলল। 'নতুন বাহিনী না হলে নতুন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার কী হবে?'
মার্টিনের হাসি আরও প্রসারিত হলো। 'নতুন প্রেসিডেন্টের নিজস্ব বাহিনী

রেডি আছে। ওরা আসছে। বাই দ্য ওয়ে, আসুন। জাংগারোর নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাকে।'

ইঙ্গিতে গরিলাকে দেখাল সে। কফি শেষ করে ঘুরঘুর করছে লোকটা। আগে থেকে চেনা রুমটা দেখছে। বিরাট গোল মুখটা জুড়ে বিকট হাসি খেলা করছে। কালোর মধ্যে দু' পাটি সাদা দাঁত ঝকঝক করছে। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। যেন ভারি সন্তুষ্ট হয়েছে ওর কাজে।

'ইনি হচ্ছেন জাংগারান আর্মির সাবেক প্রধান,' বলল মার্টিন। 'গতরাতের সামরিক অভ্যুত্থানের সফল নেতা। অন্তত পৃথিবী তা-ই জানবে, এবং রিপাবলিক অভ জাংগারোর নতুন প্রেসিডেন্ট, লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যান্টোনি ববি।'

চেহারায় বিনয় ফুটিয়ে লোকটার দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল রানা। হাতটা নিজের প্রকাণ্ড থাবার মধ্যে নিয়ে ঝাঁকাল ববি।

ডাইনিং রুমের শেষ মাথার একটা বন্ধ দরজা ইঙ্গিত করল রানা। 'মিস্টার প্রেসিডেন্টকে তাঁর নতুন অফিস দেখানোর এই সুযোগটা আমার পাওনা হয়েছে আশা করি।'

রানাকে দেখল মার্টিন। মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'ওহ্, শিওর!' ববির দিকে ফিরে কথাটা অনুবাদ করে দিল।

. আগ্রহের আতিশয্যে জোরে জোরে মাথা দোলাল ববি। রানার আগে আগে চলল দরজাটার দিকে, একটু যেন অসংলগ্ন পায়ে। রানার অপেক্ষায় না থেকে নিজেই দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। রানা ঢুকল ত্রিশ সেকেণ্ড পর। ঢুকে পিছনে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। পাঁচ সেকেণ্ড পর ভেতর থেকে একটা গুলির শব্দ উঠল।

তার পরপরই রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, দরজা টেনে দিল। একদম স্বাভাবিক। ডাইনিং টেবিলে বসল। পিটার মার্টিন আর হফম্যান অপলক চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। দ্বিধান্বিত।

'কিসের শব্দ শুনলাম যেন?' জিজ্ঞেস করল হতভম্ব মার্টিন।

'গুলির শব্দ শুনেছেন,' রানা নির্বিকার। 'আমি গুলি করেছি ববিকে।'

'হোয়াট! কাকে?' নিতম্বে আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে যেন, এমনভাবে বসা থেকে লাফিয়ে উঠল লোকটা। এক দৌড়ে গিয়ে দরজা ঠেলে উঁকি দিল রুমের মধ্যে। পরমুহূর্তে আকাশ ভেঙে পড়ল মাথায়। হাত পা ছড়িয়ে মেঝের টাইলসের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে ববির বিশাল দেহটা। মাথা একদিকে কাত হয়ে আছে। ছোটোখাটো পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে পেট। বুঝতে পারল বেঁচে নেই লোকটা।

ঝট করে ঘুরে তাকাল মার্টিন। চেহারা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ভাষা হাতড়াচ্ছে। 'মেরে ফেলেছ!' ফিসফিস করে কোনওমতে উচ্চারণ করল সে। 'লোকটাকে মেরে ফেলেছ তুমি! এত পরিশ্রম, এত প্ল্যান-প্রোগ্রাম, এত খরচ!' গলা ভেঙে গেল। 'তুমি... তুমি জানো কী করেছ? কতবড় সর্বনাশ... ইউ স্টুপিড। ব্লাণ্ডারিং ম্যানিয়াক, ইউ... ইউ ব্লাডি... !'

চুপ করে থাকল রানা। মার্টিনের দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহল নিয়ে।

কুস্তিগীর হফম্যানের ডান হাত শার্টের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল।

একেবারে কানের কাছে গুলির শব্দে চমকে উঠল ওরা। মার্টিন অবাক হয়ে দেখল কব্জি চেপে ধরে বসে পড়তে যাচ্ছে বিশালদেহী হফম্যান। পূর্ণিমার চাঁদের মত গোল মুখটা যন্ত্রণায় বিশ্রী রকম কুঁচকে উঠেছে। হাঁটুতে ভর করে বসে পড়ল সে, শুয়ে পড়ল কাত হয়ে। নরম নাকের নাইন এমএম বুলেট কব্জির হাড় সম্পূর্ণ চূরমার করে দিয়েছে।

তার ওপর থেকে সরে এল মার্টিনের বিস্মিত দৃষ্টি। দেখল টেবিলের তলা থেকে হাত বের করে আনছে রানা। এখনও শীতল চোখে লক্ষ করছে তাকে। একটা পিস্তল টেবিলের ওপর রাখল রানা। ম্যাকারভ নাইন এমএম অটোম্যাটিক। নীল ধোঁয়ার পাতলা একটা ফিতে বেরিয়ে আসছে ওটার নল দিয়ে।

দুই কাঁধ ঝুলে পড়ল মার্টিনের। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এক মুহূর্তে বাষ্প হয়ে উবে গেছে। তার আস্থার, ভরসার পুরু দেয়ালটা আচমকা গুঁড়িয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা।

দরজার বাইরে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে ঘুরে তাকাল সে। পুরো দস্তুর যুদ্ধের সাজে সজ্জিত ফায়জা আর মার্সিয়াকে দেখল ওখানে। হাতে স্মাইজার। সেফটি ক্যাচ অফ, অনড়, তার বুক সই করে ধরা।

'পিটার মার্টিন,' আসল নামে ডেকে লোকটাকে চমকে দিল রানা। 'ওদের হাতের ওই জিনিসগুলো তোমার সৎবাপ রুডলফ গুন্থারের টাকায় কেনা। কিন্তু মুশকিল হলো অস্ত্রগুলো বেহাত হয়ে গেছে। তাছাড়া অস্ত্র অস্ত্রই—পক্ষ কি বিপক্ষ চেনে না। বি কেয়ারফুল!'

সতেরো

ফায়জা রুমে এসে ঢুকল। ব্যথায় কুঁকড়ে থাকা হফম্যানকে ভারমুক্ত করল পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে। সঙ্গে আর কোনও অস্ত্র আছে কি না সার্চ করে নিশ্চিত হলো। নেই। এরপর লোকটাকে পিছিয়ে গিয়ে খোলা জায়গায়, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসতে বাধ্য করল ও। মার্টিনকেও সার্চ করা হলো। স্মল আর্মস নেই তার কাছে। হান্টি রাইফেলটা এখন মার্সিয়ার হাতে।

বিচলিত দেখাল লোকটাকে। রানার মুখে নিজের এবং বসের আসল নাম উচ্চারিত হতে শুনে কলজে উড়ে গেছে। যদিও মনের ভাব চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একদৃষ্টে রানাকে দেখছে।

তার চোখের সামনে এতদিন সাফল্য আর সৌভাগ্যের যে রঙিন ছবি ভাসছিল, সেটা মিলিয়ে গিয়ে ব্যর্থতা ও হতাশার আরেকটা ছবি ফুটতে শুরু করেছে। কঠিন বাস্তবের ব্যাটারিং র‍্যামের জোর গুঁতোয় রং হারিয়ে ফ্যাকাসে

সেটা। যাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে এতদিন নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তৃপ্তি পেয়েছে সে, তাদের সঙ্গে এর কোনও তুলনা হয় না। ভাবছে সে। এই লোক তাদের চেয়ে হাজার মাইল এগিয়ে আছে। এত বিপজ্জনক মানুষের সঙ্গে আর কখনও টক্কর দিতে হয়নি তাকে।

কিন্তু সেটা বুঝতে দেরি করে ফেলেছে সে।

'আপনি... আপনি জানতেন... !' বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে বলল সে কোনওমতে।

শ্রাগ করল ও। 'তা বলতে পারেন।'

'কখন... জেনেছেন?'

'আপনি যেদিন প্রথম আমার অ্যাপার্টমেন্টে যান!' হাসল ও। 'আমার বাসা থেকে বেরিয়ে আর জি টাওয়ারে গেছেন শুনে ভাবলাম, নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণে আমাকে দরকার পড়েছে গুন্থারের। অ্যাকচুয়ালি, সেদিন থেকেই আজকের এই চমকটা উপহার দেয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করি।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মার্টিন, দরজায় ডক্টর ওকোই হাজির হতে থেমে গেল।

'এভরি থিং ওকে, ডক্টর?' বলল রানা।

'এভরি থিং ওকে, কমাণ্ডার,' মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ ডাক্তার। চেহারার চাপা উচ্ছ্বাস দেখে বোঝা যায় টগবগ করে ফুটছেন ভেতর ভেতর। 'লিস্টের সাতজন নোটেবল জাংগারানের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তাঁরা সবাই নতুন সরকারে যোগ দিতে একবাক্যে রাজি হয়েছেন।'

'গুড।' হফম্যানকে দেখাল থুতনি তাক করে। 'ওর হাতটা ব্যাণ্ডেজ করে দিন, প্লিজ। আর ওই রুমে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তারও ব্যবস্থা করুন।'

'শিওর, শিওর!' ব্যস্ত হয়ে উঠল ডক্টর।

'ববি... ' মার্টিন নড়ে বসল। 'ববি মরেনি?'

'না।'

'কিন্তু... গুলির শব্দ হলো যে?'

'ওটা ফাঁকা আওয়াজ,' রানা বলল। 'কফির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল, তাই ঘুমাচ্ছে।' টেবিলে পড়ে থাকা খালি কাপ দেখাল ও।

ডক্টরের বেরিয়ে যাওয়া দেখল মার্টিন। 'কে লোকটা?'

'ডক্টর মুসা ওকোই।'

'ডক্টর?'

'এখানকার ইউএন হসপিটালের সার্জিকাল স্পেশালিস্ট। ছিলেন।'

অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল পিটার মার্টিন। বলল, 'অল রাইট। সর্বনাশ যা করার তা তো করেই ফেলেছেন, বুঝতে পারছি। ইউ হ্যাভ রুইনড্ ওয়ান অভ দ্য মোস্ট এক্সপেনসিভ অ্যাণ্ড রুথলেস ক্যু'জ দ্যাট হ্যাজ এভার বিন অ্যাটেম্পটেড। কিন্তু কেন? হোয়াই, ইন গডস্ নেইম?'

কথা গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুলল রানা। 'গুন্থার যখন আমাকে বাধ্য করল, তখনই ঠিক করি জাংগারানদের সুদিন ফিরিয়ে আনার চেষ্টার মাধ্যমে তাকে

একটা দাঁতভাঙা জবাব দেব। তারপর যখন কু-র সত্যিকারের উদ্দেশ্য জানলাম, তখন উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল আমার।' একটু থামল ও।

'সত্যিকারের উদ্দেশ্য মানে?'

'ক্রিস্টাল মাউন্টেনের কথা বলছি।' পুরো হাবা বনে গেল মার্টিন। 'আপনি জাংগারো সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ-খবর করেছেন। ভাল করেই জানেন কারা দেশটাকে গত কয়েক দশক ধরে সচল রেখেছে। কখনও ভেবেছেন, এটা তাদেরও দেশ? তারাও একটা সম্প্রদায়? সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয় বৃহত্তম হলেও শিক্ষা-দীক্ষায় এক নম্বর? কেন ওরা বস্তিতে থাকে, কেন নাগরিক অধিকার বলে কিছু নেই? ভাবেননি। কারণ টিভরা সবার অবহেলার পাত্র ছিল। ওরাও যে মানুষ, কখনও আপনাদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সে কথা ভুলেও মনে হয়নি কারও।'

'বাস্তবে তাই হয়েছে। বাইরে যে সৈন্যদের দেখেছেন, তারা কায়া বা ইরুবা নয়। টিভ। যে ক'জন সৈন্য আপনি সঙ্গে এনেছিলেন, তারা এখন ওদের আতিথেয়তায় আছে। আর যারা দলে যোগ দিতে আসছে বলছিলেন, তাদের জন্যও রিসেপশন পার্টি রেডি আছে। এই মুহূর্তে অবশ্য সৈন্য সংখ্যা কম আছে টিভদের। তবে আজ রাতের মধ্যে কয়েকশ' হয়ে যাবে আশা করছি। গুন্থারের টাকায় কেনা অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়াও সরকারী আর্মারীতে যা আছে, সব মিলিয়ে কাজ চালানোর মত একটা বাহিনী দাঁড় করিয়ে ফেলা যাবে তাদেরকে দিয়ে। আজ থেকে টিভরাই হবে এ দেশের সত্যিকারের পরিচালক।' সশব্দে দম নিল মাসুদ রানা।

'ক্লারেন্সে একটা সফল কু ঘটেছে ঠিকই, তবে সেটা অ্যান্টনি ববির অনুকূলে নয়। এ দেশের প্রধান হওয়ার যোগ্যতা আর অধিকার যাঁর আছে, তাঁর অনুকূলে।'

তাকিয়ে থাকল মার্টিন। 'কার কথা বলছেন?'

নামটা বলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল আরও ঝুলে পড়ল মার্টিনের। 'পা-পাগল হয়েছেন আপনি!' বলতে গিয়ে গলা ভেঙে গেল। 'সে তো নির্বাসিত!'

'ফর দ্য মোমেন্ট, ইয়েস। নট নেসেসারিলি ফর এভার।' খানিক বিরতি। 'বিপুল ভোটে বিজয়ী এ দেশের প্রথম এবং একমাত্র আইনসম্মত প্রেসিডেন্ট তিনি।'

'দ্যাট...দ্যাট আইডিয়ালিস্টিক বাস্টার্ড...'

'শাট্ আপ!' চাপা ধমক লাগাল ও। 'একটা দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে কথা বলছেন আপনি, তাঁরই দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে। সম্মান দিতে না পারেন ক্ষতি নেই, কিন্তু অসম্মানজনক কোনও মন্তব্য করবেন না।'

মার্টিনের চেহারা বদলে যেতে লাগল। সিনেমার স্পেশাল এফেক্টের মত দ্রুত বিশ বছর বেড়ে গেল বয়স। গালের চামড়া ঝুলে পড়ল। তেল ফুরানো কুপির মত টিম টিম করছে।

'এভাবে সবকিছুর পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন ভাবছেন আপনি?' দীর্ঘ সময় নীরব থেকে বলল সে।

'আপনারা ভেবেছিলেন ববির মত অমানুষকে ক্ষমতায় বসিয়ে সবকিছুর পাশ কাটাতে পারবেন। তাকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারবেন। আমি টিভদের ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর একটা সুযোগ করে দিতে চেয়েছি। সেই সঙ্গে চেয়েছি গুন্থারকে এমন শিক্ষা দিতে, যাতে জীবনে আর কখনও আমার পিছনে লাগার মত দুঃসাহস না হয় তার,' শ্রাগ করল রানা।

'এখন... কেউ ক্রিস্টাল মাউন্টেনের প্ল্যাটিনাম পেতে চাইলে তাকে সামনের দরজা দিয়ে আসতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজার দর অনুযায়ী কিনে নিতে হবে। টাকাগুলো জমা হবে এই দেশের কোষাগারে। এই দেশের উন্নয়নে ব্যয় হবে সে-টাকা।'

হফম্যানের দিকে তাকাল মার্টিন। তার হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছেন ডক্টর ওকোই। চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। কোনওদিকে নজর নেই লোকটার। হম্বি-তম্বি দূরের কথা, গুলি খাওয়ার পর থেকে একবারও চোখ তুলে তাকায়নি রানার দিকে। লজ্জা পেয়েছে হয়তো। এ মুহূর্তে নিজের পরিণতির কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। ওদিকে ববিকে মাটি থেকে টেনে তোলা সম্ভব না হওয়ায় ওই অবস্থায়ই হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। ঘর কাঁপিয়ে নাক ডাকাচ্ছে লোকটা এখন।

ঘড়িতে চোখ বোলাল রানা। 'প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিমের আসার সময় হয়েছে। এটা তাঁর দেশ। এই দেশকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিলেন আপনারা। এর শাস্তি কী হতে পারে, তা তাঁর সরকারই ঠিক করবে। আমার ধারণা, ফাঁসি হবে আপনাদের দুজনের। অ্যাট লিস্ট।'

কিছু সময় গুম মেরে থাকল পিটার মার্টিন। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠল একটু একটু করে। মনে মনে কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোল জাতীয় কিছু একটা বের করে রানাকে দেখাল সে। আকারে বেশ ছোটো ওটা। চ্যাপ্টা ধরনের। লাল ও নীল রঙের দু'টো বাটন আছে ওটায়। 'এটা কী জানেন?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রানা। মুখে কৌতুকের হাসি।

'আপনার শরীরে বসানো ডিভাইসটার ভাগ্য-বিধাতা। আমি এই লাল বাটনটা টিপলে মিস্টার গুন্থার বুঝে যাবেন মিশন ফেইলড। তারপর কী ঘটবে বুঝতে পারছেন আশা করি?' তিক্ত হাসি হাসল সে। 'আমরা ব্যর্থ হয়েছি, ঠিক আছে। পরাজয় মেনে নিয়েছি। পরিণতি যা হয়, হবে। কিন্তু তুমিও পার পাবে না, মিস্টার। তোমার বাঁচা-মরা এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

লাল বাটন টিপে দিল সে। রানার হাসি অমলিন থাকল।

লণ্ডন। অফিসে দুপুর থেকে অস্থির প্রতীক্ষায় আছে রুডলফ গুন্থার। প্যাডে তুফান বেগে আঁকিবুঁকি করছে। আসলে হাত স্থির রাখতে পারছে না কোনওমতে। হয় আঁকিবুকি করছে, নয়তো হাত কচলাচ্ছে। উঠে পিকচার উইণ্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু পারছে না। চেয়ারের সঙ্গে পেরেক দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যেন তাকে।

ব্রিফকেসটা চেয়ারের পাশে মাটিতে রাখা। মাসুদ রানার হাতে বসানো ডিভাইসের রিমোট কণ্ট্রোলটা রয়েছে বুক-পকেটে। ওটা বের করে টেবিলের উপর রাখল গুস্থার। ডায়ালের দিকে বারবার চোখ যাচ্ছে। ঘড়ি অনুযায়ী এখন থেকে যে কোনও মুহূর্তে পিটার মার্টিনের সিগনাল দেয়ার কথা। পজিটিভ হলে সবুজ সিগনাল, আর রানা বেইমানি করলে লাল।

বুকের ভেতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে গুস্থারের। ক্লারেন্সে এই মুহূর্তে কী চলছে, কল্পনা করার চেষ্টা করল। বারবার মুখ, গলা শুকিয়ে উঠছে। উত্তেজনা বাড়ছে। ঝাঁ-ঝাঁ করছে কান। গরম বাতাস বের হচ্ছে নাক-মুখ দিয়ে। অনেক বড় বাজি ধরেছে সে।

সাইমন এনডিনের আসার কথা ছিল আরও আধ ঘণ্টা আগে। দু'জনে মিলে শেষ দৃশ্যটা উপভোগ করার কথা ছিল। কিন্তু... করছে কী বদমাশটা? ভাবল গুস্থার। এখনও আসছে না কেন? আশ্চর্য! জীবনের এমন এক টার্নিঙের মুহূর্তেও মানুষ এরকম বেহুঁশ হয়! একটা টেলিফোন...

হাত ফসকে কলমটা নীচে পড়ে গেল। ওটা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য ঝুঁকতে যাবে, হঠাৎ চক্ষুস্থির হয়ে গেল গুস্থারের। ইণ্ডিকেটর জ্বলছে! টেবিলের উপর রাখা রিমোট-কণ্ট্রোল সঙ্কেত দিচ্ছে!

কিন্তু... লাল! আঁতকে উঠল গুস্থার। লাল? লাল মানে? আহাম্মকটা ভুল করে... থেমে গেল। না, অসম্ভব! এমন ভুল মার্টিনের হতেই পারে না। তা হলে? ওর হুকুম অমান্য করেছে মাসুদ রানা? কোন্ সাহসে?

ঝাড়া দুই মিনিট বিস্ফারিত চোখে আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকল বিংশ শতাব্দীর পাইরেট। একভাবে জ্বলছে ওটা। প্রথমে চিকন ঘাম ফুটল গুস্থারের কপালে, সারা মুখে। তারপর দরদর করে নীচের দিকে গড়িয়ে নামতে লাগল। বিশুদ্ধ অক্সিজেনের অভাবে হাঁস-ফাঁস করতে লাগল সে। দৃষ্টিভ্রম? ভুল দেখছে? প্রতি মুহূর্তে আশা করছে সে, এখনই সবুজ হয়ে যাবে ওটা।

হলো না। অনেক, অনেকক্ষণ পর মনস্থির করল পাইরেট। রিমোট কণ্ট্রোলটা কাছে নিয়ে এল। নির্দিষ্ট বাটনটার ওপর বুড়ো আঙুল রেখে কিছুক্ষণ কী ভাবল তা সে-ই জানে! নজর স্থির। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে লাথি খাওয়া কুকুরের মত।

অবশেষে বাটন টিপে দিল গুস্থার।

পরক্ষণে একেবারে সামনেই তীব্র নীলচে একটা আলো ঝলসে উঠল। বিকট কড়াক্! শব্দে বিস্ফোরিত হলো ব্রিফকেসটা। মনে হলো কে যেন চেয়ার থেকে এক ঝটকায় তুলে ফেলল তাকে। গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল। উড়ে গিয়ে ঘ্যাক করে দেয়ালের ওপর আছড়ে পড়ল গুস্থার, সেখান থেকে ফ্লোরে।

আতঙ্কিত চোখে দেখল ডান হাত আর ডান পাটা নেই। উড়ে গেছে বোমার আঘাতে। স্রোতের মত রক্তে ভেসে যাচ্ছে দামি কার্পেট এমন সময় ঝট্ করে দরজা খুলে উঁকি দিল মিস কুক। পরক্ষণে তীক্ষ্ণ বাঁশির মত চিৎকার করে উঠল সে।

এক ঘণ্টা আগের কথা। হ্যামস্টিড গার্ডেন সাবার্ব-এর বাড়ি থেকে মিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল সাইমন এনডিন। অফিসে চলেছে সে। একটু পর মার্টিন সংকেত পাঠাবে ক্লারেন্স থেকে। তারপর,... সামনের দৃশ্য দেখে 'চারো চাক্কা জাম' হয়ে গেল তার। যমদূতের মত বিশালদেহী চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সামনেই। গেটের বাইরে আছে আরও দু'জন। ওরা সিভিলিয়ান পোশাক পরা।

তাদের একজনকে দেখামাত্র চিনল সে—সার রিচার্ডের বড় ছেলে, টমাস ম্যানসন। আরেকজনকে চিনতে পারল না। এশিয়ান মনে হলো চেহারা দেখে।

'ব্যস্ত নাকি, মিস্টার রিসার্চ অ্যানালিস্ট?' সামনের অফিসার বলল। মুখে বাঁকা হাসি।

সম্বোধনটা শুনে থমকে গেল এনডিন। 'আ-আপনারা...!' কোনওমতে বলল। একজনকে চকচকে হ্যাণ্ড কাফ বের করতে দেখে ঘামতে শুরু করল আইরিশ ষাঁড়। 'কী... ব্যাপার?'

'ডক্টর মার্টিন হুপার, প্রসপেক্টর জেমস ব্রাউন ও তার বোন, রায়না হাডসনকে হত্যার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করা হলো,' প্রথম অফিসার বলল। 'আপনার কিছু বলার থাকলে উকিলের মাধ্যমে বলতে পারবেন। এখন চলুন।'

ক্লারেন্স। চার্টার করা প্লেনে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে পৌঁছলেন নির্বাসিত প্রেসিডেন্ট জাঁ বিডেল ইব্রাহিম। এয়ারেপোর্টে তাঁকে রিসিভ করলেন ডক্টর ওকোইসহ নতুন মন্ত্রীসভার কয়েকজন হবু সদস্য, বিশিষ্ট জাংগারান। লেফটেন্যান্ট আতাসী নতুন প্যারা মিলিটারি বাহিনীর বিশ সদস্য নিয়ে গার্ড অভ অনার দিল তাঁকে।

এয়ারপোর্টেই প্রেসিডেন্টকে কু সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে জানালেন ডক্টর। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা আর মাসুদ রানার এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর মারা যাওয়ার কথা জানালেন। জানালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ববিসহ আটক দুই ব্রিটিশের কথাও।

সাধারণ জাংগারানদের প্রবল আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে প্যালেসে ঢুকলেন ইব্রাহিম।

ক্ষমতায় কে না কে আসে, এই নিয়ে সারাদিন মহাআতঙ্কে ছিল জাংগারানরা। কিন্তু প্রিয় নেতাকে দেখার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। স্বাধীনতা দিবসের মাত্র দু'দিন আগে এই অকল্পনীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনে উল্লাসে ফেটে পড়ল শহরের ছেলে-বুড়ো সবাই। রাস্তায় রাস্তায় নেচে-গেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগল শহরবাসী। মুহূর্তের মধ্যে চারদিকে বাজি-পটকা ফোটানোর মহোৎসব শুরু হয়ে গেল।

প্যালেসের গেটে জাংগারান নেতাকে রিসিভ করল মাসুদ রানা। ওকে দেখেই আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দিলেন তিনি। চোস্ত ব্রিটিশ উচ্চারণে বললেন, 'হ্যালো, দেয়ার, মেজর। নাইস টু মিট ইউ এগেইন।' দীর্ঘ সময় আলিঙ্গনে ধরে

রাখলেন ওকে। ঘন ঘন পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'ভেরি... ভেরি নাইস টু মিট ইউ।'

'মি টু, মিস্টার প্রেসিডেন্ট।'

একটু পর গম্ভীর হলেন তিনি। 'যুদ্ধে আপনার একজন সহকর্মীর মারা যাওয়ার খবর শুনে আমি বিশেষভাবে দুঃখিত, মেজর। রিয়েলি সরি।'

'দ্যাট'স অল রাইট, সার। মিশ্রি খান একজন সৈনিক ছিল। সব সৈনিকের মনেই বাসনা থাকে ন্যায়ের পক্ষে লড়তে গিয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করার। আমার বন্ধুও বীরের মতই বিদায় নিয়েছে। আ'য়্যাম রাদার প্রাউড অভ হিম।'

মৃতদেহগুলো দেখতে এলেন ইব্রাহিম। সবচেয়ে দামি জাংগারান টিকের তৈরি কফিনে দাফনের জন্য প্রস্তুত চার যোদ্ধার মৃতদেহ। কিমবার লাশও কফিনে ভরা হয়েছে, তবে সেটা আগের মতই অন্যগুলো থেকে দূরে, নিঃসঙ্গ পড়ে আছে। ক্যাপ খুলে মৃতদের সম্মান জানালেন প্রেসিডেন্ট।

দোতলায় উঠতেই পিটার মার্টিন ও হফম্যানের ওপর নজর পড়ল তাঁর। লোক দু'টোকে চেয়ারের সাথে বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে। ডক্টর ওকোই নিচু কণ্ঠে কিছু বলতে ও মাথার বন্ধ রুমটার দিকে তাকালেন ইব্রাহিম, যেটায় কর্নেল ববি আছে। রানার সঙ্গে কিছুক্ষণ চাপা কণ্ঠে কথা বলে নিলেন ইব্রাহিম, তারপর মাথা ঝাঁকালেন ওকোইর উদ্দেশে। তিন মিনিট পর ববিকে নিয়ে এলেন তিনি। একটু একটু টলছে সে এখনও।

সামনেই প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিমকে দেখে থতমত খেয়ে গেল দানব। ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনও বৈরিতা নেই দেখে ক্রমে আশ্বস্ত হয়ে উঠল।

'কর্নেল, দেশের সঙ্গে, দেশের মানুষের সঙ্গে বেইমানী করলে শেষ ফল কী হয়, তার নমুনা সামনেই আছে,' বললেন তিনি। 'এ দেশে একজন অভিজ্ঞ, যোগ্য সেনাপতির প্রয়োজন রয়েছে। আমি আপনাকে সেই পদটির জন্য উপযুক্ত মনে করি। আপনি যোগ দিলে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

ধীরে ধীরে হাঁ হয়ে গেল ববি। চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ব্যাপারটা ঠাট্টা কি না, বোঝার চেষ্টা করল। হাত তুলতে গিয়েও থেমে গেল কয়েকবার। তারপর যে-মুহূর্তে বুঝল ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়, সত্যি; প্রচণ্ড আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠল তার বিশাল কাঠামোটা। চোখ ভিজে উঠেছে। হঠাৎ ফ্লোর কাঁপিয়ে ঠকাশ্ করে স্যালিউট করল সে।

'ইয়েস, সার! আমি... আমি যোগ দিচ্ছি, সার!' হড়বড় করে উঠল সে। 'থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সার! থ্যাংক ইউ ইনডিড!'

'ইউ আ' মোস্ট ওয়েল কাম!' এই প্রথম এক চিলতে হাসি ফুটতে দেখা গেল প্রেসিডেন্টের মুখে। 'নিজের দায়িত্ব বুঝে নিন।'

প্রেসিডেন্ট'স স্টাডিতে রানার সঙ্গে প্রথমে কিছুক্ষণ একান্তে কথা বললেন প্রেসিডেন্ট। তারপর আতাসী, মার্সিয়া, ফায়জাসহ বাকি টিভ যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। 'কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে আমি আপনাদের অবদানকে ছোটো করব না। শুধু বলব, আধুনিক জাংগারোর ইতিহাসে আপনাদের কথা চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। বিশেষ করে আপনার অবদানের কথা, মেজর

মাসুদ রানা। আপনি আমার গরিব, অসহায় জাতিকে কত বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, সে আমি জানি। আমার লোকদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন আপনি, অস্ত্র দিয়েছেন। সত্যি, এত প্রাপ্তির ভার বহন করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। এ কথা চিরদিন মনে রাখব আমরা। আমি ঠিক করেছি, এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আপনার সহযোগীকেও পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সিটি স্কয়ারে কবর দেয়া হবে। এপিটাফে তাঁর নাম থাকবে সবার ওপরে। আমি নিজের এবং আমার দেশের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।'

রাতে গোমেজকে দেখতে সঙ্গীদের নিয়ে জাতিসংঘ হসপিটালে গেল মাসুদ রানা। নির্দিষ্ট দিনের তিনদিন আগে কেন হামলা চালানো হয়েছিল, মারাত্মক রকম নির্যাতিত লোকটাকে দেখে সে জবাব পেয়ে গেছে ফায়জা। ওদের চারজনকে দেখে গোমেজের যে দশা হয়েছিল, তা বর্ণনার অতীত।

টেমপেস্টের ক্যাপ্টেনসহ বাকি দুই কর্মচারীকে তাদের যাবতীয় পাওনার সাথে মোটা বোনাস দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে রানা। টেমপেস্ট এখন জাংগারান নৌ বাহিনীর সম্পদ।

আতাসী-মার্সিয়া দেশে ফিরে গেছে। মিশনের পারিশ্রমিক হিসেবে মাসুদ রানা যে টাকা জোর করে ধরিয়ে দিয়েছে, তা দিয়ে আগের চেয়ে বহুগুণ শানদার এক হোটেল খুলে বসেছে। চুটিয়ে ব্যবসা করছে ওরা। রানা জাংগারো মিশনে ওদেরকেই কেন ডেকেছিল, সে জবাবও পেয়ে গেছে।

ফায়জা তার ভাগের টাকায় আগের ব্যবসাটাকেই চারগুণ বড়ো করে ফেলেছে। তারও রমরমা অবস্থা এখন। রানার ডাক পেয়ে কিছু একটা সন্দেহ করলেও ওর মনে যে এই ছিল, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও বুঝতে পারেনি ফায়জা।

ওদিকে মিশ্রি খানের স্ত্রী সিঙ্গাপুরে তিন মাসের ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ। কিছুদিন আগে জাংগারান সরকারের খরচে স্বামীর কবর দেখতে গিয়েছিল সে। ভবিষ্যতের চিন্তা নেই শাহিনার। রানা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা রেখে গেছে তার নামে। প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকা পেতে থাকবে সে, আজীবন।

***

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET